নব-কথা গ্রন্থমালার পঞ্চম উপন্যাস

উপকণ্ঠ

ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
কলিকাতা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
বিরচিত

প্রকাশক
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন্ আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—দুই টাকা

ফাইন আর্ট ৫
৬০নং বিডন ষ্ট্রীট
শ্রীরাধারমণ দা
মুদ্রিত।

প্রীতিভাজন বন্ধু

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার

করকমলেষু

শৈলেন

কর্ম্মনিষ্ঠার গুণে ক্যাল্‌কাটা-পুলিশ-সার্ভিসে উচ্চপদ
ৃত করলেও শান্ত অমায়িকতা আজও তোমার মনের
ণ !

তার উপর আমার লেখা পড়তে তুমি ভালোবাসো।
ই এ বইখানি তোমার হাতে উপহার দিচ্ছি।

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১এ, চৌরঙ্গী টেরাস্
লিকাতা, শ্রাবণ, ১৩৪৯

উপকণ্ঠ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ-বসনা

শ্রাবণ মাস। শনিবার। রাত্রি প্রায় আটটা। বৈকাল হইতে সন্ধ্যার খানিক-পরে পর্য্যন্ত খুব ঝাড়া-বৃষ্টির পর বর্ষণ-শ্রান্ত প্রকৃতি কোনো মতে নিজেকে সম্বৃত করিয়া শান্ত হইয়াছে। চারিদিকে একটা থমথমে সিক্ত ভাব। আকাশের বুকে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কালো মেঘের মধ্য হইতে চাঁদের মৃদু জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িয়াছে।

টালিগঞ্জ ট্রাম-ডিপোর দক্ষিণে যে-রাস্তা বাঁকিয়া পুব-দিকে গোড়ের দিকে গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া বেশ সন্তর্পিত-গতিতে টু-শীটার মোটর হাঁকাইয়া এটর্ণি শরৎ গাঙ্গুলি চলিয়াছেন। গাড়ীতে ড্রাইভার বা ক্লীনার কিম্বা কোনো আত্মীয়-বন্ধু সঙ্গী নাই। তিনি একা চলিয়াছেন।

গাড়ীর চাকা পাছে শ্লিপ করে, এজন্য ঘণ্টায় দশ-পনেরো মাইল রেটে গাড়ী চালাইতেছেন। মনে অধীর কৌতূহল…

পূবদিকে খানিকটা পথ চলিয়া বাঁয়ে যেখানে ঠিক আতুর-আশ্রম, তার একটু আগে ডান দিকে সরু একটা পথ। পথ কর্দ্দমাক্ত। এ পথে গাড়ী চালাইতে গেলে কাদায় পাছে চাকা বসিয়া যায়, এই আশঙ্কায় শরৎ গাঙ্গুলি গাড়ী হইতে নামিলেন; নামিয়া ঘাসের উপর দিয়া কোনো মতে আত্মরক্ষা করিয়া হাঁটিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

এই পথের প্রান্তে বাগান-বাড়ী। সেই বাগান-বাড়ীতে তঁ শ্যালীপতি-ভাই রাঘব চাটুয্যে তাঁকে আসিতে বলিয়াছেন রা আটটায়···বিশেষ প্রয়োজন আছে ; এবং শরৎ যেন ঘুণাক্ষরে কাহা কাছে এ আগমনের সংবাদ না দিয়া আসিয়া দেখা করেন—রাঘব সম্বন্ধে শরৎকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

খানিকটা আসিবার পর উপরে শরৎ দেখিলেন, রাঘবের শেভ্রোলে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীতে ড্রাইভার নাই, লোক নাই বুঝিলেন, রাঘব তাহা হইলে আগে হইতেই বাগানে আসিয়াছেন এব তাঁহারি জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

মন একটু শান্ত হইল। সারা পথ মনে শুধু দুশ্চিন্তা জাগিয়া ছিল এ-বৃষ্টিতে এমন পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থানে রাঘব যদি না আসেন,·· পেট্রোল পুড়াইয়া এতখানি আসা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইবে! এখন রাঘবের মোটর দেখিয়া সে দুশ্চিন্তা কাটিল, রাঘব তাহা হইলে আসিয়াছে!

কিন্তু কি এমন প্রয়োজন যার জন্য সারা সহর ছাড়িয়া এই বর্ষা রাত্রে নির্জ্জন বন-গাঁয়ে আসিবার অনুরোধ? মনটা আবার অধীর কৌতূহলে ভরিয়া উঠিল।

গলি-পথে দূরে-দূরে তেলের বাতি জ্বলিতেছে। সেই বাতির আলোয় পথ দেখিয়া আরো খানিকটা আসিবার পরে দেখিলেন, একটি বাগান···বাগানের মধ্যে একখানা বাড়ী। এক-তলা বাড়ী। পাকা বাড়ী। বাড়ীর সামনের দিকে ঢাকা বারান্দা।

বাগানের ফটক খোলা ছিল। সেই খোলা ফটক দিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখেন, একখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। সেলুন-বডি বুইক-গাড়ী। গাড়ীতে লোকজনের চিহ্ন নাই!

…শরৎ বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন… হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে আর্ত্ত চীৎকার-ধ্বনি…স্ত্রীলোকের কণ্ঠ!

শরৎ চমকাইয়া উঠিলেন! যেদিক হইতে আর্ত্ত চীৎকার উঠিয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন…চীৎকার-ধ্বনি উঠিয়া তখনি নীরব হইল…সে চীৎকার আর শুনা গেল না। শরতের বুকের মধ্যে ছম্‌ছমানি! রাঘব তাঁকে আসিতে বলিয়াছেন…তিনি যেন একা আসেন! অথচ এ-বাড়ীতে স্ত্রীলোক…

হঠাৎ একটা ক্ষিপ্র পদ-শব্দে শরৎ চাহিয়া দেখেন, বাড়ীর ঢাকা-বারান্দায় একজন নারী…বারান্দায় জ্যোৎস্নার মৃদু আলো পড়িয়াছে… সেই জ্যোৎস্নার আলোয় দেখিলেন, নারী কম্পিত পায়ে বারান্দা হইতে নামিয়া ঝোপ-ঝাপের মধ্য দিয়া আসিয়া সেই সেলুন-বডি মোটরে উঠিয়া বসিলেন,—বাসিবামাত্র গাড়ীতে ষ্টার্ট এবং গাড়ী নিমেষে জাগ্রত হইয়া বাগান হইতে এক-ছুটে বাহির হইয়া গেল।

শরৎ স্তম্ভিত বিমূঢ় দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং তাঁর চোখের সামনে দিয়া স্বপ্নের মতো এ-ব্যাপার ঘটিয়া গেল!

শরতের চমক কাটিল। ভাবিলেন, গভীর রহস্য! কে ও নারী? কেন ঐ আর্ত্ত চীৎকার? গাড়ীর পিছনে তিনি ছুটিবেন?

অসম্ভব! এই জল-কাদায় তিনি ফটক পার হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী গিয়া পথে পড়িবে…তাঁর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ…ললাটে স্বেদ-বিন্দু দেখা দিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া শরৎ গাঙ্গুলি আসিয়া ঢাকা-বারান্দায় উঠিলেন এবং ভিতরের কামরায় প্রবেশ করিলেন।

কামরাখানি বড় এবং সজ্জিত। কামরায় আলো জ্বলিতেছে। ইলেক্‌ট্রিক আলো। সে আলোয় শরৎ চাহিয়া দেখেন, মেঝের —

কার্পেটের উপর একজন ভদ্রলোক মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছেন··· কার্পেটের সেখানটা রক্তে রক্তময়! লোকটির কণ্ঠে আর্ত্ত গ্যাঙানি রব।

শরৎ তার কাছে আসিলেন—নতজানু হইয়া ঝুঁকিয়া পাশে বসিলেন। যা দেখিলেন, শিহরিয়া উঠিলেন! এ যে তাঁর শ্যালীপতি-ভাই রাঘব! দেহে প্রাণটা এখনো আছে!

শরৎ ডাকিলেন,—রাঘব···

অতি কষ্টে রাঘব চাহিল শরতের পানে, বলিল—শরৎদা···

শরৎ কহিলেন—হ্যাঁ। ব্যাপার কি, রাঘব?

রাঘব বলিল—জল···জল···আমি বাঁচবো না!

শরৎ চারিদিকে চাহিলেন—ঘরের কোণে তেপায়া টেবিল। টেবিলের উপর জলের কুঁজা। কুঁজার মুখে কাঁচের গ্লাস। তাড়াতাড়ি এক-গ্লাস জল আনিয়া শরৎ সে গ্লাস ধরিলেন রাঘবের মুখে। গণ্ডূষ মাত্র বুঝি মুখের মধ্যে গেল···অনেকখানি জল রাঘবের দুই কষ বহিয়া বাহিরে পড়িল।

শরৎ বলিলেন—কে এ কাজ করলে, রাঘব?

কোনো মতে রাঘব বলিল—স্ত্রীলোক···

বলিতে বলিতে স্বর ভাঙ্গিয়া গেল ··

শরৎ বুঝিলেন, ঐ স্ত্রীলোকই···ঐ সজ্জিত বেশ···ছুটিয়া গিয়া মোটরে উঠিয়া বসিয়া নিমেষে অন্তর্ধান···

শরৎ বলিলেন—কে ও স্ত্রীলোক? বলো···বলো···

রাঘবের কণ্ঠে জড়িত স্বর ফুটিল—মুখে কালো ভেইল্ (ঘোমটা)··· মুখ দেখতে পাইনি। ছুরি মেরেছে···বুকে···শরৎদা···

—কিন্তু ওর নাম?

জড়িত কণ্ঠে আবার স্বর বাহির হইল—মী···রা···তুমি দেখো··· শরৎদা···

কণ্ঠ মিলাইয়া স্তব্ধ হইল···

শরৎ ডাকিলেন—রাঘব···রাঘব

সাড়া নাই! শরৎ বুঝিলেন, জীবন-দীপ চির-নির্ব্বাপিত হইয়াছে! তিনি যেন পাথরের মূর্ত্তি বনিয়া গেলেন···নির্ব্বাক···নিশ্চল···নিস্পন্দ!

এ ভাব কাটিল অনেকক্ষণ পরে···

যে গিয়াছে, তার পানে চাহিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে লাভ হইবে না! এখন ঐ কৃষ্ণ-বসনা···অবগুণ্ঠিতা নারী···ঐ বুইক গাড়ী···

হায়রে, গাড়ীর নম্বরটা যদি দেখিয়া রাখিতেন!

কিন্তু কেন দেখিবেন? কে জানিত, এখানে এমন ব্যাপার!

স্তম্ভিত ভাব কাটিলে শরৎ পাশের ঘরগুলিতে ঘুরিয়া সন্ধান করিলেন···যদি কোনো হদিশ মেলে!

কিন্তু এমন কোনো চিহ্ন দেখিলেন না, যাহাতে···

টেলিফোন ছিল। তখনি মনে পড়িল সমর মিত্রের কথা··· ক্যালকাটা পুলিশের ইন্‌সপেক্টর···লালবাজার ডি-ডিতে কাজ করেন! সমর মিত্রের সঙ্গে সামান্য জানাশুনা আছে! টেলিফোনের বই দেখিয়া তাঁর নম্বর দেখিয়া ফোন্ করিলেন ··পি-কে নাইন্ ফাইভ্ ওয়ান্!

সাড়া মিলিল—হ্যালো···

শরৎ বলিলেন—সমর বাবুর বাড়ী?

—হ্যাঁ···

—আপনি সমর বাবু?

—স্পীকিং। (আমি কথা বলিতেছি)।

—ও…নমস্কার। আমার নাম শরৎ গাঙ্গুলি…ধীরেন চাটুয্যে মহাশয়ের জামাই আমি…

সমর বলিলেন—বটে! এটর্ণি…বুঝেছি…বলুন…

শরৎ গাঙ্গুলি সংক্ষেপে ঘটনা বলিলেন।

শুনিয়া সমর মিত্র বলিলেন—লোকাল পুলিশকে খপর দেওয়া হয়েছে?

—না। এখনি চোখের নিমেষে সব ঘটলো! আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে রাঘব এইমাত্র চোখ বুজেছে…

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ…বাড়ীটা কোথায়?

শরৎ গাঙ্গুলি নির্দ্দেশ দিলেন! দিয়া বলিলেন—আমি অকূল পাথরে পড়েছি…তাই আপনাকে স্মরণ করছি।

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ, আমি যাচ্ছি! আপনি ইতিমধ্যে টালিগঞ্জ পুলিশে ফোন্ করে খপর দিন…বেঙ্গল পুলিশের আণ্ডারে সে টালিগঞ্জ থানা…ক্যালকাটা পুলিশের থানায় নয়…

বেশ…কিন্তু আপনাকে কতক্ষণে expect (আশা) করতে পারি?

সমর মিত্র বলিলেন—যেতে যেটুকু সময় লাগে…

—ট্যাক্সিতে আসছেন তো?

—নিশ্চয়। তার কারণ, আমার গাড়ী বিগড়ে আছে।

—দয়া করে' ট্যাক্সিতেই আসুন…

—অল্ রাইট্…

সমর মিত্র ফোন্ ছাড়িয়া দিলেন।

শরৎ গাঙ্গুলির বুকের মধ্যে সমুদ্র যেন গর্জ্জন তুলিয়াছে…

হঠাৎ তিনি ভাবিলেন, মীরা…শ্যালিকা মীরার কথা!

রিসিভার লইয়া ফোন্ করিলেন মীরার গৃহে। শুনিলেন, মীরা গিয়াছে সিনেমায়···

শরৎ বলিলেন—কোন্ সিনেমা ?

জবাব মিলিল—চিত্রা···

শরৎ বলিলেন—আচ্ছা···

তিনি দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। আমোদ করিয়া সিনেমা দেখিতে গিয়াছে · বেচারী···এখানে তার কি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! কি করিয়া সেখানে এ-সংবাদ দিয়া মীরাকে এখানে আনিবেন ?··

মনের মধ্যে যেন আকাশের বজ্র-বিদ্যুৎ উন্মত্ত-তাণ্ডবে নৃত্যমাতন সুরু করিয়া দিল!

তারপর আধঘণ্টা সময় কি করিয়া তিনি কাটাইলেন···শরতের যেন ফাঁশির হুকুম হইয়াছে!

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাহিরে ট্যাক্সির হর্ণ শুনিয়া শরৎ বাহিরে আসিলেন। ট্যাক্সি হইতে নামিলেন সমর মিত্র···এবং তাঁর সহকারী গুণময়।

সমর মিত্র বলিলেন—টালিগঞ্জ থানায় খপর দেছেন ?

—দিয়েছি।

—তারা এখনো আসে নি ?

—না। তবে আসবে, বলেছে।

—আসতে বাধ্য। বেশ, আমরা এখন দেখাশুনা করি। কোন্ ঘরে ?

শরৎ বলিলেন—আমার সঙ্গে আসুন···

তিনজনে সেই কামরার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া সব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমর মিত্র চাহিলেন শরতের পানে, বলিলেন—এঁর স্ত্রীকে খপর দেছেন?

শরৎ বলিলেন…তিনি গেছেন চিত্রায় ছবি দেখতে। তাই সেখানে কি ব'লে খপর দেবো…দিই নি! এ খপর শুনে হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে!

সমর মিত্র বলিলেন,—এখন দশটা বেজেছে…তিনি স-ছটার শোতে গেছেন? না, সাড়ে নটার শোয়ে?

শরৎ বলিলেন—সাড়ে নটার শো…

—হুঁ…সমর মিত্র কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—পথে একখানা শেভ্রোলে গাড়ী দেখলুম…সচল তো?

—তা জানি না।

—আচ্ছা, গুণময়কে আমি চিত্রায় পাঠাই। ও ম্যানেজ করে আপনার শালীকে নিয়ে আসবে। We can't help (উপায় নেই)। তাঁকে দরকার। To have a last look at her dear husband (স্বামীকে একবার শেষ দেখা দেখুন) তাছাড়া দু' চারটে খপর বোধ হয় জানতে পারবো। এ বিপদের কথা লুকিয়ে রাখা চলবে না তো আজ রাত্রে, না হয় কাল সকালে তাঁকে জানাতেই হবে!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শরৎ বলিলেন—Poor girl (বেচারী বালিকা)!

সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে দেরী নয়…গুণময় চিত্রায় যাক! খোঁজ নিয়ে বলবে, এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে…তাঁকে আসতে হবে। এই কথা বলে তাঁকে নিয়ে আসুক…

বেশ···

তাহাই হইল। শেভ্রোলে গাড়ীখানা চালাইয়া গুণময় তখনি ছুটিল চিত্রা সিনেমা-হাউসের অভিমুখে···

সমর মিত্র বলিলেন—আসুন শরৎ বাবু···বাইরে বুইক গাড়ীখানা কোথায় ছিল···দেখি গিয়ে ··

শরৎ বলিলেন—তেমন আলো···

সমর মিত্র বলিলেন—আমার কাছে খুব জোরালো টর্চ্চ আছে···

দুজনে বাহিরে আসিলেন···

সমর মিত্র বলিলেন—মুখে কালো কাপড়ের ঘোমটা···রাঘব বাবু সে কথা বলেছেন, এবং আপনিও দেখেছেন, মুখে কালো সিল্কের ঘোমটা···! তার উপর বৃষ্টি হয়ে গেছে! তা থেকে হয়তো কোনো-কোনো দিকে একটু কিনারা মিলবে···

তারপর গলির অপর প্রান্তে চাহিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—ও দিকে গোড়ের খাল না?

শরৎ বলিলেন—হ্যাঁ···

—ওদিকটাও দেখে আসি···

শরৎকে লইয়া সমর মিত্র খালের দিকে গেলেন···এবং সেদিকে সর্ব্বত্র টর্চ্চের আলো ফেলিয়া গভীর অভিনিবেশ-সহকারে যতখানি সম্ভব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিলেন···

তারপর ফিরিলেন বাড়ীর সেই বড় কামরায়···

বলিলেন—চাকর-বাকর নেই?

—দেখি নি।

—জলের কুঁজোয় জল ছিল?

—ছিল।

—পাশের ঘরে দেখলুম একানে খাট···তাতে বিছানা · ধপধপে বিছানা···কোণের আলনায় কাপড়-চোপড় নেই! কিন্তু খাটের ধারে ছোট একখানা রুমাল···মেয়েদের রুমাল! রুমালে সেণ্ট!···

সে ঘরের মেঝে কার্পেটে ঢাকা। দু'ঘরের কার্পেটে কাদা লাগিয়া আছে···কাদায় জুতার দাগ! সমর মিত্র বলিলেন—বৃষ্টির পর এই স্ত্রীলোকটি বাগানে এসেছিল···রাঘব বাবু এসেছিলেন বৃষ্টির আগে।··· বৃষ্টির পরে তিনি এলে তাঁর জুতোর দাগ পড়তো কার্পেটের গায়ে···

রাঘবের মৃত দেহ তিনি ভালো করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এমন সময় টালিগঞ্জ থানা হইতে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সমর মিত্রকে দেখিয়া ইন্‌সপেক্টর রহমন্ বলিল,—আপনি এসেছেন স্যর···আঃ, বাঁচা গেল!

সমর মিত্র বলিলেন—জুতো খুলে ঘরে ঢুকো হে। কার্পেটে যে কাদার দাগ আছে, সে-দাগের সঙ্গে তোমাদের জুতোর কাদা মিশি দিয়োনা যেন!

রহমন্ বলিল—না স্যর, জুতো খুলে ঘরে ঢুকবো!

সমর মিত্র বলিলেন—লাশের কাছে ছুরি পড়ে আছে···আমি ছুঁইনি। এবার ছুরিখানা দেখবো। কিন্তু তার আগে শরৎ বাবুর সঙ্গে কথা আছে। তুমি লিখে নাও রহমন্, শরৎ বাবু যা বলবেন···

এই কথা বলিয়া সমর মিত্র চাহিলেন শরতের পানে···বলিলেন—রাঘব বাবুর কথা হোক এবার···

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনিশ্চিত

শরৎ বলিলেন—বলুন…

সমর মিত্র বলিলেন—রাঘব বাবু আপনার ভায়রা-ভাই…এবং রাত্রি আটটায় তিনি এখানে এসে আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন…সব কথা আবার বলুন, শুনি!

শরৎ বলিলেন—বলি…অর্থাৎ রাঘব বাইরে গিয়েছিল…গত বুধবার ফিরেছে। তারপর আমি জানি, আজ সকলে তার আবার বাইরে যাবার কথা পাকা।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি যদি তা জানতেন, তাহলে এখানে আজ রাত্রি আটটায় তাঁর সঙ্গে তিনি দেখা করতে বলেছেন সে সম্বন্ধে কোনো খোঁজ-খপর নিলেন না?

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—আমার অফিসে শুক্রবার…মানে, কাল সে গিয়ে উপস্থিত…আমি তখন মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত। রাঘব বললে, কাল সকালে আবার আমি বাইরে যাবো দাদা…অর্থাৎ আজ যাবো। এই থেকেই আমি ঠিক করেছিলুম, সে আজ সকালে কলকাতা ত্যাগ করেছে!…তারপর আজ হঠাৎ দুপুরবেলায় অফিসে আমার কাছে এই টেলিগ্রাম এসে হাজির…টেলিগ্রামখানা আমার পকেটে আছে। দিচ্ছি…

বলিয়া শরৎ গাঙ্গুলি পকেট হইতে খামের মধ্যে ভাঁজ-করা টেলিগ্রাম বাহির করিয়া সমর মিত্রের হাতে দিলেন, বলিলেন—পড়ুন এ টেলিগ্রাম…

খোলা খামের মধ্য হইতে টেলিগ্রাম বাহির করিয়া সমর মিত্র পড়িলেন। তাহাতে লেখা আছে—

খুব দরকার। আজ রাত্রে দেখা হওয়া চাই। এ সম্বন্ধে কাহাকেও কোনো কথা বলিয়ো না। আমার জীবন-মরণের সমস্যা। টালিগঞ্জে রিজেন্ট-পার্কের আগে ভুবন সান্যালের বাগান-বাড়ী···আতুর-আশ্রমের একটু আগে দক্ষিণ-দিকে গলি,—সেই গলিতে বাড়ী। বাড়ীর দক্ষিণে গোড়ে-খাল। ও তল্লাটে অমন বাড়ী-বাগান আর নাই। নিশ্চয় আসিবেন রাত্রি আটটায়—নহিলে আমার দুঃখ ভোগের সীমা থাকিবে না।

রাঘব

টেলিগ্রামখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া সমর মিত্র বলিলেন,—টেলিগ্রাম এসেছে হাওড়া থেকে। আচ্ছা শরৎ বাবু, কলকাতার বাইরে রাঘব বাবুর কোথায় যাবার কথা ছিল?

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—তা আমি জানি না।

—আপনার সঙ্গে কিসের পরামর্শ ছিল, তা বলতে পারেন?

—তাও বলতে পারি না। এ টেলিগ্রাম শুধু নয়···বেলা প্রায় তিনটের সময় আমাকে আবার সে ফোন্ করেছিল। ফোনেও একই অনুরোধ···রাত আটটায় নিশ্চয় দেখা করবেন···জরুরি পরামর্শ আছে।

সমর মিত্র চুপ করিয়া রহিলেন। কুঞ্চিত ললাট···মাথায় চিন্তার তরঙ্গ!

মৃদু স্বরে শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—কিসের পরামর্শ, সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই। তবে কথা যা বল্লে, গলার স্বর অবসাদে আচ্ছন্ন মনে হলো! জিজ্ঞাসা করলে, টেলিগ্রাম পেয়েছি কি না? আমি বললুম, পেয়েছি। তাতে বললে, আরো sure (নিশ্চিত) হবার জন্য ফোন্ করেছে! আমি একবার জিজ্ঞাসা করলুম, সহরে এত জায়গা

থাকতে হঠাৎ সহরের প্রান্তে বনালয়ে দেখা করবার মানে কি? তাতে বললে, কারণ আছে! দেখা হলে সে-কারণ বলবে! তারপর কি কতকগুলো যে বললে, তার মানে বুঝলুম না! কেমন excited (উত্তেজিত) ভাব। আর কথাগুলো incoherent (ছাড়া-ছাড়া) গোছ!

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার শালীর নাম মীরা? রাঘব বাবুর স্ত্রী?

—হ্যাঁ।

—তিনিও কিছু জানেন না?

—রাঘব আমায় কোনো মতে মীরার নামটুকু বললে! তাতে আমার ধারণা হলো, মীরা এ সম্বন্ধে কিছু জানে না!

রহমন্ সাহেব বলিল—ভদ্রলোকের দেনা ছিল বাজারে?

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—তা আমি জানি না।

সমর মিত্র বলিলেন—কাল···মানে, শুক্রবার আপনার অফিসে তিনি যখন গেছলেন, তখন তাঁর ভাব-ভঙ্গীতে এমন কোনো বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করেছিলেন···

সমর মিত্রের মুখের কথা লুফিয়া লইয়া শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—কৈ, না···যা বলেছি, ঐ অবসন্ন ভাব, তা ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করিনি। তবে অফিসে আমার মস্ত একখানা খাম রেখে গেছে।

—তার মধ্যে কি আছে?

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—শীল-করা খাম। ভিতরে কি আছে, আমি সে সম্বন্ধে তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিনি, সেও আমাকে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলে নি!

—সে খাম কোথায় আছে?

—আমার অফিসের সিন্দুকে। মক্কেলদের দলিল-পত্র যেখানে থাকে, সেই সঙ্গে আছে।

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···আচ্ছা, আপনার সঙ্গে রাঘব বাবুর যখন শেষ কথা হলো, তখন কত রাত ?

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—ন'টার পর এবং স'নটার মধ্যে! যারা গেলে আমি ঘড়ি দেখেছিলুম··· এমনি! কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়··· তখন ঘড়িতে ঠিক স'নটা!

সমর মিত্র বলিলেন—ডাক্তার থাকলে জিজ্ঞাসা করতুম, ক'টার সময় ছুরির ফলা বুকে বিঁধেছিল···

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—আমি যখন ফটকে ঢুকলুম, তখন আবছা আঁধার! পথে জল-কাদা···আমি খুব সন্তর্পণে আসছিলুম। টালিগঞ্জের এদিকটায় সাপের ভয় আছে···বর্ষা-রাত···বাড়ী নিঝুম নিস্তব্ধ··হঠাৎ মেয়ে-গলায় চীৎকার শুনলুম···চকিতের জন্য! শুনে আমি থ? রাঘব আমাকে এখানে আসতে বলেছে। জরুরি পরামর্শ··কিন্তু বাড়ীতে স্ত্রীলোক আসে কোথা থেকে? রাঘবের স্ত্রীলোক-ঘটিত দুর্ব্বলতা ছিল কি না, তা আমার জানা নেই। তাই নানা চিন্তায় আমার যেন কেমন স্তম্ভিত ভাব···এবং সে স্তম্ভিত ভাব কাটলো সেই কালো-কাপড়ের ঘোমটা মুখে স্ত্রীলোকটিকে দেখে। স্ত্রীলোকটি এত চকিতে গাড়ীতে উঠলেন এবং গাড়ীতে এত শীঘ্র ষ্টার্ট দিয়ে চলে গেলন যে চোখের পলক পড়তেও বুঝি অতখানি সময় লাগে না!···চমক ভাঙ্গতে আমি দেখি, ও-গাড়ীর পিছনে এ জল-কাদায় ছোটা মিথ্যা, তখন আমি ঘরে এলুম···

সমর মিত্র বলিলেন—সে কথা আমি শুনেছি···তবে রহমনের শোনা দরকার! এ ব্যাপারে আপনি হলেন প্রধান সাক্ষী···ফাষ্ট

ইন্‌ফর্মেশন আপনিই দিচ্ছেন! আপনার মুখ থেকে সব কথা শুনে উনি লিখে নেবেন···ওর ডায়েরী!

শরৎ গাঙ্গুলি আবার গোড়া হইতে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। রহমন্‌ সাহেব সব কথা সবিস্তারে লিখিয়া লইলেন···

সমর মিত্র লাশের দেহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন···এ-ঘর-ও-ঘর ঘুরিলেন···টেবিলের টানা টানিলেন···আলমারির কপাট খুলিলেন··· এবং প্রায় চব্বিশ মিনিট পরে আবার এ ঘরে ফিরিলেন।

রহমনের জবানবন্দী লেখা তখন শেষ হইয়াছে···

শরৎ গাঙ্গুলিকে উদ্দেশ করিয়া সমর মিত্র বলিলেন—আপনার ভায়রা-ভাই আমাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুললেন, শরৎ বাবু। দেখবেন আসুন, আলমারির মধ্যে আন্‌কোরা দুপ্রস্থ ইংরেজী সুট! রাঘব বাবু এখানে তো ধুতি-জামা ঘরে পড়ে আছেন। তিনি সুট পরতেন না কি?

—দেখি···

পাশের ঘরে গিয়া সকলে আলমারির মধ্যে রক্ষিত বিলিতী সুট দেখিলেন···

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—কলকাতার কুইনি কোম্পানির দোকানের সুট···বেশ দামী সুট।

সমর মিত্র বলিলেন—ভদ্রলোক খুব সৌখীন এবং সাহেবী মেজাজের ছিলেন?

শরৎ বলিলেন—না।

সমর মিত্র বলিলেন—দুপ্রস্থ নতুন সুট···আন্‌কোরা···আরো দুপ্রস্থ পুরানো যা রয়েছে, তাও দামী। ঐ কুইনি কোম্পানির দোকানের।··· আলমারিতে জিনিষ-পত্রও যা দেখছি···

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—টালিগঞ্জে কোনো কালে তার কোনো রকম আস্তানা ছিল বলে আমার জানা নেই !

সমর মিত্র বলিলেন—আমারো তাই মনে হচ্ছে…

শরৎ বলিলেন—দু-চারটে সখ তার ছিল, তবু ভারী হিসেবী ছিল রাঘব।

সমর মিত্র বলিলেন—তার উপর দেখেছেন, চার-পাঁচ জোড়া জুতোর বাক্স! পেটেণ্ট লেদারের যে পাম্পশু দেখছি, এর এক-জোড়ার দাম পনেরো-কুড়ি টাকার কম নয়। এই লেশওয়ালাটা…এ জোড়া মন্‌টিথের দোকানের…দাম যার নাম ত্রিশ টাকা। আর ঐ যে ক'টা টুপি…এ টুপি কিন্তু ঐ মৃত ভদ্রলোকের…সে বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—তা তো দেখছি! কিন্তু এই হ্যাট, ঐ ক্যাপ…

সমর মিত্র বলিলেন—আমার কেমন ধাঁধা লাগছে শরৎ বাবু…এ থেকে মুক্তি পাবো না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না…

এই অবধি বলিয়া সমর মিত্র চুপ করিলেন…রহমনের পানে চাহিয়া বলিলেন—তুমি একটু ঘুরে ছাখো হে রহমন, বাড়ীতে কিম্বা আশেপাশে মালী কি বেয়ারা-টেয়ারা কাকেও পাও কি না। মেঘ কেটে গেছে …চাঁদের জ্যোৎস্না ফুটেছে…তবে সাবধান, এ হলো নাগপুরের সামিল তোমাদের টালিগঞ্জের এদিকটায় সাপের ভারী উৎপাত! ফিল্ম-ষ্টুডিয়োগুলো থেকে ক'বার সাপ বেরিয়ে ছিল বলে শুনেছি।
—বিষাক্ত সাপ!

রহমন বাহিরে গেল, সঙ্গে থানার জমাদার-কনষ্টেবল। সমর মিত্র

একটা ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ভাবে দেহ-ভার বিন্যস্ত করিলেন···শরৎ গাঙ্গুলি বসিলেন খাটের বিছানায়।

সমর মিত্র বলিলেন—খাটের বিছানা ধপ্ ধপ্ করছে···বিছানা পাতা অথচ বিছানায় কেউ বসেছে বা শুয়েছে বলে মনে হয় না!

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—না। যত দেখছি, ততই রূপ-কথার সেই নিঝুম পুরীর কথা মনে পড়ছে, সমর বাবু।

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—আপনারা এটর্ণি মানুষ···রূপ-কথার ছায়া এখনো আপনাদের মনের কোণে জমে আছে···আশ্চর্য্য!

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—তা আছে কি না জানি না। তবে আমার মনে পড়ছে সেই রূপ-কথার গল্প। সাজানো পুরী···অথচ জন-মানবের চিহ্ন নেই!···না হলে দেখুন, টেলিফোন্‌টি পর্য্যন্ত অটুট-মজুত···এর বেশী কি আর চান?

সমর মিত্র বলিলেন—আমাকে একটু ভাবতে দিন। আমার মাথায় একরাশ কথা যেন সাপের মতো কিল্‌বিল্ করছে!

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—ভাবুন···আপনাকে বিরক্ত করবো না···

সমর মিত্র ধ্যানস্থ হইলেন। শরৎ গাঙ্গুলি বিছানায় কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন···অফিসে সারা দিন পরিশ্রম গিয়াছে···তারপর এখানে কি মনে করিয়া আসিয়া কত-বড় আঘাত পাইয়াছেন!

মীরা···হাস্যময়ী মীরা···বেচারী!

মীরার বিবাহ-রাত্রির কথা মনে পড়িল। যেন সে-দিনের কথা! সমারোহ না থাকিলেও কতখানি আনন্দ···মীরার চোখে-মুখে হাসির আলো! বয়সে তরুণ না হইলেও রাঘব সুপুরুষ···তার পাশে মীরাকে কি চমৎকার মানাইয়াছিল! যেন প্রতিমা!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লাশ দাবী

রহমান ফিরিল, বলিল—এটা দেখুন তো স্যর···

বলিয়া একখানা সাদা কাগজ দিল সমর মিত্রের হাতে। কাগজের উপর দু'তিনটা লাইন লেখা। একই কথা···দু'বার পর-পর লেখা হইয়াছে। লেখা আছে—

শরৎদার শুভ-কামনায়

রাঘব-মীরা

কথাগুলো ইংরেজী অক্ষরে লেখা।

এ-কাগজ দেখিয়া সমর মিত্র উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—আপনার জন্ম-দিন আসন্ন না কি শরৎ বাবু?

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—হ্যাঁ। পরশু আমার জন্মদিন···

সমর মিত্র বলিলেন—পরশু জন্মদিন! কিন্তু এ কাগজে হঠাৎ হাতের লেখা মকসো করবার কি কারণ থাকতে পারে? দেখুন শরৎ বাবু···দুটি লেখায় একটু-আধটু তফাৎ আছে। তাই দেখলে মনে হয়···লেখা মকসো প্রাকটিশ করেছে!

রহমন বলিল—আর একটি জিনিষ পেয়েছি স্যর···বাইরের ঢাকা-বারান্দা থেকে। বোধ হয়, হীরে···

রহমন দিল সমর মিত্রের হাতে একখণ্ড হীরা···

সমর মিত্র বলিলেন—আর একটি জিনিষ আমি পেয়েছি রহমন···ভাখো।

বলিয়া পকেট হইতে তিনি ব্রোঞ্জের তৈরী ছোট একটি পক্ষীরাজ ঘোড়া দিলেন…ঘোড়ার পিঠে পরী…

সমর মিত্র বলিলেন—এ মূর্ত্তি বোধ হয় ছিল ঐ বুইক-মোটরের মাথায়! আর হীরেটা নিশ্চয় কারো আংটি থেকে খশে গেছে। বোধ হয় সেই কালো সিল্কের ঘোমটা-ঢাকা মেয়ে…তাঁরি হাতের আংটি থেকে!

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—গাড়ীর নম্বর না পেলেও এ দুটি থেকে গাড়ী ধরা বোধ হয় শক্ত হবে না!

—দেখি…বলিয়া সমর মিত্র আবার চিন্তা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। রহমন বাহিরে গেল। শরৎ গাঙ্গুলি রহিলেন বিছানায় তেমনি অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে…

চারিদিকে বিপুল স্তব্ধতা…বাহিরে মাঝে মাঝে শুধু ভেকের রব… এবং জল-সিক্ত বনানীর বুকে ঝিল্লীর অবিরাম রাগিণী…

হঠাৎ বাহিরে একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল…

সমর মিত্রের ধ্যান ভাঙ্গিল। শরৎ গাঙ্গুলি লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—মীরা এলো বুঝি…

সমর মিত্রকে কোনো কথা বলিতে হইল না। বাহিরে গুণময়ের স্বর শুনা গেল…

গুণময় বলিল—এইদিকে আসুন…শরৎ বাবুও আছেন…তিনি আগে এসেছেন।

যাঁকে উদ্দেশ করিয়া এ-কথা বলা হইল তাঁর মুখের কথা শুনা গেল না…

শরৎ গাঙ্গুলির বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো সশব্দে দুলিতে লাগিল···

মীরা ঘরে ঢুকিল...সস্মিত বেশ···যেন একখানি ছবি!

তাকে দেখিয়া শরৎ যেন কাঠ!

মেঝেয় মৃতদেহ দেখিবামাত্র মীরা উন্মাদিনীর মতো তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল···কণ্ঠে করুণ আর্ত্ত রব···

শরৎ গাঙ্গুলি চাহিলেন সমর মিত্রের পানে। সমর মিত্র স্তম্ভিত-প্রায়।

মীরা চিনিল···স্বামী রাঘব! কিন্তু···

ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বলিল—আজ সকালেই যে উনি গেলেন চাটগাঁ···সেখানে একজন সাহেব জুয়েলারি নেবে, কথা ছিল!

রাঘবের জুয়েলারির কারবার। দোকান ছোট···কিন্তু লাভ মন্দ হয় না। তাছাড়া কলিকাতায় পৈত্রিক তিন-চারখানি বাড়ী আছে। সে সব বাড়ী হইতে মাসে ভাড়া আদায় হয় প্রায় আড়াইশো টাকা। বাবুয়ানা জানে না, হিসাব করিয়া চলে। কিন্তু কৃপণ নয়। মন উদার ···মীরার সম্বন্ধে তার নিষেধ-শাসনের কোনো বালাই নাই। স্বামী-স্ত্রীতে খুব ভাব।···জুয়েলারির ব্যবসাটি তার পৈত্রিক। সকালে বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার সময় রাঘব মীরাকে বলিয়া গিয়াছে, পাঁচদিন বাহিরে থাকিবে। এ পাঁচদিন মীরা কি করিবে, সে সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছে—শনিবার রাত্রে রাঘবের খুড়তুতো ভাই মহেন্দ্রর সঙ্গে যাইবে চিত্রায়···রবিবারে যাইবে শরৎ বাবুর গৃহে···সোমবার আবার বায়োস্কোপ দেখা···মঙ্গলবার শরৎ বাবুর বাড়ী যাওয়া। রাঘব বাহিরে গেলে একা তার জন্য ভাবিয়া মন পাছে খারাপ হয়, এ জন্য এ ব্যবস্থা

আগে হইতেই করিয়া গিয়াছে। যখনই বাহিরে যায়···মীরার জন্য সুব্যবস্থা করিয়া তবে রাঘব বাহির হয়।···

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সমর মিত্র বলিলেন—আমায় মাপ করবেন··· আপনারা এত উতলা হচ্ছেন···মীরা দেবী বলছেন, ইনি তাঁর স্বামী··· কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার একটু সন্দেহ আছে। সে সন্দেহ নিরাকরণের জন্য আমি সকলের আড়ালে এক-জায়গায় ফোন্ করেছি···সে-জায়গা থেকে কারা আসেন, কি বলেন, আগে শুনুন···

বেদনায় মীরা যেন চেতন-হারা! শরৎ তার হাত ধরিয়া তাকে আনিয়া পাশের ঘরে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন···

মীরা ডাকিল—শরৎদা···

শরৎ বলিলেন—দুর্ভাগ্যের উপর আমাদের কোনো হাত নেই ভাই···

মীরা বলিল—আমাকেও মেরে ফেলতে পারেন না? সেই ছুরি··· সেটা এখানে নেই?

উত্তেজনার ঘোরে মীরা উঠিয়া দাঁড়াইতে চায়। শরৎ তাকে ধরিয়া রাখিলেন। বলিলেন—স্থির হও মীরা···এ রকম করলে কোনো উপায় হবে না বোন্। সমর বাবু কি বললেন, শুনলে তো···

তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে মীরা বলিল—পাগল হয়েছো শরৎদা···আমি চিনবো না তাঁকে···যাঁর ছায়া দেখলে বলতে পারি?

শরৎ গাঙ্গুলি কোনো কথা বলিলেন না। সত্য কথা! তিনিও চিনিবেন না? রাঘব তাঁর স্নেহের শ্যালীপতি-ভাই···তাঁকে কতখানি

মান্য করিত···ভালোবাসিত!···ভুল হওয়া অসম্ভব! তাছাড়া তাঁকে দেখিয়া কাতর মুমূর্ষু কণ্ঠে রাঘবের সেই আহ্বান···শরৎদা···তাঁকে বলিল, স্ত্রীলোক···তার মুখে কালো কাপড়ের ঘোমটা···ছুরি···

অসম্ভব!

যারা চেনে, জানে, তারা বলিতেছে, রাঘব। মাঝখান হইতে সমর মিত্র বলিয়া বসিলেন, তাঁর মনে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে!

সমর মিত্র পাগল হইয়াছেন! না হয় মীরাকে মিথ্যা স্তোক দিতেছেন।

যার সব গিয়াছে, মিথ্যা স্তোক দিয়া তার সঙ্গে এ ছলনায় কোনো লাভ নাই!

মীরার মাথায় শরৎ হাত বুলাইতে লাগিলেন। মীরার কান্নার বিরাম নাই! ক্রন্দনে শ্রান্ত হইয়া ফোঁপাইতে লাগিল—তারপর সকল শোক, সকল ব্যথা-যাতনায় বিরাম দিতে নিদ্রা আসিয়া মীরার দুই চোখে আশ্রয় লইল। মীরা ঘুমাইল।

বাহিরে সমর মিত্র ঘুরিতেছেন···সঙ্গে রহমন, গুণময় এবং সিপাহী-পাহারাওলার দল···শরৎ পাথরের মূর্ত্তির মতো স্তম্ভিত বসিয়া আছেন!

অনেক কথা মনে জাগিতেছিল···মীরার কথা···বৃদ্ধা শাশুড়ী ঠাকরুণের কথা···স্ত্রী নীরজার কথা···

হঠাৎ বাহিরে যেন গাড়ীর শব্দ! ট্যাক্সি!

সঙ্গে সঙ্গে একটা কলরব···ঐ না সমর মিত্রের কণ্ঠ? হ্যাঁ। সমর মিত্র বলিলেন,—আসুন মিসেস চাকারবর্ত্তি···

তারপর জুতার দুপদাপ শব্দ···সে-শব্দ বারান্দা অতিক্রম করিল··· শব্দ ক্রমে বড় কামরায়···যেখানে মৃতদেহ···

সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠে স্বর,—উনি ! এঁ্যা···

আর এক রমণী-কণ্ঠে স্বর জাগিল,—বাবা···

এ কণ্ঠ কেমন একটু···

তারপর একটা চীৎকার···ক্রন্দন···! শরৎ চমকিয়া উঠিলেন।

মীরা ? সে ঘুমাইতেছে···

সন্তর্পণে উঠিয়া শরৎ আসিলেন বড় কামরায়। লাশের পাশে দু'জন মহিলা বসিয়া আছেন···একজনের বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে···আর একজনের বয়স বাইশ-তেইশ। দুজন পুরুষ আছে সঙ্গে···একজনকে শরৎ চিনিলেন—বঙ্কু···এটর্ণিপাড়ায় ঘোরে। কাপ্তেন পটাইতে ওস্তাদ। পিতৃহীন নির্কোধ কত ধনাঢ্য তরুণকে ফাঁদে ফেলিয়া বধ করিয়াছে, তার সংখ্যা নাই!

শরৎকে দেখিয়া বঙ্কু বলিল—এই যে স্তর, আপনি এখানে!

শরৎ বলিলেন—কিন্তু তুমি ?

বঙ্কু বলিল—মিসেস চাকারবর্ত্তির বিপদ শুনলুম। ওঁরা ধরলেন। বললেন, সঙ্গে এসো।

শরতের মনে নিমেষের দ্বিধা···তিনি বলিলেন—এ লাশ ?

বঙ্কু বলিল—মিষ্টার চাকারবর্ত্তির···কামিনী চাকারবর্ত্তি···কনট্রাক্টর···

—সত্যি ?

—হ্যাঁ। ওঁকে চিনি না স্তর ? তাছাড়া ওঁর স্ত্রী ইনি মিসেস্ চাকারবর্ত্তি···মেয়ে ঐ মিস্, চক্রবর্ত্তী···

এ কি হেঁয়ালি! সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে শরৎ চাহিলেন সমর মিত্রের পানে।

বিস্মিত কণ্ঠে সমর মিত্র বলিলেন—এমন দেখা যায় না। লাশের উপর দু'জনের দাবী!

বঙ্কু চাহিল সমর মিত্রের পানে। কহিল—তার মানে, স্যর?

সমর মিত্র বলিলেন—মানে এখন থাক···আগে এঁরা লাশ সনাক্ত করুন···

বঙ্কু বলিল—স্ত্রী···মেয়ে···ইনি কর্ম্মচারী বিভোর বাবু। এঁরা সকলে সনাক্ত করছেন। মোদ্দা আপনাদের কথা বুঝতে পারছি না! এ লাশ আর কারো বলে কেউ সনাক্ত করেছে না কি?

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ।

মিসেস চাকারবর্ত্তি মৃত দেহের গায়ে হাত রাখিয়াছিলেন···হাতে হীরার ব্রেশলেট···হীরার গায়ে বিজলী-বাতির আলো আসিয়া পড়িয়াছে···হীরা ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।

মিসেস চাকারবর্ত্তি একজন সোসাইটি-উয়োম্যান···সহরে তাঁর নাম-ডাক–আছে···ছেলেমেয়ে সকলেই বেশ স্বাধীন-মনের মানুষ? কাহারো তোয়াক্কা রাখে না।···

সমর মিত্র চাহিলেন মিসেস চাকারবর্ত্তির পানে, বলিলেন—ইনি মিষ্টার চকরবর্ত্তি···?

তিনি বলিলেন—আপনার সন্দেহ হয়?

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু আর-একজন মহিলা এসে সনাক্ত করেছেন তাঁর স্বামী বলে! তিনি বলেন, এঁর নাম রাঘব বাবু···ইনি মিষ্টার চাকারবর্ত্তি নন্।···দেখুন ভালো করে। চেহারায় হয়তো খানিকটা সাদৃশ্য আছে। তার উপর মিষ্টার চাকারবর্ত্তি হলেন সাহেব মানুষ···আর এঁর গায়ে দেখছি ধুতি-পাঞ্জাবি···বাঙালী!

বিরক্তি-ভরে মিসেস চাকারবর্ত্তি ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন।

সমর মিত্র বলিলেন—ব্যাপার রীতিমত জটিল, দেখছি।

বিভোর বলিল— কি নাম বললেন আপনি? রাঘব বাবু?

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ। ইনি হলেন রাঘব বাবুর শ্যালীপতি-ভাই…শরৎ গাঙ্গুলি হাইকোর্টের একজন নামজাদা এ্যাটর্ণি!

এ কথায় বিভোর চাহিল শরতের পানে,—বলিল—আপনি রাঘব বাবুর লাশ বলে সনাক্ত করেছেন?

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—শুধু আমি নই। রাঘব বাবুর স্ত্রীও সনাক্ত করেছেন!

বিভোর বলিল—স্ত্রী! Strange! (আশ্চর্য্য)

এ কথায় মিসেস চাকারবর্ত্তি চাহিলেন সমর মিত্রের পানে…তাঁর কণ্ঠে ছিল মুক্তার হার…সে হার দুলিয়া উঠিল।

মিসেস চাকারবর্ত্তি বলিলেন—এর মানে কি, বুঝতে পারছি না। এঁরা কারা? এখানে আমার স্বামীর দেহ…আর সেই দেহের সামনে এঁরা যা তা কথা বলে' ওঁর অপমান করছেন…আমাদের অপমান করছেন!

এ-কথার পূর্ব্বে মীরা আসিয়া কখন এ-ঘরে দাঁড়াইয়াছে, কেহ লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ মীরার মৃদু কণ্ঠস্বরে চমকিয়া সকলে চাহিল তার পানে…দেখে, মীরা…বিয়োগ-বেদনায় মলিন আতুর-মূর্ত্তি!

মীরা বলিল—আপনার স্বামী?…আমার এ বিপদে কেন আপনারা পরিহাস করছেন!

বিগলিত কণ্ঠ…মীরার কাতর দৃষ্টি ফিরিল শরৎ গাঙ্গুলির দিকে। মীরা ডাকিল—শরৎ দা…

শরৎ গাঙ্গুলি তাড়াতাড়ি আসিয়া মীরাকে ধরিয়া একখানা কৌচে বসাইয়া দিলেন।

মিসেস চাকারবর্ত্তির এত শোক...তবু বিরক্তির ঝাঁজে সে শোক কোথায় যেন উবিয়া গেল! তিনি বলিলেন—Who is in charge here? (এখানকার চার্জ্জ নিয়েছেন কে)? এত বড় বিপদের সময় নাট্যাভিনয় চলবে না কি? Disgraceful (গর্হিত-ব্যাপার)।

বঙ্কু চাহিল সমর মিত্রের পানে, কহিল—আপনি রয়েছেন, স্যর... আপনি সব বুঝিয়ে দিন।...মানুষ খুন হয়েছে, চক্ষে আমরা সকলে দেখতে পাচ্ছি! ইনি বলছেন, মিষ্টার চাকারবর্ত্তি! উনি বলছেন, ওঁর স্বামী! এমন আশ্চর্য্য কথা আমরা শুনিনি! হয়তো দু'জনের চেহারায় খুব মিল আছে...তারি জন্য...কিন্তু এমন ভুল কখনো কল্পনা করা যায় না! এবং যাঁরা সনাক্ত করছেন, তাঁরা বাইরের লোক নন, দূর-সম্পর্কের নন... স্ত্রী আর মেয়ে!

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—ইনি যে রাঘব বাবু...আমি তাঁর শ্যালীপতি-ভাই...ও-দেহ দেখে আমি চিনেছি। তাছাড়া আমি যখন এ ঘরে আসি, তখন ওঁর শেষ মুহূর্ত্ত...আমায় দেখে উনি আমায় শরৎদা বলে ডেকেছেন...ডেকে দু-চারটে কথাও বলেছেন! তারপর সব শেষ হয়ে গেছে!

রহমন বলিল—এ তো মহা-সমস্যার কথা হলো...

এ-কথার পর ক্ষণেক স্তব্ধতা...বিমূঢ়ের মতো সকলের দৃষ্টি পরস্পরের উপরে বিচরণ করিল।

সমর মিত্র ডাকিলেন—শরৎ বাবু...

শরৎ বলিলেন—বলুন...

সমর মিত্র বলিলেন—আপনারা ভুল করেছেন...আপনি এবং মীরা দেবী···দুজনেই। আমার মতে···

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—কিন্তু

সমর মিত্র বলিলেন—এঁরা যা বলছেন···তাছাড়া ও ঘরে যে বিলিতি স্থট দেখেছি, তা থেকেও প্রমাণ পাচ্ছি, এ স্থট সাহেব-সাজা বাঙালীর। রাঘব বাবু বাঙালী মানুষ। তিনি কখনো সাহেব সাজেন নি। লাশ দেখে মিসেস চাকারবর্ত্তি বলছেন, মিষ্টার চাকারবর্ত্তি··· সেই সঙ্গে স্থট মিলছে! এ থেকে মনে হয়, দু'জনের চেহারায় মিল আশ্চর্য রকমের···এক রকম চেহারা! এখন···

এই অবধি বলিয়া তিনি চাহিলেন মৃত দেহের পানে···

রহমন বলিল—এখন আমার কি কর্ত্তব্য?

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি লেখো যিনি যা বলছেন···তারপর আসল সনাক্ত যে ভাবে করতে হবে, আমার মনে হয়, তোমার সার্কেল-অফিসার নিতাই বাবুকে তা জিজ্ঞাসা করা দরকার। এ এলাকার মধ্যে আমি হঠাৎ কোনো পরামর্শ দিতে পারি না··· নিজে থেকে! আমি বলি, তুমি একবার নিতাই বাবুকে ফোন্ করো রহমন···

রহমন যেন শিহরিয়া উঠিল! বলিল—এত রাত্রে?

—উপায় কি?

—বেশ···

—তাঁকে বলো, যা হয়েছে···

রহমন গিয়া টেলিফোন্ করিল। ঘরের মধ্যে আর সকলে রুদ্ধ নিশ্বাসে বসিয়া রহিল।

সার্কেল ইন্‌সপেক্‌টরকে পাওয়া গেল। তিনি সব শুনিলেন রহমন বলিল—সমর মিত্র মশায়ও আছেন···ক্যালকাটা পুলিশের ডি-ডি-অফিসার সমর মিত্র।

শুনিয়া তিনি বলিলেন—তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে লাশ নিয়ে এসো।···পোষ্টমর্টেম হবে···তার আগে লাশের ফটো রাখা চাই।···আমি কাল সকালেই যাবো···গিয়ে স্বচক্ষে দেখবো—লাশ আর রিপোর্ট। ডায়েরি তুমি কমপ্লীট রাখো রহমন···

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুয়ে এক

ডাক্তারের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। লাশের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য দু'দল গিয়া পুলিশের কাছে দরখাস্ত দিল। মিসেস চাকারবর্ত্তির ব্যারিষ্টার দরখাস্ত দিলেন,···মৃত ব্যক্তি ছিলেন মিসেস চাকারবর্ত্তির স্বামী···কাজেই তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ার অধিকার মিসেস চাকারবর্ত্তির! শরৎ গাঙ্গুলি ব্যারিষ্টার লইয়া আর্জী পেশ করিলেন, ও-লাশ চাকারবর্ত্তির নয়; তাঁর শ্যালীপতি-ভাই রাঘবের। মৃত ব্যক্তি নিজে শেষ কথা কহিয়া গিয়াছেন তাঁর সঙ্গে···এবং ঐ বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ জানাইয়া যে-চিঠি লিখিয়াছিলেন, শরৎ গাঙ্গুলি সে চিঠি পুলিশের হাতে দিয়াছেন। তার উপর ঘটনার অব্যাহতি পরক্ষণে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ মৃত রাঘবের স্ত্রী মীরা

গিয়া লাশ সনাক্ত করিয়া বলিয়াছেন, এ তাঁর স্বামী রাঘবের মৃত দেহ!

ব্যাপার জটিল। কাজেই পুলিশ-সাহেব বলিলেন—আদালতে মৃতের ব্যক্তিত্ব প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত পুলিশ এ সম্বন্ধে কোনো আদেশ দিবে না! তবে আপোষে যদি এমন ব্যবস্থা হয় যে উভয়-পক্ষ মিলিয়া সহযোগীতায় দাহ করিবে, তাহা হইলে তেমন অনুমতি দানে আপত্তি থাকিবে না।

দু'পক্ষ তখন আপোষে সেই ব্যবস্থা করিল। অর্থাৎ মৃতদেহ লইয়া উভয়-পক্ষ গেল শ্মশানে এবং দু'পক্ষ মিলিয়া শ্মশান-কৃত্য সম্পাদন করিল।

তার পরের দিনের কথা বলিতেছি।

সুযোগ বুঝিয়া খপরের কাগজওয়ালারা বিভীষিকার সঙ্গে কৌতুক-রস মিশাইয়া কাগজে সংবাদ ছাপিল—

টালিগঞ্জের মাঠে সান্যালদের বাগান-বাড়ীতে শনিবার রাত্রি আটটায় যে হত্যা সংসাধিত হইয়াছে, তাহার বিবরণে রোমাঞ্চ থাকিলেও রোমান্স আছে অনেকখানি। অর্থাৎ কাল যে সংবাদ ছাপিয়াছি যে জুয়েলারি-ব্যবসায়ী রাঘব চাটুয্যের কথামত এটর্ণি শ্রীযুক্ত শরৎ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বাগানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন, ঘরের মধ্যে রাঘব বাবু অস্ত্রাহত পড়িয়া আছেন···মুমূর্ষু অবস্থা। এবং মৃত্যুকালে খুনীর সম্বন্ধে শরৎ বাবুকে মৃত ব্যক্তি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন! রাঘব বাবুর স্ত্রী সংবাদ পাইয়া অনতিবিলম্বে বাগানে গিয়া মৃত ব্যক্তিকে স্বামী বলিয়া সনাক্ত করেন। তারপর পুলিশ-কর্ম্মচারী সমর বাবুর আহ্বানে মিসেস চাকারবত্তি বাগানে আসেন। আসিয়া তিনি বলেন—সে দেহ তাঁর স্বামীর। দু'পক্ষের কেহই মৃতের উপর দাবী ত্যাগ করেন নাই। পোষ্ট-মর্টেমের পর উভয় পক্ষ মিলিয়া

মৃত-দেহের শ্মশান-কৃত্য সমাধা করেন। ঘটনা খুব রহস্যময় সন্দেহ নাই! কে হত্যা করিয়াছে তার জন্য আমাদের এখন তত চিন্তা নয়! আমাদের জিজ্ঞাস্য, মৃত ব্যক্তি কে, তাহার নির্দ্ধারণ পূর্ব্বে হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে কি? আশা করি, এ সম্বন্ধে অচিরে আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বেঙ্গল ও কলিকাতা পুলিশ-কৃতার্থ করিবেন

দুপুরবেলা। অফিসে শরৎ গাঙ্গুলি নিজের কামরায় একা বসিয়া আছেন। কাজে মন নাই! দু-চার জন মক্কেল আসিয়াছিল, শরৎ গাঙ্গুলি বিনীতভাবে জানাইয়াছেন,—দুদিন আমায় মাপ করবেন··· আমার মনের অবস্থা ভালো নয়···

একা বসিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন···

অনেক কথা ভাবিতেছিলেন। রাঘব যে নাই, সে সম্বন্ধে মনে তিলমাত্র সন্দেহ নাই! কিন্তু ঐ মিসেস চাকারবর্ত্তি···

সোসাইটি-উওম্যান! তাঁর মতো একজন মহিলা অপরের স্বামীকে নিজের স্বামী বলিয়া অমন দৃঢ় কণ্ঠে সনাক্ত করিবেন? অসম্ভব! মীরার মতো তিনি বিচলিত হন্ নাই, সত্য! কিন্তু সকলের মন ভগবান এক ধাতুতে গড়েন নাই। বিপদে কেহ আকুল হইয়া পড়ে, কেহ বা ধৈর্য্যশীল! তার উপর তাঁর কন্যা শ্যামলী! ডাগর মেয়ে! স মেয়েকে যতটুকু দেখিয়াছেন, ভালো বলিয়াই মনে হইয়াছে। সেই মেয়েই বা কিসের লোভে খুনী-লাশকে নিজের বাপ বলিয়া সনাক্ত করিবে? রাঘবের কি এমন লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী আছে যে ফিল্মের গল্পের মতো সে সে-জমিদারীতে ওয়ারীশনী-দাবী খাড়া করিবার জন্য মানুষ নির্লজ্জভাবে এতখানি অগ্রসর হইবে?

হঠাৎ টেলিফোনে বেল্ বাজিল। রিশিভার লইয়া শরৎ বলিলেন,
—হ্যালো···

জবাব শুনিলেন—আমি সমর মিত্তির। আপনার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন। অফিসে আসতে পারি?

শরৎ বলিলেন—নিশ্চয়।

—আচ্ছা, তাহলে দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি।

—আসুন।

শরৎ গাঙ্গুলির মনে দুশ্চিন্তা! হঠাৎ সমর মিত্র আসিতেছেন কেন?

মনের মধ্যে আবার প্রশ্নের ঘূর্ণীচক্র···তার আর বিরাম নাই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগিতেছে! কোনো প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষা রাখে না!

দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে সমর মিত্র আসিলেন। শরৎ তাঁকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের কামরায় বসাইলেন! ম্যানেজিং-ক্লার্ককে বলিয়া দিলেন, এ ঘরে কেহ যেন না আসে!

ম্যানেজিং ক্লার্ক বলিল—আচ্ছা···

ম্যানেজিং ক্লার্ক চলিয়া গেলে শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—চা? সিগারেট? পান?

সমর মিত্র বলিলেন—কিছু না। এই মাত্র চা খেয়ে আসছি··

—আচ্ছা, তাহলে বসুন।

সমর মিত্র বলিলেন—অনেক delicate কথা জিজ্ঞাসা করবো··· সেজন্য আপনার মৃত ভায়রা-ভাইয়ের স্মৃতির অপমান হতে পারে। তাতে বিচলিত হলে চলবে না!···আমার হাতে এ কেশ এনকোয়ারির

হুকুম-মোতাবেক না এলেও আমার ডেপুটি-সাহেবের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কয়ে খানিকটা সন্ধান আমি নিয়েছি। আর তারি জন্য···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি চাহিলেন শরতের পানে···

রুদ্ধ নিশ্বাসে শরৎ বলিলেন—আপনার কোনো প্রশ্নে আমি আঘাত পাবো না। আপনি অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন।

—বেশ।

বলিয়া সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন—আপনার শ্যালীর সঙ্গে রাঘব বাবুর বিয়ে হয়েছে কদ্দিন ?

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—আট বছর সাত মাস।

—বিবাহের সময় আপনার শ্যালীর বয়স কত ছিল ?

শরৎ বলিলেন—কুড়ি-একুশ বছর।

—অত বয়স পর্য্যন্ত তাঁর বিয়ে না দেবার কারণ ?

শরৎ বলিলেন— লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক ছিল। বি-এ পাশ করবার আগে বিয়ে করবে না, পণ করেছিল। আমার শ্বশুর-মশায়ও বলেছিলেন, আচ্ছা !

—বিয়ের সময় আপনার শ্বশুর-মশায় বেঁচে ছিলেন ?

—না।

—রাঘব বাবু নিজে এসে বিয়ের প্রস্তাব করেন ?

—হ্যাঁ। মানে, সেবারে মীরা বি-এ দেবে···তখন অঘ্রাণ মাস। আশ্বিন মাসে আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ শিলঙ্‌ গিয়েছিলেন। সেখানে আমার এক খুড়-শ্বশুর থাকতেন, তাঁর ওখানে। শাশুড়ীর সঙ্গে মীরাও গিয়েছিল। তারপর ওঁরা ফিরে আসেন অঘ্রাণ মাসে। ওঁরা ফিরে

আবার দিন দশ-পনেরো পরে রাঘব বাবু এসে শাশুড়ী-ঠাকরুণের সঙ্গে দেখা করেন। দেখা করে বলেন, তিনি বিপত্নীক···বিয়ে করতে চান্···ডাগর এবং লেখাপড়া-জানা মেয়ে। তাঁর মেয়েটিক তিনি বুঝি শিলঙে দেখেছিলেন আমার খুড়-শ্বশুরের বাসায়। খুড়-শ্বশুর মশায় রাঘবকে বিলক্ষণ জানেন-শোনেন। তাই থেকে বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকা হয়। রাঘবের ছিল পৈত্রিক জুয়েলারির কারবার। ছেলেমেয়ে নেই। শাশুড়ী-ঠাকরুণের পয়সার জোর ছিল না। পছন্দ হলো। বিয়ে আটকালো না! ··বিয়ে হলো অবশ্য মীরার বি-এ এগজামিন দেবার পর বৈশাখ মাসে।

—বিবাহে সমারোহ হয় নি নিশ্চয়?

—না। রাঘব বললে, তার কোনো কুলে কেউ নেই। তাছাড়া মিথ্যা জাঁক-জমকে খরচ করে কি দরকার?

সমর মিত্র বলিলেন—এই ক' মাসের মধ্যে অর্থাৎ আঘ্রাণ আর বৈশাখ মাস···এর মধ্যে রাঘব বাবু আপনার শাশুড়ী-ঠাকরুণের ওখানে যাতায়াত করতেন?

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—দু' বার নিজে গিয়েছিল···তা বিশ-পঁচিশ মিনিটের জন্য মাত্র···তাছাড়া আমার ওখানে রাঘব আসতো। আমাকে খুব মান্য করতো। আমার স্ত্রীকেও মান্য করতো।

সমর মিত্র বলিলেন—উপহার বিতরণ করতেন···? সে সময়ের মধ্যে?

—তা করেছিল। আমার স্ত্রীকে ভালো একটা হীরের আংটি দিয়েছিল। আর শাশুড়ী-ঠাকরুণের একটি বিগ্রহ ছিল; সে বিগ্রহের জন্য একটা বজ্রমুখী-পাথর এনে দিয়েছিল। তাছাড়া মীরাকে দিয়েছিল

একজোড়া চুনীর দুল। সে যা চুনী·· দেখে এখানকার অনেক জুয়েলার বলেছিল, দু' খানি চুনীর দাম পাঁচশো টাকার কম নয়!

শুনিয়া সমর মিত্র ক্ষণকাল ভাবিলেন, পরে বলিলেন—তারপর এই আট বৎসর আপনাদের সম্পর্ক ছিল মধুর?

—নিশ্চয়! রাঘবের মতো অমায়িক আর বিনয়ী লোক দেখা যায় না।

সমর মিত্র বলিলেন—আগে কোথায় বিয়ে করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নি?···

—মীরার কাছে বলতো, আগে বিয়ে হয়েছিল, সে-স্ত্রী ছিল দারুণ দুর্মুখ···স্বার্থপর···বিয়ে করে একটি দিনের জন্য সুখী হয়নি। ব্যবসার জন্য দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতো। তারপর সে-স্ত্রী মারা গেছে বলেছিল, সে স্ত্রীর সঙ্গে এক-মাসের বেশী দু'-মাস ঘর করেনি!

—হুঁ! আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কখনো প্রথম বিয়ের কথা হয় নি?

—না।···সে কথার প্রয়োজন কখনো ঘটে নি!

সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা···সে রাত্রে গুণময়কে আপনার শ্যালীকে আনবার জন্য পাঠানো হলে আমি ফোন্ করেছিলুম ···জানেন?

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—করেছিলেন, দেখেছিলুম। তবে কাকে ফোন্ করছেন, কেন করছেন, আমি খেয়াল করিনি। তার কারণ, আমার মন তখন এমন অভিভূত ছিল যে কোনোদিকে আমার খেয়াল ছিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি ফোন্ করেছিলুম ঐ মিসেস চাকারবর্ত্তির ওখানে···

'শরৎ গাঙ্গুলি নিস্পন্দ···তাঁর দু' চোখের দৃষ্টিতে অধীর কৌতূহল··· সে দৃষ্টি অবিচলভাবে সমর মিত্রের মুখে নিবদ্ধ!

সমর মিত্র বলিলেন—মানে, dead-body (মৃতদেহ) দেখে আমি চিনেছিলুম ওঁকে মিষ্টার চাকারবর্ত্তি বলে'। কামিনী চক্রবর্ত্তী শ্বশুরের কারবার দেখাশোনা করতেন। শ্বশুর হচ্ছেন মস্ত রেলওয়ে-কন্‌ট্রাক্টর! বি-এন্-আর কোম্পানীর কন্‌ট্রাক্টর। সেই কারবারের সূত্রে কামিনী চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল। ওঁর শ্বশুর-বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। ওঁর শ্বশুরের নাম বলরাম মুখুয্যে। দমদমায় থাকেন। বেঁচে আছেন। মিসেস চাকারবর্ত্তি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। বলরাম বাবু বাতে পঙ্গু; উঠতে পারেন না। আমাদের পুলিশ-স্পোর্টসে বলরাম বাবু বরাবর মোটা টাকা চাঁদা দিতেন। সেই সূত্রে আলাপ। তারপর বলরাম বাবুর বাড়ীতে সাহেব-সুবোর পার্টি লেগে থাকতো। সে সব পার্টিতে গিয়েছি-এসেছি। কাজেই কামিনী চক্রবর্ত্তীকে জানতুম তো···তাই লাশ দেখে আপনি আপনার ভায়রা-ভাই রাঘব বাবুর লাশ ব'লে চিনলেও আমার মনের ধোঁকা তাতে যায় নি শরৎ বাবু। তাই আপনার কথায় আপনার শ্যালীকে আনতে গুণময়কে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, বলরাম বাবুর মেয়ে অর্থাৎ মিসেস চাকারবর্ত্তিরও আসা দরকার। তিনি থাকেন ট্যাংরায়। সে বাড়ী আমি জানি। তাই মিসেস চাকারবর্ত্তিকে তাঁর কন্যাসহ আসবার জন্য আমি ফোন্ করেছিলুম। আমি জানতুম, তিনি এসে লাশ দেখে ঠিক বলবেন, তাঁর স্বামীর লাশ!···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সমর মিত্র চুপ করিলেন।

রুদ্ধ নিশ্বাসে শরৎ তাঁর পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁর মাথার

মধ্যে যেন একরাশ সরীসৃপ কিলবিল করিতেছে! তিনি ভাবিতে-ছিলেন, তা যদি হয়, তাহা হইলে…

সমর মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—*আপনি এটর্ণির ব্যবসা করছেন। মানব-চরিত্র সম্বন্ধে নিশ্চয় প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন! আপনার বিশ্বাস, মানে, যে-মানুষের* চেহারা দেখে, তার কথাবার্ত্তা শুনে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছেন খাশা লোক…পরে আচার-ব্যবহারে তাকে আপনার সে-ধারণার বিপরীত স্বভাবের দেখে শিউরে উঠেছেন কখনো?

প্রশ্ন শুনিয়া শরৎ চৌধুরীর কৌতূহল বাড়িল…

সমর মিত্র বলিলেন—মানুষকে বিশ্বাস করে সে-বিশ্বাস আপনার কখনো ভাঙ্গে নি?

কথাটা শরৎ বুঝিলেন। বলিলেন—নিশ্চয় ভেঙ্গেছে। ইংরেজীতে সেই যে কথা আছে all that glitters is not gold! (যাহা কিছু ঝকমক্ করে, তাহাই সোনা নয়), সত্য কথা! যাকে অমায়িক, শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছে, পরে বেশী অন্তরঙ্গতায় দেখেছি, সাপের মতো সে হিংস্র ক্রূর…

সমর মিত্র বলিলেন—Exactly…তাই।…চেহারা দেখে, কথাবার্ত্তা শুনে, আচার-ব্যবহার দেখে যাকে মনে হয়েছে মহাপুরুষ, পরে কাজে-কর্ম্মে দেখা গেছে, সে লোকের মনে রাবণ কুম্ভকর্ণ দুঃশাসন শকুনি আর মীরজাফর মিলে আক্রোশ-ভরে শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য ফন্দী-অভিসন্ধি আঁটছে!…আমার মনে হয়, সব মানুষের মধ্যে দুটোর বেশী না হলেও দুটি করে মানুষ বসে আছে…ঔপন্যাসিকেরা যাকে দেবতা আর দানব বলেছেন! এক-জন ভদ্রভাবে পরম-উপাদেয়

মিষ্ট কথায় আর আচরণে যেমন মুগ্ধ করছে, অপর-জন তেমনি বিষের ছুরি উঁচিয়ে পিঠে বসাতে উদ্যত! মুখে কেউ বলছেন···তোমার উন্নতিতে আমি ভারি খুশী···মনে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্বলছে হিংসার আগুন! মনে মনে তখন সঙ্কল্প আঁটছে, কি করে তোমার সর্ব্বনাশ করবো!···কিন্তু যাক, এতখানি ভূমিকার দরকার নেই। যা বললুম, তার মানে, আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না যদি আমি বলি, আপনার এই অমায়িক দেব-চরিত ভায়রা-ভাই রাঘব বাবুটি ছিলেন একজন এমনি ধরণের লোক···মিষ্টার জেকিল্ এ্যাণ্ড ডক্টর হাইড্ ষ্টাইলের লোক! আপনাদের কাছে বিপত্নীক নিরীহ রাঘব বাবু সেজে থাকলেও অন্যদিকে তিনি ছিলেন হীন স্বার্থপর ইতর-মনের কামিনী চক্রবর্ত্তী!

শরৎ গাঙ্গুলির বুকের উপর যেন বন্দুকের গুলি পড়িতেছিল! বুকখানা সে-আঘাতে বুঝি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল!

কোনো মতে সে ভাব কাটিলে তিনি শুনিলেন সমর মিত্র বলিতেছেন—আমি বলছি, ও-লাশ নিয়ে সেদিন যে-ব্যাপার ঘটলো··· আপনারা বললেন, রাঘব বাবুর লাশ···চাকারবর্ত্তি সাহেবের লাশ নয়। —আর ওঁরা বললেন, ও-লাশ চাকারবর্ত্তি সাহেবের—রাঘব বাবুর নয় ···এতে বিন্দুমাত্র রহস্য নেই বা ভেলকি নেই, শরৎ বাবু! আপনাদের মধ্যে এ ব্যাপার হেঁয়ালির মতো দুর্ব্বোধ হলেও আমার কাছে তাতে বিন্দুমাত্র হেঁয়ালি নেই। অর্থাৎ আমি আপনাদের দু-দলের মতেই সায় দিচ্ছি, ও-লাশ একজনেরই···আপনাকে বলবো হ্যাঁ, ও রাঘব বাবুর লাশ···আবার মিসেস চাকারবর্ত্তিকে বলবো, আপনার ভুল হয়নি মিসেস চাকারবর্ত্তি, ও-লাশ মিষ্টার চাকারবর্ত্তির···

এই অবধি বলিয়া সমর মিত্র চাহিলেন শরৎ গাঙ্গুলির পানে··· শরতের দুই চোখ যেন দীপ-শিখার মতো ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে!

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—তার মানে?

সমর মিত্র বলিলেন—মানে, আপনারা যাঁকে জানেন রাঘব, তাঁকেই ওঁরা জানেন কামিনী চাকারবর্ত্তি···অর্থাৎ নামেই শুধু যা পার্থক্য···আসলে কিন্তু মানুষটি এক! একই মানুষ দু' নামে দু' দিকে আত্মপ্রকাশ করে ছিলেন···

উত্তেজিত কণ্ঠে শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—সমর বাবু···

সমর মিত্র বলিলেন—শুধু তাই নয়···শুনলে আরো বেশী মনস্তাপ পাবেন যে ঐ কামিনী চক্রবর্তীই ছদ্মনামে পরিচয় দিয়ে মীরা দেবীকে বিয়ে করেছিলেন! আপনাদের সঙ্গে তিনি প্রতারণা করেছিলেন··· ইতরাধিক প্রতারণা!

শরৎ গাঙ্গুলির মনে অহঙ্কার ছিল, তাঁর মনের জোর আছে··· কিন্তু সে-অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাঁর ভাগ্য-বিধাতা তাঁকে এমন আঘাত দিলেন যে তাঁর মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে লাগিল। তিনি অচেতনের মতো নিস্পন্দ বসিয়া রহিলেন! চোখের সামনে দিনের এই অত্যুজ্জ্বল আলো নিমেষে যেন নিবিয়া গেল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পলিশির নমিনী

সম্বিৎ ফিরিলে শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—স্বামীর বিয়োগ-দুঃখ মীরা কোনো মতে সহ্য করতে পারলেও এ প্রতারণার কথা শুনলে···

সমর মিত্র বলিলেন—তিনি কোথায় আছেন ?

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—আমার স্ত্রী গিয়েছিলেন মীরাকে আমার ওখানে নিয়ে আসবার জন্য। সে আসে নি। কিছুতে আসবে না। অগত্যা আমার স্ত্রী এখন মীরার কাছে আছেন, মীরার বাড়ীতে। দেখাশুনা করতে হচ্ছে।

সমর মিত্র বলিলেন—এ খপর যত দিন তাঁর কাণে না যায়, দেখবেন ! শুনলে যখন একবিন্দু সান্ত্বনা মিলবে না, তখন···

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—রাঘব তাহলে সব রকম rascality করতে পারে ! আমার মনে হয়, যে-স্ত্রীলোক খুন করে গেছে, তার সঙ্গেও হয়তো এমনি ধাপ্পাবাজি করেছিল···সে বাঙালী-ঘরের শান্ত-শিষ্ট মেয়ে নয় হয়তো ! তাই এসে···

সমর মিত্র বলিলেন—এত সহজে এ রহস্যের মীমাংসা হবে না, শরৎ বাবু ! বহু কষ্টে জাল গুড়োতে হবে···তবে আমি এ ব্যাপারের পিছনে রইলুম। উপস্থিত এ মামলার তদন্ত করছে টালিগঞ্জ থানার অশ্বিনী বাবু···রহমন ছুটীতে যাচ্ছে···তার ছুটীর অর্ডার হয়ে গেছে কি না··· তার জায়গায় অশ্বিনী এখন অফিসার-ইন্-চার্জ্জ !

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—খুনী ধরা পড়লো কি না পড়লো···আপনার কাছে যা শুনলুম, এর পর আর তাতে আমার তত interest (আকর্ষণ) থাকবে না সমর বাবু···তবে বেচারী মীরাকে বাঁচিয়ে রাখবো কি করে' এই আমার চিন্তা! এ rascality কেন করেছিল ঐ নিরীহ মেয়েটার জীবন নিয়ে? মীরা তার কাছে কোনো অপরাধ করেনি তো!

সমর মিত্র বলিলেন—তার নানা কারণ থাকতে পারে। এক কারণ, যে-সংসার তার ছিল, সে-সংসারে হয়তো অশান্তি ছিল তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিল। অন্য কারণ হতে পারে, শিলংও আপনার শ্যালীকে দেখে তার মনে লোভ জেগেছিল to possess her···

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—কিন্তু মীরাকে শিলঙে যখন প্রথম দেখে, তারপর বহু মাস পরে বিয়ে হয়েছিল···

মৃদু-হাস্যে সমর মিত্র বলিলেন—যারা পাকা শয়তান, তারা প্রতীক্ষা করতে জানে। মানে, অসীম ধৈর্য্যে তারা নিজেদের অভিসন্ধি-পূরণের জন্য অপেক্ষা করে! তাদের মন্ত্র হলো, সবুরে মেওয়া ফলে··· slow but sure (ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিত)! এই হলো তাদের সিদ্ধির মন্ত্র! থাক, ও নিয়ে ভেবে কোনো ফল হবে না। তবে আপনার যখন যেমন সাহায্য দরকার হবে···সে সাহায্য যেন পাই। ···মামলাটি আমি হাতে নেবার চেষ্টা করবো। তার প্রধান কারণ, এর মধ্যে দেখছি একটা human drama (মানব-জীবন-নাটক)··· এমন খুন কালে-ভদ্রে ঘটে! সেজন্য আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে to take up the matter (তদারকের ভার লইতে)।

সমর মিত্র উঠিতে উদ্যত হইলেন। শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—একটা কথা···হঠাৎ মনে হলো···

—বলুন···

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—সেই হীরে পেয়েছিলেন···তার কোনো সন্ধান···

সমর মিত্র বলিলেন—জানি না। তার কারণ, এন্‌কোয়ারি হিসাবে এ ব্যাপার নিয়ে এখনো আমি মাথা ঘামাচ্ছি না···তবে যে-কথা বলতে এসেছিলুম···আপনাদের মনে একটা দারুণ সংশয় আছে··· রাঘব বাবু মারা গেলেন? না, চক্করবর্তি সাহেব? সে সম্বন্ধে আমি জেনেছি, দু'জন একই ব্যক্তি···সেই কথা আপনাকে বলে পরের ঘটনার জন্য আপনার মনকে আপনি শক্ত করবেন, তারি পরামর্শ দিতে আমার আসা!···এ খপর শুধু আমিই জানি। কি করে তা এখন বলবো না···পরে জানতে পারবেন।···এখন তাহলে আসি···

এই কথা বলিয়া সমর মিত্র বিদায় লইলেন···

শরৎ গাঙ্গুলি হতভম্বের মতো বসিয়া রহিলেন।··

অফিসের পর বাড়ী ফিরিবার পথে শরৎ আসিলেন মলঙ্গায় মীরার গৃহে।

বাড়ীখানি বড় না হলেও বেশ কেতা-দুরস্ত। দোতলা বাড়ী। দোতলায় চারখানি ঘর; এক তলায় পাঁচখানি। তাছাড়া খানিকটা উঠান। উঠানের ওদিকে রান্না-ঘর, ভাঁড়ার-ঘর। উঠানের টবে বহু ফুলের গাছ, পাম-গাছ। বাহিরে আলাদা গেরাজ। বছর খানেক পূর্ব্বে

বিবাহের বার্ষিকী-উৎসবে শেভ্রোলে-গাড়ী কিনিয়া রাঘব সে-গাড়ী মীরাকে উপহার দিয়াছিল। মীরার গা-ভরা গহনা আছে। দু' শেট গহনা। বাড়ীতে দাস-দাসী আছে, বামুন আছে, ড্রাইভার আছে। তবে মীরা নিঃসন্তান! সেজন্য স্বামী-স্ত্রী···দুজনের মনেই ক্ষোভের সীমা ছিল না।

শরৎ গাঙ্গুলি আসিলেন দোতলার খোলা ছাদে। মাথার উপর ঘোলাটে আকাশ। আকাশে ক'টা বিক্ষিপ্ত নক্ষত্র। আসিয়া দেখেন দুই বোনে গুম্ হইয়া ছাদে বসিয়া আছে।

শরৎ গাঙ্গুলিকে দেখিয়া তাঁর পত্নী নীরজা বলিল—কোনো খপর পেলে?

মীরা চাহিয়া দেখিল শরতের পানে···

শরৎ বলিলেন—না। কিন্তু ছাদে কেন তোমরা? মেঘ করছে ···ঘরে এসো···

মীরাকে উদ্দেশ করিয়া নীরজা বলিল—আয় মীরা···

ক'জনে ঘরে আসিয়া বসিল। দোতলায় বসিবার ঘর। এ ঘরটি মীরার নিজস্ব। মীরার রুচি-মাফিক, মীরার প্রীতির জন্য এ ঘর রাঘব সাজাইয়া দিয়াছিল। ঘরে সোফা-কৌচ, রেডিও-সেট, টেবিল-হার্মোনিয়ম, মীরার কিছু দিন সখ হইয়াছিল সেতার শিখিবে···একটি সেতার-যন্ত্রও ঘরে আছে। কোণে মাঝারি সাইজের কোচের আলমারিতে একরাশ বাঙলা বই।

ঘরে আসিয়া বসিবামাত্র নীরজা বলিল—রাঘবের একখানা ছবি দু'মাস আগে তুলিয়ে ছিল···সে ছবিখানা এনলার্জ করিয়ে এনে দিয়ো তো। যত শীগগির হয়। বিলিতি দোকান থেকে। চেহারা যেন

চেনা যায়। রি-টচ্ করে আর-কারো মুখ না তৈরী করে বসে, বুঝলে!

শরৎ বলিলেন—বেশ। ছবি আমায় দাও... আজই আমি নিয়ে যাই···বোর্ণ এ্যাণ্ড শেপার্ডের ওখানেই দেবো'খন!

—তাই দিয়ো। আমরা দু' বোনে অনেক ছবির মধ্য থেকে এই ছবিই বেছে ঠিক করে রেখেছি। আনি···দে তো মীরা তোর ওঘরের আলমারির চাবি···ড্রয়ারে রেখেছি।

আঁচল হইতে চাবির রিং খুলিয়া মীরা সে-চাবি দিল দিদির হাতে ···নিঃশব্দে চাবির রিং লইয়া নীরজা চলিয়া গেল।

ঘরে শরৎ আর মীরা।···শরতের বুকের মধ্যে একটা কাঁপন···সমর মিত্রের মুখে রাঘবের যে-পরিচয় সদ্য শুনিয়া আসিয়াছেন···বেচারী মীরা জানে না। স্বামীর ছবি তৈয়ারী করিয়া দেবতা-প্রতিষ্ঠার মতো সে-ছবির প্রতিষ্ঠা স্বপ্নে মীরা আকুল! হায় নারী! লেখাপড়া যতই শেখো, যত বুদ্ধিমতীই হও··· তোমাদের মনে এমন সরল বিশ্বাস যে, বিদ্যাবুদ্ধি লইয়াও পাপিষ্ঠ-পুরুষের স্বরূপ বুঝিতে পারো না!

সমর মিত্র যে-পরিচয় দিলেন···দু' জায়গায় দুটা সংসার পাতিয়া দু-নামে দু' জায়গাতেই রাঘব ফন্দী-বাজী করিয়া ফিরিত! কোনোদিন মনে হইত না···

মীরা ডাকিল—শরৎদা···

শরৎ বলিলেন—মীরা···

মীরা বলিল—কে এমন শত্রু ছিল শরৎদা? তোমাকেই বা ও জায়গায় উনি রাত্রে দেখা করতে বললেন কেন? আমায় বলে আমার সামনে তিনি বেরুলেন,···বললেন চাটগাঁ-মেলে বাইরে যাচ্ছি!

মীরা চুপ করিল…শরৎ নিরুত্তর। কথাগুলো শরতের মনে কাঁটার মতো বিঁধিল।

মীরা বলিল—ট্রেণ যদি ফেল করে থাকেন, বাড়ীতে আসতে তাঁর কি হয়েছিল? তোমার অফিসে ফোন্ করলেন…টেলিগ্রাম পাঠালেন …আর আমাকে একবার জানালেন না যে চাটগাঁ যাওয়া হয় নি!… এর মানে আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না, শরৎদা…

শরৎ কোনো কথা বলিলেন না। কি বলিবেন?…রাঘবের যে পরিচয় পাইয়াছেন, বুঝিয়াছেন, এমন কিছু ঘটিয়াছিল, যার জন্য…

হয়তো মীরাকে না জানিতে দিবার জন্যই এ সব আয়োজন! কিন্তু তা যদি হইবে তো চাটগাঁ মেলে বাহিরে যাইবার কথা না তুলিয়া অন্য ছলে, হাজার উপায়ে শরতের সঙ্গে দেখা করিতে পারিত!

সামনে যেন অকূল পাথার…এ পাথারে তীরের রেখা দেখা যায় না!

মীরা বলিল—কারবারে এমন কোনো গোলযোগ ঘটলো কি? ইদানীং মাঝে মাঝে দেখতুম, কেমন যেন উতলা ভাব। জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতেন না। একদিন আমি বললুম—লোকসান যাচ্ছে? তাতে নিশ্বাস ফেলে বললেন, লোকসান ঠিক নয় মীরা…দু-চারটে জটিল সমস্যা! এর বেশী আর একটি কথাও বলেন নি।

মস্ত একটা নিশ্বাসের বাষ্পে মীরার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। সে চুপ করিল। শরৎ তার পানে চাহিয়া রহিলেন…দু' চোখে অবিচল দৃষ্টি… দেখিতেছিলেন মীরার করুণ মলিন মূর্ত্তি!…মন বলিয়া উঠিল, হায় রে অভাগিনী!

নীরজা আসিল। তার হাতে ছবি। নীরজা বলিল—এই স্থাখো···

বলিয়া সে-ফটো নীরজা দিল শরতের হাতে। বলিল—এইটেই ঠিক ছবি·· মুখে কোনো অমিল নেই···না ?

ছবি দেখিয়া শরৎ বলিলেন—হ্যাঁ। এ-ছবি আমি রাখলুম। পরন্তু এ-ছবির বাঁধানো এনলার্জমেণ্ট পাবে!

নীরজা বলিল—তাই আমরা চাই।

মীরা বলিল—আপনার চা তৈরী করতে বলি।

শরৎ বলিলেন—না, চা খাবো না।

মীরা বলিল—কেন খাবে না শরৎদা ?

শরৎ বলিল—এখনি বাড়ী যাবো দিদি···

মীরা বলিল—আমি তৈরী করে আনি তোমার চা। তুমি আমার হাতের চা চেয়ে খাও চিরদিন···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শরৎ বলিলেন—সে চেয়ে খাওয়ার দিন আমার ফুরিয়ে গেছে, ভাই···

—না. না···আমি এখনি চা তৈরী করে আনছি···

এ কথা বলিয়া মীরা তখনি উঠিয়া সে-ঘর হইতে বাহিরে গেল।

শরৎ বলিলেন—কেন গেল ?

নীরজা বলিল—যাক···সারাক্ষণ গুম্ হয়ে আছে! ভয়ে আমি কাঠ হয়ে আছি···শেষে কি পাগল হয়ে যাবে? ছোট খোকাকে অত ভালোবাসে···তাকে আনিয়েছিলুম···ছোট খোকা ওকে দেখে কাঠ হয়ে রইলো···ও-ও যেন মাটীর পুতুল! একবার বললে না যে আয়রে খোকা···মাচিমার কাছে···

শরৎ নিশ্বাস ফেলিলেন। কোনো কথা বলিলেন না।

শরতের ভাব দেখিয়া নীরজা একটু বিচলিত হইল। সর্ব্বনাশ যা হইবার হইয়া গিয়াছে…এ সর্ব্বনাশের পর কাল উনি আসিয়াছিলেন …কাল তো এ-ভাব ছিল না। আজ এমন অন্যমনস্কতা কেন?

নীরজা বলিল—তোমার শরীর খারাপ বোধ করছো?

—না। কেন বলো তো এ-কথা জিজ্ঞাসা করছো?

—দেখছি।

শরৎ বলিলেন—মন খুব খারাপ হয়ে আছে…এমন একটা ব্যাপার!

নীরজা বলিল—তা তো বুঝছি…মীরা সংসারের কিছুই জানে না …এই বয়স…সামনে শুধু ধু-ধু মরুভূমি!

শরৎ বলিলেন—আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে পারবে না?

—না। ও বলে, এ বাড়ী ছেড়ে এক-মিনিটের জন্য কোথাও যাবে না…যেতে পারবে না!…

আহা!

শরৎ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

নীরজা বলিল—যে করে সারাদিনের পর একটু দুধ খাইয়েছি! কিছুতে খাবে না! শেষে রাগ করে বললুম, মা থাকলে মার কথা ঠেলতে পারতিস্ মীরা? আমি দিদি হই, তাই…তবে খেলে!

শরৎ শুধু বলিলেন—হুঁ…

মন গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল, হতভাগা ইতর এই স্ত্রীর সঙ্গে কি কাণ্ডই করিয়া গিয়াছিস্!…দেবতা করিয়া তোকে সে বসাইয়াছিল মাথার উপর…আর তুই…

মন বলিল, পুরুষ মানুষ এমনিই হয়! স্ত্রীর ভালোবাসার মর্ম্ম ক'জন বোঝে? ???

মীরা আসিল···হাতে চায়ের পেয়ালা। পেয়ালা সে রাখিল শরতের সামনে ছোট তেপায়ার উপর···

শরৎ বলিলেন—একটা কথা আছে মীরা···সে-কথার মীমাংসা না হলে আমি চা খাবো না।

—বলুন···

শরৎ বলিলেন—তুমি যদি এমন করে কারো মুখ না চাও···না খেয়ে নিজেকে হত্যা করবে পণ করে থাকো, তাহলে আমার পক্ষে এখানে আসা অসম্ভব হবে!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে মীরা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল···মাথা নত করিল।

শরৎ বলিল—কাল থেকে আজ···এর মধ্যে এক পেয়ালা দুধ খেয়েছো শুধু!

—খিদে নেই শরৎদা। বিশ্বাস করো তুমি···সত্যি বলছি।

—খিদে না থাকলেও আমাদের কথায় খেতে হবে।

মীরা কোনো জবাব দিল না···

শরৎ বলিলেন—তোমার যা হয়েছে, তার আর তুলনা নেই, বোন! কিন্তু আমাদের সেই সঙ্গে কি হয়ে গেছে···একবার সে-কথা ভাবো! এ সর্ব্বনাশের মধ্যে তোমার পানে চেয়ে আমাদের তবু সব সইতে হচ্ছে। সেই তুমি যদি···

কণ্ঠে কথা বাধিয়া গেল···মীরার দু' চোখে জল···নীরজার চোখ আর্দ্র হইল।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে একটি বাবু আসিয়াছেন···তাঁর হাতে চিঠি। বলিলেন, খুব দরকারী চিঠি!

শরৎ বলিলেন—আমি যাচ্ছি। গিয়ে দেখছি···

কথাটা বলিয়া শরৎ নামিয়া আসিলেন।

বাহিরে ড্রয়িং-রুম। সাহেবী পোষাক-পরা এক স্থূলকায় ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। পোষাক চাঁদনীমেক্! ভদ্রলোকের মাথায় টাক—রঙ ময়লা—মুখে চুরুট।

শরৎ আসিয়া বলিলেন—কি চান?

ভদ্রলোক বলিলেন—আমি আসছি বেঙ্গল্স্ প্রাইড্ ইনসিওরেন্স কোম্পানির অফিস থেকে।···কামিনী চক্রবর্ত্তী মশায় আমাদের অফিস থেকে পঁচিশ হাজার টাকার একটা ইনশিওর করেছিলেন। তিনি মারা গেছেন···very sad death (অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে মৃত্যু)···তিনি তাঁর পলিশিতে বছর দুই আগে বেনিফিশিয়ারী করে গেছেন রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতী মীরা দেবীকে। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বললেন, এই ঠিকানায় এসে শ্রীমতী মীরা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে। অর্থাৎ এ-সব কাজে অফিস খুব প্রম্পট্ কি না! তা··· আপনি?

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—মীরা দেবী হলেন আমার শ্যালী।

—ও··তাহলে তো ভালোই হয়েছে!···তা মীরা দেবীর স্বামী রাঘব বাবু বাড়ী আছেন?

ভদ্রলোক যেন পা দিয়া সবলে শরতের বুকখানাকে চাপিয়া মাড়াইয়া ধরিয়াছেন···বুকে তেমনি বেদনা !

শরৎ বলিলেন—আজ্ঞে না। মানে, এ বাড়ীতে বিপদ চলেছে। মীরা দেবীর স্বামী রাঘব বাবু মারা গেছেন···খুব সম্প্রতি।···আপনার কথা আমি শুনলুম। আপনি এক কাজ করুন···অফিস থেকে মীরা দেবীর নামে অফিসিয়ালি চিঠি পাঠাবেন।

ভদ্রলোক যেন একটু কুণ্ঠিত হইলেন। দু মিনিট তাঁর মুখে কথা নাই! তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—দেখুন, আমার আসায় একটু ইয়ে ছিল! অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন তো···মানে, এ কাজে আমি ছিলুম এজেণ্ট···কামিনী বাবুকে আমিই ধরে এ-ইনসিওরটা করিয়েছিলুম। তখন এ রকম বেনিফিসিয়ারি নমিনেট্ করার কোনো কথা ছিল না, অবশ্য! দু' বছর আগে হঠাৎ একদিন আমার সঙ্গে দেখা করে কামিনী বাবু বলেছিলেন,—ঐ পলিসিটার জন্য তিনি বেনিফিসিয়ারী নমিনেট্ করতে চান···নমিনী হবেন রাঘব চ্যাটার্জ্জীর স্ত্রী মীরা দেবী। আজ সকালে কামিনী বাবুর স্ত্রীর তরফ থেকে অফিসে চিঠি গেছে···তাতে তিনি জানিয়েছেন, কামিনী বাবু মারা গেছেন—তাঁর ক'খানা পলিশি আমাদের অফিসে আছে, তিনি জানতে চান্। তাই থেকে আমি শুনলুম কামিনী বাবুর মৃত্যুর কথা।···আমার তখনি মনে পড়লো···নমিনী! তাই আমি এসেছি। মানে···ইয়ে অর্থাৎ এ রকম্ ক্ষেত্রে আমরা কিছু আশা করি কি না···

গম্ভীর হইয়া শরৎ গাঙ্গুলি এ-কথা শুনিলেন। তারপর বলিলেন—আপনার কথা শুনলুম। আপনাদের দস্তুর যদি তেমন কিছু থাকে, তাহলে পাবেন আপনি!···তবে ঐ যা বললুম, অফিস থেকে এ

সম্বন্ধে মীরা দেবীকে চিঠি লিখলে তিনি সে-চিঠি তাঁর এটর্ণিকে দেবেন। টাকাটা সেই এটর্ণির মারফৎ আদায় হবে। তাঁকেই আমরা বলে দেবো, আপনার ইয়ের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে !···কি বলেন ?

ভদ্রলোক বলিলেন—আজ্ঞে, তা তো জানি···আপনাদের সে অনুগ্রহ আছে বলেই···না হলে ইনসিওরেন্স সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে কড়াক্কড় আইন বেঁধে দেছে···এ-কাজে আর তেমন জুৎ নেই। এই আমিই মশায়, এককালে কি টাকাটাই লুঠেছি···ছুটো ছেলেকেও স্কুল ছাড়িয়ে এ কাজে ঢুকিয়েছিলুম। একদিন লাল হয়ে গেছলুম, মশায় ! এখন আর এদিকে লাল হবার উপায় নেই ! ইনসিওরেন্সে আমরা এখন নীল মেরে যাচ্ছি !

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

শরৎ উপরে আসিলেন। নীরজা জিজ্ঞাসা করিল কে ?

শরৎ বলিলেন—এক ইনসিওরান্স-কোম্পানির লোক। রাঘবের সঙ্গে জানাশুনা ছিল···খপর পেয়ে দেখা করতে এসেছিল।

নীরজা কোনো জবাব দিল না।

শরৎ বলিলেন—আজ আর আমি বসবো না, মীরা ! এখন আসি। একটা কথা ছিল···মানে, ব্যবসার কাগজ পত্র, ইনসিওরেন্সের পলিশি ···এ সবগুলো আমি একবার দেখতে চাই !···মানে, তা থেকে মামলার কিনারা না হতে পারে, এমন নয়। আর তা না হলেও তার হাতের তৈরী বিষয়-সম্পত্তি···না দেখাশোনা করলে ছরকোট্ হয়ে যাবে। তাই দেখে···মানে, যতক্ষণ আমরা আছি, আমাদের কর্ত্তব্য করি। তোমায় কিছু করতে বলি না···তোমার দিদিই করবেন· তুমি তাঁকে একটু সাহায্য করো, ভাই···কেমন ?

অত্যন্ত মৃদু ভাবে মাথা নাড়িয়া মীরা সম্মতি জানাইল।

তারপর শরৎ গমনোদ্যত হইলে নীরজা বলিল—ভানুর হাফ-ইয়ার্লি এগজামিন সামনে···ছেলেটার দিকে নজর রেখো গো! মাষ্টার-মশাই আসছেন, তুমি শুধু একটু দেখো, মাষ্টার মশাই চলে গেলেই যেন বইয়ের সম্পর্ক না কেটে যায়!

শরৎ বলিলেন—দেখবো···

নীরজা বলিল—আর এই বৃষ্টি-বাদলার দিন··বৃষ্টি হলে কেউ না ভেজে! বনমালীকে খুব ভালো রকম নজর রাখতে বলো সেদিকে।

শরৎ বলিলেন—বলবো।

তারপর শরৎ চলিয়া আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুখার্জ্জী সাহেব

দু'চার দিন পরে ইনসিওরান্স কোম্পানির অফিসে কলরব উঠিল। মিসেস চাকারবর্ত্তির তরফ হইতে এটর্ণির চিঠি গিয়া হাজির ইনসিওরান্স অফিসে···কামিনী চক্রবর্ত্তীর পলিশির টাকা যেন তাঁর নির্দ্দিষ্ট কোনো বেনিফিসিয়ারিকে ইতিমধ্যে দেওয়া না হয়···বিশেষ করিয়া রাঘব চ্যাটার্জ্জী নামে কোনো লোকের অস্তিত্ব যখন নাই, তখন তাঁর স্ত্রী-স্থানীয়া বা স্ত্রী বলিয়া অভিহিতা কোনো ব্যক্তিকে পলিশির টাকা দিলে কোম্পানির রিস্ক্ ইত্যাদি···

কোম্পানি তখন এ ব্যাপারের ফয়শালার জন্য পুলিশ-কমিশনারের দ্বারস্থ হইল। প্রার্থনা করিল, এ ব্যাপারের সঙ্গে টালিগঞ্জের সেই রহস্যময় হত্যাকাণ্ড বিজড়িত এবং রাঘব চ্যাটার্জ্জীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন গোলযোগ উঠিয়াছে, তখন ডিটেকটিভ-বিভাগ হইতে আগা-গোড়া তদন্তের ব্যবস্থা হোক্!

পুলিশ-কমিশনার তখন সমর মিত্রের উপর ইনসিওরান্সের এ সমস্যা-নিরাকরণার্থে তদন্তের ভার দিলেন।

সমর মিত্র বলিলেন—এ ব্যাপারের সঙ্গে টালিগঞ্জের হত্যা ব্যাপারের সম্পর্ক অতি :ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সুতরাং ইনসিওরেন্সের সহিত হত্যার তদারকী একযোগে করিলে সুবিধা হইতে পারে!···

সমর মিত্রের এ প্রস্তাবে বাংলার ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের সহিত পরামর্শ করিয়া কমিশনার সাহেব সেই ব্যবস্থাই করিলেন। স্থির হইল, টালিগঞ্জ, থানার ইন্‌স্‌পেক্টর অশ্বিনী বাবু সমর মিত্রের অধীনে তদারকীর কাজ করিবেন।

তদারকীর ভার গ্রহণ করিয়া সমর মিত্র নিঃশব্দে বৈকালে গিয়া দেখা করিলেন দমদমায় মিসেস চাকারবর্ত্তির পিতা বলরাম মুখার্জ্জীর সঙ্গে।

ভদ্রলোক বাতে পঙ্গু। চাকাওয়ালা চেয়ারে উপবিষ্ট। ভৃত্য গৃহ-সংলগ্ন বাগানে সেই চেয়ার-গাড়ী ঠেলিয়া তাঁকে হাওয়া খাওয়াইতেছিল।

সমর মিত্র গিয়া সংবাদ দিবামাত্র বেয়ারা তাঁকে লইয়া গেল বাগানের পূর্ব্বপ্রান্তে। সামনে গোলাপের ক্ষেত,···তারি সামনে কাঁকর-ফেলা পথে চেয়ার-গাড়ী সংরক্ষিত,—সেই গাড়ীতে বসিয়া বলরাম মুখার্জ্জী সাহেব মালীদের কাজ দেখিতে ছিলেন।

সমর মিত্র আসিয়া নমস্কার করিলেন।

বলরাম মুখার্জ্জীর গায়ে ওভারকোট চাপানো, মাথায় ক্যাপ, গলায় কম্ফটার, পায়ে গরম মোজা, মুখে সিগার। সমর মিত্রকে দেখিয়া মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—সমর যে! এসো। ওরে, একখানা চেয়ার নিয়ে আয়।

বেয়ারা তাড়াতাড়ি একখানা বেতের চেয়ার আনিয়া দিল। মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—বসো সমর···

সমর মিত্র চেয়ারে বসিলেন।

মুখার্জ্জী বলিলেন—বুঝেছি, কেন এসেছো!

সমর মিত্র বলিলেন—নিষ্ঠুর কর্তব্য !

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—হুঁ···পেলে কোনো সন্ধান ?

সমর মিত্র বলিলেন—আজ আমি এনকোয়ারির তার পেয়েছি। পেয়েই আপনার কাছে এসেছি !

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—হুঁ···তা, চলো, ঘরে বসবে। এখানে কথা হতে পারে না।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার কোনো অসুবিধা হবে না তো ? এ সময়টা বাইরে আপনি একটু হাওয়ায় থাকেন !

—আর হাওয়া !···হুঁ। সারা জীবন কুলির মতো খাটলুম···তারপর যে-বয়সে বিশ্রাম করবার কথা, সে বয়সে এই দারুণ রোগ ! এ রোগকেও কি গ্রাহ্য করতুম সমর, মনে যদি শান্তি পেতুম !···যাকে সংসার বলে, সে সংসার-সুখ ভাগ্যে কখনো মিললো না। তাই ভাবি, টাকা-কড়ির পিছনে পাগলের মতো ছুটেছি সারা জীবন। মস্ত ভুল করেছিলুম। সুখ বলো, শান্তি বলো···টাকা-কড়িতে তা নেই ! সুখ আর শান্তির স্থান মানুষের ঘরে !···

কথাটা বলিয়া মুখার্জ্জী সাহেব মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিলেন !

সে নিশ্বাসের সঙ্গে কৃতী কন্‌ট্রাক্টরের জীবনের কতো সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা···যেন ঝরা পাতার মতো খশিয়া ঝরিয়া গেল···সমর মিত্র যেন স্বচক্ষে তাহা দেখিলেন।

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—ছেলেমেয়ে···জামাই···স্ত্রী···এরা যদি মনের মতো না হয়···হুঁঃ ! কেউ কিছু নয়, বুঝলে সমর !·· কিন্তু না, এ সব কথায় কাজ নেই। এসো তুমি···

বেয়ারাকে ডাকিলেন। বেয়ারা আসিল। বলিলেন—কোঠী লে চলো···

চেয়ার ঠেলিয়া বেয়ারা লইয়া আসিল। সমর মিত্র সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন।

তারপর মুখার্জ্জী সাহেবকে আনিয়া ড্রয়িং-রুমে বিশেষ আসনে বসানো হইলে সমর মিত্র বসিলেন সামনের কৌচে।

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—তোমার জন্য কি আনবে বলো? চা? সরবৎ?

সমর মিত্র বলিলেন—এক পেয়ালা চা দিতে বলুন···

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—একালে চা ছাড়া আর কিছুতে তোমাদের রুচি দেখি না। অন্যায়! Something substantial (সার-বস্তু কিছু) খাওয়া উচিত! একালে তোমাদের মুখে ভিটামিনের এত স্তব-স্তুতি শুনি, অথচ খাবার বেলায় ভিটামিন বাদ দিয়েই যা-কিছু মুখে দাও! টোমাটো খাওনা কেন?···সেকালে আমাদের ছিল বেলের পানা খাওয়া··তোমরা তার স্বাদ জানো না। তোমাদের আমোলে টোমাটোর আদর হলো! কিন্তু সে টোমাটো তোমরা খাও কৈ? আমি বলি, টোমাটো-স্যুপ দিক্···খেয়ে ছাখো। চায়ের চেয়ে খেতে ভালো লাগবে···খেলে উপকার পাবে।

অপ্রতিভ-ভাবে সমর মিত্র বলিলেন—বেশ, আপনি বলছেন, টোমাটো-স্যুপই দিতে বলুন।

বেয়ারার পানে চাহিয়া মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—টোমাটো স্যুপ ···সেই সঙ্গে বাহাদুরকে বলো—ফ্রাই, কিম্বা কাটলেট দু' এক পীশ···

একটু ষ্টু…পুডিং…আলাদা এমনি কিছু দিক। মানুষ সেই কলকাতা থেকে দমদমায় এসে…শুধু এক পেয়ালা চায়ে কি হবে?

বেয়ারা চলিয়া গেল।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার খাওয়া-দাওয়া এখন…?

মৃদু হাস্যে মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—ডাক্তারদের সব মানা…আমি তা শুনি না। যা রুচি হয়…একটু-আধটু খাই। আমার এমন বদ অভ্যাস হয়ে গেছে…রোজ মুখ বদলানো চাই। আজ যদি মাছ-সিদ্ধ খেলুম, কাল সে মাছ-সিদ্ধ মুখে রুচবে না। ভাবি, পয়সা আছে, তাই রুচি-অনুযায়ী খাচ্ছি! এ পয়সা যদি না থাকতো, তাহলে?…আসলে কিছুই কিছু নয় সমর…পয়সা হবার সঙ্গে সঙ্গে নবাবী করে আমরা আমাদের মনকে শুধু মারি না…খাওয়ার রুচি-স্বাদ সব একেবারে জবাই করে বসি। নেচারকে ছেড়ে এমন artificial হয়ে উঠি যে তার ফলে দেহটাকে controlএ রাখিতে পারি না! পয়সা থাকা বিড়ম্বনা!…দুর্ভাগ্য!

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—যাঁদের পয়সা আছে, তাঁরা বলেন, তাঁরা দুর্ভাগা! আর যাদের নেই, তারা বলে, তাদের মতো দুর্ভাগা আর নেই!

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—দুটোই সত্য কথা। সৌভাগ্য ঐ দুটোর মাঝখানে between these two extremes! আমাদের শাস্ত্রে কথা আছে না…সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্? খুব সত্য কথা! হ্যাঁ, এখন তোমার কথা বলো…

সমর মিত্র বলিলেন—বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, অথচ উপায়ও নেই। এ বয়সে রোগের যাতনা…তার উপর এত-বড় শোকের

আঘাত···আর আমি যা বলবো, তাতে আঘাত বাড়বে বৈ কমবে না!

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—No help···তাছাড়া এ জীবনে এত ঝড় খেয়েছি, এত ব্যথা পেয়েছি···ingratitude, unfaithfulness treachery···*oh, too many!*···কোনো আঘাতে আর বিচলিত হই না! আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়!
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়!

···মানুষকে বিপদে খাড়া রাখবার এ যা মন্ত্র···চমৎকার!

সমর মিত্র বলিলেন—আশ্চর্য্য! আপনি পাকা ব্যবসায়ী মানুষ··· আপনি এমন করে রবীন্দ্রনাথের গান পড়েছেন!

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—আগে পড়িনি। রোগে পঙ্গু হয়ে নিরুপায় পড়ে আছি···ছেলেমেয়ে থাকলেও এমন সান্ত্বনা পেতুম না সমর, যে-সান্ত্বনা পাই বিশ্ব-কবির কবিতায়-গানে। একদিন একটি ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকে নিয়ে দেখা করতে এসেছিলেন···মেয়েটি গান গেয়ে শোনালে···রবীন্দ্রনাথের গান! মেয়েটি গেয়েছিল,

আপন লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায়, তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায়, তা লয়ে
প্রাণ করে হায় হায়!

…এ-জীবনে দেখেছি, যতই পাই, চাওয়ার তুলনায় তা কত কম! …মনে আলো ফুটলো সেদিন! সান্ত্বনার আভাস যে পেলুম! রবীন্দ্রনাথের লেখা যত বই পাওয়া গেল, কিনে আনলুম। পড়ি। কারো অভাব মনে জাগে না! এই যে কামিনীর মৃত্যু… একটি মাত্র মেয়ে… তার আজ বৈধব্য…এতে এতটুকু বিচলিত হইনি…বুঝলে সমর!…কিন্তু না, বড্ড নিজের কথা কইছি…চুপ করলুম। এবার তোমার কি বলবার আছে, বলো…

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনায় আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার মোটে নেই…আমি আপনার এ ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি, মিষ্টার মুখার্জ্জী! পুলিশে চাকরি করলেও আমি মানুষ …আমি বাঙালী…আমি সংসারী…আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে… আত্মীয়-বন্ধু আছে। কাজেই যে-কথা না কইলে নয়, কর্ত্তব্যের দায়ে বাধ্য হয়ে আমায় সে কথা বলতে হবে! আপনি তো বুঝছেন আপনার জামাইয়ের এই শোচনীয় হত্যা-ব্যাপারের সঙ্গে আমার কর্ম্মগত জীবনের কি সম্পর্ক!

—তুমি বলো সমর…কোনো রকম সঙ্কোচ করো না। আমিও যা জানি, অকপটে তা বলবো।

সমর মিত্র বলিলেন—সে রাত্রে এটর্ণি শরৎ গাঙ্গুলি আমাকে ফোন্ করেছিলেন, টালিগঞ্জের সেই বাগান বাড়ী থেকে। আমি যেতে লাশ দেখিয়ে তিনি বললেন, এ লাশ তাঁর ভায়রা-ভাই রাঘব চ্যাটার্জ্জীর। সে-কথা শুনলেও আমি তো কামিনী বাবুকে চিনতুম… আমার মনে ধোকা লাগলো! শরৎ বাবুকে কোনো প্রশ্ন না করে তখন আমি আপনার মেয়েকে…মানে, মিসেস চাকারবর্ত্তিকে ফোন্

করলুম। ফোন্ পেয়ে তিনি সেখানে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল আপনার দৌহিত্রী, কামিনী বাবুরও কর্ম্মচারী বিভোর···আর বন্ধু বলে একজন দালাল। লাশ দেখবামাত্র মিসেস চাকারবর্ত্তি তখনি সনাক্ত করলেন কামিনী বাবুর লাশ! তারপর···

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—সে সব কথা এদের মুখে আমি শুনেছি।

সমর মিত্র বলিলেন—তারপর ব্যাপার এসে যেখানে দাঁড়িয়েছে, তাতে দেখছি রাঘব চ্যাটার্জ্জী ব'লে শরৎ বাবু যাকে সনাক্ত করেছেন, তিনি এবং আপনার জামাই কামিনী বাবু···এক লোক! দুটি নাম নিয়ে দুই স্ত্রীর দৌলতে দুটি আলাদা সংসার পেতে তিনি বাস করছিলেন।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—তাহলে বুঝছো তো এ সংবাদ প্রচার হবেই, এবং প্রচার হলে what it means to me···to my name and my family (আমার নাম-যশ এবং আমার পরিবারের তাতে কলঙ্ক কতখানি), বোঝো!

সমর মিত্র বলিলেন—নিশ্চয়। বড় লোকের কোনো রকম কিছু ইতর-বিশেষ ঘটলে দেশে একটা হুলস্থুল বেধে যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন নাটকে লিখেছেন,—যে-সূর্য্যের পানে মানুষ চাইতে পারে না, গ্রহণের সময় সেই সূর্য্য রাহুগ্রাসে পড়লে অপদার্থ মানুষগুলো কাঁচে কালি মাখিয়ে চোখে সেই কালো কাঁচ লাগিয়ে সূর্য্যকে কালো দেখে!···

মুখার্জ্জী সাহেব নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—আমায় কি জিজ্ঞাসা করবে, করো।···

—মানে, আপনার জামাই যে দু' নামে এতখানি ছলনা করে বেড়াচ্ছিলেন, এ খপর আপনি শুনেছেন ?

—শুনেছি !

—কবে শুনলেন ?

—শনিবার রাত্রে।

সমর মিত্র বলিলেন—রাঘব চ্যাটার্জ্জীর নাম আপনি কখনো শুনেছিলেন ?

মুখার্জ্জীর সাহেবের মাথা যেন একবার নড়িল…অতি মৃদু ভাবে।

সমর মিত্র বলিলেন—কামিনী বাবু যে পঁচিশ হাজার টাকার একটা লাইফ-ইনসিওর করেছিলেন… সে আপনার কথায় ?

মুখার্জ্জী সাহেব মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ।

—তার বিশেষ কোনো কারণ ছিল ?

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—আমার কোনো অসদুদ্দেশ্য ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল purely on principle. স্বামীর টাকায় আমার মেয়ের কোনো কালে কোনো প্রয়োজন ছিল না…প্রয়োজন হবেও না।…কামিনীর চাল-চলন দেখে আমার মনে হতো, ও না মানে মানুষকে, না মানে ভগবানকে! উড়নচণ্ডী…যা মনে হতো, তাই করতো!…সাহেবী আচার গ্রহণ করলেও আমি সেকেলে মানুষ, বুঝলে সমর…নানা অনাচার করে বেড়ালেও ভগবানের উপর একেবারে বিশ্বাস হারাইনি। ঘর-সংসার, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং ভগবান—এ-তিনের উপর আমার মায়া-মমতা-শ্রদ্ধা কোনো দিন এক তিল কম নয়! I believe in God and in home (ভগবান এবং ঘর-সংসার—এ দুয়ে আমার বিশ্বাস আছে পরিপূর্ণ রকম)!

সমর মিত্র বলিলেন—থাকা উচিত। নাহলে মানুষে আর পশুতে কোনো তফাৎ থাকে না! কিন্তু আপনি কি জানতেন, আপনার জামাই এই কামিনী বাবু···

বাধা দিয়া তীব্র কণ্ঠে মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—না···না···না··· সে ছিল একটা হতভাগা। স্ত্রী, মেয়ে, ঘর-সংসার···এ সবে তার কোনো আস্থা ছিল না···ভগবানের উপরেও তার আস্থা ছিল না। সে ছিল পশু···a shame (হেয়)!

সমর মিত্র বলিলেন—আমি আপনার কথা মানি।···মোদ্দা আপনি জানেন, তিনি ঐ পঁচিশ হাজার টাকার পলিসির জন্য একজন বেনিফিসিয়ারি নমিনেট করে গেছেন···

—না। এ কথা আমি জানি না।···করেছে না কি?···

—হ্যাঁ। লিখে গেছেন, এ পলিসির টাকা তাঁর অবর্ত্তমানে পাবেন রাঘব চাটার্জ্জীর স্ত্রী মীরা দেবী···

মুখার্জ্জী সাহেবের দুই চোখে যেন বিদ্যুতের আগুন! সে-কথায় নিমেষে তাহা নিবিয়া গেল!

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—দিন-কাল যা পড়েছে···অতি বিশ্রী! আসলে, কামিনীকে আমি কোনো দিন সুচক্ষে দেখতে পারিনি। তাকে প্রথম যেদিন দেখেছি, সেই দিনই আমার মনে হয়েছে, কামিনীর মন অতি দুর্ব্বল···চরিত্র-বল যাকে বলে, তা ওর নেই! চেহারাখানি দিব্যি রাজপুত্রের মতো··· ভিতরটা কিন্তু একেবারে অসার!··· অর্থাৎ আমাদের পাড়াগাঁয়ে হয় মাকাল-ফল···সে-ফলে চোখ জুড়িয়ে যায়, ভিতরে কিন্তু তার নোংরা ময়লা! কামিনীও ঠিক তেমনি!···নিজের মঙ্গল কিসে তা যে বোঝে না, তাকে মানুষ বলা যায় না!···আমার তখন বয়স হয়েছে

…চল্লিশ পেরিয়ে পঞ্চাশে পড়েছি…খড়্গ্পুরে আমি একটা বড় কণ্ট্রাক্ট নিয়ে সেখানে আটকে রয়েছি…আমাদের পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে কামিনী এসে হাজির হলো…তার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ…বয়সে আমার মেয়ের চেয়ে দু' বছর মাত্র বড়।…মেয়ে অম্বার খুব ভালো লাগলো এই কামিনীকে!…একটি আই-সি-এস পাত্র ছিল, তাকে ত্যাগ করতে হলো, সমর। গৃহিণী বললেন, তোমার ঐ এক মেয়ে… ভগবান তোমায় অনেক ঐশ্বর্য্য দেছেন…সেদিকে দেখবার দরকার কি? মেয়েটা যখন ওর জন্য…হুঁঃ…দিলুম বিয়ে।

সমর মিত্র বলিলেন—কামিনী বাবুর আর্থিক অবস্থা তখন?

—Pauper! (পথের ভিখারী)!

মুখার্জ্জী সাহেবের স্বর ঈষৎ কম্পিত হইল। তিনি বলিলেন, —পরে শুনেছি, কামিনীর মা ছিল একজন দজ্জাল স্ত্রীলোক… পয়সায় ছিল তার অমানুষিক লোভ! কামিনীর বাপ…শুনেছি, ঐ স্ত্রীর বাক্য-বাণে বৈরাগ্য নিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছলো …কামিনী ইংরেজী বলতো-কইতো ভালো। তারপর জামাই হলে আমার কাজে তাকে টেনে নিলুম! ভাবলুম, বেকার ছিল, সৌভাগ্যের স্পর্শ পেলে হয়তো ক্রমে-ক্রমে মানুষ হবে! ওকে কী না দিয়েছি? ওর জন্য কী না করেছি? But the ungrateful cur…

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার কারবারের কাজ তো তাঁকেই আপনি দেখতে দিয়েছিলেন…

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—যে কাজ পণ্ড করা যায় না, এমনি কাজেরই ভার দিয়েছিলুম। অনেক জায়গায় কণ্ট্রাক্ট…তাকে আমি

পাঠাতুম সে-সব জায়গা ঘুরে কাজের রিপোর্ট সংগ্রহ করতে! আর এই ব্যাপারের সম্পর্কে অনেক সময় সে নিজের ঘর-দোর ছেড়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতো, জানি না। আমার বিশ্বাস, ঐ মেয়েটার ওখানেই অজ্ঞাতবাস করতো!...তাকে কাজের ভার দিলেও আমার চোখ ছিল সজাগ...নিজে আমি সব দেখতুম-শুনতুম আজ আমি বাতে পঙ্গু হয়েছি, কাজের বার হয়েছি সমর · কিন্তু আমার এমন দশা বেশী দিনের নয়! এ সব রোগ যা হয়েছে, তা নিজের দোষে নয়...ডাক্তারদের কড়াক্কড় শাসনে! আমায় কিছু করতে দেবে না! খোলা বাতাসে বসতে দেবে না...পথ্য যদি দেবে এক ছটাক, তার সঙ্গে গেলাবে তিন পিপে ওষুধ!

সমর মিত্র বলিলেন—আমার কথা খুব delicate...

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—ব্যাপার এমন scandalous হয়েছে যে এখন এ সম্বন্ধে কোনো কথা আর delicate থাকতে পারে না। তুমি বলো সমর...

সমর মিত্র বলিলেন—ছদ্ম-নামে আর একজন ভদ্র মহিলাকে বিয়ে করে কামিনী বাবু যে তাঁর সর্ব্বনাশ করলেন, এর-কারণ...মানে, আপনার কন্যার সঙ্গে কামিনী বাবুর মোটে বনিবনা ছিল না।

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—যাকে আসল বনিবনা বলে, তা ছিল না। আমার মেয়ের স্তুতি-গান করছি না। আমার অগাধ পয়সা...আমার ঐ একমাত্র মেয়ে...তার উপর আমি যে ষ্টাইলে চলেছি চিরদিন·· তার ফলে খুব একরোখা...জেদী মেয়ে...তা স্বীকার করবো বৈ কি! বিয়ের দেড় বছর পরে অম্বার মেয়ে হলো। ছেলেমেয়ে হলে বহু স্বামী-স্ত্রীর মনের অমিল সেরে যায়! এদের তা না হয়ে সে অমিল বেড়ে উঠলো!

আসল কারণ, আমার মেয়ে খুব সোশ্যাল্‌...পার্টি দেওয়া, থিয়েটার করা মজলিশ...এ সবের বাতিক ওর ভয়ানক...কামিনী ও সব দু'চক্ষে দেখতে পারতো না!...আমি অবাক হতুম...বিয়ে করেছিস্‌ যে-সোসাইটিতে, সে-সোসাইটির দস্তুর সহ্য করতে পারবি না, তা কখনো হয়! অনেক বলেছি...কিন্তু কাকে বলা? মানে, unequal match হলে যা হয়...ও হয়েছে এক-ভাবে মানুষ...আমার মেয়ে আর এক-ভাবে মানুষ হয়েছে!...যাই হোক, তা বলে স্ত্রীকে লুকিয়ে আর একটা বিয়ে...the horror of it!...যদি বা তাই করলি, এমন নাম পাল্‌টানো...ছলনা...এ সব কেন?

সমর মিত্র সব কথা শুনিলেন...বলিলেন—মেয়ের সঙ্গে বাপের বনিবনা ছিল কেমন?

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—মেয়ে হলো একালের...জানে, মা-বাপ...কেউ ফেলবার নয়! শুধু মাকেই সে সব বলে জানতো এবং মানতো। বাপকে একেবারে অগ্রাহ্য করতো, তা নয়!...মেয়ে মাঝে-মাঝে চেষ্টা করতো, দু'পক্ষে যাতে একটা understanding...রফা হয়!

সমর মিত্র বলিলেন—আপনাকে অনেকক্ষণ বিরক্তি করলুম...সেজন্য ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনাকে কষ্ট দিয়ে আমার লাভ হলো এই, এ-ব্যাপারের psychology বুঝলুম।...একটা কথা ঠিক যে কামিনী বাবু যত-বড় rascal হোন্‌...কোনো বদ স্ত্রীলোক...মানে, বেশ্যা নিয়ে মাতামাতি করেন নি কখনো!

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—সে-সব লোকের মন অমন heinous তারা ভদ্র-ঘরে বিবাহ না করে যদি সে-সংসর্গে মেতে থাকে, তাদের

আমি ক্ষমা করবো শুধু এই কারণে যে যত-বড় অনাচার করুক, কোনো ভদ্র-ঘরের মেয়ের তারা সর্ব্বনাশ করে নি! যে-লোক বিবাহ করবে, তার উচিত, স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করা। স্ত্রীকে আসবাবের মতো গ্যাখে যে-পুরুষ, ভদ্র সমাজে তার স্থান হওয়া উচিত নয়, this is my candid opinion (এই আমার সুস্পষ্ট মত)!

সমর মিত্র বলিলেন—এ রহস্য আমি যেমন করে পারি, আবিষ্কার করবো। এবং দরকার হলে হয়তো আপনাকে আবার বিরক্ত করবো···এবং কোনো রকম হদিশ পেলেও আপনাকে আমি খপর দেবো।

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন—তার জন্য আমি লালায়িত নই। তবু দিয়ো খপর···

বিদায় লইয়া সমর মিত্র ঘরের বাহিরে আসিলেন···

এমন সময় বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় বুইক-মোটর আসিয়া থামিল। সেলুন-বডি গাড়ী। এবং সে-গাড়ী হইতে নামিল চক্রবর্ত্তী-কন্যা শ্যামলী এবং সেই বিভোর।

সমর মিত্রকে দেখিয়া শ্যামলী বলিল—আপনি!

—হ্যাঁ। এসেছিলুম তোমার দাদামশায়ের কাছে···দু' একটা খপর জিজ্ঞাসা করতে।

—ও···

বিভোর কথা কহিল না···ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল··· তার হাতে একটা প্যাকেট।

শ্যামলী তার পানে চাহিল···বলিল—প্যাকেটটা আমায় দিন··· দিয়ে আপনি ওদিককার অফিস-কামরায় বসুন···

বিভোর প্যাকেট দিল শ্যামলীর হাতে। শ্যামলী তাহা গ্রহণ করিল এবং সমর মিত্রের পানে চাহিয়া বলিল—চলে যাচ্ছেন?

শ্যামলীর পানে দু' চোখের অবিচল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ···তোমার মা একটু সামলেছেন?

শ্যামলী বলিল—হ্যাঁ। মার strength of mind খুব···তার উপর একটা কাজ ঘাড়ে পড়েছিল··public কাজ···কোরিয়ায় বন্যা হয়েছিল সেখানকার বিপন্নদের রিলিফের জন্য একটা ড্রামাটিক শো করিয়ে টাকা তোলা···এ বিপদেও মার সে-কাজ ফেলবার জো ছিল না কি না!···নমস্কার!

শ্যামলী চলিয়া গেল।

সমর মিত্র ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। শ্যামলীর আঙুলে আংটি দেখিলেন,—সে আংটির পাথর যেন খশিয়া গেছে! মনে হইল, সেই হীরা নয় তো? তার উপর শরৎ গাঙ্গুলি বলিয়াছিলেন, বুইক্-গাড়ী··সেলুন-বডি···সেই বুইকে চড়িয়া সেই কৃষ্ণ-বসনা সুন্দরীর অন্তর্দ্ধান···

এ বুইকে ড্রাইভার নাই!···সে-বুইকেও ছিল কি না, কে জানে! এ গাড়ী চালাইয়া আসিয়াছে শ্যামলী নিজে! না, ঐ বিভোর ছোকরা? বিভোর কাজ করিত কামিনীর কাছে···কিন্তু সব সময়ে ইহাদের সঙ্গে আঁটিয়া আছে। সেদিন বাগানে গেলেন মিসেস চক্রবর্ত্তী এবং শ্যামলী···তাঁদের সঙ্গে ছিল বিভোর! এবং আজ এখানে আসিয়াছে শ্যামলী···সঙ্গে ঐ বিভোর!···

একটু খোঁজ করা দরকার। বুইক-গাড়ীর নম্বর দেখিয়া সে-নম্বর মনে গাঁথিয়া লইলেন···তার পর বাহিরে ছিল তাঁর টু-শীটার···সেই টু-শীটারে চড়িয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চক্রবর্ত্তী-পরিবার

মুখার্জ্জী সাহেবের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সমর মিত্র সমস্তায় পড়িলেন। পথে এখন একটু অপেক্ষা করিবেন? শ্যামলী আসিয়াছে মাতামহের কাছে! কেন?···আসিয়াছে যখন, নিশ্চয় শুনিবে সমর মিত্র কেন আসিয়াছিলেন! সে-কথায় কিছু আসিয়া যায় না! কিন্তু এই যে বুইক গাড়ীতে চড়িয়া আসিয়াছে···সঙ্গে বিভোর! বিভোর আত্মীয় নয়, বাপ কামিনী বাবুর কাছে চাকরি করিত···

বিভোরের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গতা!···এতখানি পথ আসিয়াছে··· ডাগর মেয়ে···একা···ঐ বিভোরের সঙ্গে। সে-রাত্রে ও-বাড়ীতে বিভোর ছিল সঙ্গে! বাপের কাছে যে চাকরি করে—দিনের বেলায় তার সঙ্গে দেখা-শুনা হওয়া বিচিত্র নয়! তাই বলিয়া সর্ব্বক্ষণ? এমন কি সন্ধ্যার সময় দমদমায় আসা···আবার সেদিন সেই রাত্রি একটা-দুটোর সময় টালিগঞ্জে যাওয়া! তাছাড়া ঐ বুইক গাড়ী। তার উপর সদ্য দেখিয়াছেন, শ্যামলীর আঙুলে আংটী···সে আংটীর পাথর খশিয়া গিয়াছে! সেই হীরাখানা ও আংটিতে ছিল না তো? শরৎ গাঙ্গুলি বলিয়াছেন, বুইক গাড়ীতে করিয়া পলায়ন!

হয়তো এই বুইক।···হয়তো সে রাত্রেও এই বুইকে ছিল বিভোর! সে-ই গাড়ী হাঁকাইয়া দ্রুত সরিয়া গিয়াছিল!

এগুলা যদি সত্য হয়···তাহা হইলে মেয়ে শ্যামলীই কি বাপের বুকে ছুরি বসাইয়া···সমর মিত্রের গা ছমছম্ করিয়া উঠিল।

সমর মিত্র স্থির করিলেন, পথে কোথাও গাড়ী-সমেত একটু গা-ঢাকা দিয়া থাকিবেন। তারপর শ্যামলী আসিলে…ঐ বুইকের পিছনে-পিছনে অনুসরণ !

হাতের নাগালে এতগুলো ব্যাপার পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক হইবে না !

কিন্তু তাঁর গাড়ী…উহারা চিনিয়া ফেলিবে না তো ? চেনে,…তাহাতে কি ! দেখিয়াছে, দমদমায় আসিয়াছিলেন…তারপর হয়তো অন্য কাজ সারিয়া একই পথ ধরিয়া কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন !

সমর মিত্র এদিকে যশোর রোডের উপরে…দম্‌দম্ জেলের একটু দক্ষিণে যে-চার্চ্চ, সেই চার্চ্চের সামনে পথের ধারে গাড়ী থামাইয়া প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

মাথার উপর শ্রাবণের এক-টুকরা কালো মেঘ জমিয়া এক-পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। সে-বৃষ্টি থামিবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা… এবং আকাশের বুকে ফাটা-ফাটা একরাশ কালো মেঘের মধ্য হইতে চাঁদের মলিন জ্যোৎস্না নীচে পৃথিবীর বুকে ঝরিয়া পড়িল।

প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সামনে দিয়া কত মোটর আসিল-গেল…বাসের গুরু-গম্ভীর গতি…অবশেষে সেই বুইক-গা[illegible]…

সমর মিত্র চট্ করিয়া নামিয়া গাড়ীর বনেট খুলিলেন… যেন কোথায় কি বিগড়াইয়াছে, পরীক্ষা করিতেছেন !

বুইক-গাড়ী কাছে আসিল…পাশ দিয়া চলিয়া গেল। সমর মিত্র তাড়াতাড়ি গাড়ীতে বসিয়া গাড়ী চালাইলেন। টু-শীটার চলিল—বুইককে লক্ষ্য করিয়া তাহারি পিছনে…

যশোর রোড ধরিয়া ক্রমে পাতিপুকুর…বেলগাছিয়া…খালের

পুল পার হইয়া সোজা পশ্চিম-মুখে চলিয়া গাড়ী বাঁয়ে মোড় লইল ! অপার সার্কুলার রোড···

এদিকে বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পথ বেশ পিছল···গাড়ী জোরে চালাইলে চাকা স্লিপ্ করিতে পারে···বুইক তার গতিবেগ মৃদুতর করিল···সমর মিত্রকেও তাই করিতে হইল···

তারপর বিডন ষ্ট্রীটের মোড়···মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের মোড়···বহু-বাজারের মোড়···ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট···বুইক ঢুকিল মৌলালির সেই পূব-দিককার গলিতে।

সে-গলি ধরিয়া রেলোয়ে-লাইনের পুলের উপর দিয়া আরো পূর্ব্বে ট্যাঙরা !

ট্যাঙরার মাধব পালিত ষ্ট্রীটে বড় একটা কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়ীর ফটকের মধ্যে গিয়া বুইক ঢুকিল। সমর মিত্র ফটকে ঢুকিলেন না···সে-বাড়ীর সামনে দিয়া সোজা দক্ষিণ-দিকে চলিয়া গেলেন···তারপর দশ মিনিট চক্র দিয়া তিনি আসিয়া সে-বাড়ীর ফটকে প্রবেশ করিলেন।

ফটক দিয়া অনেকখানি-ভিতর পর্য্যন্ত ফাঁকা খোলা পথ। দুদিকে বড় বড় সেগো-পাম্···কাঁকর-ফেলা পথ গিয়া মস্ত দোতলা বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার নীচে ঢুকিয়াছে !

গাড়ী-বারান্দার বাহিরে গাড়ী থামাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া সমর মিত্র ভিতরের ল্যাণ্ডিংয়ে আসিলেন।

ও-দিককার একটা ঘরে গান-বাজনার সমারোহ···যেন রিহার্শাল চলিয়াছে ! তিনি স্তম্ভিত হইলেন। সদ্য এত বড় বিয়োগ-শোকের ব্যাপার···আর সে বিয়োগ-বেদনার বুকের উপরে নাচ-গানের এমন তাণ্ডব !···

মনের মধ্যে যেটুকু মমতা ছিল···

সমর মিত্র ভাবিলেন,—কিসের মমতা-মায়া! যারা এত বড় নির্লজ্জ ···এমন হৃদয়হীন···

সেই গান-বাজনা লক্ষ্য করিয়া তিনি আসিয়া সে-ঘরের দ্বারের পর্দা সরাইলেন। শ্যামলীর দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিল। শ্যামলী চুপ করিয়া সোফায় বসিয়া আছে···আর তার সামনে দুটি কিশোরী কোমরে আঁচল জড়াইয়া পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া হাত তুলিয়া নাচের তালিম দিতেছে!

সমর মিত্রকে দেখিবামাত্র শ্যামলী দ্রুত উঠিয়া দ্বারের কাছে আসিল, বলিল—আপনি?

—হ্যাঁ। তোমার মা?

শ্যামলী বলিল—মা দোতলার ঘরে শুয়ে আছে। তাঁকে দরকার?

সমর মিত্র বলিলেন—তোমাকেও দরকার। আর তোমাদের সঙ্গে সে-রাত্রে যে-দুজন টালিগঞ্জে গেছলেন···তাঁদের চাই।

শ্যামলী বলিল—বিভোর আর বঙ্কু বাবু?

—ও···হ্যাঁ···ঐ নাম বটে।

শ্যামলী বলিল—বঙ্কু বাবু এখানে নেই···বাড়ী গেছেন।

—তাঁকে ডাকিয়ে আনা যায় না?

—কেন যাবে না?··· আপনি ও-ঘরে বসবেন, চলুন···বঙ্কু বাবুর ওখানে এখনি আমি গাড়ী-শুদ্ধ লোক পাঠাচ্ছি।

এ কথা বলিয়া সমর মিত্রকে আনিয়া শ্যামলী বসাইল মাঝখানের প্রকাণ্ড ড্রয়িং-রুমে। মস্ত ঘর···সজ্জিত।···

বসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—তোমার মাকে জ্বালাতন করবো! কি

ারি···এ সময়ে তোমাদের এই শোক···দুঃখ···তার মধ্যে আমি এসে ৎপাত করছি। কিন্তু উপায় নেই! কর্ত্তব্য···কঠিন হলেও তা ালন করতে হবে।

—নিশ্চয়···যাকে আমি এখনি খপর দিচ্ছি।

শ্যামলী চলিয়া যাইতেছিল···কি মনে হইল, ফিরিল। ফিরিয়া লিল,—আপনার জন্য কি দিতে বলবো? চা? সরবৎ? কফি?

সমর মিত্র বলিলেন—না···না···কিছু দরকার নেই।

শ্যামলী বলিল—বাঃ, তা কখনো হয়! সন্ধ্যার আগে দমদমায় খা হলো···সেই অবধি ঘুরে বেড়াচ্ছেন···একটু কিছু মুখে বেন না?

সমর মিত্র বলিলেন—এখন থাক··· যে-কাজে এসেছি, সে-কাজ াগে শেষ করি, তার পরে না হয়···

এ-কথায় শ্যামলী যেন একটু খুশী হইল! শ্যামলী বলিল—বেশ, ন্তু কিছু না খেয়ে আপনার যাওয়া হবে না। চুরুট দেবে?

—না চুরুটের অভ্যাস নেই তেমন।···

শ্যামলী বলিল—আশ্চর্য্য কথা···

শ্যামলী চলিয়া গেল। সমর মিত্র বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া খিলেন···

ও-দিককার ঘরে ঘুঙুর তখন ঘাঘর-ঝাঁজর রবে সাড়া তুলিয়াছে ·সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদের মুখে চীৎকার—এক দুই তিন···এক দুই তিন ·এক দুই তিন···

সমর মিত্র মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন, খাশা জীবন! হার্শাল এবং বিয়োগ-বেদনার সমন্বয় গঙ্গা-যমুনার মতো! এমন

ব্যাপার অজীব মর্ত্ত্যলোকে দেখা যায়, বিশেষ বাঙালীর ঘরে··· এতদিনের পুলিশ-জীবনের অভিজ্ঞতা থাকিলেও সমর মিত্র তাহা কল্পনা করেন নাই!

তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন···মাথার মধ্যে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সম্বন্ধে উদ্ভট বহু কথা বায়োস্কোপের ছবির মতো তীব্র-প্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে···

হঠাৎ বাহিরে পুরুষ-কণ্ঠে পুরুষ আহ্বান—শ্যামলী···শোনো···

ভিতরে শ্যামলীর কণ্ঠ শুনা গেল—শ্যাণ্ডেল!

পূর্ব্বেকার সে পুরুষ-কণ্ঠ শুনা গেল—শ্যাণ্ডেলের!

শ্যাণ্ডেল বলিল—তোমাদের ঐ আদুরে বিভোর···তাকে আমি চাবুক লাগাবো এবার!

শ্যামলী বলিল—তার অপরাধ?

শ্যাণ্ডেল বলিল—আমার গাড়ীর বনেটে যে-রোবোট ছিল, সেটা খুলে কোথায় রেখেছে···বললে, খুঁজে দেবো···আজ পর্য্যন্ত পেলুম না।···তাছাড়া গাড়ীটা কোথায় ধাক্কা লাগিয়ে এনেছে··পিছনের মাড-গার্ড তোবড়ানো···চালাকি পেয়েছে সে? বটে! কেন তাকে আবার আমার গাড়ী হ্যাণ্ড্‌ল্‌ করতে দিয়েছিলে, জানতে পারি?

শ্যামলী বলিল—আমাদের এখানে গাড়ী যখন রেখে গেছলে, তখন তুমিই বলেছিলে, এটাকে চালিয়ো···নাহলে ওর ব্যাটারি পুরোনো, সেটি একদম্‌ ডিস্‌চার্জ্জ হয়ে যাবে···

শ্যাণ্ডেল বলিল—সে কথা বলেছিলুম বলে ঐ বিভোরকে দিয়ে গাড়ী চালাবে?

—কেন, ও চালায় ভালো !···লাইসেন্স আছে !···গাড়ীতে ও আর আমি ছাড়া আর কেউ ওঠে নি···

শ্যাণ্ডেল বলিল—তুমি লক্ষবার চড়বে। তা বলে ঐ ক্যাড্‌টাকে দিয়ে গাড়ী চালাবে···এইতেই আমার আপত্তি। আর সে-আপত্তি তোমার অজানা নয়।

শ্যামলী বলিল—এই তোমার লভ্‌! আমার কাছে···

শ্যাণ্ডেল বলিল—সে কথা হচ্ছে না। তুমি ভুল বুঝছো··· শুধু ঐ স্কাউণ্ড্রেল···

হাসিয়া শ্যামলী বলিল—আমি জানি, ওর উপর তোমার একটু জেলশি আছে। আমার ফাই-ফরমাশ খাটে···পাঁচটা কাজে আমি ওকে ডাকি···না ?

উত্তরে শ্যাণ্ডেল অতি মৃদু স্বরে কি বলিল, শুনা গেল না। তারপর শ্যামলী যা বলিল, সমর মিত্র শুনিলেন।

শ্যামলী বলিল—তুমি বোঝো না···ওকে নিয়ে একটু রঙ্গ করি।

শ্যাণ্ডেল বলিল—না···না···ওতে ও-সব গাধারা প্রশ্রয় পায়।

হাসিয়া শ্যামলী বলিল—প্রশ্রয় যদি পায়, তোমার তাতে ক্ষতি নেই···আমারো নয়। মাঝে থেকে একটু মজা···

কথার শেষে শ্যামলী যেন হাসিতে লুটাইয়া পড়িল !

সমর মিত্র কাঠ হইয়া শুনিতে লাগিলেন···ওদিকে ছোট একটু প্রণয়-নাটিকাও চলিয়াছে ! বাঃ ! সে নাটিকায় ঐ হাসির ঝাপটার উপরে আর একটি কণ্ঠ জাগিল—কিসের অত হাসি রে শ্যামলী ?

শ্যামলী বলিল—মা···

সমর মিত্র বুঝিলেন, মিসেস অম্বা চক্রবর্ত্তী আসরে আসিয়াছেন।

শ্যামলী বলিল—বিভোরকে নিয়ে একটু মজা করি···শ্যাণ্ডেলের তাতে বুক চড়চড় করে···

সঙ্গে সঙ্গে শ্যাণ্ডেল বলিল—সে কথা নয়। আমার গাড়ীর রোবোট্‌টা কোথায় ফেলেছে···ক'দিন জিজ্ঞাসা করছি···বলে, খুলে রেখেছি···দেবো। তা দেবার নাম নেই। নির্ঘাৎ বেচে মেরে দেছে। ···ওটার দাম অনেক টাকা। দেখুন তো তার কত বড় অন্যায়। তারপর কোথায় ধাক্কা লাগিয়েছে··মাড-গার্ডে এত বড় টোল।···ধাক্কা লাগিয়েছিস্, তা সে-কথা আমায় বল্. ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে খপর দিয়ে সারিয়ে নি···তা করবে না! So irresponsible আর careless···

মিসেস চক্রবর্ত্তী বলিলেন—সত্যি, ওর গাড়ীখানা এখানে রেখে গেছে বলে' সেটাকে নিয়ে যখন-তখন···

শ্যাণ্ডেল বলিল—চড়ুক···গাড়ী তো চড়বার জন্য। তা বলে ড্রাইভারকে দিয়ে না চালিয়ে ঐ হতভাগাকে দিয়ে···

মিসেস চক্রবর্ত্তী বলিলেন—না, না···সত্যি তো···ওর সখের গাড়ী···তোর নিজের গাড়ী তো রয়েছে বাপু···তাই নিয়ে বেরুলে পারিস···

গম্ভীর কণ্ঠে শ্যামলী বলিল—কে চায় বুইকে চড়তে! নেহাৎ বলে গিয়েছিল, তাই···

শ্যাণ্ডেল একটু বিচলিত হইল, বলিল—দেখলেন, আপনার মেয়ের অমনি অভিমান হলো!

—যা, যা, ঝগড়া করিস নে।···এ্যাদ্দিন পরে ও এলো, দুজনে গল্পস্বল্প করগে যা···

এই কথা বলিয়া মিসেস চক্রবর্ত্তী আসিয়া ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিলেন।

সমর মিত্র উঠিয়া নমস্কার করিলেন।

মিসেস চক্রবর্ত্তী বলিলেন—আমাকে কি দরকার?

সমর মিত্র বলিলেন···আমার উপরে এনকোয়ারির ভার পড়েছে। আপনাদের এই বিপদ···এত বড় শোকের আঘাত···তারি মধ্যে আমায় অত্যন্ত নিষ্ঠুর হৃদয়-হীনের মতো আসতে হয়েছে! আমার কর্ত্তব্য। আপনাদের সাহায্য না পেলে এ নিষ্ঠুর হত্যা-ব্যাপারের কোনো কিনারা করা আমার পক্ষে অসম্ভব! তাই মানে···

মিসেস চক্রবর্ত্তী বলিলেন—বলুন···শোক বটে···কিন্তু তার জন্য বসে থাকলেও তো চলবে না। সব কাজ মানুষকে করতে হয়···শোককে বুকে চেপে। এর জন্য আপনার কিন্তু বোধ করবার কারণ নেই। তার উপর শ্যামলী বলছিল, আজ আপনি বাবার কাছেও গেছলেন।

—হ্যাঁ। দায়ে পড়ে তাঁকেও বিরক্ত করতে হয়েছে বৈ কি!···তা আমাকে ক্ষমা করবেন···আমাকে হয়তো অনেক প্রশ্ন করতে হবে, যা আপনাদের কাছে অপমান-জনক মনে হতে পারে। কিন্তু আপনি একজন লেডি অফ্ এডুকেশন্ এ্যাণ্ড এমিনেন্স্ (শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্ত মহিলা)··এবং exceptionally wise and intelligent (অসাধারণ রকমের জ্ঞান-মণ্ডিতা এবং বুদ্ধিমতী)···কাজেই আমার প্রশ্নের আপত্তিকর অংশটুকু শুধু আপনি দেখবেন না,—আপনার স্বামীর শোচনীয় হত্যার জন্য যে পাপিষ্ঠ দায়ী, তাকে ধরা এবং বিচারে তার যোগ্য শাস্তি যাতে হয়,—এই জন্যই আমার এ তদারকী

চলেছে! এই মহদুদ্দেশ্যের কথা মনে করে আমাকে ক্ষমা করবেন এবং আমার কাজে সাহায্য করবেন, এ আশা আমি দুরাশা ব'লে মনে করি না!

ভূমিকা শুনিয়া মিসেস চক্রবর্ত্তী খুশী হইলেন, বলিলেন—বুঝি তো আপনার কর্ত্তব্য কতখানি কঠিন। না, আমি বিরক্ত হবো না··· আপনি বলুন।

সমর মিত্র বলিলেন—আমার প্রথম কথা, সেদিন বাগানে যে-সময় আপনার স্বামী মারা যান্, ঠিক তার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে একজন স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শোনা গিয়েছিল···এবং তার পর-মুহূর্ত্তেই কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে তরুণ বয়সের একটি স্ত্রীলোক ছুটে ঘর থেকে বাইরে এসে বুইক গাড়ীতে চড়ে ও-বাগান থেকে বেরিয়ে যান্···এ খপর আমরা পেয়েছি এবং এ খপর পাকা!

মিসেস চক্রবর্ত্তী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—আমিও শুনেছি···

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার বাড়ীতে বুইক গাড়ী আছে···

মিসেস চক্রবর্ত্তী বলিলেন—হ্যাঁ···সে গাড়ী আমার নয়। আমাদের এক বন্ধু আছেন · স্যাণ্ডেল··· তাঁর বুইক গাড়ী আছে। সে রেলে কাজ করে···এ-টি-এস-এর কাজ। বদলি হয়ে টাটানগর গেছে। তার গাড়ী সে আমাদের গেরাজে রেখে গেছে। এখানকার বাস তুলে দেছে কি না, তাই।

সমর মিত্রের মনে পড়িল, সে রাত্রে মিসেস চক্রবর্ত্তী বাগানে গিয়াছিলেন সজ্জিত-বেশে···সালঙ্কারা। বাড়ীতে মানুষ অত গহনা গায়ে দিয়া থাকেন না···সাধারণতঃ। তাই প্রশ্ন করিলেন—সে রাত্রে

আপনি যখন ফোনে খপর পান, তার আগে বাহিরে কোথাও গেছলেন ?

—গিয়েছিলুম। ভ্যাণ্ডারলিন্ সাহেব···রেলোয়ে-পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট···তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে·· সে রাত্রে ডালহাউসি ইন্‌ষ্টিটিউটে ডান্স-পার্টি ছিল···সেখানে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে ফিরে দোতলায় উঠছি, এমন সময়ে আপনার ফোন্ শুনলুম···

—আপনি একা ডান্সে গেছলেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনার মেয়ে ?

—না। ও বাড়ীতে ছিল। আমার সঙ্গে ওর যাবার কথা ছিল···কিন্তু সন্ধ্যার আগে আমাকে বললে, বড্ড মাথা ধরেছে মা, আমি কোথাও বেরুবো না। তাই ও যায় নি,···বাড়ীতে ছিল !

—হুঁ।·· বিভোর ?

—না, বিভোর কোথায় যাবে ?

—বিভোর আপনার বাড়ীতেই থাকে ?

—না। ও থাকে ইটিলিতে! আমার স্বামীর কাছে কাজ করতো। চিঠি-পত্র লিখতো। করেস্‌পণ্ডেন্স-ক্লার্ক।

—ওকে আপনারা একটু বেশী স্নেহ করেন ?

—তা করি। ওর বাপ আমার বাবার ম্যানেজার ছিলেন। বাপ মারা গেলে ওরা দু' ভাই, আমাদের পরিবারে আশ্রয় পায়। বিভোরের দাদা বি-এস-সি-পাশ···তাকে আমার বাবা রেখেছেন তাঁর লোহার ফাউণ্ড্রিতে। আর ছোট বিভোর···বিদ্যা ওর ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্য্যন্ত। ওকে বাবা দেন আমার স্বামীর কাছে। টাইপ-রাইটিং

জানে চিঠিপত্র নকল করে…অর্থাৎ কোনো মতে ওকে প্রোভাইড করা আর কি!

—আপনার মেয়ের বিবাহের কোনো কথা হয়েছে?

মিসেস চক্রবর্ত্তী বলিলেন—ঐ শ্যাণ্ডেল…ওর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছে…কথা প্রায় পাকা!

—আপনার মেয়ের আঙুলে যে আংটি আছে…সেটি আমি একবার দেখতে চাই, মিসেস চক্রবর্ত্তী…

—তার মানে? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে মিসেস চক্রবর্ত্তীর চোখে ভ্রূকুটি-রেখা!

—এ পর্য্যন্ত যতদূর জানা যাচ্ছে, তার সঙ্গে ওঁর আংটির একটু সম্পর্ক আছে, মিসেস চক্রবর্ত্তী। এতে কোনো অসম্মান বা অপমানের ইঙ্গিত নেই!

—বেশ…আমি তাকে ডাকাচ্ছি।

'বলিয়া মিসেস চক্রবর্ত্তী কলিং-বেল টিপিলেন। বেয়ারা আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

অম্বা চক্রবর্ত্তী বলিলেন—দিদিমণি…

বেয়ারা চলিয়া গেল।

সমর মিত্র বলিলেন—ব্যাপারটা এত বেশী রকম রহস্যপূর্ণ যে এমন ব্যাপার আমি তো কখনো প্রত্যক্ষ করি নি!

অম্বা চক্রবর্ত্তী কোনো জবাব দিলেন না। তাঁর মুখে একটু গাম্ভীর্য্য!

সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা, মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর দেনাপত্র কিছু ছিল?

—আমি জানি না।

—ভালো কথা। একটা লাইফ ইনসিওরের বেনিফিসিয়ারি সম্বন্ধে কোম্পানিকে আপনি এটর্ণির চিঠি দেছেন?

—দিয়েছি। কারণ ও-পলিশির জন্য এযাবৎ যে-টাকা দেওয়া হয়েছে, সে-টাকা আমার বাবা বরাবর জুগিয়েছেন। আমার স্বামী সে-পলিশির জন্য পকেট থেকে একটি পয়সা বার করেন নি! সে-পলিশির টাকা দেওয়া হয় বছরে একবার করে'…ফার্ষ্ট প্রিমিয়াম যা দেওয়া হয়েছে, তা সেই ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত! এবং শোনা গেল, সে-পলিশির নমিনি না কি কে রাঘব চ্যাটার্জ্জীর স্ত্রী মীরা দেবী! How scandalous (কি লজ্জার কথা)!

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু এই রাঘব চ্যাটার্জ্জী বলে কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই বলে' আপনার বিশ্বাস? কিন্তু আমি বলছি, আপনার স্বামী তাঁর কোনো ফন্দী-সাধনের জন্য নিজে ঐ নাম নিয়েছিলেন। এবং ঐ নামে এবং পরিচয়ে তিনি বিবাহ করেছিলেন দশ-বারো বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রীমতী মীরা দেবীকে!

বিরক্তি-পূর্ণ স্বরে মিসেস চক্রবর্ত্তী বলিলেন—বিবাহ আমি বিশ্বাস করি না!…Mistress (উপপত্নী) রেখেছিলেন…

সমর মিত্র বলিলেন—Excuse me (ক্ষমা করবেন) মিসেস্ চক্রবর্ত্তী। It is as sacred a tie as yours (আপনার সঙ্গে যে বিবাহ,এ বিবাহও তেমনি পুণ্য-বন্ধন)!

রাগে মিসেস চক্রবর্ত্তী অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন…কোনো জবাব দিলেন না।

সমর মিত্র স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেন—রমণীর সপত্নী-বিদ্বেষ! শিক্ষা-অশিক্ষায় এ বিদ্বেষে এতটুকু পার্থক্য ঘটে না!

এমন সময় শ্যামলী আসিল। আসিয়া প্রশ্ন করিল—আমাকে ডেকেছো মা?

মা বলিলেন—হাঁ। সমর বাবু তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করতে চান!···তোমার father-এর murder সম্বন্ধে···

শ্যামলী বসিল মায়ের পাশে কৌচে···দু'চোখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি।

সমর মিত্র বলিলেন—যে-রাত্রে তোমার বাবা মারা যান, সে-রাত্রে তোমার মা গিয়েছিলেন ডালহাউসি ইন্স্টিটিউটে ডান্স-পার্টিতে···তুমি বাড়ীতে ছিলে?

—হ্যাঁ···আমার বড্ড মাথা ধরেছিল।

—তুমি আদবে বেরোও নি?

—না।

সমর মিত্র বলিলেন—ভুলে যাচ্ছো মা! বেশ করে মনে করে ছাখো দিকিনি···বুইক-কারে চড়ে বেরিয়েছিলে। আর সে-গাড়ীর মাথায় যে-রোবোট ছিল, সে-রোবোট হারিয়ে যায় ঐ রাত্রেই···

শ্যামলীর মুখের উপরে যেন তীব্র কশা পড়িয়াছে···তার মুখ তেমনি বিবর্ণ-মলিন!

মিসেস চক্রবর্ত্তী বলিলেন—কি বলতে চান আপনি, সমর বাবু?

সমর মিত্র বলিলেন—আমি কিছু বলছি না তো···বলবেন আপনার কন্যা।

—কিন্তু···

সমর মিত্র বলিলেন—বুইক-গাড়ীর সে পরী…দেখলে বোধ হয় চিনতে পারবে ?

প্রশ্ন শেষ করিয়া পকেট হইতে কাগজের প্যাকেট খুলিয়া সমর মিত্র বাহির করিলেন। সেই পরী-মুর্ত্তি।

দেখিয়া…শ্যামলী যেন শিহরিয়া উঠিল…আতঙ্কে সে চক্ষু মুদিল।

সমর মিত্র বলিলেন—দয়া করে বিভোরকে যদি একবার ডেকে স্থান্…

মিসেস চক্রবর্ত্তী বলিলেন—আমার বাড়ীতে আমার এই বাচ্ছা মেয়েকে আপনি অপমান করতে চান ! I do not understand your motive (আপনার অভিপ্রায় আমি বুঝিতেছি না) ! You seem to stand by that precious lady...sister-in-law of that solicitor friend of yours (মনে হইতেছে, আপনার সেই সলিসিটার-বন্ধুর শ্যালিকার পক্ষ আপনি অবলম্বন করিয়াছেন) …and not working for us (আমাদের তরফে কাজ করিতেছেন না) ! এবং আপনি যদিও নিশ্চিত বুঝছেন that she murdered him (সে আমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে) !

এ কথায় সমর মিত্র কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না…শান্ত স্বরে বলিলেন—স্ত্রী অর্থাৎ সেই মীরা দেবী আপনার স্বামীকে খুন করেছেন …আপনার বিশ্বাস ?

— Why, every sane man would say so (যে-কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এই কথাই বলিবে)। আমার স্বামী তাকে করে গেছেন পঁচিশ হাজার টাকার পলিশির নমিনী ! আমার স্বামী মারা গেলে সে পাবে পঁচিশ হাজার টাকা ! পঁচিশ হাজার টাকা means for a

beggar quite a prince's ransom (তার মতো ভিখারিণীর কাছে রাজ-সম্পদের তুল্য)!...

রাগে আক্রোশে মিসেস চক্রবর্ত্তীর বিরাট বক্ষ সঘন-স্পন্দিত হইতে লাগিল...

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি রাগ করেছেন, উত্তেজিত হচ্ছেন... কিন্তু জানেন, আমার এ কর্ত্তব্য করবার জন্য এখানে যদি অসুবিধা বোধ করি বা বাধা পাই, তাহলে আইন আমাকে যে-ক্ষমতা যে-অধিকার দেছে, এবং এনকোয়ারিতে যে-সব তথ্য জেনেছি, তার জোরে আপনার এই কন্যাকে এবং বিভোর বাবুকে আমি এখনি গ্রেফতার করতে পারি! এবং তা যদি করি তাহলে আপনার এ ধন-গর্ব্ব নিমেষে ধূলিসাৎ হবে?...

কথাগুলা মিসেস চক্রবর্ত্তী শুনিলেন—বজ্র-নির্ঘোষের মতো।

সমর মিত্র বলিলেন—বাইরে এ-সব কথা যত না প্রকাশ পায় আপনাদের সম্মান রক্ষা করে যতখানি নিঃশব্দে এন্‌কোয়ারি হয়, সেইদিকে আমার লক্ষ্য।...তা না বুঝে আপনি যদি পয়সার অহঙ্কারে এমন ঝাঁজ-মেজাজ দেখান...

শ্যামলী ডাকিল—মা...

মিসেস চক্রবর্ত্তী যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। বুঝিলেন, একটা খুনী ব্যাপার...পারিবারিক মান-মর্য্যাদায় কলঙ্কের যে-ছাপ লাগিয়াছে ...আর কিছু না হোক্, সে কলঙ্ক হইতে মুক্তি পাওয়া প্রয়োজন! নহিলে সোসাইটি...

তিনি বলিলেন—আর রাগ করবো না। বলুন...মানে, বুঝতে পারছেন তো, স্বামীর এ নীচতায় জন্য মনে কতখানি আঘাত লেগেছে!

মান-ইজ্জৎ যদি না রইলো···আপনি আমার মনের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারবেন না সমর বাবু···

সমর মিত্র বলিলেন—আমি খুব বুঝি, মিসেস চক্রবর্ত্তী। এবং আমি বলেই আপনার বাবার সঙ্গে নিঃশব্দে গিয়ে দেখা করে এসেছি। এবং আপনার এখানেও দিনের বেলায় লোকের ভিড়ের মধ্যে না এসে এখন এসেছি। কোনোদিকে এতটুকু জানাজানি না হয়, এই উদ্দেশ্যে। আপনিই বাধা দিচ্ছেন···

—না, না···আমি আর কোনো কথা বলবো না। আপনি আপনার কর্ত্তব্য করুন···

সমর মিত্র কহিলেন—তোমায় যা জিজ্ঞাসা করলুম শ্যামলী···ভয় নেই · তুমি আমার মেয়ের মতো···বলো। এই পরী-মূর্ত্তিটিই কি ছিল শ্যাণ্ডেল সাহেবের বুইক-গাড়ীতে ?

শ্যামলীর ম্লান বিষাদিনী মূর্ত্তি···আনত শির···মুখ সে আর তুলিতে পারে না !

সমর মিত্র বলিলেন—বুঝেছি···এই মূর্ত্তিই !···আর এই পরী-মূর্ত্তি পাওয়া যাচ্ছে না বলে শ্যাণ্ডেল সাহেব একটু আগে বাইরে তোমার সঙ্গে ছোট-খাট ঝগড়া করছিল···

শ্যামলী মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল···পারিল না। মাথার উপর যেন পাহাড় চাপিয়া আছে ! সে পাহাড় ঠেলিয়া মাথা তোলা যায় না !

সমর মিত্র বলিলে—বিভোরকে ডাকবে ? এ-মূর্ত্তি কোথায় হারিয়েছিল···সে যদি বলতে পারে ?

শ্যামলী মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিল। কি বলিতে চাহিতেছিল, বলিতে পারিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার হাতে একটি আংটি আছে, তার পাথর খশে গেছে ?

নিজের অজ্ঞাতে শ্যামলী আংটি-পরা আঙুল সবলে চাপিয়া ধরিল। সমর মিত্র তাহা লক্ষ্য করিলেন।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি জ্যোতিষ জানি না। তবু বলে দেবো ও-আংটিতে ছিল বড় একখানি হীরে। যেদিন বুইক-গাড়ীর মাথা থেকে পরীমূর্ত্তি খশে হারিয়ে যায়, সেই দিনই তোমার আঙুলের ও-আংটি থেকে সে হীরে খশে হারিয়ে গেছে ! তাই নয় ?

অতি-কষ্টে শ্যামলী এবার মাথা তুলিল। মাথা তুলিয়া চাহিল সমর মিত্রের পানে। সমর মিত্র তার পানে অবিচল দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। শ্যামলীর যে-মুখ দেখিলেন, সে-মুখ রক্তহীন বিবর্ণ··· কাগজের মতো সাদা !

মিসেস চক্রবর্ত্তীও দেখিলেন, মেয়ে চকিতে এ কী হইয়া গিয়াছে ! তাঁর বুকখানা ধড়াশ করিয়া উঠিল !

সমর মিত্রের উপর নিরুপায় আক্রোশ ! তিনি বলিলেন—শ্যামলীকে আপনি কি বলতে চান, সমর বাবু ? ঐ বাচ্চা মেয়ে···ওর উপরে আপনার একটু মায়া হচ্ছে না ?

শান্ত অবিচল স্বরে সময় মিত্র বলিলেন—আমি আর কোনো কথা বলতে চাই না, মিসেস চক্রবর্ত্তী। কথা এখন শ্যামলী বলবে···এবং সে-কথায়, আমি জানি, শ্যামলীর কোনো অনিষ্ট হতে পারে না।

তারপর তিনি চাহিলেন শ্যামলীর পানে···বলিলেন—কিছু বলবে আমায় ? আমার অবশ্য জোর নেই···আর বলেছি তো, তুমি আমার মেয়ের মতো !

শ্যামলী বলিল—বলবো…

স্বপ্নে যেন সে কথা কহিল…

মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া মায়ের গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল!

সমর মিত্র বলিলেন—আজ বলতে পারবে? না…

—আজই বলবো…

শ্যামলী চাহিল মিসেস চক্রবর্ত্তীর পানে, বলিল—তুমি ও-ঘরে যাও মা…তোমার সামনে আমি কোনো কথা বলতে পারবো না।

এ-কথায় মা খুশী হইলেন না!

কিন্তু পুলিশ-অফিসার বসিয়া আছে…তার সঙ্গে কথা…এন্‌কোয়ারির ব্যাপার…

নিরুপায়ে তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন…বুকের উপরে যেন গোটা হিমালয় পাহাড়ের ভার বহিয়া।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বুইক-গাড়ীর রহস্য

শ্যামলী বলিল—আপনি যা অনুমান করেছেন···সেদিন সন্ধ্যার একটু পরে মা বেরিয়ে যাবার পর বিভোরকে আমি ডাকিয়ে পাঠালুম-বুইক-গাড়ীখানা বার করো···একটু বেড়াতে বেরুবো! বিভোর বিনা-বাক্যে গেরাজ থেকে বুইক-গাড়ী নিয়ে এলো। আকাশে তখন দারুণ মেঘ···বুঝছিলুম যে-কোনো মুহূর্ত্তে আকাশ ফেটে ভীষণ বৃষ্টি নামবে! বিভোর বললে, যাবেন? কিন্তু আকাশে দেখছেন, কি ভয়ঙ্কর মেঘ! আমি বললুম, যাবো···হোক্ বৃষ্টি! তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় বদলে তৈরী হয়ে আমি এসে গাড়ীতে বসলুম··· বিভোর গাড়ী ছাড়লো। আমার নির্দ্দেশে গাড়ী চললো। সার্কুলার রোড ধরে বরাবর গিয়ে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে আমরা বাঁয়ে বেঁকলুম। সোজা তারপর আমীর আলি এভেনিউ ধরে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। বালিগঞ্জ আউট-পোষ্টের কাছে মুষল-ধারে বর্ষা নামলো। বিভোর বললে—আর যায় না! আমি বললুম,—বৃষ্টিতে খুব মজা। যাবো। গাড়ী চললো···

সমর মিত্র বলিলেন—টালিগঞ্জের বাগানে যাচ্ছিলে?

—হ্যাঁ। তার কারণ, সেদিন দুপুরবেলায় একখানা চিঠি পেয়েছিলুম। একজন বেয়ারা এসে আলাদা আমায় ডেকে চিঠি দিয়ে যায়। বাবার চিঠি। চিঠিতে বাবা লিখেছিল—সন্ধ্যার পর তাঁর

সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে—বিশেষ দরকার। মা বা বাড়ীর কোনো লোক যেন এ-কথার এতটুকু না জানতে পারে!…কাকেও আমি বলিনি। বিভোরকেও বলিনি যে কোথায় আমি চলেছি, কেন চলেছি!

সমর মিত্র বলিলেন—টালিগঞ্জের ও-বাগান আগে থেকে তুমি জানতে?

—না। তবে চিঠিতে বাবা লাইন টেনে একটা নক্সা এঁকে দিয়েছিল। বাবা লিখেছিল,ঠিক রাত আটটার মধ্যে যাওয়া চাই। তাই সন্ধ্যা হতেই আমি বেরিয়ে ছিলুম।…আউট-পোষ্টের কাছে আকাশ-ফাটা বৃষ্টি… বিভোর একবার বললে, এ-বৃষ্টিতে ওদিকে যাবেন না! আমি বললুম, যাবো। চলো তুমি গোড়ে-হাট রোড ধরে। বিভোর কি করে? গাড়ী চালিয়ে এগিয়ে চললো। টালিগঞ্জের ডিপোর পাশ দিয়ে চক্র দিয়ে ঘুরে পূবদিকে…বিভোর গাড়ী চালিয়ে সেদিকে চললো। …রেলোয়ে-লাইন পার হয়ে ওদিকে যখন যোধপুর-ক্লাবের কাছে এসেছি, তখন ভাবনা হলো, এই অন্ধকারে আর এ-জলে বাড়ী-বাগান ঠাওর করতে পারবো কি!…সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, চিঠিতে বাবা লিখেছে, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের আতুর-আশ্রম আছে…তার সামনে দক্ষিণ-দিকে গলি, সেই গলিতে বাগান! আতুর-আশ্রম জানতুম। মোটরে করে ওদিকে কতদিন তো গিয়েছি!…শেষে আমাদের গাড়ী এলো সেই আতুর-আশ্রমের সামনে। বিভোরকে বললুম,—ঐ গলিতে ঢোকো। বিভোর বললে, পাগল হয়েছেন! এই দুর্যোগ…শেষে কি গাড়ীর চাকা বসে ষ্ট্রাণ্ডেড হয়ে থাকবো! আমি তার কথা শুনলুম না। বললুম, চলো। সঙ্গে ছিল কালো

সিল্কের বর্ষাতি-কোট···সে-কোটে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে আমি গাড়ী থেকে নামবার উদ্যোগ করলুম। সেই গলির মুখে বিভোর গাড়ী থামিয়েছিল। আমাকে নামবার উদ্যোগ করতে দেখে বিভোর বললে, নামতে হবে না···গলির মধ্যে গাড়ী নিয়ে যাচ্ছি! গাড়ী সে নিয়ে গেল। যে করে গাড়ী নিয়ে যাচ্ছিল···ভয় হচ্ছিল, সে-কথা লুকাবো না! কিন্তু বাবা লিখেছে, খুব দরকার। তার উপর মাকে বা আর কাকেও এখপর যেন না জানাই, লিখেছে! মনে হচ্ছিল, নিশ্চয় something very serious had happened (বিশেষ কোনো গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে)। বাগান পেলুম। ফটক খোলা···গাড়ীশুদ্ধ ঢুকলুম সেই বাগানের ফটকে! দেখি, কেউ নেই। বারান্দার কোলে ঘর, চাবি বন্ধ। হাতে ছিল হাত-ঘড়ি, কোনো মতে সময় দেখলুম, সাতটা বেজে দশ মিনিট! ভাবলুম, বাবা সময় দেছে আটটা···বাবা এখনো আসে নি! ভাবলুম, বসে থাকি···কিন্তু বিভোর ভয়ানক চ্যাঁচামেচি সুরু করে দিলে। তখন কি করি, গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে এলুম।···তারপর আবার গোড়ে-হাটের পথ ধরে সোজা টালিগঞ্জের ট্রাম-ডিপোর দিকে এলুম। ···সামনে একটা বড় গাছ মড়-মড় শব্দে ভেঙ্গে পড়লো মোটা একটা ডাল পড়লো এসে একেবারে আমাদের গাড়ীর গায়ে। গাড়ী বুঝি উল্টোয়! ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলুম!···বেচারী বিভোর গাড়ী থেকে নামলো এবং বহু-কষ্টে ডাল সরিয়ে গাড়ী পিছনে হঠিয়ে নিলে···গাছের ঘায়ে গাড়ীর মাড্-গার্ড রীতিমত চোট্ খেয়েছিল···তারপর ব্যাক্ করে নিচ্ছে···তা ছাড়া উপায় নেই··· সামনের পথ বন্ধ! গাড়ী কিন্তু ষ্টার্ট হতে চায় না! আমি বললুম দুজনে ঠেলি। আমি নামবো। বিভোর আমায় নামতে দিলে না।

বললে, এ জলে মারা যাবেন!···আমার নামা হলো না। বিভোর কশরতি করতে লাগলো। বৃষ্টির বেগ বাড়লো। আমরা তখন চুপ-চাপ নিরুপায়! শেষে বৃষ্টি থামলো · ডাকাডাকি করতে আশ-পাশ থেকে দু'চার জন লোক এলো। তাদের দিয়ে গাড়ী ঠেলাতে গাড়ী ষ্টার্ট হলো। এবং আমরা আবার এলুম সেই আতুর-আশ্রমের কাছে।··সেই গলি। ঘড়িতে তখন দেখি, আটটা। বিভোরকে বললুম, গলির মধ্যে ঢোকো। বিভোর বললে, আজ রাত্রে একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটবেই, দেখছি। হেসে আমি বললুম—মন্দ কি! তুমি আছো সঙ্গে···just like a hero! বিভোর কি ভাবলে, জানি না···গাড়ী নিয়ে সে ঢুকলো গলির মধ্যে। আবার সেই বাগান··· সার্শির মধ্য দিয়ে এবার দেখি, ঘরের মধ্যে আলো। বুঝলুম, বাবা এসেছে। বাগানের একটু আগে গলিতে একখানা মোটরও দেখেছিলুম···

বাধা দিয়া সমর মিত্র বলিলেন—সেভ্রোলে?

—তা জানি না। লক্ষ্য করিনি।···ফটকের মধ্যে গাড়ী ঢুকিয়ে রাখলে বিভোর। আমি বললুম—তুমি গাড়ীতে চুপচাপ বসে থাকো··· একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে···আমি যাবো আর আসবো। বিভোর আমার কথা শিরোধার্য্য করে নিঃশব্দে গাড়ীর মধ্যে বসে রইলো। বেচারী যা ভিজেছিল! শীতে সে কাঁপছিল। গাড়ীতে একখানা র‍্যাগ ছিল···আকাশে মেঘ দেখে বেরুবার সময় আমি সেটা সঙ্গে নিয়েছিলুম। বিভোরকে র‍্যাগখানা দিয়ে বললুম, মুড়ি দাও··· না হলে শীত করবে। বলে' গাড়ী থেকে নেমে আমি বাড়ীর বারান্দায় গিয়ে উঠলুম···

বাধা দিয়া সমর মিত্র বলিলেন—এই যে তারপর বাগান পেলে, বাগানে এমন কোনো-কিছু দেখলে যাতে মনে কোনো রকম সন্দেহ বা ভয় হয় ?

—না। কিছু না। বন্ধ সার্শির মধ্য দিয়ে ঘরে আলো আছে দেখে সার্শিতে আমি ঠেলা দিলুম...সার্শি খুলে গেল। খোলা সার্শি... আমি ঘরে ঢুকলুম। ঢুকে দেখি, মেঝের উপরে বাবা পড়ে আছে... সাড়া নেই, শব্দ নেই !...ভাবলুম, অজ্ঞান? আরো এগিয়ে এসে দেখলুম। গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকবো...দেখি, রক্ত! আমার মাথা ঘুরে গেল...ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলুম! তারপর বাতাসে সার্শিটা দুম্ করে বন্ধ হয়ে গেল! আমার আরো ভয় হলো ভাবলুম, খোলা সার্শি দিয়ে যদি কেউ আসে? ওদিককার দরজা খুলে বেরিয়ে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে একা আমি গাড়ীতে উঠে সামনের শীটে বিভোরের পাশেই বসলুম! মুখ দিয়ে প্রথমটা কথা বার হলো না। মনে হলো, বিভোর ঘুমিয়ে পড়েছে! মনে হলো! তাকে ঠেলা দিয়ে কোনো মতে বললুম—চালাও...শীগগির...ডাকাত · খুনী!... বিভোর চমকে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে তখনি ফটকের বাইরে গলিতে বেরিয়ে পড়লো গাড়ী চালিয়ে। গাড়ীতে ওঠবার সময় একজন মানুষ দেখেছিলুম। তিনি আপনাদের সেই এটর্ণি শরৎ বাবু বোধ হয়!...এই হলো আসল ব্যাপার।

সমর মিত্র বলিলেন—সে-রাত্রে যদি ইঙ্গিতেও আমায় এ-কথা বলতে!

শ্যামলী বলিল—বলবার উপায় ছিল না, সমর বাবু। বলবার মতো মনের অবস্থাও তখন ছিল না! আমি কেমন আচ্ছন্নের মতো

হয়ে গিয়েছিলুম। বাড়ী ফিরে কি করে কাপড়-চোপড় বদলেছিলুম, জানি না! তারপর ঘুমোতে পারিনি···বিভোর যত বলে, কি হয়েছিল ওখানে বলুন তো? আমি শুধু বলেছিলুম—একটা লোক মরে ঘরে পড়ে আছে! কে, তা বলিনি! বলতে পারি নি···ভয়ে! তারপর আপনার টেলিফোন পেতেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো! আমি বুঝেছিলুম···কিছু ব্যাপার হয়েছে মার সঙ্গে। তাই মাকে কোনো কথা বলতে বারণ ছিল। মা আমাকে বেরুতে বারণ করেছিল। কিন্তু বাবা ডেকেছে··থুব দরকার নিশ্চয়···তাই মার বারণ সত্ত্বেও বেরিয়েছিলুম। আর ঠিক করেছিলুম, বিভোর গাড়ী চালাবে···ওদিকার পথ-ঘাট ও জানে। বিভোরকে বারণ করে দিয়েছিলুম, আমরা যে সেদিকে গিয়েছিলুম, সে-কথা ঘুণাক্ষরে যেন না প্রকাশ পায়!

সমর মিত্র বলিলেন—বঙ্কুকে অত রাত্রে পেলে কি করে?

—বঙ্কু এসেছিল আমাদের ওখানে···মার কাছে কি দরকার ছিল। আমরা ফিরে গিয়ে দেখি, বঙ্কু বাবু বসে আছে। মা এলে বঙ্কু বাবুকে বললে, এ জলে-কাদায় ফিরো না···আমাদের এখানেই রাতটা পড়ে থাকো। এমন সময় আপনি ফোন্ করলেন!

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার অংটির পাথর···মানে, ডায়মণ্ড··· সে রাত্রে আমি সেখানে পেয়েছিলুম···এই ত্থাখো!

পকেট হইতে কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া তার মধ্য হইতে হীরাখানি বাহির করিয়া সমর মিত্র দেখাইলেন।

দেখিয়া শ্যামলী বলিল—আমার আংটির হীরে!

—কি করে সেখানে পড়লো?

—যখন ভয়ে দরজা খুলে পালাচ্ছিলুম···আঙুলে চোট্ লেগেছিল ···বোধ হয়, সেই সময় হীরেখানা খুলে পড়ে গেছে।

সমর মিত্র বলিলেন—গাড়ীর মাথায় যে পরী-মূর্ত্তি ছিল··· রোবোট?

—হুঁ···

—সেটা পেয়েছি ঐ বাগানে···

শ্যামলী চুপ করিয়া রহিল···

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি যখন দেখলে, ঘরে তোমার বাবা পড়ে আছেন···এত বড় ব্যাপার···বাবা মারা গেছেন···রোগে নয়, গায়ে জখম···তিনি খুন হয়েছেন···তখন এ-কথা বিভোরকে তুমি তখনি বললে না কেন?

অত্যন্ত সঙ্কোচ-ভরে শ্যামলী বলিল—ভয়ে-লজ্জায় বলি নি। তার উপর আমার মনের তখন যা অবস্থা, কি করছি, কি করবো··· কিছুই ঠাওর করতে পারিনি। বাড়ীতেই বা কি বলবো! বাড়ীতে মার কাছে বাবার খুব খাতির বা সম্মান ছিল না···বড় হয়ে অবিধ আমি দেখছি···

কথা বাধিয়া গেল···

শ্যামলীর কথা শেষ হইল না···

সমর মিত্র বলিলেন—আমায় সব কথা খুলে বলো মা। সব কথা জানলে আমার তদারকীর সুবিধা হবে! যা বলবে, সে কথা কোনো দিন প্রকাশ হবে না।···তাছাড়া তুমিও এটা চাও তো যে যে-লোক তোমার বাবাকে খুন করেছে, সে-লোক ধরা পড়ুক আর তার সাজা হোক

খোলা খড়খড়ির মধ্য দিয়া শ্যামলী বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল··· মুখের উপর উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক পড়িয়াছে !···সে আলোয় সমর মিত্র দেখলেন, সজল-বাষ্পে শ্যামলীর দুই চোখ ছলছল করিতেছে !

তিনি বলিলেন—বড় হয়ে কি দেখতে, বলো মা···

শ্যামলী বলিল—দেখতুম···বাবা যে-কোনো কথাই বলতেন, মা তাচ্ছল্য-ভরে তা অগ্রাহ্য করতেন। বাবা যদি আমার জন্য কোনো সিল্ক বা খেলনা কিনে আনতেন···আমার ছোট-বেলায় সবে জ্ঞান হচ্ছে, তখনকার কথা বলছি···দেখে মা বলতেন, ও কাপড় আমার মেয়ে পরবে না !···কেন যে এ-সব কেনো ! আমাদের বাড়ীর টেষ্ট তুমি কি করে পাবে ? এমনি সব কথা !

সমর মিত্র বলিলেন—অথচ তোমার দাদামশায় বললেন, তোমার মার আগ্রহেই তোমার বাবার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল তোমার দাদামশায়ের এ-বিবাহে মত ছিল না !

শ্যামলী শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার বাবা এ-বাড়ীতে খুব কম থাকতেন ···না ?

—হ্যাঁ। দাদামশায়ের কারবারের চাপে তাঁকে এখানে-ওখানে প্রায় ঘুরতে হতো। তিনি ঘুরতেই ভালোবাসতেন।

—তোমাকে তোমার বাবা ভালোবাসতেন !

—বাসতেন।

—তুমিও নিশ্চয় বাবাকে ভালোবাসতে ?

মাথা নাড়িয়া শ্যামলী জানাইল, হাঁ।

সমর মিত্র বলিলেন—ছাখো মা, তুমি নেহাৎ ছোট নও···লেখাপড়া

শিখেছো···তুমি বুদ্ধিমতী···এবং আজ এত বড় বিপদের আঘাতে তুমি বুঝছো, বড্ড unpleasant (অপ্রীতিকর) বিষয় হয়তো দু' দিন আগে বরদাস্ত করতে পারতে না···এ বিপদের দায়ে আজ তা যেমন করে হোকে সইতেই হবে!···তোমার দাদামশায় বলছিলেন, বিশ্ব-কবির লেখা থেকে, যে বিপদকে ভয় করলে চলবে না···বিপদকে সামনা-সামনি পেয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে···এ কথা খুব সত্য! ···তাই আজ এ-বিপদ ঘটেছে বলেই এবং সে-বিপদকে তুমি তুচ্ছ করতে পারবে এমন শক্তি তোমার আছে বলেই একটা কথা বলতে চাই··a very unpleasant truth (খুব অপ্রীতিকর একটি সত্য কথা)।

শান্ত অবিচল কণ্ঠে শ্যামলী বলিল—বলুন···

সমর মিত্র বলিলেন—সে-রাত্রে বাগানে আর একজন মহিলাকে দেখেছিলে···মনে আছে, নিশ্চয়?

মাথা নাড়িয়া শ্যামলী জানাইল, মনে আছে।

—জানো, তাঁকে তোমার বাবা বিবাহ করেছেন···তিনি তোমার বিমাতা?

শ্যামলী বলিল—সেই রাত্রেই প্রথম শুনেছি···

—এ খপর আগে জানতে না?

—না!

—ঘুণাক্ষরেও আভাস পাও নি?

—না।

—আশ্চর্য্য! এক-আধ দিনের কথা নয়। প্রায় আট-দশ-বছর আগে এ-বিবাহ হয়েছে···এবং এই মহিলার সঙ্গে তোমার বাবা

কলক্যাতাতেই বাস করছিলেন। মলঙ্গা লেনে বাড়ী। সে-বাড়ী তোমার বাবাই কিনেছিলেন। সে-বাড়ীতে আমি গিয়েছি···বেশ টেষ্টফুল সাজ-সজ্জা···আর মহিলাটিও শিক্ষিতা এবং বড় ভালো···

শ্যামলী অবিচল দৃষ্টিতে সমর মিত্রের পানে চাহিয়া এ-কথা শুনিল। সমর মিত্রের কথা শেষ হইবার পর কিছুক্ষণ শ্যামলীর মুখে কথা নাই··· তারপর ধীর স্বরে বলিল—এঁর ছেলেমেয়ে আছে?

—না।

শ্যামলী নিশ্বাস ফেলিল।

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার বাবা সেখানে নাম বদলে ছিলেন ···কামিনী চক্রবর্ত্তী সেখানে হয়েছিলেন রাঘব চ্যাটার্জ্জী।

শ্যামলী বলিল—এখন মনে পড়ছে। অনেক বছর আগে মা একদিন বাবাকে খুব বকছিলেন, বলছিলেন, বিশ হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট-পেপার তোমার নামে ছিল···সে-কাগজের চিহ্ন দেখি না কেন? বাবা বলেন, সুদ আনবার জন্য এটর্ণিকে দিয়েছিলুম; তারপর আর ফিরিয়ে আনা হয় নি। মা বললেন, সে-কাগজ এনে আমায় দিতে হবে। তারপর ঐ গবর্ণমেণ্ট-পেপার নিয়ে দুজনে প্রায় খিটিমিটি চলতো। বড় হয়েও দেখেছি···মাকে বাবা প্রায় এড়িয়ে চলতেন!

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার বাবার নিজের পয়সা-কড়ির জোর ছিল কেমন?

শ্যামলী বলিল—শুনেছি, আমার যিনি পিতামহ ছিলেন, তিনি খুব ভালো জুয়েলার ছিলেন···তাঁর কারবার নষ্ট হয়ে যায়। কারবার নষ্ট হলে কলকাতায় এক আমেরিকান জুয়েলারি ফার্ম্ম ছিল···গিম্‌বল্‌ ব্রাদার্স···তাদের ওখানে আমার পিতামহকে তারা 'টেষ্টার' রাখেন

…বাবা ও জুয়েলারি চেনেন··মাঝে-মাঝে উনিও অনেক রাজা-মহারাজাকে জুয়েলারি সাপ্লাই করতেন…তাদের জুয়েলারি যাচাই করে দিতেন।

শুনিয়া সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা, সেদিন তোমার বাবার কাছ থেকে যে চিঠি পেলে…তোমার বাবার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল কবে ?

শ্যামলী বলিল—শনিবারে এই বিপদ ঘটলো, তার চারদিন আগে চিঠি পেয়েছি। সেদিন ছিল সোমবার।

—কোথায় দেখা হয়েছিল ?

—এই বাড়ীতেই। রবিবার বিকেলে বাবা এলো…বললে, পুরী গিয়েছিল। রাত্রে এখানে থেকে পরের দিন খাওয়া-দাওয়া সেরে বাবা বেরুলো। বললে, আসানশোল যেতে হবে।

—তোমার বাবা প্রায় বাইরে-বাইরে থাকতেন··বাইরে থেকে তাঁর চিঠি পেতে ?

—না। এর জন্য আমি যদি কোনোদিন কিছু বলতুম, বাবা বলতো, ভালো থাকলে চিঠি দেবো না··কোথায় কখন কোন্ কাজে ঘুরি !…আমি বলতুম, আমার যদি অসুখ হয়··বেশী অসুখ ? তাতে বাবা বলতো, তোমার অসুখ করলে আমি তা জানতে পারবো…আমার মন সে-কথা বলে দেবে !

—আচ্ছা। শনিবার টালিগঞ্জে দেখা করতে বলে তোমার বাবা তোমাকে যে-চিঠি লিখেছিলেন, সে-চিঠি আছে তোমার কাছে ?

—না। পাছে কেউ দেখে, সে জন্য সে চিঠি পড়েই ছিঁড়ে ফেলেছি।

শুনিয়া সমর মিত্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন··তারপর

বলিলেন—অনেকক্ষণ তোমাকে কষ্ট দিয়েছি মা···এবার তোমার ছুটী।

শ্যামলী বলিল—মনে হয়, সে-লোককে ধরতে পারবেন?

—দেখি চেষ্টা করে।··ভালো কথা, তোমাদের ঐ বিভোরকে কাল লালবাজার পুলিশ-অফিসে একবার পাঠাতে হবে। বেলা দুটোর সময়। দোতলায় গিয়ে খোঁজ করলেই আমায় পাবে। সে যেন নিশ্চয় যায়! রাত কম হয়নি! এখন আর তাকে নিয়ে বসতে চাই না। কেমন?

—বেশ। বেলা দুটোয় সে যাবে।

—হ্যাঁ। আজ তাহলে আসি, মা···

—মাকে বলি···বলিয়া শ্যামলী উঠিল।

সমর মিত্র বলিলেন—তাঁকে আর নাই বা বিরক্ত করলে! তিনি রিহার্শালের ব্যাপারে ব্যস্ত।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শ্যামলী বলিল—দেখুন একবার মার কাণ্ড! এই বিপদ···মাকে বললুম, লোকে কি বলবে, মা? তাতে মা বললে, নিজের বিপদ বলে এত বড় একটা কাজ হাতে নিয়ে ফেলে রাখবো! লোকে হাসবে। তাছাড়া অত সব বিপন্ন লোক···তাদের রিলিফ!

সমর মিত্র বলিলেন—এই নিয়ে মনে যদি তবু একটু সান্ত্বনা পান···

শ্যামলী কোনো জবাব দিল না। সমর মিত্র ঘর হইতে বাহিরের বারান্দায় আসিলেন···

ওদিককার ঘরে পর্দ্দার আড়ালে তখন ঘুঙুরের বাদ্য বিরাট-সঘন হইয়া উঠিয়াছে। সেই সঙ্গে ওস্তাদের করতালি এবং স্বর—এক দুই তিন···এক দুই তিন···এক দুই···

নবম পরিচ্ছেদ

অশ্বিনীর সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট

রাত্রে মাথার মধ্যে যেন একরাশ মৌমাছির ভন্‌ভনানি···সমর মিত্রের নিদ্রা হইল না।···যেদিক দিয়াই সূত্র বাহির করিতে যান, খানিকটা পরেই চিন্তায়-চিন্তায় সে সব জোট পাকাইয়া যায়। সমর মিত্রের মনে হয়, যেন মাকড়শার জাল বুনিতেছেন! কোথাও যেন বাহির হইবার পথ নাই!

বিনিদ্রভাবে তিনি বিছানায় পড়িয়া রহিলেন···চিন্তার তরঙ্গে দোল খাইয়া বিপর্য্যস্ত···ওদিকে ঘড়িতে বারোটা···একটা···দুটো···তিনটা বাজিয়া গেল।

তিনটার পর ঝম্‌ঝম্ শব্দে বৃষ্টি নামিল। খড়খড়ির সার্শি খোলা ছিল। ঠাণ্ডা বাতাস। সমর মিত্র ফ্যান্ বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে মাথা যেন জুড়াইয়া গেল। তারপর শ্যামলীর কথা, মীরার কথা, বলরাম মুখার্জ্জী সাহেব, তাঁর শ্যালী মিসেস অম্বা চক্রবর্ত্তী···এবং অম্বা চক্রবর্ত্তীর গৃহে এ-দিনেও রিহার্শাল চলিয়াছে···এই সব ভাবিতে ভাবিতে তিনি কখন ঘুমাইয়া পড়িলেন···

ঘুমাইয়া চমৎকার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন···যেন কামিনী চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা···সাহেবী বেশ···মুখার্জ্জী সাহেবের বাড়ীর লনে মস্ত পার্টির আসর···লোক-জনের হাসি-কলরব যেন পাথার সৃষ্টি করিয়াছে! কামিনী চক্রবর্ত্তী সে-ভিড় ছাড়িয়া ঝোপঝাপের অন্তরালে যথাসম্ভব

আত্মগোপন করিয়া বেড়াইতেছেন···এবং সেই ঝোপঝাপের আড়ালে সমর মিত্রের সঙ্গে দেখা···

সমর মিত্রকে দেখিয়া কামিনী বলিলেন—সমর বাবু···

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ, আপনি ঝোপের আড়ালে···?

কামিনী। বড় লোকের বড়মানুষির সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত খাপ খেতে পারলুম না মশাই···

সমর। এখানে বড় মানুষ, ছোট মানুষ কি, মশাই! আপনি হলেন এঁদের জামাই···একটী মাত্র জামাই।

কামিনী। পোষাকে আজ সাহেব সাজলেও হিন্দুত্ব বিসর্জ্জন ছান নি···কাজেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে একটি জামাই সংগ্রহ করেছেন! এ সব লোক জামাইকে জামাই বলে' দেখে না···দেখে বাড়ীর চাকর-বাকরের মতো প্রয়োজনীয় paraphernalia বলে'!···এ বাড়ী হলো কন্যা-তন্ত্র। মেয়ে যা করবে, মেয়ে যা বলবে, বড়-লোকের আদুরী মেয়ে···

সমর। সে মেয়ে স্বয়ংবরা হয়েই আপনার গলায় মালা দেছেন!

কামিনী। Idle fancy! শুধু ঐ বিয়ে! স্বামী বলে, কোনো-দিন মানে না! ভাবেন, আমি ওঁর পিছনে ফিরবো কৃপা-প্রর্থীর মতো!

কোথায় বাজ পড়িল···তীব্র আলোক ঝলক!···

সমর মিত্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র মনে হইল, যেন ছায়া-মূর্ত্তি সরিয়া গেল! চোখের সামনে যেন তেমনি আবছায়া!

সমর মিত্র উঠিলেন। মাথার মধ্যে আবার সেই রাজ্যের সরীসৃপ কিলবিল করিয়া উঠিল।

তিনি আসিলেন পথের দিককার বারান্দায়···আকাশ-ভরা নিবিড় অন্ধকার···আকাশ যেন মার-মূর্ত্তিতে বৃষ্টির তীক্ষ্ণ-শর বর্ষণ করিতেছে! পথে গ্যাসের বাতিগুলায় আলোর রশ্মি যেন নিতান্ত বেচারীর করুণ দৃষ্টির মতো মিট্‌মিট্ করিতেছে!

বারান্দায় ইজিচেয়ার ছিল। সমর মিত্র সেই ইজিচেয়ারে গা ঢালিয়া বসিলেন। গায়ে বৃষ্টির ছাট লাগিতেছে···সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই!

বৃষ্টি যেন তাঁকে সাক্ষী করিয়া নিজের বিক্রম মুহুর্মুহু বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল···

সমর মিত্র ভাবিলেন, ঘোমটা ছিল মুখে···পুরুষ-মানুষও তো মুখে কালো কাপড় মুড়ি দিয়া খুন করিয়া যাইতে পারে! কিন্তু শরৎ বলিয়াছেন, কামিনী বলিয়াছিল, মেয়ে-মানুষ! পুরুষ-মানুষ যদি কালো কাপড়-মুড়ি দিয়া খুন করিতে আসিত, তাহা হইলে কাপড়-মুড়ি-লোক বলিত। চোট খাইবার আগে লোকটাকে য দেখিয়াছিল, সজ্ঞানেই! কাজেই পুরুষ কি স্ত্রীলোক, তাহা বুঝিয়াছিল···এবং বুঝিয়াছিল বলিয়াই বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছে, স্ত্রীলোক···মুখে কালো-কাপড়ের ঘোমটা!

অথচ যেটুকু বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, ভদ্রলোকের এই একটি গর্হিত আচরণ ছাড়া আর কোনো গ্লানির কথা কাহারো মুখে শোনেন নাই! স্ত্রী অম্বা চক্রবর্ত্তী যে স্বামীকে সুচক্ষে দেখিতেন না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই! শ্যামলী বলিয়াছে, মা-বাপের মধ্যে সব

সময়েই বিরোধ-খিটিমিটি লাগিয়া থাকিত !·· যে-স্ত্রী স্বামীকে এতখানি তাচ্ছিল্য করিত, কামিনীর, যদি অন্য রকম চরিত্র-দোষ থাকিত, গণিকা-সংসর্গ—তাহা হইলে সে কথা বলিতে অম্বা চক্রবর্ত্তী এক-মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতেন না !

একটা কথা···

সে-রাত্রে স্বামীর ঐ মূর্ত্তির সামনে তাঁর যে-মূর্ত্তি দেখিয়াছেন··· খুব যে বিচলিত,এমন মনে হয় নাই ! কেন বিচলিত হইবেন ? বাপের অগাধ পয়সা···সোসাইটিতে বিরাট প্রতিপত্তি ! স্বামী হয়তো এককালে ···প্রথম যৌবনে মোহ-অনুরাগ জাগাইত···তারপর যৌবনের সে প্রদীপ্ত রাগ-রঞ্জিত দিনের অবসানে স্ত্রী যখন নিজেকে আবার জাগ্রত দেখিলেন···ঐশ্বর্য্য এবং মর্য্যাদা-প্রতিপত্তির বিরাট সমারোহকে জীবনের চরম-সার্থকতা বলিয়া বুঝিলেন, তখন স্বামীকে একটা অনাবশ্যক জীবের মতো দেখিবেন···সোসাইটি উওম্যানদের জীবনে এমন তো দেখা যায় ! কাজেই স্বামী গেলেও ঐশ্বর্য্যের জোরে তার বিয়োগ-বেদনাকে অগ্রাহ্য করা এ-সব নারীর পক্ষে তিলমাত্র অসম্ভব নয় !

তারপর ঐ রিহার্শাল···

ওদিকে মীরা দেবী ! স্বামীর এত বড় ছলনার কথা জানিয়াও শোকে-ব্যথায় যেন মরিয়া রহিয়াছেন ! দুজনেই স্ত্রী ! দুখানি ছবি এক-রকমের হওয়া উচিত ছিল ! হয় নাই !···

কিন্তু এ-সব কথা ভাবিয়া লাভ নাই ! তার চেয়ে···

ঠিক ! অম্বা চক্রবর্ত্তীকে ভালো করিয়া প্রশ্ন-বাণে জর্জ্জরিত করিতে হইবে !···

ইজি-চেয়ারে এমনি পড়িয়া থাকিয়া তিনি চক্ষু মুদিলেন···চোখে নিদ্রা আসিয়া মোহ-তুলি বুলাইয়া দিল !

ঘুম ভাঙ্গিল। সকাল হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি কখন থামিয়াছে··· আকাশে সূর্য্যের রশ্মি।

সমর মিত্র উঠিলেন···

তারপর ডায়েরি লিখিয়া স্নানাহার সারিয়া লালবাজারে আসিতে বেলা প্রায় একটা বাজিয়া গেল। আসিয়া শুনিলেন, টালিগঞ্জ থানা হইতে ইন্‌স্‌পেক্টর অশ্বিনী বাবু আসিয়া তাঁকে খুঁজিতেছিলেন···তিনি রাইটার্স-বিলডিংয়ে গিয়াছেন, তাঁর আই-জীর কাছে।

সমর মিত্র বলিলেন—কেন এসেছে ?

গুণময় বলিল—খুব excited মনে হলো। বোধ হয় কিনারা করবার মতো কিছু পেয়েছে !

তাচ্ছিল্য-ভরে সমর মিত্র বলিলেন—ছাই !

সমর মিত্র চলিলেন ডেপুটির কামরায়। কাল মুখার্জ্জী সাহেব ও শ্যামলীর মুখে যাহা কিছু শুনিয়া আসিয়াছেন, সাহেবের কাছে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন।

সাহেব বলিলেন—কোনো আত্মীয়ই খুন করেছেন, মনে হয় ?

সমর মিত্র বলিলেন—ফশ্ করে কোনো কথা venture করবো না, স্যর। ঐ একটা কালো-কাপড়···শরৎ বাবু বলেছেন, তাঁর মনে হয়েছিল, সিল্ক। ঐ কাপড়ের যদি সন্ধান মেলে···

সাহেব বলিলেন—ছুরির হ্যাণ্ডেলে আঙুলের ছাপ দেখেছিলে··· তার ফটো এসেছে···খুব সাকশেসফুল ছবি···ত্যাখো।

ড্রয়ার টানিয়া আঙুলের ছাপের চার্ট দেখাইলেন···

দেখিয়া সমর মিত্র বলিলেন—স্ত্রীলোকের হাতের আঙুল বলে' মনে হয়!

সস্মিত মুখে সাহেব বলিলেন—Exactly···আমারো তাই মত।

সমর মিত্র বলিলেন—কাল রাত্রে আমি মোটে ঘুমোতে পারিনি ···শুধু ভেবেছি। ভেবে আমারো ধারণা, এ-খুন স্ত্রীলোকের কাজ। কিন্তু কে এমন স্ত্রীলোক···

সাহেব বলিলেন—হ্যাঁ···হয় সে স্ত্রীলোক জানতো victim ওখানে আসবে! জেনে ওখানে এসেছিল। না হয় সে স্ত্রীলোক vengeance নিতে এসেছিল···

সমর মিত্র কোনো জবাব দিলেন না···

সাহেব বলিলেন—তুমি কি বলো?

সমর মিত্র বলিলেন—এ সম্বন্ধে আমি এখনো কোনো কথা বলতে পারছি না, স্যর! তবে শুনলুম, টালিগঞ্জের অফিসার অশ্বিনী এসেছে লালবাজারে আমার কাছে। হয়তো সে কোনো খপর পেয়েছে।

—Rubbish! বলিয়া সাহেব তাচ্ছল্য-ভরে টেবিলের উপর হইতে পাথরের কাগজ চাপাটা টানিয়া লইলেন।

সমর মিত্র বলিলেন—আজ আমি একবার মিসেস চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা করবো···মীরা দেবীর সঙ্গেও কথা কইবো···ওঁদের detailed statements নেবো।

সাহেব বলিলেন—নাও। এ মামলার যদি কিনারা করতে পারো, তাহলে সেটা হবে achievement (একটি কীর্ত্তি)।···

সাহেবের ঘর হইতে ফিরিয়া নিজের কামরায় আসিয়া সমর মিত্র দেখেন, অশ্বিনী বসিয়া আছে···তার হাতে কাগজের তাড়া।

সমর মিত্র বলিলেন—কি খপর অশ্বিনী ?

অশ্বিনী বলিল—সে কালো সিল্ক পেয়েছি, স্যর। আমি দু' জায়গা সার্চ্চ করবো ঠিক করে তল্লাসী-ওয়ারেণ্ট নিয়েছিলুম কাল ফার্ষ্ট আওয়ারে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের কাছ থেকে। নিয়ে আজ ভোরে গিয়ে সার্চ্চ করি প্রথমে মলঙ্গা লেনে রাঘ চ্যাটার্জ্জীর বাড়ী। সেখানে গিয়ে দু' গজটাক কালো সিল্কের 'ভেইল' একটা পেয়েছি। এনকোয়ারিতে জানা গেছে, যে খুন করেছিল, সে মেয়ে-লোক,আর তার মুখে ছিল কালো সিল্কের ভেইল !···রাঘব চ্যাটার্জ্জীর স্ত্রীকে ভেইল সম্বন্ধে দু'চার কথা জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বললেন, ও ভেইল দু' মাস আগে রাঘব বাবু কিনে দিয়েছিলেন···তিনি বলেছিলেন বোম্বাই থেকে কিনে এনেছিলেন! আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এ ভেইল তিনি সে-রাত্রে ব্যবহার করেছিলেন কি না ? তিনি তার জবাবে হাঁ,-না কোনো কথা বললেন না। তাছাড়া আরো দু' চারটে যা প্রশ্ন করেছিলুম, তার যা জবাব দিয়েছেন, সে-জবাব আমার কেমন সন্দেহ-জনক মনে হলো। তাই স্যর, আমি তখনি কাগজে-কলমে এ্যারেষ্ট লিখিয়ে জামিনে খালাশ দিয়ে চলে এসেছি। থানায় নিয়ে যাই নি···তাঁর সম্মানের কোনো হানি হয় নি।···মানে, বাড়ীতে যেমন

ছিলেন, তেমনি আছেন···শুধু একজন জামিন দিয়েছেন। তারপর অন্য কাজে আই-জির কাছে আমায় যেতে হয়েছিল···তাঁকে এ-কথা বললুম। তিনি বললেন, ক্যালকাটা-পুলিশের ডি-ডি অফিসার সমর মিত্তির already in charge of the matter (এ ব্যাপারের তদারক করছেন), তুমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করো !···এই দেখুন স্যর মিসেস চ্যাটার্জ্জীর ষ্টেটমেণ্ট···

এই কথা বলিয়া অশ্বিনী তার কাগজের তাড়া সমর মিত্রের সামনে তাঁর টেবিলের ধরিয়া দিল।

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি রাঘব বাবুর স্ত্রীকে arrest করেছো ! আশ্চর্য্য ! how silly ! (কি নির্বুদ্ধির কাজ) ! কালো সিল্কের ভেইল দোকানেও তো পাওয়া যায়। তা বলে যত দোকানদারকে গ্রেফতার করতে পারবে অশ্বিনী ?

অশ্বিনী কহিল—দোকানে কালো ভেইল থাকা আর victimএর বাড়ীতে ভেইল থাকায় তফাৎ আছে, স্যর। তাছাড়া victim মারা যাবার সময় বলে গেছে, মেয়ে-লোক খুন করেছে !

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার ধারণা, রাঘব চ্যাটার্জ্জীর স্ত্রী রাঘব চ্যাটার্জ্জীকে খুন করেছেন ?

অশ্বিনী বলিল—সে-কাজটা কি এমনি অসম্ভব, মনে করেন, স্যর ? ···বিশেষ একালের স্বাধীন জেনানা···

সমর মিত্র বিরক্ত হইলেন, বলিলেন—চুপ করো। সমাজ-তত্ত্বের কথা কয়ো না। মেয়েদের সম্বন্ধে মনে যে-মতই তুমি পোষণ করো, পুলিশ-অফিসার তুমি, নিরপেক্ষ হয়ে তোমার case তদারক করবার কথা ! নিজের মনের সংস্কার নিয়ে তার উপর নির্ভর করে' কে দোষী,

কে নির্দ্দোষ হতে পারে, সে অনুমান করলে you will be guilty of rash act (অন্ধ-ধারণার বশে বিচার করিলে গোঁয়ার্ত্তুমি হইবে)!...তুমি বলছো...স্বাধীন জেনানা...পুলিশ-রেকর্ড খুঁজলে এমন বহু স্ত্রীলোকের পরিচয় পাবে, যারা নিষ্ঠাবতী সাধ্বী এবং সম্পূর্ণ সেকেলে মেয়েদের মতো হয়েও স্বামি-হত্যা করেছে!...তুমি অন্যায় করেছো মীরা দেবীকে arrest করে! সে সন্দেহ আমার মনে জাগালে আমিও তাঁকে গ্রেফতার করতে পারতুম। কিন্তু, ঘটনা যে-রকম ঘটেছে, শুধু মীরা দেবীকে কেন, তোমার মতে কাজ করতে হলে ঐ অম্বা দেবী, তাঁর মেয়ে শ্যামলী...এঁদেরো তো arrest করা উচিত...দেখছি!

তাড়া খাইয়া অশ্বিনী ভড়কাইয়া গেল। কোনো জবাব দিল না। মনে মনে গুমরিতে লাগিল! সিনিয়র অফিসাররা চিরদিন জুনিয়ারদের ডাউন করিবার জন্য তাদের দোষ দেখেন, নিজেদের খুব অভিজ্ঞ ওস্তাদ বলিয়া বিশ্বাস! তার মনে হইল, সেই অন্ধকার রাত্রে শুধু পদবীর উচ্চতা স্মরণ করিয়া সমর মিত্র তাকে অপদস্থ করিলেন।... এমনি ধারণায় অশ্বিনীর মন নিষ্ফল আক্রোশে ভিতরে ভিতরে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

সমর মিত্র বলিলেন—ট্যাংরায় অম্বা দেবীর বাড়ী সার্চ্চ করবার ওয়ারেণ্ট বোধ হয় সই করিয়ে এনেছো?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ...

—সে বাড়ী সার্চ্চ করো নি কেন?

—আপনার সঙ্গে দেখা করে তারপর সে-বাড়ী সার্চ্চ করবো, এমনি আমার আইডিয়া ছিল।

সমর মিত্র বলিলেন—আমাকে না বলে' ওয়ারেন্ট নেছো যখন. তখন যাও, সে-বাড়ী আর বাকী রেখো না···সার্চ্চ করে এসো।

অশ্বিনী আরো দমিয়া গেল। সত্যই অন্যায় করিয়াছে না কি ?

সমর মিত্র বলিলেন—তোমাদের ধড়ফড়ানির জন্য কাজ অনেক সময় পণ্ড হয়ে যায়! তুমি ভাবছো·· মেয়ে-লোক খুন করেছে, এ খপর যখন পাওয়া গেছে এবং অকুস্থলে এই তিনটি মেয়ে-লোককে যখন পাওয়া গেছে, তখন কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশ-মেয়ে-লোকের সন্ধানে ঘুরবো···কর এদের গ্রেফতার! এ ব্যাপারটি এত সহজ নয় ···আমি সেই খুনের রাত্রি থেকে বিস্তর মাথা ঘামিয়েও কূল পাচ্ছি না, বুঝলে অশ্বিনী···and you are sure to give me this credit that I have more experience in these matters than you (তোমার চেয়ে এ সব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশী এটুকু নিশ্চয় তুমি স্বীকার করিবে)!

অশ্বিনী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সমর মিত্রের মানস-নয়নের সম্মুখে একখানি করুণ ছবি ভাসিয়া উঠিল...সেই বিয়োগ-বেদনাতুরা মীরা দেবীর ম্লান মুখ !···

হঠাৎ টেলিফোন বাজিল। একজন এ-এস-আই আসিয়া সমর মিত্রকে জানাইল,—আপনাকে ফোনে ডাকছে, স্যর···

সমর মিত্র আসিয়া ফোনের রিসিভার ধরলেন···

এটর্ণি শরৎ গাঙ্গুলি ডাকিতেছিলেন। তিনি বলিলেন বাড়ী-সার্চ্চের কথা···সেই সঙ্গে মীরা দেবীর গ্রেফতার···

শুনিয়া সমর মিত্র বলিলেন—আমি এইমাত্র সে খপর পেলুম। I am so sorry (আমি অত্যন্ত দুঃখিত)! It was unwarranted (অনুচিত কাজ হয়েছে)। কিন্তু যা হয়ে গেছে, তার চারা নেই।··· ও-এ্যারেষ্ট প্রত্যাহার করা হবে। আর আমি যাবার আগে মলঙ্গা লেনে একবার যাবো···আপনি সে-সময় থাকবেন···আমি যাবো, say (ধরুণ) সন্ধ্যা ছ'টা সাড়ে ছ'টা !

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—নিশ্চয় থাকবো।···মোদ্দা এ ব্যাপার এই মর্ম্মান্তিক ব্যথার উপর ছুরি চালানো···adding insult to injury···

সমর মিত্র বলিলেন—বললুম তো, আমার অজ্ঞাতে এ কাজ হয়েছে। আর হবে না। এবং যা হয়েছে, তার জন্য আপনাদের সকলের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। মীরা দেবীর কাছে আমি গিয়ে নিজে করজোড়ে ক্ষমা চাইবো, শরৎ বাবু।

রিসিভার ছাড়িয়া তিনি আসিলেন নিজের চেয়ারে।

অশ্বিনী বলিল—আমি তাহলে কি করবো? সাহেবকে বলে আমায় বরং এ দায় থেকে মুক্তি দিন, স্যর···

সমর মিত্র বিরক্ত হইলেন, বলিলেন—You cannot choose your freedom (নিজের মুক্তি নিজের খুশী-মতো তুমি পাইতে পারো না)!···বুঝেছি, ভুল করবে। তার জন্য কোথায় নীচু হবে, তা নয় ···রাগ! ও রাগে আমার ঘৃণা হয়, অশ্বিনী!···এ কাজ না পারো, আমার বলতে অপমান বোধ হয়, তোমার সাহেবকে গিয়ে বলো! বলে' ছুটী নাও।

এ ভৎর্সনায় অশ্বিনী একেবারে এতটুকু! বলিল—না স্যর, রাগ কিসের! আপনাদের সঙ্গে কাজ করে কাজ শিখবো…রাগ-অভিমান করবো কেন?

সমর মিত্র বলিলেন—যদি কাজ শিখতে চাও, তাহলে যা করবে, সে সম্বন্ধে আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করো। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া যায় না, অশ্বিনী…খেতে গেলে বহু বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়…এ কথা মনে রেখো।

অশ্বিনী যেন লগুড় খাইয়েছে…মাথা তুলিতে পারিল না!

সমর মিত্র বলিলেন—ও সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট তোমার ঝুলির মধ্যে রেখে দাও! সে-বাড়ী সার্চ্চ করতে যেয়ো না…সেটা মেষশাবকের বাড়ী নয়…কেউটে সাপের বিবর! হুলস্থূল বেধে যেতে পারে। তাছাড়া আসল কথা কি জানো, অশ্বিনী…হাই-লাইফের ব্যাপার…বড় সতর্ক হয়ে আমাদের কাজ করতে হবে and with a degree of patience (এবং অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে)। তাঁদের মান-ইজ্জত পাছে কোনো রকম চিড় খায়, এ জন্য বড় সন্তর্পণে কথাবার্ত্তা কইতে হয়। প্যাঁচোয়া কথাকেও বিনয় এবং মিষ্টতার কোটিং-এ ঢেকে তবে মনের সন্দেহ প্রকাশ করতে হয়। অবশ্য যেখানে প্রমাণ খুব palpable (প্রকাশ্য), সেখানে সব-রকম জোর-জবর-দস্তি চলে! এ ক্ষেত্রে তো তা হবে না…চারিদিকে দারুণ mystery (রহস্য)।…বেশ, তুমি কিছু মনে করো না…তোমার উপর আমায় রাগ নেই! তোমাদের আমি ছোট ভাইয়ের মতো দেখি…তাই ভুল-চুক করলে একটু-আধটু বকি, জেনো। অল্-রাইট্ ব্রাদার…একখানা ভেইল পেয়েছো…দেখি, তা থেকে আমাদের next step (পরের ধাপ) এ আমরা কি রকম অগ্রসর হতে পারি!

দশম পরিচ্ছেদ

দিকে-দিকে

অশ্বিনীকে বিদায় দিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সমর মিত্র আসিয়া ডালহৌসি-স্কোয়ারে টালিগঞ্জের ট্রামে চড়িয়া বসিলেন। ডিপোর কাছে ট্রাম হইতে নামিয়া ট্যাক্সি লইলেন এবং ট্যাক্সিতে চড়িয়া আসিয়া নামিলেন রেফিউজের সামনে। নিঃশব্দে সেই সান্যালদের বাগান-বাড়ীতে গিয়া ঢুকিলেন। বাগানের মধ্যে বাড়ীর সামনে ঢাকা-বারান্দায় টালিগঞ্জ-থানার এক কন্‌ষ্টেবল বসিয়া খইনি মাড়িতে মাড়িতে গান ধরিয়াছে—কানহাইয়া রে···

সমর মিত্রকে দেখিবামাত্র তার গান থামিল। কন্‌ষ্টেবল উঠিয়া দাঁড়াইল।

সমর মিত্র কহিলেন—কেউ এসেছিল ?

—না···

সমর মিত্র বলিলেন—এক কাম্ করো! কিসি [illegible] যাকে পুছো ···ই-বাগান-কা যো মালিক হ্যায়···সানিয়াল্ বাবু···ও বাবু কাঁহা রয়তা! ঔর এ বাগানমে কোই মালী হ্যায় কি নেহি···

কন্‌ষ্টেবল উঠিয়া পাড়ায় সন্ধান করিতে বাহির হইল।

সমর মিত্র সারা-বাগান ঢুঁড়িয় বেড়াইলেন···কোথাও সামান্য

কিছু পাওয়া যায় কি না···সিগারেটের বাক্স, জুতা, দেশলাইয়ের বাক্স, কাগজ···এমনি কিছু!

বাগানে কিছু মিলিল না। সমর মিত্র আসিলেন বারান্দায়। কোণে ফির্পোর একখানা মুখ-খোলা সাদা খাম···একখানা ক্যাশ-মেমো···এক-বাক্স সাবান···ক্যাশ-মেমোয় তারিখ লেখা তিন-মাস আগেকার···

তিনি ঘরে ঢুকিলেন। ঘরের কোণ, কার্পেটের তলা···সর্ব্বত্র খুঁজিয়া দেখিলেন। মিলিল···

একখানা সাদা খাম। খামে ইংরেজীতে নাম লেখা কামিনী চাকারবর্ত্তি···ট্যাংরা।···এক-টুকরা চিঠি···চিঠির কাগজে দু' চারিটি মাত্র কথা লেখা—

বেশী দিন নয়। আমা···
জানিবে। যদি দেখি, সত্যই ইহার মধ্যে···
শুধু বলিবে, মিথ্যা···

স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। বাকী টুকরা বহু সন্ধানেও পাওয়া গেল না। দেওয়ালের যে গা-আলমারির মধ্যে বিলাতি সুট পাইয়াছিলেন, সে আলমারির মধ্যে মিলিল সরকার্স ডায়েরির একখানা ছেঁড়া পাতা ···পাতার উপর সাল-তারিখের চিহ্ন নাই! পাতায় দু' তিনটা হিসাব লেখা আছে—

জ্যাম ২ কৌটা—৸৹
বিস্কুট ১ টিন—১৸৶৹
চায়ের টিন ১ টা—১।৶৹

এ লেখা পুরুষের হাতের···এ জিনিষ কে কিনিয়াছিল, কবে এবং

কেন কিনিয়াছিল···হিসাবই বা কে লিখিয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই!

আরো যা মিলিল—সোডা-লিমনেডের ভর্ত্তি বোতল···একখানা ছেঁড়া গামছা···তামাক-পোড়া···এক-টিন বার্ডস-আই···একগোছা পোড়া বিড়ি···

সমর মিত্র আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। বসিয়া তিনি চাহিলেন বাড়ীর সামনেকার পথ ও বাগানের পানে।

পথের বাঁ দিকে বড় বড় ঘাস জমিয়া আছে। যেন চোর-কাঁটার কেয়ারি! সেখানে মোটরের টায়ারের দাগ···অসংখ্য দাগ। কাদার উপর সে-দাগ রৌদ্র পাইয়া ছোটখাট খোন্দলের সৃষ্টি করিয়াছে

তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন···

কন্‌ষ্টেবল ফিরিয়া আসিল। তার সঙ্গে পনেরো-ষোল বছর বয়সের হাড় বাহির-করা এক ছোক্‌রা। ছোকরার নাম নবীন। নবীন থাকে খালের উপরেই যে-ঘর,সেই ঘরে। তার বাবা করে কাছারিতে পেয়াদার কাজ।

নবীনকে প্রশ্ন করিতে নবীন বলিল, এ বাগানে মালী ছিল। যেরাত্রে খুন হয়, তার পরের দিন হইতে মালীর আর দেখা পাওয়া যায় নাই! মালীর নাম আদিনাথ। জাতে উড়িয়া। এ বাগানের মালিক সাণ্ডেল বাবুরা থাকেন ভবানীপুরে···ঐ যে টকি-ছবির বাড়ী আছে, তার পাশে। কোন্ টকি-ঘর, নবীন তাহা বলিতে পারে না। তবে বাবুরা এ-বাগানে বড় আসেন না! মাঝে মাঝে জলশা হয়,

ভোজ হয়···বাবুদের অবস্থা পড়িয়া গিয়াছে···তাঁহাদের বলিয়া যে-সে লোক আসিয়া ও-পুকুরে মাঝে মাঝে মাছ ধরে।···বাবুরা না কি এ বাড়ী-বাগান বেচিয়া দিবেন···দু' চারজন খরিদারও মাঝে মাঝে আসিয়া বাড়ী-বাগান দেখিয়া গিয়াছে···

সে-রাত্রির ব্যাপার সম্বন্ধে নবীন কোনো কথা বলিতে পারিল না। সেদিন সন্ধ্যার আগে হইতে তোড়ে বৃষ্টি সুরু হইয়াছিল···সে বৃষ্টিতে সে বা তার বাড়ীর লোকজন বাড়ীর বাহির হয় নাই!···

নবীনকে বিদায় দিয়া সমর মিত্র কন্‌ষ্টেবলকে বলিলেন—কিসিকো মৎ আনে দেও···

—নেহি বাবু···বলিয়া কনষ্টেবল খুব আস্ফালন করিল।

সমর মিত্র চলিয়া আসিলেন। বাহিরে ট্যাক্সি দাঁড়াইয়াছিল··· ট্যাক্সিতে চড়িয়া টালিগঞ্জের ট্রাম-ডিপোয় আসিলেন। তারপর ট্রামে চড়িয়া আসিয়া তিনি নামিলেন ভবানীপুর থানায়।

অফিসার হেমন্তর সঙ্গে দেখা···হেমন্ত ডায়েরি লিখিতেছিল···

সমর মিত্র বলিলেন—বিজলী, কিম্বা পূর্ণ থিয়েটার কিম্বা ঐ রূপালির পাশে কোনো সান্যাল-বাড়ী আছে কি না···বেশ একজন চালাক লোক পাঠিয়ে খপর আনাও তো হে হেমন্ত···খুব জরুরী দরকার। এ খপর এখনি চাই···

হেমন্ত বলিল—বেশ···আমি লিটারেট সামসুদ্দিনকে পাঠাচ্ছি··· ও খুব চালাক ছোকরা।

—বেশ···

সামসুদ্দিনকে তখনি পাঠানো হইল। হেমন্ত বলিল—আপনার টালিগঞ্জ ম্যাটারের কিছু হদিশ পেলেন, স্তর ?

—না।

—ও-বাগানে আমরা একদিন নেমন্তন্ন গেছি স্তর। বাগানে যে পুকুর আছে, ও-পুকুরে নাকি খুব মাছ। মাছ ধরার নেমন্তন্ন পেয়েছিলুম···

—কে নেমন্তন্ন করেছিল ?

—ও পাড়ায় থাকেন শৈল চাটুয্যে···তাঁর খুব মাছ ধরার সখ··· পুলিশ-কোর্টে তিনি বেঞ্চ-ক্লার্ক ছিলেন···রিটায়ার করেছেন। তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন।

—বটে ! কতদিন আগে ?

—গত বোশেখ মাসের শেষাশেষি।

—হুঁ !···আচ্ছা, তোমার সে শৈল বাবুকে ডাকাতে পারো ?

—দেখি···তিনি পাশেই থাকেন···কালীঘাট রোডে।

হেমন্ত লোক পাঠাইল।

সামসুদ্দিন ফিরিবার পূর্ব্বেই শৈল চাটুয্যে আসিল। বলিল,—কি খপর হে হেমন্ত ?

হেমন্ত বলিল—সমর বাবু ডাকছিলেন।

শৈল বলিল—নমস্কার সমর বাবু। এখন আপনি ডি-ডিতে আছেন, না ?

—হ্যাঁ···

—কোর্ট-ইনসপেক্টরী ছেড়ে ঐখানেই কায়েমি হয়ে রইলেন ?

—হ্যাঁ।

—তা বলুন, কি চাই ?

সমর মিত্র বলিলেন—টালিগঞ্জে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আম্‌স্‌হাউসের সামনে গলির মধ্যে সান্ন্যালদের একটা বাগান-বাড়ী আছে না ?

শৈল বলিল—যেখানে সদ্য সেদিন খুন হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ…হ্যাঁ…

—ঐ বাগান-বাড়ীর মালিককে আপনি চেনেন ?

—চিনি। ওরা পাঁচ ভাই…বনিবনা নেই! ওদের দু' ভাইকে আমি জানি। বড় মন্মথ। আর মেজো হলো অপূর্ব্ব। তাদের কার আছে ?

—পেলে ভালো হয়।…মানে, রাঘব বাবু…অর্থাৎ যিনি খুন হয়েছেন, তিনি ও-বাগানে যে গেলেন, কার কাছ থেকে বাগানে যাবার অনুমতি নিয়েছিলেন, জানতে হবে।

শৈল বলিল—বেশ। ওহে হেমন্ত, ঐ পূর্ণ থিয়েটারের পিছনে গলি…সেই গলির মধ্যে থাকে মন্মথ…কাকেও পাঠাতে পারো ?

হেমন্ত বলিল—তোমাকে যে ডেকে এনেছে…বেশ, তাকেই পাঠাই।

ভবেশ গেল মন্মথকে ডাকিতে। মন্মথ বাড়ীতে ছিল। ভবেশের সঙ্গে থানায় আসিল।

৯

উপকণ্ঠ

সমর মিত্রের প্রশ্নের উত্তরে মন্মথ বলিল, রাঘব বাবুর সঙ্গে মন্মথর জানা-শুনা হইয়াছিল এক দালালের মারফৎ। দালালের সঙ্গে আসিয়া তিনি বাগান দেখিয়া যান···কিনিবার উদ্দেশ্যে। আমরা দাম বলিয়াছিলাম পনেরো হাজার টাকা। তারপর কথাবার্ত্তা আর অগ্রসর হয় নাই। যেদিন তিনি খুন হন, তার আগের দিন সন্ধ্যার সময় রাঘব বাবু একা আসিয়া বলেন, কাল তিনি বাড়ীর মেয়েদের বাগান-বাড়ী দেখাইতে আনিবেন এবং মেয়েরা পছন্দ করিলেই বায়না করিবেন। এই কথা বলিয়া বাড়ীর চাবি চাহিয়া লইয়া যান। বাগানের ফটকে চাবি লাগানো ছিল। বাড়ীটি চাবি-বন্ধ থাকিত। তারপর এই চাবি তারা আর ফিরিয়া পায় নাই। ওখানে পুলিশ আছে; বাড়ী এখন পুলিশের হেফাজতে।

একাগ্র মনোযোগে সমর মিত্র এ কথা শুনিলেন···আগে হইতে রাঘব চাবি লইয়া গিয়াছিল···আগের দিনে ঐ গৃহে তাহা হইলে রাত্রি-যাপন! তারপর···

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার মালী?

মন্মথ বলিল—তার নাম আদি। যে-রাত্রে খুন হয়, তার পরের দিন কেঁদে সে বলে, ও বাড়ীতে খুন হয়ে গেছে। মেরে ফেললেও ওখানে সে আর কাজ করতে যাবে না। এই কথা বলে সে তার মাহিনা চায়···কিন্তু মাহিনা দেওয়া হয়নি! ছুট্ বলতেই মাহিনা··· সরিকানী সম্পত্তি···তাই দেওয়া হয় নি।

—সে আদি-মালী এখন কোথায়?

—ওখানে নেই?

—না।

—আশ্চর্য্য! আমরা জানি, সে ঐখানেই আছে। আমাদের কাছে আর তো আসেনি। আমরা তাকে বলেছিলুম, ইংরেজী মাসের পাঁচ-তারিখে আসতে মাহিনার জন্য।

—বটে! আচ্ছা, খুনের সম্বন্ধে মালী আপনাদের কিছু বলেছিল?

—না।

—খুনের রাত্রে সে কোথায় ছিল, জানেন?

—না।

—আপনাদের এখানে সে-রাত্রে মালী আসে নি?

—না।

তারপর আরো দু' চারিটা প্রশ্ন করিয়া সমর মিত্র বলিলেন—আপনি যেতে পারেন মন্মথ বাবু···দরকার হলে আপনার সঙ্গে পরে দেখা করবো।

মন্মথ চলিয়া যাইতেছিল, সমর মিত্র বলিলেন—আর একটা কথা···

—বলুন···

—কামিনী চক্রবর্ত্তী বলে' কাকেও জানেন?

—কৈ, না।

—বি, এন রেলওয়ের কনট্রাক্টর বলরাম মুখার্জ্জীকে জানেন?

—আজ্ঞে না···নাম শুনেছি বটে! কিন্তু চিনি না···জানি না তাঁকে।

—আপনার বাড়ীর কেউ বি, এন, রেলোয়েতে কাজ করেন?

—না।

—আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন। নমস্কার।···

মন্মথ সান্যাল চলিয়া যাইবার পর সমর মিত্র বলিলেন—ঐ মালীকে এখনি দরকার। আমার মনে হয়, সে-বৃষ্টিতেও ঐ বাগানে ছিল, বাগান ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারপরে গা-ঢাকা দেছে···তার কারণ···

হেমন্ত বলিল—তার সন্ধান চাই ?

সমর মিত্র বলিলেন—শৈল বাবুর সঙ্গে তোমরা তো ও-বাগানে গিয়েছিলে পুকুরে-মাছ ধরতে! মালীকে নিশ্চয় দেখেছিলে···

শৈল বলিল—দেখেছি বৈ কি মশায়!···আচ্ছা, দাঁড়ান, আমি হয়তো সাহায্য করতে পারি। বাগানের পুব-গায়ে একটি মুসলমান ভদ্রলোকের বাস···তাঁর ছেলে ট্যাক্সি-ড্রাইভারী করে। সেদিন আমায় ধরেছিল, তার ছেলে একটা কেশে পড়েছে···বাঙ্কশাল-ষ্ট্রীটে কেশ··· দে সাহেবের ঘরে। আমায় বলেছিল, কোনো মতে মাপ-টাপ যদি মেলে! ফার্ষ্ট অফেন্স! পেটি কেশ!···আমি তাকে পাঠিয়েছিলুম কোর্ট-ইনস্‌পেক্টর নির্ম্মল গুপ্তর কাছে···সেই মুসলমানটিকে বেয়ে-চেয়ে আমি দেখি। যাবো ? কি বলেন ?

সমর মিত্র বলিলেন—মন্দ কি! আমি গেলেই বিভ্রাট। যে যে-কথা জানে, বলবে না···আমায় দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠরোধ হবে!

শৈল বলিল—আচ্ছা, আমি তো রোজ বিকেলে মাঠে বেড়াতে যাই, আজ একটু আগেই বেরুবো। বেরিয়ে আজ টালিগঞ্জ যাবো।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার গাড়ী ভাড়ার জন্য না হয়···

বাধা দিয়া শৈল বলিল—আরে না! রাখুন মশায় গাড়ী! ট্রামের মন্থলি পাশ আছে! হুঁঃ···

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু ট্রাম-ডিপোয় নেমে সেখান থেকে অনেকখানি পথ যে মশায়···

শৈল বলিল—চিরদিন হেঁটে চললুম। আমাদের পা বাবুর পা নয় সমর বাবু। আজই আমি যাবো। তারপর খপর যদি মেলে, আপনাকে ফোন্ করবো।

সমর মিত্র বলিলেন—কাল সকালে ফোন্ করবেন। আজ রাত্রে কখন বাড়ী ফিরবো, জানি না।

—বেশ···আজ আমি তাহলে উঠি।

শৈল চলিয়া গেল।

হেমন্ত বলিল—কোর্টের লোক···পাকা লোক। কৌশল করে ঠিক খপর আনবেন'খন।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি তাহলে আসি। সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমার আবার অন্য এনগেজমেণ্ট আছে···বোধ হয় একটু দেরী হয়ে গেল।

ভবানীপুর থানা হইতে বাহির হইয়া সমর মিত্র আসিলেন মলঙ্গা লেনে রাঘব চ্যাটার্জ্জীর গৃহে। শরৎ গাঙ্গুলি সেখানে তাঁর আশায় বসিয়া আছেন।

সমর মিত্র বলিলেন—একটু দেরী হয়ে গেছে। মানে, বিশেষ কাজে আটকে পড়েছিলুম।

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—আপনাদের কাজের ক্ষেত্র তো সামান্য নয়···

—তা ঠিক !

তারপর সমর মিত্র চাহিলেন শরতের পানে, বলিলেন—আজ আপনার শ্যালীর সঙ্গে অনেক কথা আছে। এ সময়ে তাঁকে এ সব কথা নিয়ে বিরক্ত করা অমানুষিক হবে, জানি ! কিন্তু বুঝছেন তো··· নিরুপায় !···তাঁকে দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলবেন, যা হয়ে গেছে, বিশেষ তাঁর···রাজার রাজ্য-বিনিময়েও সে ক্ষতির পূরণ হবে না ! অথচ···

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—আমি আর আমার স্ত্রী দুজনেই বুঝিয়েছি ···তাছাড়া স্বামীর যে-পরিচয় পেয়েছে···বেচারী কেমন গুম্ হয়ে আছে !·· সে কান্নাকাটী আর নেই···

সমর মিত্র বলিলেন—কথা যা হবে, আপনি সেখানে থাকবেন ···আপনার সামনেই হবে ! ওঁকে এইটুকু শুধু বুঝিয়ে দেবেন···এ সব কথার একমাত্র উদ্দেশ্য, যে-পাষণ্ড এ-কাজ করেছে, তার শাস্তির বিহিত করা চাই !

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—আপনি একটু বসুন · আমি তাকে তৈরী করে নিয়ে আসি।

শরৎ গাঙ্গুলি চলিয়া গেলেন। সমর মিত্র ঘরে পায়চারি করিতে লাগিলেন। সহসা কি মনে পড়িল···ভাবিলেন ··এতদিন ইহা খেয়াল হয় নাই, আশ্চর্য্য !

টেবিলের উপরে বড় ব্লটার···ব্লটারের উপর লেখার ছাপ। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল···সে-আলোয় তিনি সেই ছাপগুলি দেখিতে লাগিলেন···

অসংখ্য হরফের কাট্-কুট্···ইংরেজী হরফ···বাঙলা হরফ···সে সব

হরফের মধ্য হইতে এমন কিছু পাইলেন না, যাহা হইতে অম্বা চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর সংযোগ মেলে !

ব্লটারের নীচে ছেঁড়া কতকগুলা কাগজ…কোনো কাগজে লেখা আছে, কোনো কাগজে লেখা নাই। লেখা কাগজগুলার মধ্যে একখানা কাগজে দেখা গেল, ইংরেজী অক্ষরে লেখা

For wife's photo

Paid to Dinesh—Rs. 15/-

এইটুকু শুধু পারিবারিক সম্পর্কে…কাগজখানা তিনি কাছে রাখিলেন।

শরৎ গাঙ্গুলি আসিলেন, বলিলেন—উপরে আসুন…

—উপরে ?

—হ্যাঁ, প্রাইভেট ঘরে…কোনো রকম disturbanceএর ভয় থাকবে না।

সমর মিত্র বলিলেন—একটা অনুমতি চাইছি শরৎ বাবু…

—বলুন…

—রাঘব বাবুর ডেস্ক…টেবিলের ড্রয়ার… এগুলো দেখতে চাই। মানে, এমন কোনো কাগজ-পত্র পাই কি না, যা থেকে…

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—বেশ তো…এখনি দেখবেন ?

—না। আগে ওঁর ছুটী করিয়ে দি…তারপর এ-কাজ যখন হোক…

—আসুন তাহলে।

সমর মিত্রকে লইয়া শরৎ গাঙ্গুলি দোতলার ঘরে আসিলেন… মীরার শয়ন-কক্ষে।

ঘরে ডবল-বেড খাট। খাটে বিছানা।···ঘরে একটি লেডিস রাইটিং-ডেস্ক···সামনে ভেলভেট-মোড়া ছোট চেয়ার। তাছাড়া একখানা সোফা···আর্শির টেবিল···আলমারি। কোণে শ্বেত-পাথরে বাঁধানো গোল ছোট টেবিল···তার উপর শ্বেত-পাথরের একটি পরী-মূর্ত্তি ইত্যাদি···

কৌচের সামনে একটা টিপয় ··টিপয়ের উপরে প্লেট রুটি-তরকারী ···চায়েয় পেয়ালা···

শরৎ বলিলেন—মুখ-হাত ধুয়ে একটু-কিছু মুখে দিতে হবে।

সমর মিত্র বলিলেন—না···না···

শরৎ বলিলেন—'না' বললে চলবে না সমর বাবু! না হলে ওঁরা দুই বোনে অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাবেন ওঁদের অনুরোধ···মিনতি···

সমর মিত্র আর কোনো প্রতিবাদ তুলিলেন না, বলিলেন—বেশ, তাহলে···

—পাশে বাথরুম···সেখানে সব তৈরী পাবেন।

মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া কিছু মুখে দিতে হইল। তারপর সমর মিত্র বলিলেন—মিথ্যা কথা বলবো না···খিদে বেশ পেয়েছিল। সারাদিন টো-টো করে ঘুরেছি···পিপাসাও পেয়েছিল···কিন্তু যেখানে-সেখানে চা বা জল আমি মুখে দিই না···

মৃদু হাস্যে শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—দেখলেন তো! 'না' বলছিলেন!

—'না' বলেছি অভ্যাসের বশে।···এত যত্নে কে আমাদের খেতে দেবে, বলুন তো? হ্যাঁ, এবার···

দ্বারের দিকে চাহিয়া শরৎ ডাকিলেন—মীরা···

আহ্বান-মাত্র বেদনার জীবন্ত মূর্ত্তির মতো ধীর-পদে মীরা সে-ঘরে প্রবেশ করিল…

শরৎ বলিলেন—তোমার দিদি ?

মীরা বলিল—দিদি বাইরে…

—বাঃ! তিনিও আসুন। সমর বাবু আমাদের পরমাত্মীয়ের মতো! সিনেমায় যেতে সকলের সামনে বেরুচ্ছো…সবার সঙ্গে বসছো… আর সমর বাবুকে …হুঁঃ…এসো গো…

নীরজা আসিল।

শরৎ বলিলেন—তোমরা দুই বোনে এই কৌচে বসো… আমরা দুজনে বসি এই দুখানা চেয়ারে…

তাহা হইল।

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—এবারে সমর বাবু যা যা জিজ্ঞাসা করবেন, মীরা তার প্রত্যেকটির জবাব দাও, কোনো রকম লজ্জা বা সঙ্কোচ করো না!

সমর মিত্র বলিলেন—এ সময়ে এ সব কথা তুলতে আমার খুবই কষ্ট হবে! কিন্তু বুঝছেন তো, উপায় নেই…

নীরজা বলিল—কি জিজ্ঞাসা করবেন, করুন! মীরা জবাব দেবে।

সমর মিত্র বলিলেন—আমাকে পুলিশ বলে মনে করবেন না… মনে করবেন, আমি আপনার বড় ভাই…দাদা…কেমন ?

মাথা নাড়িয়া মীরা জানাইল, আচ্ছা…

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেই মালী

সমর মিত্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন. এবং মীরা দেবী সে সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে লাগিল।

প্রথম প্রশ্নের পূর্ব্বে সমর মিত্র বলিলেন—আপনি নারী-সুলভ লজ্জা বা সঙ্কোচ করবেন না। কারণ, কোনো প্রশ্ন অহেতুক বা অলস-কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে আমি করছি না। আমাকে আপনার শুভার্থী বড় ভাইয়ের মতো মনে করে অসঙ্কোচে আমার সব কথার জবাব দেবেন।

মীরা বলিল—না, লজ্জা বা সঙ্কোচ করবো না।

নীরজা বলিল—কোনো কথা বলতে যদি লজ্জা হয়, আমাকে বলিস্, আমি সে কথা জানাবো।

সমর মিত্র বলিলেন—খুব ভালো কথা।

তারপর প্রশ্নোত্তর চলিল।

১ প্রশ্ন আপনার সঙ্গে বিবাহের পর হইতে কোনোদিন আপনার স্বামীর ব্যবহারে আপনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন ?

উত্তর। না।

—আপনার প্রীতি-সম্পাদনে আপনার স্বামী সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন ?

—হাঁ।

—এই বাড়ী তিনি আপনার নামে কিনিয়াছেন কতকাল পূর্ব্বে?

—পাঁচ বৎসর হইল, এ বাড়ী কেনা হইয়াছে।

—কত টাকা দাম দিয়া কেনা হইয়াছে, জানেন?

—বাইশ হাজার টাকা। তারপর বাড়ীর মেরামতী এবং উন্নতি-বাবদ আরো দু' হাজার টাকা খরচ হইয়াছে।

সমর মিত্র মনে মনে হিসাব কষিলেন, বিশ হাজার টাকা দামের গভর্ণমেণ্ট পেপার লইয়াই ও-বাড়ীতে অম্বা চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বিরোধ!

জিজ্ঞাসা করিলেন—এ টাকা তিনি কোথা থেকে পেলেন, জানেন?

—আমাকে বলেছিলেন, ব্যাঙ্কে জমা ছিল। বাড়ী কিনবেন বলে' টাকা জমাচ্ছিলেন।

—আচ্ছা, তিনি যে-কারবার করতেন, তার খাতাপত্র হিসাব-নিকাশ···বাড়ীতে এ-সব আছে?

—আছে।

—আপনি তা দেখেছেন?

—না। দেখার প্রয়োজন মনে করিনি!

—কোন্ ব্যাঙ্কে তিনি টাকা রাখতেন?

—সে খপর আমি কোনো দিন জিজ্ঞাসা করিনি···তিনিও বলেন নি।

—আপনার শ্বশুর-বাড়ীর সম্পর্কে কোনো লোকজন এ-বাড়ীতে কখন এসেছেন?

—না। তিনি বলতেন, আত্মীয় বলতে তাঁর কেউ নেই।

—কামিনী চক্রবর্ত্তীর নাম কখনো তাঁর মুখে শুনেছেন ?

—না।

—অম্বা চক্রবর্ত্তী ? শ্যামলী চক্রবর্ত্তী ?

—না।

তিনি পূর্ব্বে বিবাহ করেছিলেন···সে স্ত্রী মারা গেছেন···সে স্ত্রীর কোনো ছেলেমেয়ে নেই, আপনি জানতেন। কখনো কথাচ্ছলে আগের বারে কোথায় বিয়ে করেছিলেন, সে-সম্বন্ধে কিছু শুনেছিলেন তাঁর মুখে ?

সলজ্জ ভাবে মীরা বলিল—মাঝে মাঝে উনি বলতেন, প্রথম বারে খুব বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন ! একটি দিনের জন্য সুখী হন্ নি। সে স্ত্রীর মেজাজ ছিল ভারী কড়া। বলতেন···

এই অবধি বলিয়া সলজ্জ-ভাবে মীরা মাথা নত করিল।

নীরজা বলিল—আমাদের কাছেও রাঘব বলতো,—দিদি, সংসার কাকে বলে, স্ত্রী কাকে বলে···মীরাকে বিয়ে করবার আগে সে তা কখনো জানতো না ! সংসার আর স্ত্রীর নামে মনে বিভীষিকা জেগে থাকতো !

তারপর পারিবারিক ব্যাপার লইয়া সমর মিত্র বহু প্রশ্ন করিলেন —মীরা সে সব প্রশ্নের উত্তর দিল।

তারপর সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন—টালিগঞ্জে বাগান কেনবার সম্বন্ধে কোনো কথা রাঘব বাবু কখনো বলেছিলেন ?

—না।

—যে-রাত্রে এ ব্যাপার ঘটলো, সেদিন বা তার আগের দিন আপনি টালিগঞ্জে গিয়েছিলেন ?

—না।

—ভালো কথা, ঐ কালো কাপড়ের ভেইল কতকাল আগে কিনে দিয়েছিলেন ?

—ছ' সাত মাস আগে উনি বোম্বাই গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কিনে এনে আমায় ভান।

—খালি ঐ একখানি কিনে এনেছিলেন ?

—ভেইল কিনে আনেন নি ! বিশ গজ সিল্ক এনেছিলেন ··দশ গজ আমার জন্য রাখেন···সে দশ গজ থেকে আমি দু'খানা ভেইল তৈরী করিয়ে নি। বাকী দশ গজ উনি নিয়ে যান···বলেন, একটি বন্ধুকে দেবেন।

সমর মিত্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন···নিমেষের চিন্তা ! তারপর বলিলেন —সে শনিবারে যে আপনি চিত্রায় ছবি দেখতে গিয়েছিলেন··· একা ?

মীরা বলিল—না, একা যাইনি। পাশের বাড়ীতে আমার বন্ধু আছেন···নরসিং বাবুর স্ত্রী সরলা·· সে গিয়েছিল। আর আমাদের নিয়ে গিয়েছিল সরলার বড় ছেলে যাদব।

—ঐ কালো রেশমী ভেইল সে-রাত্রে ব্যবহার করেছিলেন ?

—করেছিলুম। আগের দিন রাত্রে উনি বললেন—সে ভেইলটি একদিনও তোমাকে ব্যবহার করতে দেখলুম না তো ! তাতেই বলেছিলুম, বেশ, কাল সিনেমায় যাবার কথা আছে, তখন ব্যবহার করবো।

—চিত্রায় গিয়েছিলেন বাড়ীর ঐ শেভ্রোলে-গাড়ীতে ?

—না। ও-গাড়ী তখন কারখানায় ছিল। দুদিন আগে কারখানায় দেওয়া হয়েছিল। উনিই কারখানায় দিয়েছিলেন।

তারপর আরো দু'চারিটা কথার পর সমর মিত্র বাহিরের অফিস-কামরায় আসিলেন। ড্রয়ার খুলিয়া কাগজ-পত্র বাহির করিয়া দেখিলেন ···দেনা বা জটিলতার চিহ্ন মিলিল না।

ঘড়িতে ন'টা বাজিল। সমর মিত্র বলিলেন—একটা কথা···ওঁর কর্ম্মচারী বিভোর···তাকে কখনো দেখেছেন?

মীরা বলিল—না।

সমর মিত্র বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন। মাথার মধ্যে কালো রেশমী সিল্কের বাকী ক'গজ যেন কুণ্ডলী পাকাইতে লাগিল!···

তার পর সে-রাত্রের মতো বিশ্রাম···

পরের দিন ভবানীপুর থানা হইতে টেলিফোন্···

হেমন্ত বলিল— শৈল বাবু আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান্ সমরদা···

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যালো···

উত্তরে শৈল বলিল—মালীর সন্ধান পেয়েছি··· নিউ-থিয়েটার্সে'র ষ্টুডিয়োয় তার একজন সম্বন্ধী কাজ করে। সেই সম্বন্ধীর আশ্রয়ে সে আছে, স্যর।

—সম্বন্ধীর নাম পেয়েছেন?

শৈল বলিল—সম্বন্ধীর নাম মার্কণ্ড।···আমি নিউ-থিয়েটার্সে গিয়েছিলুম। মালীটাকে দেখে এসেছি। সে আমায় ত্যাখেনি···

সমর মিত্র বলিলেন—সহস্র ধন্যবাদ শৈল বাবু! আমি তার সঙ্গে এখনি গিয়ে দেখা করবো···

রিশিভার রাখিয়া সমর মিত্র ভাবিলেন, এখন নয়···ষ্টুডিয়োয় কাজ জমে বেলা এগারোটার পর···সেই সময় অফিসে যাইবার পূর্ব্বে টালিগঞ্জের ষ্টুডিয়ো ঘুরিয়া যাইবেন!···

এবং সেই সঙ্কল্প-মতো ষ্টুডিয়োয় গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন বেলা প্রায় বারোটায়।

সেখানকার অনেকের সঙ্গে চেনাশুনা আছে···

প্রথমেই দেখা অমর মল্লিকের সাথে।

হাস্য-মুখে অমর মল্লিক বলিল—আপনি···হঠাৎ?

—তোমাদের কি ছবি তোলা হচ্ছে হে অমর?

—একখানা হিন্দী বই···দেখবেন?

—দেখবো বৈ কি যখন এসেছি। তবে তার আগে তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে···

অমর মল্লিক বলিল—বলুন···

সমর মিত্র বলিলেন—মালী মার্কণ্ডকে চুপি-চুপি একবার ডেকে দিতে হবে।

'অমর মল্লিকের দু' চোখে বিপুল বিস্ময়! অমর মল্লিক বলিল—কেন বলুন তো? কিছু করেছে?

—না। ফুলের মতো তোমাদের মার্কণ্ড নিষ্পাপ অকলঙ্ক···তার পরমায়ু মার্কণ্ডর মতো অক্ষয় হোক্! তা নয়। তার দেশের একটা

লোকের সম্বন্ধে সে যদি কিছু জানে, তাই আর কি! যোদ্দা, তুমি তাকে এমন ভাবে ডেকে পাঠাও, যেন তোমার কোনো দরকারে ডাকছো!

—বুঝেছি···বলিয়া অমর মল্লিক তখনি মার্কণ্ড মালীকে এত্তেলা পাঠাইল।

মার্কণ্ড আসিল। অমর মল্লিক বলিল—বাবুর জন্য বেশ ভালো দেখে ফুল বেছে নিয়ে আয় দিকিনি। যা, শীগগির যা···আমাদের দাদা হন রে···

অসন্দিগ্ধ চিত্তে মার্কণ্ড গেল ফুল আনিতে।

অমর মল্লিক বলিল—চা আনতে বলি?

সমর মিত্র বলিলেন—না ভাই···তোমাদের ষ্টুডিয়োর সাধারণ চা···তার মানে, রাজ্যের শুকনো পাতা কুড়িয়ে গরম জলে ফেলে তারি রস!···

হাসিয়া অমর মল্লিক বলিলেন—না, না!

সমর মিত্র বলিলেন—আমার জানা আছে। তোমাদের মালিক সরকার-সাহেবের সামনে যে-পেয়ালা আসে, তাতে চা থাকে! তাঁর সঙ্গে বসে খেলে সত্যিকারের চা পাওয়া যায়! তাঁর অনুপস্থিতিতে যে-চা···সে-চায়ের আর যা খুশী নাম দিতে পারো···শুধু তাকে 'চা' বলো না!···তোমাদের এটা অভিনয়ের ক্ষেত্র···এখানে সব ঝুটা হ্যায়··· কথাবার্ত্তা, গান, বন্ধুত্ব, রোমান্স···মায় পেয়ালার চা পর্য্যন্ত!

কথা শুনিয়া অমর মল্লিক হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল!

একজন ছোকরা আসিয়া বলিল—শেটে একখানা লাঙ্গল দেবার কথা ছিল, পাইনি মল্লিক মশায়!

বিরক্তি-ভরে মল্লিক বলিল—আঃ, নাওনা একখানা গড়ে···কাঠ পড়ে আছে···ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়ে গড়ে নাও!···এখন ইলেভ্‌নথ্‌ আওয়ারে এসে বলে, লাঙ্গল চাই! হুঁঃ!

ধমক খাইয়া ছোকরা চলিয়া গেল।

সমর মিত্র বলিলেন—লাঙ্গল না হলে কাজ আটকাবে না?

—ক্ষেপেছেন দাদা! যত রকমের বাজে বায়নাক্কা! মানে, ফিল্ম হলো ফাঁকির কাজ! বলে, লাঙ্গল চাই! লাঙ্গল না দিলে কে বা কি বলছে! ডিরেক্‌টরের ওস্তাদি!

—কনটিনিউটির জন্য?

—কনটিনিউটি, না, হাতী! কিছুই কিছু নয়, দাদা···অডিয়েন্স চায় শুধু গান আর গান···ব্যস্! ও সব লাঙ্গল-টাঙ্গল details চাওয়ার মানে, ডাইরেক্টরের বায়নাক্কা!···হুঁ! সকলকেই দেখলুম দাদা! কিছুই কিছু নয়···গল্প কিছু নয় আর্টিষ্ট কিছু নয়···শুধু দুচার-খানা গান আর মেলো-ড্রামার চীৎকার তুলে অভিনয়! হাট-মাঠ বাছবার কোনো দরকার নেই···একটা মেয়ের ন্যাকামি, পুরুষের কান্না···এই হলো বাঙলা-ফিল্মের জান্!

সমর মিত্র এ-কথার জবাব দিলেন না।

মার্কণ্ড আসিল একরাশ ফুল লইয়া।

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার নামই মার্কণ্ড?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা। তোমার এক ভগ্নীপতি আছে না?

—হুঁ।

—তা ন্যাখো বাপু, ক'দিন আগে আমার বাগানের জন্য সে যে-লোক

দিয়েছিল, একটি দিন থেকে অসুখ বলে সে-লোক চলে গেছে···আমার কাছে দুটো টাকা রেখে গেছে···বলে গেছে, আদির কাছ থেকে ধার করেছিল···আমি যেন আদিকে টাকা দুটো দি···তা সে আদি কোথায়, জানো?

সম্বন্ধী সত্য দুটা টাকা পাইবে, মার্কণ্ড বলিল—তার ব্যামো, আমার কাছে আছে।

—ডেকে দাও তো বাপু···টাকা দুটো তাকে দিয়ে যাই!

মার্কণ্ড গিয়া আদিকে ডাকিয়া আনিল···আদির শীর্ণ কুণ্ঠিত মূর্ত্তি!···

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার নাম আদি?

—হ্যাঁ।

—তুমি ঐ সান্যাল বাবুদের বাগানের কাজ করতে তো?

—হুঁ···

—সে-চাকরি ছেড়ে দিলে কেন?

—ব্যায়রাম হলো। দেশে যাবো···ছুটী নিয়ে এসেছি।

—হুঁ···ছুটী নেছ ঐ খুনের পর?···চালাকি বুঝেছি!···শোনো বাপু আমি পুলিশ···ও-বাগানের খুনের কথা তুমি সব জানো তোমাকে আমি গ্রেফতার করবো···বুঝছো!

—কিন্তু আমি খুন করিনি বাবু···বলিয়া সক্রন্দনে আদি একেবারে সমর মিত্রের পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

অমর মল্লিক স্তম্ভিত!···মার্কণ্ড একেবারে কাঠ! দু'টাকা ধার! সেটা পাইবে আদি, তা না···

সমর মিত্র বলিলেন—তোকে বাঁচাতে পারি, যদি তুই আমার কাছে সব কথা খুলে বলিস্!

আদির চোখের সামনে যেন সরিশা ফুলের গাছ···সে চাহিল অমর মল্লিকের পানে।

অমর মল্লিক চাহিল মার্কণ্ডর পানে, বলিল—যা জানে, বলতে বলো মার্কণ্ড···নাহলে সম্বন্ধীর ফাঁশি হতে পারে।

মার্কণ্ডর চেতনা ফিরিল···অমর মল্লিকের আশ্বাসে। আদির পানে চাহিয়া মার্কণ্ড বলিল—বোকামি না করে সব কথা বল্ তুই বাবুকে···যা যা দেখেছিস!

আদি তখন যে-দৃষ্টিতে সকলের পানে তাকাইল···সে-দৃষ্টি দেখিলে বুঝি পাষাণ গলিয়া যায়!

সমর মিত্র বলিলেন—কি রে, বলবি? না, কোমরে দড়ি বেঁধে পাহারাওয়ালাকে দিয়ে থানায় নিয়ে যাবো?

দু' চারিটা ঢোঁক গিলিয়া আদি বলিল—বলবো। কেন বলবোনা বাবু?

—বল্ তাহলে, তুই যা দেখেছিস্···

বার বার ঢোঁক গিলিয়া থামিয়া কাশিয়া কাঁদিয়া আদি যে বিবরণ দিল, তার মর্ম্ম···

সেদিন দশটা বেলায় এক বাবু আসিয়া পাঁচটা টাকা দিয়া বলেন, মালী, আজ এ-বাগানটা তাঁর চাই···ক'জন লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাঁদের সঙ্গে বাগানে কিছু কাজ করিবেন। মনিবের ওখানে বাবু গিয়াছিলেন···চাবি আনিয়াছে। মালীর হাতে চাবি দেন। দিয়া বলেন, ঘরগুলা যেন সাফ করিয়া রাখা হয়। বাবুর সঙ্গে ছিল একটা স্নুটকেশ। স্নুটকেশ হইতে বিলিতি পোষাক বাহির করিয়া তিনি ঐ ঘরে যে গা-আলমারি আছে, তার মধ্যে রাখিয়া দেন। সে আলমারির চাবি ছিল না। বাবু বলেন, মালী, তোমার জিম্মায় রহিল।

তোমায় আরো বকশিস দিব। বাবু আসিয়াছিলেন ট্যাক্সি গাড়ীতে… সেই ট্যাক্সি গাড়ীতে করিয়াই তখন আবার চলিয়া যান।

তিনি চলিয়া যাইবার পর লোক ডাকিয়া মালী ঘর-দ্বার সাফ করায়। বিজলী-বাতির কনেক্‌শন্ তো নাই! বাবুদের কতকগুলা তেলের বাতি ছিল; সেই বাতিগুলায় তেল ভরিয়া রাখা হয়। তারপর বেলা পাঁচটার সময় বাবু আবার ফিরিয়া আসেন, বাবুর সঙ্গে আসে একজন মেয়ে-লোক। মেয়ে-লোকটি একেবারে মেম-সাহেবের মতো! সঙ্গে আর-একজন বাঙালী বাবু ছিলেন। সে বাবুটি বেঁটে-গড়নের…ময়লা রং… মুখে বসন্ত-গুটির দাগ। সে বাবুকে এবং মেয়ে-লোকটিকে দেখিলে মালী চিনিতে পারিবে।

তাদের লইয়া বাবু গেলেন ঘরের মধ্যে। মালী এধার-ওধার ঘুরিতেছিল। হঠাৎ ভিতরে একটা কলহ-চীৎকার শুনিতে পাইয়া মালী আসিয়া বারান্দায় দাঁড়ায়। কলহের যেটুকু সে বুঝিয়াছিল…বাবু বলিতেছিলেন, এ বাড়ী তিনি বুঝি বিশ হাজার টাকায় কিনিতে চান… মেয়ে-লোকটি বলিয়াছিল,'এ-বনে বিশ হাজার টাকা ফেলিয়া কি লাভ? বাবু বলিলেন, তিনি এইখানে আলাদা নাকি বাস করিবেন। তারপর মালীর কৌতূহল শেষ হয় এবং মালী নিজের ঘরে চলিয়া যায়। বাহিরে যাইতে ডান দিকে মালীর ঘর। এই সময়ে খুব মেঘ করিয়া চারিদিক আঁধারে ভরিয়া আসে। মালী চুপ করিয়া বসিয়াছিল…হঠাৎ দেখিল, বাবু একা রহিলেন…সেই মেয়ে-লোকটি আর বসন্ত-গুটীমার্কা ময়লা বাবু ট্যাক্সি-গাড়ীতে চাপিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁরা চলিয়া যাইবার পর মালী গেল বাবুর কাছে। বাবুকে বলিল—খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে? বাবু তখন কি ভাবিতেছিলেন। বাবু বলিলেন—না।

খাবারের কথা তিনি হোটেলে বলিয়া আসিয়াছেন—সেখান হইতে খাবার আসিবে। তারপর ঝমাঝম শব্দে বৃষ্টি সুরু···সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাবু ফিরিলেন না···মালী গিয়া তার ঘরের মধ্যে আস্তানা লইল। বাবুর কাপড়-চোগড় তার কাছে এখনো আছে···তারি হেফাজতে বাবু রাখিয়াছিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ফটকে একটা মোটর-গাড়ী ঢুকিল। ঘরের আলো নিবানো ছিল। মিথ্যা তেল পুড়াইয়া কি ফল! তাই মোটরের শব্দ শুনিয়া সেই অন্ধকারে মালী বারান্দায় আসে। আসিয়া দেখে, মোটর আবার ফিরিয়া যাইতেছে···বাবুর দেখা নাই। মালী ভাবিল, এ বৃষ্টিতে বুঝি কেহ আসিতে পারিলেন না!

তারপর আবার হঠাৎ একখানা গাড়ী আসিল। গাড়ীখানা বাড়ীর সামনে না আসিয়া ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পথেই থামিল···গাড়ী হইতে নামিলেন বাবু এবং একজন মেয়ে-লোক।

আগেকার সে মেয়ে-লোক নয়···আর-একজন।

মালী ছিল বারান্দায়···বাবু বলিলেন—তুমি য়েতে পারো মালী।

এ কথা শুনিয়া মালী চলিয়া গেল। ভাবিল, অনেক বাবুর যেমন রোগ আছে···রক্ষিতা উপপত্নী আনেন···তেমনি। বাবুর সামনে মালী এমন ভঙ্গী করিল যেন সে চলিয়া যাইতেছে।

কিন্তু সে-বৃষ্টিতে তার ভিজিবার সখ ছিল না। বারান্দার সব-উত্তরের কোণে কতকগুলা ভাঙ্গা টেবিল-চেয়ার পড়িয়াছিল···মালী গিয়া সেইখানে বসিল! চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া আছে···এমন সময় ট্যাক্সিতে করিয়া দুজন লোক···একজন মেয়ে-লোক···আর-একজন পুরুষ আসিয়া উপস্থিত। মালী লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাদের হাতে ছিল টর্চ্চের আলো। বাহিরে বৃষ্টি তখন একটু কমিয়াছে···

টর্চ্চের আলো ফেলিয়া দুজনে বারান্দায় উঠিলেন…তারপর ঘরে ঢুকিলেন। সে আলোয় মালী তাঁদের যতটুকু দেখিল, চিনিতে পারিল। আগে যাঁরা আসিয়াছিলেন তাঁরাই! ইঁহারা ঘরে ঢুকিবামাত্র একটা চেঁচামেচি-সোরগোল…ধাক্কাধাক্কি…

মালী আসিয়া সন্তর্পণে দাঁড়াইল ঘরের বাহিরে। ভিতরে টেবিলের উপরে বড় আলো জ্বলিতেছিল…ওদিকার কপাট ছিল ভেজানো…ফাঁকের মধ্য দিয়া মালী দেখিল, সদ্য যে মেয়ে-লোকটি আসিয়াছেন, তিনি—আগে যে মেয়ে-লোকটি আসিয়াছিলেন, তার গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন…আর বসন্তর-গুটিমার্কা বাবু চীৎকার করিতেছেন…আমি কিছু জানি না…বসন্ত-মার্কাকে বাবু চড় ঘুষি লাথি মারিতেছেন…বসন্ত-মার্কা বাবু গলা ছাড়িয়া চেঁচাইতেছে…

মালী ভয়ে কাঁটা…সর্ব্বনাশ! মাতাল হইয়া এ কি কাণ্ড! ভয়ে সে ঘরের মধ্যে যাইতে পারে না…অথচ সরিবে, পা নড়ে না!

এমন সময় মেয়ে-লোক দুটিতে বকাবকি। কথাবার্ত্তা বুঝা গেল না। বসন্ত-মার্কাকে ছাড়িয়া ট্যাক্সিতে যে মেয়ে-লোক আসিয়াছিলেন, বাবু তাকে টানিয়া মুক্ত করিলেন…তার পরেই দেখি, একখানা ছোরা…আলোয় ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে বাবুর চীৎকার—খুন…খুন…

চীৎকার শুনিয়া ভয়ে মালী সেখান হইতে ছুটিয়া পালায়…তারপর ও ত্রিসীমায় সে যায় নাই। ঘুমাইতে পারে নাই! সন্তর্পণে শুধু বাহির হইতে দেখিয়াছে…লোকের পর লোক আসিতেছে…গাড়ীর পর গাড়ী সকালে বাবুদের বাড়ীতে গিয়া বাবুদের বলিয়া গা-ঢাকা দিয়া এখানে আছে! দেশে যায় নাই। তার কারণ চাকরি চাই। দেশে গিয়া কি

খাইবে? ভগ্নীপতির কাছে থাকিয়া কাজের চেষ্টা করিতেছে। সে চেষ্টাও খুব সন্তর্পণে!

বিবরণ শুনিয়া সমর মিত্র বলিলেন—সে মেয়ে-লোক আর বাবুকে দেখলে চিনতে পারবি?

—পারবো।

—আচ্ছা। এখনই তোকে থানায় নিয়ে যাবো না। আমার সঙ্গে আসতে হবে কিন্তু···গাড়ীতে করে যাবি। আবার তোকে ফিরিয়ে রেখে যাবো।···কেমন?

আদি মালী বলিল—তা কেন যাবো না বাবু? ভালো মানুষ আমি··· খুন খারাপী করি নি···কেন যাবো না? বিশ বার যাবো।

বিলম্ব নয়···মালীকে রাখিয়া তখনি সমর মিত্র ষ্টুডিয়ো ত্যাগ করিলেন। অমর মল্লিক ভদ্রতা করিল···ষ্টুডিয়োর গাড়ীতে করিয়া ট্রাম-ডিপো পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিল।

ডিপোয় আসিয়া ট্রামে চড়িয়া সমর মিত্র আসিলেন নিজের গৃহে··· তারপর নিজের টু-শীটার বাহির করিয়া তাহাতে বসিয়া একা তিনি চলিলেন সোজা ট্যাংরায়।

যাত্রার পূর্ব্বে টেলিফোন করিয়া গুণময়কে বলিয়া দিলেন, তুমি এখনি ট্রামে চড়িয়া মৌলালির মোড়ে যাও। সে-মোড়ে তোমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইব। কাহাকেও এখন কোনো কথা বলিয়ো না! নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিবে।

গুণময় বলিল—তাই করবো স্যর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মিসেস নন্দী

লালবাজার হইতে সময় মিত্র বাহির হইবেন, ফটকের কাছে শরৎ গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা।

সমর মিত্র গাড়ী থামাইলেন, বলিলেন—কি খপর ?

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—খপর আছে। একখানা চিঠি পাওয়া গেছে …আজ…ডাকে।

কথাটা বলিয়া শরৎ গাঙ্গুলি লেফাফা-ছেঁড়া একখানি চিঠি দিলেন সমর মিত্রের হাতে। সমর মিত্র বলিলেন—গাড়ীতে উঠে বসুন।… আপনার ড্রাইভারকে বলে দিন, আমার গাড়ীর পিছু পিছু গাড়ী চালিয়ে আনবে।

সেই ব্যবস্থা করিয়া শরৎ গাঙ্গুলি উঠিয়া বসিলেন সমর মিত্রের গাড়ীতে। সমর মিত্র গাড়ী চালাইয়া সোজা আসিলেন শেয়ালদার মোড়ে। আসিয়া শেয়ালদা মুন্সেফ-কোর্টের সামনে গাড়ী রাখিয়া চিঠি খুলিলেন।

চিঠি মীরার নামে। রাঘবের লেখা। চিঠিতে লেখা আছে—

মীরা

নানাদিক দিক দিয়া জীবনে বহু জোট বাঁধিয়াছি। নাগপাশের বন্ধন। এ বন্ধন যেমন করিয়া পারি, কাটিব। তোমায় আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। অতীত জীবনে এত বিরোধ, এত অশান্তি ভোগ করিয়াছি যে তাহা হইতে মুক্তি লইয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিলাম। সে-জন্য ধূলা-মাটী-আবর্জনা মাখিয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছিলাম। তোমার সঙ্গে অনেক ছলনা করিয়াছি,—অনেক কথা গোপন রাখিয়াছি—কিন্তু পাছে তোমার আঘাত লাগে, পাছে তোমায় অসম্মান করি সে শুধু এই জন্য।

আশা করি, আমাকে তুমি চিনিয়াছ। তোমার সঙ্গে আমি ছলনা করি নাই। তুমি আমায় প্রাণ দিয়াছ! সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। শরৎদার কাছে সব কথা খুলিয়া বলিব। এবং অন্য দিকে যে-বাঁধনে আমি আবদ্ধ, শরৎদার সাহায্যে সে-বন্ধন আমি কাটিবই। শরৎদার কাছে অকপটে সব কথা খুলিয়া বলিব। শুনিয়া···তারপর আমায় যদি ক্ষমা করিতে পারো, তবেই আবার বাঁচিতে পারিব। নহিলে আমার বাঁচিবার কোন উপায় থাকিবে না।

কথাগুলো হেঁয়ালির মতো লাগিতেছে। কিন্তু দু'দিন ধৈর্য্য রাখিয়ো। তারপর হয়তো দুজনের আকাশ নির্ম্মল হইবে।

এ বন্ধন কাটিবার উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ করিব বলিয়া শরৎদার সঙ্গে একান্তে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়াছি। কাল রাত্রি আটটায় সে-ব্যবস্থা।

তোমার রাঘব।

চিঠি পড়িয়া খামখানা ভালো করিয়া দেখিলেন।

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—চিঠিখানা লিখেছিল যে-রাত্রে, এ ব্যাপার হয় তার পরের দিন।

সমর মিত্র বলিলেন—খামের উপরে ডাক-ঘরের ছাপ দেখছি, কালকের। ভবানীপুর পোষ্ট অফিস।

এ চিঠি কার কাছে ছিল? এতকাল পরে সে ডাকে দিলে কেন? সমস্যা!

শরৎ গাঙ্গুলি বলিলেন—মীরা এ চিঠি পেয়েছে আজকার ডাকে। ন'টার ডেলিভারী। চিঠিখানা আমার বাড়ীতে পাঠিয়েছিল···আমি আজ সকাল-সকাল অফিসে এসছি। মীরার লোক বাড়ীতে আমায় পায় নি। না পেয়ে চিঠি নিয়ে আবার সে মলঙ্গা লনে ফিরে গেছে। তারপর আবার এ-চিঠি নিয়ে এসেছিল আমার অফিসে। আমার ছিল কোর্টে চেম্বার-এ্যাপলিকেশন্। কোর্ট থেকে ফিরে চিঠি পেলুম। চিঠি পেয়ে

আমি মঙ্গলা লেনে ফোন করি···তারপর লালবাজারে আপনার কাছে ছুটি···

সমর মিত্র বলিলেন—চিঠি আমার কাছে থাক।···আপনি অফিসে ফিরবেন তো? মানে, আমি একবার ট্যাংরায় যাচ্ছি···এই ব্যাপারেই। ···যা হয়, ফোনে আপনাকে জানাব।···কেমন?

—আচ্ছা।

শরৎ গাঙ্গুলি টু-শীটার হইতে নামিয়া নিজের মোটরে উঠিলেন। সে মোটর ছিল পিছনে···তাহাতে চড়িয়া তিনি গেলেন নিজের অফিসে।

সমর মিত্র টু-শীটার চালাইয়া মৌলালির মোড়ে আসিলেন। সেখানে গুণময় ও জমাদার রাম-খেলোয়ানের সঙ্গে দেখা। তাদের গাড়ীতে তুলিলেন···তুলিয়া বলিলেন,—থানায় যাবো। সেখান থেকে একজন ইন্‌স্‌পেক্টর আর দুইজন সিপাহী নিয়ে যাবো। মানে ট্যাংরায় অম্বা চক্রবর্ত্তীর বাড়ী সার্চ্চ করতে চাই, গুণময়।

দু'চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি···গুণময় চাহিল সমর মিত্রের পানে।

তারপর ট্যাংরা··অম্বা চক্রবর্ত্তীর বাড়ী।

দোতলার ঘরে রেডিয়োয় ইংলিশ-প্রোগ্রাম চলিয়াছে···পিয়ানোর টুং-টুং···বেয়ারা আসিয়া দেখা করিল।

সমর মিত্র বলিলেন— মেম্‌-সাব···

সকলকে ড্রয়িং-রুমে বসাইয়া বেয়ারা গেল খপর দিতে।

প্রথমে আসিল শ্যামলী, বলিল—কি খপর সমর বাবু?

সমর মিত্র বলিলেন—Call of duty (কর্ত্তব্যের আহ্বান)!

শ্যামলী বিমূঢ়ের মতো একটা কৌচে বসিল···নির্ব্বাক ! নিস্পন্দ !

সমর মিত্র বলিলেন—বঙ্কু বাবুকে এখনি একবার দরকার··তার কাছে কাকেও একবার পাঠাও। এক লাইন লিখে দিয়ো, এখনি যেন তিনি আসেন ! খুব দরকার।

শ্যামলীর মনে একরাশ প্রশ্ন···উত্তরের প্রত্যাশায় সে দাঁড়াইল না। বলিল, লোক আমি এখনি পাঠাচ্ছি···চিঠি দিয়ে। বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

তারপর অম্বা চক্রবর্ত্তী আসিলেন।

সমর মিত্র বলিলেন—নমস্কার···

অম্বা বলিলেন—নমস্কার ! বসুন।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি বসুন।···কিন্তু ক্ষমা করবেন···সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট আছে ! এ বাড়ী আমি সার্চ্চ করবো। নিঃশব্দে করতে চাই··· চাকর-বাকর পর্য্যন্ত জানতে পারবে না। তা যদি allow না করেন, তাহলে অবশ্য···বুঝছেন তো, কঠিন কর্ত্তব্য।

অম্বা চক্রবর্ত্তীর নয়নে রোষ-স্ফুলিঙ্গ···মনে দারুণ আক্রোশ। কোনো মতে সে-ভাব চাপিয়া তিনি বলিলেন—কিন্তু কারণ ?

সমর মিত্র বলিলেন—যে কাজে যে-রকম রীতি, মিসেস চাকারবর্ত্তি মানে, কোনো রকম কাগজ-পত্র বা কোনো কিছু লেখা···

—কি চাই, আমাকে বলতে পারেন তো···

—তা হয় না। কোনো নির্দ্দিষ্ট জিনিষ চাইছি না তো···কাগজ-পত্র টুকিটাকি থেকে কি খপর মিলবে ! তাছাড়া কতকগুলো এমন খপর পাওয়া গেছে, তা থেকে এ সার্চ্চ অনিবার্য্য হয়েছে···

—ম্যাজিষ্ট্রেট সার্চ্চের অর্ডার দেছে ?

—নিশ্চয়। আপনি ইচ্ছা করেন,উকিল-ব্যারিষ্টার আনতে পারেন! আপনার বাবাকে খপর দিতে পারেন। আমি wait (প্রতীক্ষা) করতে প্রস্তুত! কিন্তু আপনারা আমাদের চোখের উপরে থাকবেন। ক্ষমা করবেন, মিসেস চক্রবর্ত্তী…কথাটা রূঢ় এবং অপমানজনক! কিন্তু এ হলো আইনের ব্যাপার! আর জানেন তো Law is no respecter of persons (আইন কাহারো মর্য্যাদার তোয়াক্কা রাখে না) !

অম্বা চক্রবর্ত্তীর চোখে ভ্রূকুটি-রেখা… কানের ডগা অগ্নি-তাপে লাল টক্‌টক্ করিতেছে! তিনি বলিলেন -করুন সার্চ্চ…কাকেও খপর দেবার দরকার নেই!…যত শীঘ্র এ অপমানের শেষ হয়…কিন্তু কিছু যদি না পান, এ-সার্চ্চের consequences (পরিণাম) …?

সমর মিত্র বলিলেন—You are at liberty to seek your redress (প্রতিকারের উপায় অবলম্বনে আপনার পূর্ণ অধিকার আছে) মিসেস চাকারবর্ত্তি…

তারপর যথারীতি সার্চ্চ আরম্ভ হইল…

গুণময় রহিল অম্বা চক্রবর্ত্তী এবং শ্যামলীর চার্জ্জে। সার্চ্চের জন্য আমন্ত্রিত দুজন প্রতিবেশী ভদ্রলোককে লইয়া সমর মিত্র সার্চ্চ করিতে দোতলায় উঠিলেন।

শ্যামলী তাঁর কাছে আসিল। সমর মিত্র বলিলেন—তুমি এসেছো মা …ভালো হয়েছে! তোমার সাহায্য চাই। বঙ্কু বাবুকে ডাকতে পাঠিয়েছো?

শ্যামলী বলিল—হ্যাঁ…

শ্যামলীর মুখে মেঘের ভার !···

সমর মিত্র বলিলেন—সার্চ্চ করছি·· তোমার থাকা দরকার, মা··· জিনিষ-পত্র না তছনছ হয় ! সঙ্গে এসো ।

শ্যামলী এ-কথার জবাব দিল না ..গম্ভীর মুখে সমর মিত্রের সঙ্গে মায়ের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল ।

ঘরে ঢুকিবামাত্র সমর মিত্রের দৃষ্টি পড়িল ছোট আনলায়···সিল্কের দুখানি শাড়ী·· চারিটা সিল্কের ব্লাউশ···পেটিকোট···বডিস্···তার সঙ্গে কালো সিল্কের ভেইল । বেশ বড় ভেইল !

দেখিয়া মনে বিপুল আশা ! এই ভেইলের জুড়ি দেখিয়াছেন মীরার কাছে । মীরা বলিয়াছে, স্বামী কালো সিল্ক আনিয়া খানিকটা দিয়া মীরার জন্য ভেইল তৈয়ারী করাইয়াছিলেন ; আর বাকীটুকু···

শ্যামলীর পানে চাহিয়া সমর মিত্র বলিলেন– এ ভেইল কার ?

শ্যামলী বলিল—আমার ।

—তুমি নিজে কিনেছিলে ?

—না । বাবা তৈরী করিয়ে দিয়েছিল ।

—এটা তুমি ব্যবহার করো ?

—না ।

—বাইরে রয়েছে যে ?

—সম্প্রতি বার করা হয়েছিল । সেদিন ডালহৌসি ইন্‌ষ্টিটিউটে যাবার সময় মার সঙ্গে একটি মহিলা গেছলেন···তাঁর নিজের ভালো শাড়ী ছিল না···এখান থেকে তিনি সাজগোজ করেছিলেন । তাঁর জন্যই মা আমাকে বলেছিল, দিস্ তোর ভেইলটাও শাড়ীর সঙ্গে : তাই বার করে দিয়েছিলুম ।

—সে মহিলা কে, শ্যামলী ?

—আমি ঠিক জানি না। মার সঙ্গে জানাশুনা···মার কাছে প্রায় আসেন-যান।

সমর মিত্র আর কোনো কথা বলিলেন না। সিল্কের ভেইলটা সার্চ্চ-লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। করিয়া বলিলেন—তিনি কোন শাড়ী-ব্লাউশ পরে গিয়েছিলেন, জানো ?

শ্যামলী বলিল—হ্যাঁ। ফিকে গোলাপী রঙের···ওটাও আমার।

—ও··তারপর অলনা থেকে আর তোলা হয় নি ?

—না। মা বললে, কাচিয়ে দেবে। তাছাড়া যদি থিয়েটারের জন্য দরকার হয়, বাইরেই ওটা থাকুক।

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার মার আর বাবার লেখার সরঞ্জম-পত্র কোন্ ঘরে ?···আর তোমার বাবা কোন্ ঘরে থাকতেন ?

শ্যামলী বলিল—বাবা এ-বাড়ীতে বড় বেশী থাকতো না। কখনো যদি থাকতো, তাহলে রাত্রে বাবা শুতো ঐ পূব-দিককার ঘরে।

—সে-ঘরটাও একবার দেখতে চাই।···

কোনো ঘর বাকী রহিল না।···তারপর সমর মিত্র আসিলেন এক-তলায়।

এক-তলায় আসিয়া প্রথমে তিনি ফোন্ করিলেন টালিগঞ্জে নিউ থিয়েটার্সে'র ষ্টুডিয়োর অমর মল্লিককে। বলিলেন—তোমাদের ষ্টুডিয়োর মালীর যে-ভগ্নীপতি আছে আদি···তাকে কোনো লোকের সঙ্গে এখনি একবার পাঠিয়ে দিতে পারো অমর! খুব দরকার। ট্রামে নয়···

ট্যাক্সিতে পাঠিয়ো। আমি ভাড়া দেবো। ট্যাংরায় পাঠাতে হবে। ঠিকানা ১৭ নম্বর মাধব পালিত ষ্ট্রীট···

অমর জবাব দিল—আপনি একটু ধরে থাকুন। আমি দেখি, তারা দুজনে আছে কি না! থাকলে এখনি ঐ আদিকে আমি ভালো লোকের চার্জ্জে পাঠিয়ে দেবো।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি ফোন্ ধরে রইলুম···

একটু পরে অমর মল্লিক ডাকিল—সমর বাবু···

—অমর ?

—হ্যাঁ। আদি আছে। আমাদের দরোয়ানকে সঙ্গে দিয়ে আদিকে পাঠাচ্ছি। ট্যাক্সিতে নয়···আমাদের বাস যাচ্ছে ঐদিকে···সুরি লেনে আর্টিষ্ট পৌঁছুতে···আদিকে একেবারে আপনাদের ওখানে নামিয়ে তবে সে গাড়ী সুরি লেনে যাবে, বলে দিলুম।

—মেনি থ্যাঙ্কস অমর···

সমর মিত্র এক-তলায় সার্চ্চ করিতে লাগিলেন···

অম্বা চক্রবর্ত্তী মনে মনে জ্বলিতেছিলেন! এ জ্বালা ক্রমে সহ্য-সীমা অতিক্রম করিল। তিনি বলিলেন—I do not know what you mean (আপনার অভিপ্রায় বুঝিতেছি না) ··আমাকে কি আপনি এ্যারেষ্ট করেছেন যে এক-জায়গায় চুপ করে এমন নজর-বন্দী হয়ে থাকবো ?

সমর মিত্র বলিলেন—নিশ্চয় তা নয়। বাড়ীর মধ্যে যেখানে খুশী আপনি যেতে পারেন।

—বাইরে যেতে পাবো না ?

অত্যন্ত বিনয়ের ভঙ্গীতে সমর মিত্র বলিলেন—আজ্ঞে, না! মাপ

করবেন! আপনার বাড়ীতে সার্চ্চ করছি···কাজেই বাড়ীতে থেকে আপনার বাহিরে যাওয়া চলে না!

—Disgraceful! (অপমানকর) বলিয়া অম্বা দেবী নিস্ফল হুঙ্কার তুলিলেন, তারপর ডাকিলেন—শ্যামলী···

শ্যামলী বলিল—মা···

—বয়কে বলো, আমায় চা আর টোষ্ট দিয়ে যাবে। আর কারুকে একবার পাঠাও গিরিবালার বাড়ী···বলবে, রিহার্শাল আজ হবে না··· কারো কাছে গাড়ী যেন না যায়।

—বলি···

শ্যামলী চলিয়া গেল।

এক-তলার সার্চ্চ শেষ হইতে দু'ঘণ্টা সময় লাগিল। কতকগুলা কাগজ-পত্র মাত্র সমর মিত্র সঙ্গে লইলেন। আদি ওদিকে আসিয়াছে হয়তো! সমর মিত্র বলিলেন—সেই বঙ্কু বাবু এসেছেন?

—এই যে···বলিয়া বঙ্কু বাবু আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

—আদি···

গুণময় বলিল—এসেছে। গাড়ী-বারান্দায় তাকে বসিয়ে রেখেছি।

—ডাকো তাকে।

আদি আসিল। সমর মিত্র বলিলেন—সে রাত্রে বাগানে যাঁদের দেখেছিলে, তাঁদের মধ্যে কেউ এখানে আছেন?

চারিদিকে চাহিয়া আদি তখনি বঙ্কু এবং অম্বা দেবীকে দেখাইয়া দিল; বলিল—এঁরা···

—হুঁ···আচ্ছা, তুমি বাইরে বসো।

আদিকে লইয়া গুণময় বাহিরে গেল।

সমর মিত্র বলিলেন—বঙ্কু বাবু আমার সঙ্গে ও-ঘরে আসুন।

বঙ্কুকে লইয়া সমর মিত্র বারান্দায় আসিলেন। বলিলেন—সব কথা যদি বলেন, ভালো। না বলেন, আদির সনাক্তেতে আপনাকে আমি arrest করবো।

শুষ্ক কণ্ঠে বঙ্কু বলিল—কারণ?

—কারণ, প্রমাণ পাওয়া গেছে, কামিনী বাবু যে-রাত্রে খুন হন, সেদিন সন্ধ্যায় ঐ জল-ঝড়ের সময় আপনি আর মিসেস চাকারবর্ত্তি টালিগঞ্জের সে বাগানে গিয়েছিলেন। মিসেস চাকারবর্ত্তির সঙ্গে কামিনী বাবুর খুব বচসা চলেছিল। এবং সেই সঙ্গে···অর্থাৎ আপনারও কিছু বলতে চান যদি···

বঙ্কুর মুখ পাণ্ডাশ! বঙ্কু বলিল—আমি মশায় চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম। স্পেক্‌টেটর! একটু পরে কামিনী বাবু বললেন—আজ আমি মুক্তি নেবো। তোমার মনে সন্দেহ হয়েছে, আমি কোনো স্ত্রীলোককে উপপত্নী রেখেছি! আমাকে তার সঙ্গে সিনেমায় অনেকে দেখেছে—এই তো? এ কথা মিথ্যা নয়! কিন্তু সে স্ত্রীলোক আমার উপপত্নী নয়···আমার স্ত্রী তিনি। আমি তাঁকে বিয়ে করেছি। এ কথায় মিসেস চাকারবর্ত্তি বললেন—বিয়ে! মিথ্যা কথা! আমার সঙ্গে মিসেস নন্দী আছে! সে তোমাকে দেখেছে···শুধু সিনেমায় নয় ট্রেণের কামরায় উঠেছো··· সঙ্গে সাজগোজ-করা মেয়ে-মানুষ! মিসেস নন্দী আছে···তাকে ডাকছি।

বাধা দিয়া সমর মিত্র বলিলেন—মিসেস নন্দীও সঙ্গে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তাঁকে কোথায় পেলেন?

—তিনি এ-বাড়ীতে এসেছিলেন।

—ও···তিনি বুঝি শ্যামলীর শাড়ী পরে শ্যামলীর স্টেইল এঁটে গিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ এ বাড়ীতে তিনি এমনি বেড়াতে এসেছিলেন। মিসেস চাকারবর্ত্তি তাঁকে সঙ্গে যেতে বললেন।

—বেশ! কিন্তু আপনি গেলেন কি জন্য ?

আমায় বললেন, দুজন মেয়েমানুষ যাচ্ছি···আকাশে অমন দুর্য্যোগ··· তুমিও সঙ্গে এসো বন্ধু। তাই গেলুম।

—টালিগঞ্জ থেকে তারপর ওঁরা গেলেন ডালহাউসি ইনষ্টিটিউটে ?

—হ্যাঁ।

সমর মিত্র কি ভাবিলেন···তারপর বলিলেন—ছুরি এলো কোথা থেকে ?

—ছুরিখানা কোথায় ছিল, জানি না মশাই। তবে দুজনে খানিকটা ঝগড়া হবার পর মিসেস চাকারবর্ত্তি বললেন—তোমার যা-খুশী তুমি করতে পারো! তোমাকে আমি চাই না···mean low creature (হীন ইতর জীব)! কিন্তু আমার বাবার টাকায় যে লাইফ ইনসিওর করেছো, তার বেনিফিসিয়ারী করছো তোমার পেয়ারের [illegible]-মানুষকে ···ওটি নাকচ করতে হবে ; আর বিশ হাজার টাকার গভর্ণমেণ্ট পেপার ফিরিয়ে দিতে হবে। আমার বাবার টাকা ভোগ করবে একজন বেশ্যা··· তা হবে না। এই কথায় কামিনী বাবু গরম হয়ে মিসেস চাকারবর্ত্তিকে যা-তা অকথা বলে' লাথি মারলেন। লাথি মেরে বললেন তাকে তুমি বলো বেশ্যা! নিজের ব্যবহার কি, তা মনে করে ছাখো। বাটার-ফ্লাই! ডোনাল্ড সাহেবের সঙ্গে তার হাত ধরে বল্-নাচ নেচে বেড়াও···তার সঙ্গে কাশানোভায় গিয়ে ড্রিঙ্ক করো···এমনি দারুণ রকমের কথাবার্ত্তা চললো!

লাথি খেয়ে মিসেস চাকারবর্ত্তি উঠে দাঁড়াতেই আমি পা টিপে সরে আসছিলুম···হঠাৎ একটা জাপটা-জাপটি আর চীৎকার! দেখি, কামিনী বাবু মেঝেয় পড়ে গেছেন···রক্তের ফোয়ারা ছুটেছে। মিসেস নন্দী আর মিসেস চাকারবর্ত্তি দুজনে শিউরে রয়েছেন! ব্যাপার দেখে ওঁদের দুজনকে নিয়ে ছুটে আমি বেরিয়ে এলুম। বৃষ্টি তখন সবে থেমেছে। ওঁদের নিয়ে এসে সোজা গাড়ীতে উঠলুম। উঠেই···

—বাড়ী এলেন?

—হ্যাঁ। বাড়ী এসে ওঁরা দুজনে সাজ-পোষাক বদলে ফেললেন। তিনজনেই গুম্! মিসেস চাকারবর্ত্তি বললেন, তুমি আর বাড়ী যেয়ো না বন্ধু, এইখানেই থাকো। মিসেস নন্দী বাড়ী গেলেন।···তারপর রাত্রে এখান থেকে আপনি, না, কে-একজন ফোন করলেন···

—ফোনের সে ডাক শুনে তাই ছুটে গেছলেন?

—গেছলুম। শ্যামলী জেদ ধরলে, যাবে। আমি বললুম—যাওয়া ভালো···তাহলে আমরা যে এ-ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানি···

বঙ্কুর কথা শেষ হইল না···সমর মিত্র বলিলেন—বুঝেছি।

তারপর মিসেস অম্বা চক্রবর্ত্তী···

বঙ্কুর প্রত্যেকটি কথা লইয়া তাঁকে জেরা করিতে তিনি বলিলেন, ছোরা ছিল তাঁর স্বামীর হাতে। কোথা হইতে ছোরা আসিল, তিনি জানেন না। তবে উদ্যত ছোরা দেখিয়া মিসেস নন্দী মাঝখানে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন! সে-ছোরা তিনিই কাড়িয়া লইলেন! তখন স্বামী মিসেস নন্দীকে জাপটাইয়া ধরিয়া চীৎকার করিলেন—খুন···খুন···!

সে চীৎকারে মিসেস নন্দী কেন যে সে-ছোরা স্বামীর বুকে গুঁজিয়া দিল···

চকিত-ক্ষণ···তারপর সব লালে লাল হইয়া গেল !

অম্বা চক্রবর্ত্তীর রোষের সীমা নাই ! বকিয়া ধমকাইয়া শাসাইয়া কাঁদিয়া তাঁকে স্বীকার করিতে হইল, কামিনীর সম্বন্ধে জনরব তাঁর কাণে আসিত। ডোনাল্ড সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব—সে সম্বন্ধে অম্বা দেবী কোনো কথা বলিলেন না ! তবে ছুরি···তিনি স্বামীর বুকে বসান নাই ! তাঁর রাগ হইয়াছিল খুব ! কামিনীর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে, তাহাতে তাঁর কোনো ক্ষতি ছিল না। তিনি শুধু চাহিলেন সুবিচার ! তাঁর পিতা বলরাম মুখার্জ্জীর যে-টাকায় কামিনী জীবন-বীমা করিয়াছে, সে-টাকা স্বামী দিবে তার পেয়ারের স্ত্রীলোককে ? না···না···না···

তার উপর ঐ গভর্ণমেণ্ট পেপার ! সেগুলা কামিনী বেচিয়া সাফ করিয়া দেয় কি বলিয়া ? সে-পেপারের এ-তছরুপির জন্য যদি আদালতে মামলা চলিত, তিনি একবার মজা দেখিতেন !

সেদিন অম্বা চক্রবর্ত্তীও স্বামীর কাছ হইতে চিঠি পাইয়াছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল—সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা হইতে আটটায় টালিগঞ্জে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আর্ম্‌স্‌-হাউসের দক্ষিণে গলি···সেই গলির মধ্যে সান্যালদের বাগান-বাড়ীতে দেখা করা চাই। স্বামী তার স· ঋণ-শোধ করিয়া দিবে ! অম্বা বুঝিয়াছিলেন সেই গভর্ণমেণ্ট পেপারের ঋণ-শোধ ! লাইফ-ইনসিওরের সমস্যা-সমাধান !

তাই অম্বা চক্রবর্ত্তী গিয়াছিলেন। মিসেস নন্দী সঙ্গে গিয়াছিলেন ···কারণ কথা ছিল, দুজনে টালিগঞ্জ হইতে সোজা ডালহাউসি ইনষ্টিউটের পার্টিতে যাইবেন।

মিসেস নন্দীকে পাওয়া গেল ! যেন বাঘিনী ! একা থাকেন ! স্বামী নাই ! কেহ নাই···

মাথার চুলে কলপের কালি···সে-চুল যেন হাজার-সাপের মতো ফণা তুলিয়া আছে! সে-ফণার কি বাহার! মুখে এখনো ঘষেন পাউডার···রুম···রুজ! মুখখানাকে এক এক সময় দেখায় যেন ভিখারী-বামন শীতলা ঠাকরুণের মতো।

পার্ক সার্কাসের দিকে একটা ফ্ল্যাট-বাড়ীর তিন তলায় কামরায় বাস করেন। যে কাজ করিয়া তাঁর দিন চলে, ভদ্র-সমাজে তা বলা চলে না।

অর্থাৎ বিলাত-ফেরত ধনী সম্প্রদায়ের যে-সব তরুণ পুত্র বাপের মৃত্যু কামনা করিয়া বেড়ায়, তাদের জন্য মিসেস নন্দী শীকার ধরিয়া বেড়ান। অসহায় ভদ্র-ঘরের যে-সব মেয়ের মনে বিলাস-স্বপ্নের ছোপ লাগিয়াছে, মোটর আর সিনেমার মোহে যে-সব মেয়ে নিজের হিতাহিত-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চেতন-হারা, স্নেহ-মায়া-মমতা আর মিষ্ট-মধুর বচনের তীরে এমন কৌশলে তাদের গাঁথিয়া মারেন···

কিন্তু সে কথা থাক!

আদালতে বঙ্কু বাবু হইলেন সাক্ষী···আদি মালী সাক্ষী···তারপর শরৎ গাঙ্গুলি···শ্যামলী···মীরা দেবী পর্য্যন্ত। আসামীর কাঠগড়ায় অম্বা চক্রবর্ত্তী এবং মিসেস নন্দী।

এ-ব্যাপারে বলরাম মুখার্জ্জী রাগিয়া বকিয়া এক কাণ্ড করিলেন। এটর্ণি ডাকিয়া তাঁর যা-কিছু বিষয় সম্পত্তি···সর্ব্বস্ব দিয়া কার্শিয়ঙে নার্শিং-হোম রচিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের স্কুল···যে-সব দুঃখী গরীব বাঙালী পরিবার অভাবে স্বাস্থ্য-লাভের জন্য বাহির হইতে পারে না, তারা এ নার্শিং-হোমে বিনা-ব্যয়ে স্থান পাইবে, সেবা-পরিচর্য্যা পাইবে! শুধু শ্যামলীর জন্য দিলেন এক লক্ষ টাকা দামের

গভর্ণমেণ্ট পেপার এবং দমদমার বাড়ী-বাগান। মেয়ে অম্বাকে জানাইলেন তিনি যেন বাপের কাছে ও-মুখ লইয়া আর না দাঁড়ান!

বিচারে অম্বা চক্রবর্ত্তী খালাশ পাইলেন। মিসেস নন্দীর হইল সাত বৎসরের জন্য জেল।

শ্যামলী নিজে আসিয়া দেখা করিল মীরার সঙ্গে। বলিল—আমি কাকে মা বলে ডাকবো? একা···আমার বুক কাঁপে!

মীরা তাকে বক্ষলগ্ন করিয়া বলিল—আমি তোমার মা।

সমর মিত্র বলিলেন—মা আর মেয়ে···একসঙ্গে নিশ্চিন্ত সুখে থাকো।

বলরাম মুখার্জ্জী এ-আঘাত সহিয়া বাঁচিতে পারিলেন না। মকর্দ্দমার ফল বাহির হইবার দু'দিন পরে এ্যাপোপ্লেক্সি···সে-যাত্রা তিনি তার বাঁচিতে পারিলেন না।

অন্তিম শয়নে মীরাকে আর শ্যামলীকে দেখিতে চাহিলেন। মুখে কথা সরিল না। কম্পিত হাতে মীরার হাতে শ্যামলীর হাত গুঁজিয়া দিয়া বলরাম মুখার্জ্জী চক্ষু মুদিলেন!

জানি আপনারা কি খপর জানিতে চান! শ্যামলীর বিবাহ তো?

শ্যামলীর বিবাহ হইল। স্যাণ্ডেল সাহেবের সঙ্গে নয়···আর একটি সুপাত্রের সঙ্গে। পাত্রটির নাম মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জী। সদ্য বিলাত হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া ফিরিয়াছে। ব্যবসার দিকে ঝোঁক নাই। কার্শিংয়ে বলরাম নার্শিং হোমের চার্জ্জ লইয়াছে। সেই মনোরঞ্জনের সঙ্গে শ্যামলীর বিবাহ।

তবে এ বিবাহ হইল বলরাম মুখার্জ্জীর মৃত্যুর প্রায় দেড় বৎসর পরে।

বেচারী বলরাম মুখার্জ্জী···এ বিবাহ চোখে দেখিলে একটু আরামে পরলোক যাত্রা করিতেন!

শেষ

রতনের জিম্মা করে দিয়ে তবে এসেছি। তার ঘর তাকে দেখিয়ে দিয়েছি, ঠাকুর ভাত দিচ্ছিল, খেয়ে গেছে বলে সে খেলে না—তবু মোক্ষদা ঝি জোর করে জলখাবার খাইয়ে দিয়েছে। সে বেশ আছে, তার জন্যে ভাববেন না। কালই তাকে ওরা ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে।…এই যে একটা চিঠিও দিয়েছে—'

এক টুকরো কাগজ বার করে শ্যামার সামনে ফেলে দেয় অভয়পদ। শ্যামা সাগ্রহে তুলে নিয়ে পড়ে, কান্তিরই গোটা গোটা গোল গোল হরফ, 'প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং (শ্যামাই এসব শিখিয়েছে ছেলেমেয়েদের) মা, আমি নিরাপদে পৌঁছিয়াছি। ভাল আছি। আপনি ভাবিবেন না। সকলকে আমার প্রণাম জানাইবেন, আপনিও জানিবেন। ইতি—সেবক কান্তি।'

কিন্তু চিঠিটা ভাল করে শ্যামাকে পড়বারও অবকাশ দেয় না অভয়পদ। অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসে, 'আমি এসেছি অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করতে। বাড়ি কিনবেন ?'

চমকে কেঁপে ওঠে শ্যামা। হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়ে যায়। কান্তি কি লিখেছে তা সবটা পড়াও হয় না বোধ হয়।

সে কি ভুল শুনছে ?

না কি অভয়পদ ঠাট্টা করছে তাকে ?

এত ধৃষ্টতা হবে তার ! সে তো সে রকম ছেলে নয়। অথচ আর কীই বা হতে পারে—মর্মান্তিক পরিহাস ছাড়া ?

অতি কষ্টে, অনেকক্ষণ পরে সে উচ্চারণ করে, 'কী বললে ? কী কিনব ?'

'বাড়ি। আমি বাড়ির কথা বলছি। এই কাছেই—আতুলে একখানা পাকা বাড়ি খুব সুবিধেয় বিক্রি হচ্ছে। লোকটা দায়ে ঠেকেছে তাই অত সস্তায় বেচতে চাইছে। প্রায় তিন বিঘে জমি, তার মধ্যে বারো কাঠা আন্দাজ জলকর—পুকুরটাও বেশী দিনের কাটানো নয়—পাকা বাড়ি। একটা ঘর দালান আগাগোড়াই পাকা, আর একটা ঘরের ভিত পর্যন্ত করা আছে। বৈঠকখানা ঘরটা সব পাকা নয়—পাকা দেওয়াল খড়ের চাল। মেটে রান্নাঘরও একখানা আছে এ ছাড়া।…যাই হোক, আপনাদের ভাল রকমই সম্পত্তি হবে !'

'কত দাম ?' অসম্ভব জেনেও প্রশ্নটা বেরিয়ে যায় শ্যামার মুখ দিয়ে।

'দেড় হাজার টাকা চাইছে—যে রকম গরজ, বোধ হয় বার-তের শতেও রাজী হয়ে যাবে !'

'কিন্তু তা হলে আমাকে আর ওকথা বলতে এসেছ কেন বাবা? এ কি
াট্টা করছ? আমার অবস্থা জান না?' তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে শ্যামার কণ্ঠস্বর।
ামাইকে সমীহ করে কথা বলা উচিত—এটাও তার মনে পড়ে না।

কিন্তু এ ভর্ৎসনাতে অভয়পদর মুখের একটি রেখাও পরিবর্তিত হল না।
তমনি শান্ত ভাবে কিছুক্ষণ মৌন থেকে সে ধীরে ধীরে বললে, 'আমি জানি
ামান্য কিছু টাকা আপনার হাতে জমেছে। ঠিক কত জমেছে বলুন তো?'

শ্যামা এতখানি নিশ্চিত অনুমানের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সে
অস্বীকারও করবার চেষ্টা করলে না। এটুকু সে বুঝেছে যে আজ সারা
পৃথিবীতে এই জামাইটির মত হিতাকাঙ্ক্ষী তার কেউ নেই। সেও কিছুক্ষণ
চুপ করে থেকে বললে, 'ছ শ কুড়ি টাকা। তোমার কাছে মিছে বলব না—
ডুমের শিশিবোতল বেচা টাকা—এই জন্যেই জমিয়েছিলুম—হাজার দুঃখেও
াত দিই নি। কিন্তু সে তো অর্ধেকেরও কম বাবা!'

অভয়পদ একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে ছাতাটি তুলতে তুলতে বললে, 'তা হলে
ামনের রবিবার বাড়িখানা দেখে আসবেন চলুন। যদি পছন্দ হয় তো বাকী
াকার জন্যে আটকাবে না। ও টাকাটা অম্বিকের কাছ থেকে চেয়ে আমিই
ার দিতে পারব!'

শ্যামা কি জেগে আছে, না স্বপ্ন দেখছে? কানে শুনেও যে বিশ্বাস হয়
া। দু কানের মধ্যে যেন কত কী কোলাহল! এ কি ওর রক্তস্রোতেরই
গুঞ্জন?

তবু ক্ষীণ কণ্ঠে এক বার বলে, 'তার পর? এখানকার নিত্যসেবা ছাড়লে
াব কি? ইট কামড়ে তো পেট ভরবে না। আরও দু-এক ঘর যজমান
থানে আছে—'

'বাড়ি কেনামাত্র যে এখনই এসব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেতে হচ্ছে তার মানে
ক? তা ছাড়া ও সম্পত্তিটারও আয় আছে। উনিশটা নারকোল গাছ,
াটা কুড়ি সুপুরি গাছ আছে। পুকুরে মাছের ডিম ফোটালেও মন্দ আয়
বে না। সে তখন পরে দেখা যাবে।'

অভয়পদ ছাতিটি বগলে চেপে চলে গেল। বোধ করি এই-ই প্রথম—ওকে
কিছু জলখাবার দেবার কথা শ্যামার মনে পড়ল না।

উনিশটা নারকেল গাছ!

এখানে একটা নারকেল পড়লে সরকারদের সঙ্গে কী নিদারুণ টানাটানি,

প্রতিযোগিতা! কত কৌশলে সেটি চুরি করে আনতে হয়। তিনটি কিংবা দুটি পয়সা মিলবে বিক্রি করে, তারই জন্যে [illegible] প্রাণপণ।···

অত কষ্টের অর্জিত পয়সা থেকে যেন মরীয়া হয়েই একটা বার করে দেয় শ্যামা—এক পয়সার বাতাসা আনায়।

খাড়া খাড়া হরির লুট দেবে সে।

খবরটা—প্রস্তাবটা আসার জন্যই। জামাই অতগুলো টাকা ধার দিতে চেয়েছে যখন—এখানে না হোক্, অন্য কোথাও হবেই।

এতখানি সৌভাগ্য—তার কি হবে সত্যি-সত্যিই? মনে করতেও ভয় করে। তার যা কপাল!

আশা ও আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে সারারাত জেগে বসে কাটিয়ে দেয় শ্যামা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

রবিবার যখন সত্যি-সত্যিই জামাইয়ের সঙ্গে বাড়ি দেখতে গেল শ্যামা, তখন তার নিজেরই অবাক লাগছিল। এই আশাতীত কল্পনাতীত ঘটনা যে তার জীবনে সত্যিই ঘটবে—এ কে ভেবেছিল! একটা আশা যে কোথাও ছিল না তা নয়—কিন্তু সে সুদূর, সে আশাকে নিজের মনেও স্বীকার করতে ভয় করত, লজ্জাবোধ হত। এ দিন যে তার এত তাড়াতাড়ি আসবে তা সে কখনও স্বপ্ন পর্যন্ত দেখে নি বোধ হয়! যখন রওনা দিচ্ছে তখনও পর্যন্ত ব্যাপারটাকে তাই অবাস্তব—দিবাস্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে, এমন কি এমনও এক-আধ বার মনে হচ্ছে যে জামাই তাকে নিয়ে একটা তামাশা করছে না তো?

তার পর এক সময় আঁদুল রাজবাড়ির পাশ দিয়ে বাজার পেরিয়ে মা সিদ্ধেশ্বরীকে ডাইনে রেখে যখন সে সত্যিই সহদেব দাসের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তখন তার দুই চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। বাড়িটার দিকে ভাল করে তাকাতে শুধু যে সাহস হচ্ছে না তাই নয়—শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে।

কত দিনের কত লাঞ্ছনা, কত হতাশ্বাস, কত দুর্ভাগ্য মনে ও মাথায় ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকালব্যাপী পর পর আশাভঙ্গের ইতিহাস ও বেদনা। বিশেষ করে গত এই দুটো বছরের শ্বাসরোধকারী দুর্ভাগ্যের মিছিল। চারিদিক থেকে চেপে ধরেছে তাকে—একটার পর একটা।

এর মধ্যে বাড়ি! তার নিজস্ব বাড়ি! পরের অনুগ্রহ ও আশ্রয়ের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না আর!

কিন্তু বাড়ি তো তাদের ছিল। পাকা বাড়ি! বাগান, জমি, পুকুর সব দেখেই তো তার মা তাকে দিয়েছিলেন। ভোজবাজির মত চকিতে সব উড়ে চলে গেল কোথায়, নিঃশ্বাস ফেলতেও তর্ সইল না যেন। আবারও যদি তেমনি যায়!

বাড়িটা ভাল করে দেখবার আগেই প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'আবার যদি সব বেচে খায় ঐ হতভাগাটা?—'

'হতভাগা—?' ঈষৎ বিমূঢ় ভাবেই তাকায় অভয়পদ, তার পরই তার

ভাবলেশহীন প্রশান্ত মুখে প্রচ্ছন্ন একটু কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে, 'ও আপনি ওঁর কথা—মানে বাবার কথা বলছেন ? না তা পারবে কেন ? বাড়ি তো আপনার নামে কেনা হবে !'

শ্যামাকে অনায়াসে 'মা' বলে ডাকলেও নরেনকে 'বাবা' বলতে আজও সংকোচ বোধ হয় অভয়পদর—তা শ্যামা এই বিহ্বলতার মধ্যেও লক্ষ্য করে।

শ্যামা বলে, 'আমার নামে ? বাড়ি আমার নামে কেনা হবে ? মেয়েছেলের নামে বাড়ি কেনা যায় ?·· নয় তো না হয় হেমের নামেও কিনলে হয়, ও তো এখন সাবালক !'

'না না', দৃঢ় কণ্ঠে আপত্তি জানায় অভয়, 'বাড়ি আপনার নামেই কিনুন। ছেলের নামে কেনার অনেক ঝুঁকি। বিয়ের পর ছেলে কেমন দাঁড়াবে কে বলতে পারে ?··· মন না মতি !··· তখন যদি অন্য ভাইদের ফাঁকি দেয় ? যদি ধরুন আপনাকেই তাড়িয়ে দেয় ?··· আপনার নামে বাড়ি থাকলে ছেলেরা চিরদিন আপনার দাপে থাকবে !'

'তা হলে আমার নামেই কেনা হবে বলছ ? অবশ্য যদি কেনা হয় শেষ অবধি !'

কেমন একটা ছেলেমানুষের মতই উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করে শ্যামা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন আপনি বাড়িটা দেখুন ভাল করে।'

অভয় যেন মৃদু ধমক দেয় একটা।

শ্যামা আঁচল দিয়ে চোখ রগড়ে দৃষ্টিটাকে পরিষ্কার করে নেয়।

তা বাড়িটা অবশ্য ভালই। অভয়পদ যা বর্ণনা দিয়েছিল, তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়, বরং আরও বেশী ভাল। ঘরটা বেশ বড়, সরকারদের যে ঘরে তারা কোনমতে মাথা গুঁজে থাকে—তার চেয়েও বড়। তার সঙ্গে ঘেরা দরদালান, সেও তো আর একখানা ঘরই। ওপাশে এই ঘর আর দালানের মাপেই 'আদ্‌রা' করা রয়েছে, ঘর তুলতে বেশী সময় লাগবে না। বৈঠকখানা ঘরটায় গোলপাতার ছাউনি বটে—কিন্তু শোবার ঘরের চেয়েও বড়। তার সামনে আবার বাঁধানো রোয়াক। শুধু এই ঘরখানা পেলেও সে বর্তে যেত।

বাড়ি, বাগান, পুকুর সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে শ্যামা। নারকেল সুপারি গাছ একটি একটি করে গুনে নেয়। তিন ঝাড় কলা আছে। সহদেবের বৌ বললে, সব ভাল কালী-বৌ কলার জাত। সজনে গাছ, ডুমুর গাছ তো অগুন্তি। চালতা গাছেরও একটি চারা উঠেছে। তিনটে আম, একটা

কাঁঠাল। আম সবই দেশী—কিন্তু একটায় নাকি খুব মিষ্টি ফল হয়। এ ছাড়া পুকুর পাড়ে একটা আমড়া গাছ আছে—সহদেবের বৌ বললে, 'আম ফেলে আমড়া খেতে হবে মাঠাকরুন, যেমন সোয়াদ, তেমনি সৌগন্ধ।…কী বলব সব শখ করে গাছপালা আর্জানো মা, নিজে এক কোশ পথ হেঁটে বোনের বাড়ি থেকে ঐ আমড়ার চারা এনেছিলুম। এ কী বেচবার জিনিস? কী বলব, মিন্‌সের পোড়া কপাল ভাই—আর আমারও!'

ডাব পাড়ানোই ছিল, সহদেবের স্ত্রী দু জনকে দুটো কেটে দিলে। অন্তত আড়াই ঘটি করে জল এক-একটার। দুর্বার লোভে শ্যামার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল, আগ্রহে আশঙ্কায় অধীরতায় মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাড়ার দু-চার জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে, মা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে বুক চিরে রক্ত দেবার মানসিক করে যখন আবার পদ্মগ্রামের পথ ধরলে শ্যামা, তখন তার আর, 'কেনা হবে কিনা শেষ পর্যন্ত, টাকাপয়সার ব্যবস্থা হবে কিনা',—এ প্রশ্ন করবার সাহস নেই। হবে না—সে তো জানা কথাই, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মনের গোপন কোণে এই ক্ষীণ আশাটুকু থাকে, থাক না। মিছিমিছি এই সংশয়ের সুখটুকু নষ্ট করেই বা লাভ কি?

অবশেষে কতক্ষণ রুদ্ধ-নিঃশ্বাস প্রতীক্ষার পর অভয়পদই প্রশ্ন করলে, 'বাড়ি আপনার পছন্দ হল তা হলে?'

'এ কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করছ বাবা? ঘুঁটেকুড়ুনীর রাজপ্রাসাদ ভাল লাগবে না—এ কি হতে পারে। যে অবস্থায় আছি, তার হক্কে এ তো ইন্দ্রভুবন!'

'আশপাশে সব কী বললে?'

'ঐ যে যাকে বললে অর্জুনের বৌ—ঠিক পাশেই যে, সে বলছিল যে জমির কী সব নাকি গোলমাল আছে। পুকুরে নাকি ওদের অংশ আছে একটা? এ নিয়ে নাকি মামলা-মকদ্দমাও হতে পারে?'

'হুঁ। ওরা তো ভাংচি দেবেই। ওরা আট শ টাকা দাম দিয়ে বসে আছে যে। আর কে কি বললে?'

'নিবারণ দাস বলছিল যে বাড়ির ভিত তেমন ভাল নয়—তা ছাড়া ও ভিটেয় নাকি কী সব দোষ আছে, কারুরই সয় না।'

'নিবারণ দাসের কাছেই বাড়িটা বন্ধক আছে যে। চার শ টাকা ধার

দিয়েছে—সুদে আসলে মোটা হলে এক দিন ঐ টাকাতেই বাড়িটা নিতে পারবে, এই ওর মতলব !'

'কী জানি বাবা। ও সব তুমি আমার চেয়ে ভাল বুঝবে। ও নিয়ে আমি মাথা ঘামিয়ে কী করব ?···আসল কথা এখন—'

এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় শ্যামা। আসল কথাটা যেন মুখে উচ্চারণ করতেও বেধে গেল। সশঙ্কিত আগ্রহে উৎসুক হয়ে জামাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু।

কিন্তু অভয়পদর নির্বিকার মুখে কোন উত্তরই ফোটে না। সে যেমন উদাসীন নিস্পৃহতার সঙ্গে হাঁটছিল, তেমনিই হাঁটতে থাকে।

শ্যামাকেও অগত্যা নিঃশব্দে পথ চলতে হয়। কিন্তু আশা ও আশঙ্কার এই দ্বন্দ্ব যেন আর সয় না। পথ চলার পরিশ্রম তার কাছে নতুন নয়—কিন্তু এখন যেন পা দুটো ক্রমশ পাথর হয়ে আসে, বার বার শাড়ির আঁচলে কপাল মোছে কিন্তু পরক্ষণেই অজস্র ধারে ঘাম গড়িয়ে দুই চোখ ঝাপসা করে দেয়।

অবশেষে পথের ধারের একটা গাছতলায় গিয়ে সে বসেই পড়ে।

'আমি—আমি একটু বসি বাবা। বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আমি আর চলতে পারছি না।'

বিনা বাক্যে অভয়পদও একটু দূরে আর একটি গাছতলায় নিজের বিবর্ণ ছাতাটি পেতে বসে। না জানায় শাশুড়ীর এই অবস্থার জন্য কোন উদ্বেগ, না করে কোন প্রশ্ন। এমন কি অযথা দেরি হওয়ার জন্য এতটুকু অসহিষ্ণুতাও প্রকাশ করে না। শুধু চাদরের খুঁটে নিজের মুখটা মুছে নেয় এক বার।

অবশেষে আর থাকতে না পেরে, এক রকম মরীয়া হয়েই প্রশ্ন করে শ্যামা, 'তা হলে কি হবে বাবা এখন ?'

'কিসের কী হবে ?' অভয়পদ নিরুৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় শ্যামার, জামাইয়ের এই নিরাসক্তিতে। কোনমতে মনের ভাব দমন করে বলে, 'ঐ—মানে বাড়িটার ? গাছে তুলে দিয়ে এখন মই কেড়ে নেবে তো ?'

অভয়ের মুখে এবার কোন প্রায়-অদৃশ্য হাস্যরেখাও ফোটে না। সে তেমনি অনাসক্ত কণ্ঠে বললে, 'এখনও তো ঠিক বলা যাচ্ছে না, বায়না করে একটা সার্চ করাতে হবে। উকিলকে দেখাতে হবে কাগজগুলো, যদি কোন গোলমাল সত্যিই থাকে তো নেওয়া চলবে না !'

'কিন্তু যদি গোলমাল না থাকে—'

অদ্ভুত একটা আর্তনাদ কি ফোটে শ্যামার কণ্ঠে ?

হে মা সিদ্ধেশ্বরী, স্থানে থেকে কানে শুনো মা !

'তা হলে আর কি !'

'টাকা !' দাঁতে ঠোঁট চেপে অসহ একটা উষ্মা দমন করে শ্যামা।

'সে হয়ে যাবে। পরশু ভাল দিন আছে আপনি একষট্টিটা টাকা ঠিক করে রাখবেন। একান্ন টাকা বায়না—আর উকিলকে আপাতত দশটা টাকা দিয়ে রাখতে হবে। আরও লাগবে অবিশ্যি—যদি বাড়ি কেনাই সাব্যস্ত হয়।'

আরও কী বলতে থাকে অভয় কিন্তু শ্যামার কানে এক বর্ণও যায় না তার। যেন সহস্র মন্দিরা তার কানের কাছে ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে, সমস্ত তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অযুত খঞ্জনীর ঝঙ্কার ওঠে—কিছু কানে পৌঁছয় না—চোখ আসে ঝাপসা হয়ে।

হে ঠাকুর, হে মা সিদ্ধেশ্বরী, অবশেষে কি মুখ তুলে চাইলে মা ?

সে গাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে অবসন্নভাবে চোখ বোজে।

তার পর অনেকক্ষণ পরে যেন বহুদূর থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠ ক্ষীণ অস্পষ্ট ভাবে কানে এসে পৌঁছয়, 'এবার তা হলে উঠুন মা, অনেক দূর যেতে হবে।'

চোখ খুলে একেবারে উঠে দাঁড়ায় শ্যামা।

'হাঁ বাবা, চল যাচ্ছি।'

পা দুটোয় আর কিছু মাত্র ভারবোধ হচ্ছে না—আশ্চর্যরকম ভাবে হাল্‌কা হয়ে গেছে।

॥ ২ ॥

উঠোনে পা দেবার অনেক আগে থেকেই দাপাদাপি ও চেঁচামেচির শব্দ কানে আসে। কে করছে তা আর বলে দিতে হয় না কাউকেই—আর কি জন্য, সে প্রশ্ন তো নিরর্থক।

নরেন এসেছে।

বাড়িতে ঢুকে দেখা গেল সারা উঠোনটায় যেন নেচে বেড়াচ্ছে সে।

ঐন্দ্রিলা এখানে নেই—দিনকতকের জন্যে মাসীর বাড়ি গেছে। তরু একা।

সে ছোট ভাইটাকে নিয়ে ভয়ে ঘরের দোর দিয়ে বসে আছে, পিঁটকীর ছেলেমেয়েগুলো আর মঙ্গলা ঠাকরুনের নিজের ছোট ছেলেমেয়েরা ওপাশের দরজায় ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। কারুর চোখে কিছু ভয়, কারুর চোখে শুধুই কৌতুক।

'শেষ করে দেব, বুঝলি? গোর-বেটার জাতকে এক কোপে শেষ করে দেব আজ। ঝাড়ে-বংশে শেষ। কাউকে রাখব না। ছেরাদ্দ মাখতে একটাকেও আস্ত রাখব না।'

এ সবই অতি পুরাতন, তবু যেন জামাইয়ের সামনে অপমানে মাথা কাটা যায়! তারই মধ্যে মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় সে, তরুর বুদ্ধির জন্য। কে জানে, ঘরে ঢুকে নিরিবিলি থাকতে পারলে শেষ পর্যন্ত সেই জমানো-টাকাটার সন্ধান পেত কি না!

আর তা হলে—বাপ রে!—ভাবলেও সমস্ত শরীর হিম হয়ে যায়। অতি কষ্টে যখন সে আশা করতে শুরু করেছে সবে—দুরাশা হলেও—সেই সুবৃহৎ দুরাশার মূলে এমনভাবে ঘা পড়লে হয় সে পাগল হয়ে যেত, নয়তো তাকে আত্মহত্যা করতে হত।

'কী হয়েছে কি? ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?' দ্রুত বাড়ির মধ্যে ঢুকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই প্রশ্ন করে সে।

'এই যে মহারাণী সয়ার করে এলেন! বল্ মাগী আমার ছেলেকে কেন সেই বেশ্যে মাগীটার কাছে পাঠিয়েছিস! কেন, কেন পাঠিয়েছিস বল্ আগে!..কত বড় বংশের ছেলে সে তা তুই কি জানবি? ওর ঠাকুরদা শুদ্দুরের বাড়ি পা ধুতো না—আর তাকে তুই পাঠিয়েছিস খানকী বাড়ির ভাত খেতে!'

'তার ঠাকুরদা তো শুদ্দুর বাড়ি পা ধুতো না—কিন্তু তার সেই ঠাকুরদার ছেলে কি? বংশের পরিচয় দিতে লজ্জা করে না!'

'চোপরাও মাগী! আমি কি সে আমি বুঝব। তুই এখন বার কর ছেলেকে যেখান থেকে পাস্। নেকালো—আভি নেকালো হামারা লেড়কাকো!'

আরও এক পাক্ যেন নেচে নেয় সে।

'চুপ কর বলছি! ছেলে! ছেলের কথা মুখে আনতে লজ্জা করে না! ছেলেকে খাওয়াবার বেলা আমি, লেখাপড়া শেখাবার বেলা আমি—আর কত্তাত্তি করার বেলায় উনি!'

'ফের মাগী মুখ নাড়ছিস!···মুখ ভেঙে দেব তা জান না! ডাণ্ডা মারব মাথায়—তবে তুমি জব্দ হবে। বল্ তুই কেন আমার ছেলেকে পাঠিয়েছিস সেখানে, কী এক্তিয়ারে পাঠিয়েছিস তুই? জানিস আমি তার গার্জেন, পুলিস কেস করতে পারি তা জানিস? তোকে স্বুদ্ধ পুলিপোলাও খাওয়াতে পারি?'

'জানি। খুব জানি। আর মুখ নাড়তে হবে না। তোমার মুরোদ আমার আর জানতে বাকি নেই। পুলিসের ত্রিসীমানায় যাবার সাহস আছে তোমার? যাও না দেখি—কত মুরোদ!'

'বটে! আচ্ছা। মরবার পালক গজিয়েছে—বুঝেছি। পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে!···অনেকদিন গোবেড়েন খাও নি বটে।·· সপুরী এক গাড় করব আজ—সব কটাকে কেটে দুখানা করে ফেলব—তবে আমি ফলনা বাঁড়ুয্যের ছেলে। গোরবেটার জাতকে এক কোপে কেটে বাড়িতে আগুন-লাগিয়ে তবে আমার আর কাজ!'

এত ক্ষণ বোধ করি সে অভয়পদকে দেখতে পায় নি। সব ঝালটাই তাই পড়ছিল শ্যামার ওপর।

হঠাৎ এই বার জামাইয়ের কাছে এসে হাত পা নেড়ে বলে ওঠে, 'এই যে কম্মকত্তা খোদও আছেন সঙ্গে। বলি নিজেদের বংশের কেলেঙ্কার নিয়ে সব বংশ না জজালে বুঝি চলছিল না বাবাজী? তোমাদের ও আদিখ্যেতা তোমাদেরই থাক—এখন আমার ছেলেকে এনে দাও। ওকে প্রাচিত্তির করিয়ে ঘরে তুলতে হবে। তোমাদের চামে-কাটা বংশের ওতে লজ্জা-ঘেন্না হয় না—কিন্তু আমাদের বংশে কেউ কখনও ও কাজ করে নি—বুঝলে। ভিক্ষের ভাত খেয়েছি—তাই বলে বেশ্যের ভাত! চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হয় ওতে—'

অভয়পদ নির্বিকার। কিন্তু শ্যামা এই বার ক্ষেপে উঠল একেবারে। সামনে এসে দাঁতে দাঁত চেপে বীভৎস একটা ভঙ্গী করে বললে, 'বলি থামবে—না জ্যান্ত মুখে নুড়ো জেলে দেব!·· এর চেয়ে বিধবা হলেও আমার ঢের ভাল ছিল যে!··ফের যদি একটা কথা কও, তুমি তো ঐ আঁশ বঁটি দিয়ে কেটে তোমাকে দুখানা করে ফেলব বলে দিচ্ছি। তাতে আমার ফাঁসি হয় সেও ভাল। তবু ধরার ভার হরণ করে তো যেতে পারব!'

এই ধমকেই যেন কাজ হয় খানিকটা। নরেনের দাপাদাপি অনেকটা কমে আসে। সে যেন একটু ভয়ে-ভয়েই দু পা পেছিয়ে গিয়ে বলে, 'হুঁ—খুব

যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে। বিধবা হলে খুব চার হাতে খাবে—নয়? খাওয়াচ্ছি তোমায়! বেশ আমি চললুম সেইখানেই—দেখি কে ঠেকায়। নিজেই নিজের ছেলেকে নিয়ে আসব—তার জন্যে থানাপুলিস করতে হয় সেও ভাল!'

হঠাৎ যেন দুষ্ট সরস্বতী ভর করে শ্যামার রসনায়। কী বলছে তা বোঝবার আগেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'বেশ তো যাও না! তার কাছ থেকে ঠকিয়ে টাকা এনেছ মনে নেই? সেও দারোয়ানদের বলে রেখেছে—দেখলে সে-ই তোমাকে পুলিসে দেবে!'

অকস্মাৎ জোঁকের মুখে নুন পড়ল। নরেন সত্যি সত্যিই কী একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। আম্‌তা আম্‌তা করে কেমন একরকম আলগা ভাবে বললে, 'কে, কে বলেছে এ কথা, সেই মাগী বলেছে?··· তার চোদ্দ পুরুষের পুণ্যি যে বামুনে তার টাকা ছুঁয়েছে। ভারি তো কটা টাকা—তার জন্যে—হুঁ!'

তার পরই, সম্ভবত এতক্ষণের দাপাদাপির ফলস্বরূপই, অবসন্ন ভাবে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে পড়ে বলে, 'দে, একটু তামাক দে দিকি!'

কথাটা যখন বলে ফেলেছিল শ্যামা, তখন সে সুদূর কল্পনাতেও এ কথা ভাবে নি যে নরেন কোনদিন সত্যি-সত্যিই মেয়ের ননদের বাড়ি গিয়ে—বিশেষত সমাজের বাইরে অপাংক্তেয় সেই মেয়েটার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসতে পারে। ঠিকানাই তো জানার কথা নয় তার। কিন্তু আন্দাজী ঢিল এই ভাবে অব্যর্থ লক্ষ্যে পৌঁছতে অপমানে ও ক্ষোভে যেন দিশাহারা হয়ে গেল সে।···এমন কি অভয়ের সেই পাথরের মত মুখেও একটু বিস্ময় ও উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠল।

শ্যামা দ্রুত একেবারে নরেনের মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'বেরোও, বেরোও বলছি, এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। নইলে সত্যি-সত্যিই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করব বলে দিলুম।··· আমার মুখখানা আর কোথাও পোড়াতে বাকি রাখলে না, সেখানে পর্যন্ত!··· তাই তোমার বংশের আর বামনাইয়ের এত ভড়ং, তাই এত চেঁচামেচি দাপাদাপি! ওকে তামাক দেবে—! ঐ তামাকের আগুন মুখে গুঁজে দেব। কৈ, উঠলে? বেরোও বলছি, এই দণ্ডে এখান থেকে চলে না গেলে আমি অনর্থ করব।'

নরেন এক বার ভয়ে ভয়ে শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। কী দেখলে সেখানে কে জানে—কিন্তু তার পর একটা কথাও কইতে সাহস করলে না—এতটুকু স্পর্ধার স্বর আর তার কণ্ঠে ফুটল না। কেমন যেন হতচকিত বিহ্বল ভাবেই আস্তে আস্তে উঠে পা-পা করে বেরিয়ে গেল সে। গামছায় পুঁটুলি বেঁধে কোথা থেকে কী এনে দাওয়ারই এক কোণে রেখেছিল—যাবার সময় সেটার কথাও তার মনে রইল না।

উঠোন পেরিয়ে বাগানে পড়ে—সেই প্রায়ান্ধকার অপরাহ্ণের আলোতে এক সময় দৃষ্টিসীমারও বাইরে চলে গেল সে।

এই প্রথম নরেনের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটল তার বহুদিনের উৎপীড়িত অত্যাচারিত স্ত্রীর কাছে।···

মঙ্গলা ঠাকরুন ছেলেমেয়েগুলোকে সরিয়ে এবার সামনে এলেন, 'সত্যি সত্যিই এই অবেলায় ভাতারটাকে তাড়িয়ে দিলি বামনী! হাজার হোক বামুনের ছেলে, সোয়ামী!'

কথাটা বোধ হয় শ্যামারও মনের কোণে ইতিমধ্যেই কোথায় খচ্ খচ্ করতে শুরু করেছিল, সে নিজের কপালে জোরে জোরে দুটো ঘা মেরে কান্নায় ভেঙে পড়ল একেবারে, 'আর যে আমার সহ্য হয় না মা, আর কত সহ্য করি! আমার যে মরণও হয় না। যমে নিলেও যে রেহাই পেতুম! আমাকে বিষ এনে দাও মা এক ডেলা, তাই খেয়ে ছুটি নিই!'

মঙ্গলা তাকে আর কোন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে তরুকে ডেকে বললেন, 'ওলো তরী দোর খোল্ না, জামাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই থেকে—দেখতে পাচ্ছিস না?···এসো বাবা এসো—এ কেলেঙ্কার তো নিত্য এদের। তুমি ঘরে এসে বসো, ঠাণ্ডা হও। একটু জল-টল খাও।'

॥ ৩ ॥

নরেনকে তাড়িয়ে দিলেও তার কথাগুলোকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না শ্যামা। কানের মধ্যে কেবলই যেন ঘুরে ফিরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। ক্রমশ তিরস্কারের মতই শোনায় সে প্রতিধ্বনিগুলো। এর মধ্যে মঙ্গলারাও রসান দেন। ব্যাপারটা থিতিয়ে গেলে অর্থাৎ অভয়পদ জলযোগের

পর বিদায় নিলে আবার এসে জাঁকিয়ে বসল মা ও মেয়ে। দুটো একটা একথা সেকথার পর পানের পিচ ফেলে আর একটু চুন এবং দোক্তা সেই অন্ধকার মুখবিবরে ফেলে দিয়ে বলেন, 'তা যাই বলিস বাছা বামনী, লোকটা পাগলই হোক আর ছাগলই হোক—কথাগুলো যে খুব অনেয্য বলেছে, তা বলে নি। হাজার হোক পুরুত-বামুনের ছেলে, গুরুবংশ—তাকে কি উচিত ঐ সব জায়গায় পাঠানো? যা শুনলুম বাপ্ রে—গা শিউরে ওঠে। তোর কিন্তু খুব সাহস বাপু—যাই বলিস। না খেতে পেয়ে মরে গেলেও আর কেউ পারত না—'

পিঁটুকী হি হি করে খানিকটা হেসে নিয়ে বলে, 'আর কী চাপা বামুনদি, বলে কিনা আমার মেয়ের ননদের বাড়ি পাঠিয়েছি! হি হি, খুব বুদ্ধি বাপু—বলতেই হবে!'

লজ্জায় মাথা কাটা যায় শ্যামার। একটু আশঙ্কাও হয়। কে জানে এ কিসের ভূমিকা! মা-মেয়েতে দল বেঁধে এল কেন? কী বলতে চায়?

আর এক বার পিচ্ ফেলে বলেন মঙ্গলা, 'না—সে না হয় হল। ননদের কথাটা সত্যিও হতে পারে। বামুন-কায়েতের ঘরের মেয়েরা কি আর বেরিয়ে যায় না, এমন তো আকছার।· তবে সম্পক্ক যাই হোক—এক বার যে নষ্ট হয়েছে—তার সঙ্গে আর সম্পক্কই বা কি, আর তার জাতই বা কি!··· না বাপু, কাজটা ভাল করিস নি বামনী। যা হয় দু মুঠো তো তোদের জুটছিল।···মিছিমিছি নষ্ট মেয়েমানুষের অন্নদাস করে দেওয়া—কথায় বলে অন্নপাপ মহাপাপ!'

'না না মা—সে তো বামুনের রান্না ভাতই খায়। বামুনে রাঁধে যে!'

'ওলো তা জানি। পরকে যে বসিয়ে খাওয়াতে পারে—এত পয়সা—সে কি আর নিজে রান্না করবে? তা নয়। তাকে অন্নপাপ বলে না। পাপের অন্ন তো খাচ্ছে!···আগেকার দিন হলে তোদের একঘরে করত, কেউ কি আর তোদের দিয়ে পূজো-আচ্চা করাত? এখন সে সব আর নেই—সমাজও নেই, শাসনও নেই - তাই!'

কথাটা সেইখানেই চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু কথাটা কোন্‌দিকে যাচ্ছে বুঝে শ্যামার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিল সে। একে তো হেমের চাকরি নেই—তার ওপর যদি এই নিত্যসেবার বাঁধা বরাদ্দটুকুও ঘুচে যায়, তা হলে তো শুকিয়ে মরতে হবে! ··এই যে এখন—মনে মনে সেই কথাটাই খচখচ করছে সেই থেকে—বাড়ি

কেনা হলেও সেখানে গিয়ে হয়তো বাস করতে পারবে না, সে তো এই নিত্য-সেবাটুকুর জন্তেই। এ ছাড়াও এখানে যা দু-চার ঘর যজমান আছে, সরকাররা ছাড়িয়ে দিয়েছে শুনলে তারাও হেমকে দিয়ে পূজো করাবে কি না সন্দেহ। এক কথায় দাঁড়িয়ে সর্বনাশ! নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়া মানে নতুন গাঁ--নতুন পাড়া। যজমানি জুটবে কি না—জুটলেও কতদিনে জুটবে তার ঠিক কি? সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের ভরসায় নিশ্চিতকে ছাড়া--না, সে সম্ভব নয়। হেমের যদি একটা দশ-বারো টাকার চাকরিও জুটত তা হলেও সে এক বার দেখত ভরসা করে বেয়েছেয়ে! নতুন বাড়ির উনিশটা নারকেল গাছে আর কুড়িটা সুপুরী গাছ থেকে বাকিটা চলত।

সারা রাত ঘুমোতে পারে না শ্যামা। এক দিকে জীবনের সুদুর্লভ আশা পূরণের সম্ভাবনা মাত্র দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই অপর দিকে এ কী দুর্দৈব! একেবারে ভাত-ভিক্ষেয় টান।···বাড়ির আয়-পয়ও তো খুব দেখা যাচ্ছে! কেনবার প্রস্তাবেই এই, কিনলে না জানি কী হবে!···

পরের দিন ভোরবেলাই হেমকে দিয়ে খবর পাঠালে শ্যামা, জামাই যেন ছুটির পর যত রাতই হোক এক বার আসেন। হেম পৌঁছতে পৌঁছতে অবশ্য অভয় বেরিয়ে গিয়েছিল, মহাশ্বেতার কাছে বলে এল সে।

মহাশ্বেতা চোখ দুটোকে যত দূর সম্ভব বিস্ফারিত করে, চুপিচুপি বলবার প্রাণপণ চেষ্টায় প্রায় সবাইকে শুনিয়েই ফিস্‌ফিস্ করে ভাইকে প্রশ্ন করলে, 'ব্যাওরাটা কি বল্ দিকি? তোদের জামাই ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, আবার রবিবার নাকি মাকে সঙ্গে নে কোথায় গিছল, অচলি ঠাকুরঝির দেওর রঘু পথে দেখতে পেয়েছে। কী হচ্ছে রে?'

ছেলেমানুষের মত উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে সে।

'ব্যাওরাটা তাকেই তো জিজ্ঞেস করলে পারিস।' একটু চুপ করে থেকে সাবধানে জবাব দিলে হেম।

'তবেই হয়েছে!' ঠোঁট উল্টে বলে মহা, 'সে যা মানুষ! মানুষ কি পাথর সন্দ হয় মধ্যে মধ্যে। সাত বার হয়তো একটা কথা জিজ্ঞেস করলে তবে জবাব মেলে—তাও হাঁ হুঁ—একটা কথার জায়গায় দুটো কথা নয়।···জিজ্ঞেস তো করেছিলুম, বলে কি—জেনে কি হবে? তুমি তো কিছু কাজে আসবে না! যখন জানবার আপনিই জানতে পারবে!'

'ঠিকই বলেছে!' বলে হেম চলে এল।

মহাশ্বেতা খানিকটা গুম্ খেয়ে থেকে আপন মনেই বলে উঠল, 'মুয়ে আগুন! মুখপোড়ারা সবাই সমান!'

অভয়পদ কিন্তু রাত্রে এসে কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিলে।

শ্যামা সারাদিন ভাল করে খেতে পর্যন্ত পারে নি উদ্বেগে।

জামাই এলে তাকে ঘরে বসিয়ে, তরুকে বাইরে পাহারায় রেখে খুবই চুপিচুপি বলেছিল কথাটা—আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে। কিন্তু অভয়পদ গায়েই মাখলে না যেন। বললে, 'এই কথা! এখনও তো কিছু বলে নি, এরই মধ্যে এত ভাবছেন কেন?'

'যদি বলে?'

'বলে তো ছেলেকে আনিয়ে নেবেন—প্রাচিত্তির করিয়ে নিলেই হবে। এখনও তো পৈতে হয় নি। অত ভয় কিসের! আর আমার মনে হয় কিছু বলতে সাহস করবে না।'

'সাহস! এতে আবার সাহসের কি আছে বাছা?'

প্রিয় কথাই যে বলতে চায় না—অপ্রিয় কথা বলতে তার দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক। তাই কিছুক্ষণ মৌন হয়ে থেকে অভয় উত্তর দিলে—'সকলেরই কিছু না কিছু ঢাকবার থাকে মা! মিছিমিছি আপনার কাছে আর সে সব কেচ্ছা বলতে চাই না। তবে আমারও কিছু জানতে বাকি নেই। সরকাররা ওদিকে ঢিল মারতে এলে পাটকেল খেয়ে যাবে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

সে প্রশান্ত মুখেই উঠে দাঁড়ায় একেবারে।

'আপনার টাকাটা তা হলে দিয়ে দিন, কালই বায়নাটা করে ফেলি। এদিকে এসে আবার আঁটুল যাবার সুবিধা হবে না।'

'এই যে বাবা দিই!' শ্যামা জামাইয়ের অবিচলিত মুখের দিকে চেয়ে যেন ভরসা পায় খানিকটা।

টাকাগুলো গুনে দেখে নিয়ে পেটকাপড়ে বেঁধে বাড়ির দিকে রওনা হয় অভয়পদ। অফিস থেকে প্রায় ক্রোশখানেক হেঁটে বাড়ি ফিরেই মহার মুখে খবর পেয়ে এই ছাঁকা দু ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এখানে এসেছে। আবার সেই দু ক্রোশ রাস্তা ভেঙে বাড়ি ফিরবে এখন। বাড়ি ফিরে জলখাবার খাওয়ার অভ্যাস ওর কোনকালে নেই—সকাল করে একেবারে ভাত খেয়ে নেয়।

আজ সে অবসর হয় নি। সব জেনেও ওকে একটু জল খেয়ে যাবার কথা বলতে মনে রইল না শ্যামার। রাত্রে শুতে গিয়ে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় সেই অন্ধকারেই এতখানি জিভ কাটল সে।

॥ ৪ ॥

তা বাড়ির পয় ভালই বলতে হবে। বাড়ি কেনার সঙ্গে সঙ্গেই আরও এক দিকে সুরাহা হয়ে যায়।···

বায়না থেকে শুরু করে রেজেস্ট্রি পর্যন্ত নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে সব চুকে গেল। বায়নার পরই বাড়ি খালি করে দিয়েছিল সহদেবরা—বিক্রির দিন আদালতে চাবি দিয়ে কাগজ-কলমে দখল দিয়ে দিলে। এরা কোর্টের ফেরত গিয়ে 'বাঁশগাড়ি' করে এল সকলে মিলে, অর্থাৎ সে তালা খুলে নিজেরা ঘরে-দরজায় তালা লাগিয়ে এল।

এত দিন পর্যন্ত কথাটা সকলের কাছেই চেপে রাখা হয়েছিল কিন্তু আর রাখা গেল না। কারণ 'দাঁড়া' হরির লুট মানা ছিল। সেই হরির লুটের বাতাসা দিতে গিয়েই কথাটা জানাতে হল। ছেলের চাকরি হয় নি, সদ্য-বিধবা মেয়ে বুকের ওপর বসে—হরির লুট কিসের ?

শ্যামা মঙ্গলার হাত দুটো ধরে বললে, 'মা, তোমার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই—যা হল বলতে গেলে তোমার দয়াতেই হল।···একটা মাথা-গোঁজার জায়গা করে ফেললুম মা!'

'মাথা কি—কী বললি? ও—বাড়ি?' মঙ্গলার হাঁ-করা মুখ বুজতে বেশ একটু দেরিই হয়, 'বাড়ি কিনলি?···ও, তাই এত ঘন ঘন জামাইয়ের আসা-যাওয়া, গুজগুজ ফুসফুস? আমি ভাবি না জানি কী! তা ভালই তো! কিন্তু এর এত লুকোছাপার কী আছে?'

'না মা। লুকোছাপা নয়।' ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবেই বলে শ্যামা, 'এ তো আমার আশার অতীত, হবার কথাও নয়। তাই না আঁচালে বিশ্বাস করি কী করে বল। নিহাত জামাই দয়া করলেন বলেই তাই, মোটা টাকাটা অভয়পদই ধার দিলেন তো!'

'বুঝেছি বুঝেছি।' অপ্রসন্ন মুখে উত্তর দেন মঙ্গলা, 'আমার কাছে অত শাক দিয়ে মাছ না ঢাকলেও চলবে। জামাই তোমার ভারি তালেবর রহমান

কিনা। মোটা টাকা ধার দিলেন!…এ বাড়ির আনাজ ফল যে কোথায় যায় তা আমরা কি আর জানি না! কাজেই টাকা কোথা থেকে এল তা আমাকে বিস্তার করে না বললেও চলবে!'

পিঁটকী কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, 'ধন্যি চাপা মেয়েমানুষ বটে তুমি বামুনদি! বাব্‌বা তোমার পেটে পেটে এত! …কেন, আগে বললে কি আমরা টাকাটা কেড়ে নিতুম—না ভাংচি দিতুম?'

এক রকম মাথা হেঁট করেই নিজের ঘরে ফিরে আসে শ্যামা। অভয় এ ঘর থেকে সবই শুনেছিল, সুতরাং সে সব কথার পুনরুক্তি না করে ম্লান একটু হেসে বললে, 'শুনলে তো বাবা!'

'ও তো একটু হবেই মা। এত কাল যে পায়ের নীচে ছিল সে মাথা তুলতে গেলে একটু প্রাণে লাগবে বৈ কি!…ও সবে কান দেবেন না!'

নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠেই উত্তর দেয় অভয়।

'তার মানে এই শত্রুপুরীতে বাস তো!'

'দেখা যাক!' বলে উঠে দাঁড়ায় অভয়।

'তা হলে কবে গৃহপ্রবেশ করবেন? সামনে চান-পূর্ণিমের দিনটা ভাল শুনছি।'

'তাই যা হয় কর বাবা। সে তো আবার এক গাদা টাকা খরচা। একটু সিন্নিও দিতে হবে, সিদ্ধেশ্বরীর পূজো মানত আছে—'

'সে এক রকম করে যোগাড় হয়েই যাবে।' অভয় ছাতা বগলে করে উঠে দাঁড়াল।

'কিন্তু বাবা একটা কথা—', কুণ্ঠিত ভাবে বলে শ্যামা।

না ফিরেই শুধু দাঁড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে অভয়, 'কী বলুন!'

'বলছি যদি গৃহপ্রবেশ হয় তো—কান্তিকে তো আনাতে হবে, অন্তত দুটো দিনের জন্যে—আনন্দের দিনে বাছা আমার থাকবে না?'

'কেন থাকবে না। দু দিন আগেই বরং আনিয়ে নেবেন। তবে আমার শেষ পর্যন্ত সময় হবে কিনা—বরং হেমকেই পাঠিয়ে দেবেন।…গৃহ-প্রবেশের কথাটা আর বলে দরকার নেই—পূজো-আচ্চার নাম করে আনিয়ে নেবেন।'

দু পা এগিয়ে গিয়ে এবার অভয়পদ নিজে থেকেই থামে আবার।

'বরং—বরং হেম যদি যায় তো রতনকেও বলতে পারে এক বার চাকরির কথাটা। ওর তো অনেক জানাশুনো—'

কথাটা ভাল করে শেষ না করেই সে বেরিয়ে গেল।

হেম রতনদের বাড়ি খুঁজে খুঁজে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন তার চোখ থেকে যেন বিস্ময় যেতে চায় না। ঐশ্বর্য যে সে দেখে নি তা নয়—এত কাল শহরে আনাগোনা করছে ঐশ্বর্যের বাহ্য চেহারাটা ভাল করেই দেখা আছে—কিন্তু এত কাছে থেকে আগে কখনও দেখে নি। এত প্রাচুর্য যে সত্যিই থাকতে পারে—এসব যে নিতান্ত গল্প-কথা নয়, তা চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হওয়া শক্ত।

রতন বেশ সস্নেহেই গ্রহণ করলে ওকে। মোক্ষদাকে ডেকে জলখাবার দিতে বললে, খেয়ে যাবার অনুরোধ জানালে।

তার পর বললে, 'আপনিই তা হলে কান্তির দাদা?· বড় ভাল ছেলে আপনার ভাইটি, সত্যিই বড় ভাল ছেলে। ও খুব উন্নতি করবে দেখবেন!·· তা নিয়ে যান, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফেরত দিয়ে যাবেন, ওর ওপর যেন বড্ড মায়া পড়ে গেছে!'

একথা সেকথার পর প্রাণপণে সংকোচ কাটিয়ে চাকরির কথাটা পেড়ে ফেলে হেম। বহু দিন ধরে বেকার বসে আছে সে, কোথাও কিছু হচ্ছে না। পনেরো-কুড়ি টাকারও একটা চাকরি পেলে বেঁচে যায়। শেষে অভয়পদর কথাও বলে, 'তিনিই আরও বলে দিলেন—'

'আমাকে বলতে বলেছে অভয়দা, বাঃ বেশ তো! আমি কি বেটাছেলে, যে আমার হাতে চাকরির খোঁজ থাকবে?'

বলে বটে কিন্তু একটুখানি চুপ করে ভুরু কুঁচকে বইয়ের আলমারিটার দিকে চেয়ে থেকেই বলে ওঠে, 'আচ্ছা থিয়েটারে চাকরি করবেন? গেট-কীপারি? দেখুন তা হলে—ওঁর বন্ধু রমণীমোহনবাবুর থিয়েটার আছে, বোধ হয় তাঁকে লিখে দিলে কাজ হবে।'

করবেন! এ প্রশ্নও করে মানুষ?

হেম সাগ্রহে বলে, 'আমি এখন যা পাব তাই করব। শুধু দয়া করে একটু বলে দেন যদি—'

'বাড়িতে আপত্তি করবে না? মা আছেন তো? তিনি দেবেন এ চাকরি করতে? বড্ড খারাপ জায়গা ওটা!'

'কিছু বলবেন না মা। আমার ওপর সেটুকু ভরসা আছে। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন একটা—'

'তা হলে বরং আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, এখনই এক বার দেখা করে আসুন! এই কাছেই তো—গোয়াবাগানে থাকেন তিনি। দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে যান—বাড়ি চিনিয়ে দেবে।'

সে চিঠি লিখে খামে এঁটে ওর হাতে দিলে। খামেই ঠিকানা লেখা ছিল—তবু দারোয়ানকেও ডেকে সঙ্গে যেতে বলে দিলে রতন।

সৌভাগ্যক্রমে তখনও বাড়িতে ছিলেন রমণীমোহন বাবু, রতনের দারোয়ানকে দেখে বেশ প্রফুল্লমুখেই বললেন, 'কী ব্যাপার গো শিউনন্দন—কী হুকুম ওঁর?'

'এই যে—বাবুর হাতে চিঠি আছে।'

চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ মালিকজনোচিত মুখ করে ফেললেন বাবু। এমনিতেই প্রকাণ্ড রাশভারী চেহারা ভদ্রলোকের, তার ওপর মুখ গম্ভীর করে থাকলে রীতিমত ভয়ই হয়। হেমের বুকটা দুর-দুর করে উঠল। ভয়ে ও আশাভঙ্গের আশঙ্কায়।

কিন্তু রমণীবাবু বার-দুই আপাদমস্তক ওকে দেখে নিয়ে বললেন, 'তুমি তো নিতান্তই ছেলেমানুষ দেখছি, আর নিরীহ। পারবে থিয়েটারে কাজ করতে? ভারি বদ জায়গা!'

হেম আর কী উত্তর দেবে, মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ঘামে শুধু।

রমণীবাবুই আবার বলেন, 'আর যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ! যত জানাশুনো লোকই রাখি, দু দিন পরে সব শালা চোর হয়ে দাঁড়ায়।⋯ ছাখো বাপু এক কথায় চাকরি দিচ্ছি, নিমকটা রেখো। নইলে এক কথায় তাড়াতেও আমার দেরি লাগবে না। কলকাতায় থাকবার জায়গা আছে তো?'

'আছে—মাসীর বাড়ি।'

'বেশ, তা হলে পয়লা তারিখ থেকে কাজে লেগে যেও। কুড়ি টাকা করে মাইনে পাবে—আর হোল-নাইট শো হলে খাবার। রাজী থাক তো মাসকাবারের দিন দেখা করে জেনে যেও কটায় আসতে হবে!'

হেম মনের আনন্দে হেঁট হয়ে রমণীবাবুকে একটা প্রণামই করে ফেললে। রমণীবাবুরা বিশুদ্ধ কনৌজী ব্রাহ্মণ, তা সে আগেই শুনেছিল রতনের মুখে।

একে থিয়েটার—কল্পলোকের সুখস্বর্গ, শুধু মাত্র ধনীলোকের প্রমোদ-বিলাসের অধিকার সেখানে—এ-ই জানত, তায় চাকরি। আনন্দে যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে চলে এল হেম। রতনকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে স্রেফ মনের আনন্দেই বিশেষ কিছু বলতে পারল না। মাকে সংবাদটা না দিতে পারা পর্যন্ত স্থির হতে পারছে না সে!

কিন্তু শ্যামা খবরটা শুনে খুব খুশী হতে পারল না। থিয়েটারের অনেক কাহিনী শুনেছে সে বাপের বাড়ি থেকে—বহু কেচ্ছা। জোয়ান ছেলেকে সে সাত শ রাক্ষসীর খপ্পরে পাঠাতে মন চায় না তার, কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে 'না'ও বলতে পারলে না। শুধু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল।

হেমের এ খুঁতখুঁতুনি ভাল লাগে না। তার মন আনন্দে কল্পনাকাশে পাখা মেলেছে তখন! সে গলায় জোর দিয়ে বলে, 'বেশ তো, এখন কিছু দিন করি না—এধারেও তো পাঁচ জনকে বলে রেখেছি, একটা কিছু পেলে এ কাজ ছাড়তে কতক্ষণ?'

অগত্যা! শ্যামা একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

মা সিদ্ধেশ্বরী যদি এই ভাবে মুখ তুলে চান, হেমের ভাল একটা চাকরি হতেই বা কতক্ষণ?

আবারও বুক চিরে রক্ত দিয়ে পূজো দেবে না হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

শ্বশুরবাড়ির মধ্যে একদা প্রমীলাকেই সবচেয়ে পছন্দ ছিল মহাশ্বেতার। তেমনি এখন যেন আর সে 'দুটি চক্ষু পেড়ে' দেখতে পারে না ওর এই পাকা-গিন্নী 'জা'-টিকে। এক দিন সহজেই তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং অভিভাবকত্ব মেনে নিয়েছিল—সেই মেনে নেওয়াটাই যেন ওর কাল হয়েছে। যে আসনে সে স্বেচ্ছায় নিজেই তাকে বসিয়েছে, এখন সেখান থেকে টেনে নামানো ওর সাধ্যাতীত। কেমন করে কোথা দিয়ে যে সবাইকে ডিঙিয়ে প্রমীলাই সংসারের গৃহিণী হয়ে বসেছে—তা মহাশ্বেতা এতটুকু বুঝতে পারে নি। এখন সে দেখছে—প্রথম দিনটিতেও সে যেমন এ সংসারে পরমুখাপেক্ষী ছিল, আজ এত দিন পরেও—এতগুলি সন্তানের জননী হয়েও, তেমনিই আছে। কোথাও ওর মর্যাদা কিছুমাত্র বাড়ে নি।

এর জন্য আত্মগ্লানির শেষ থাকে না আজকাল ওর। মনে মনে কেবলই আপসোস হয়—ও যদি গোড়া থেকে একটু শক্ত হত। এতটা 'নাই' যদি না দিত ছোট জাকে!

বেচারী মহাশ্বেতা! ও জানে না যে এক-এক জন এ পৃথিবীতে আসে সোজাসুজি বিধাতার কাছ থেকেই কর্তৃত্ব করবার পরোয়ানা নিয়ে। প্রমীলাও সেই বিধিদত্ত সহজাত পরোয়ানা নিয়ে এ সংসারে এসেছে, কর্তৃত্ব করবার সহজ অধিকার তার। মহাশ্বেতার কোন দিনই সাধ্য ছিল না প্রমীলার ওপর অভিভাবকত্ব করবার বা জ্যেষ্ঠত্ব ফলাবার।

এই সত্যটা জানে না বলেই তার এই আত্মগ্লানি। মনে হয় প্রমীলাকে সে-ই বুঝি এতটা অগ্রাধিকার দিয়েছে।

অবশ্য আত্মগ্লানি বা অনুশোচনা থাকলেই যে—যাকে কেন্দ্র করে এই গ্লানি—তার ওপর বিদ্বেষ থাকবে না, এর কোন মানে নেই। বিদ্বেষ যথেষ্ট আছে মহাশ্বেতার—ওর এই জায়ের ওপর। আড়ালে সে ফাঁক পেলেই গালাগাল দেয়। বলে, 'শতেক্‌খোয়ারী আমার সব্বনাশ করবে বলে এ ভিটেয় এসে সেঁধিয়েছে! আমার সাতজন্মের শত্তুর।...হারাম-

জাদা মেয়েমানুষ! চোদ্দ পুরুষ বদ ওদের ঝাড়ে বংশে বজ্জাত!' ইত্যাদি—

আবার শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'মহারানী। উনি মহারানী আমি চাকরানী। মহারাজ আর মহারানী! যে যা বরাত করে এসেছে। ওরা এসেছে রাজত্ব করতে—করে যাচ্ছে। আমি যা করতে এসেছি তাই করছি। ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটী ঘুঁটেই কুড়িয়ে যাব জীবন-ভোর, আমার কি আর কোন দিন সুখ হবে!'

প্রমীলা শোনে আর হাসে। জানে মহাশ্বেতা ঢোঁড়া সাপ—একটু ফোঁস করবারও শক্তি নেই। ওর সঙ্গে ঝগড়া করাও শুধু শুধু নিঃশ্বাসের অপচয়।

আর ওর এই নিশ্চিন্ত উপেক্ষাই যেন আরও বেশী করে জ্বালাতে থাকে মহাশ্বেতাকে।

কথাটা বড় মিথ্যাও বলে না ও। মহারাজ আর মহারানী।

অভয়পদও যদি একটু মানুষের মত হত (মহাশ্বেতার সেই বড় অনুযোগ)! সর্বস্ব রোজগার করে এনে মেজভাইয়ের হাতে তুলে দেবার দরকারটা কি? তোমার ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ আছে। ভাই যে চিরকাল দেখবে তার কি কিছু লেখাপড়া আছে? সবাই কিনা ওঁর মত সত্যযুগের মানুষ!

'দেখব দেখব! রোজগার যদি কোন দিন তোমার বন্ধ হয় সেইদিন দেখে নেব। অত সহজে আমি মরছি না। ঐ ভাই যদি তখন মুখে নাতি না মারে তো আমি কী বলেছি! উনি কলির রামচন্দ্র-গিরি ফলাচ্ছেন! আগে ছাখ্‌—যার ওপর ফলাচ্ছিস সে লক্ষ্মণ কিনা!'

দাঁত কিড়মিড় করে চাপা গলায় বলে মহাশ্বেতা, অভয়পদর সামনে বসেই বলে আজকাল। এটুকু সাহস তার হয়েছে।

কিন্তু বলেই বা লাভ কি? এর চেয়ে ঐ ইঁটের দেওয়ালটাকে বলাও ঢের ভাল। নিজের নিষ্ফল রোষ এবং অর্থহীন সেই রোষের অভিব্যক্তি ফিরে এসে শুধু নিজেকেই আঘাত করে। আরও ক্ষতবিক্ষত হয় সে অন্তরে অন্তরে।

এই যুদ্ধের বাজারে টাকা যে এরা কম রোজগার করে নি, তা মহাশ্বেতা এত দিনে বেশ বুঝেছে। প্রথমটা অত ধরতে পারে নি ঠিকই—কিন্তু প্রমীলা চোখ-কান খুলে দেবার পর বুঝতে আর কিছু বাকী নেই ওর। কিন্তু সে টাকা পর্যন্ত সব এনে ঐ ভাইয়ের পেটে পুরেছে বোকা লোকটা! মোট-মোট টাকা! রাত জেগে আড়ি পেতে মহাশ্বেতা দেখেছে অনেক কিছুই। নগদ

কাঁচা টাকা ইটের মত করে সাজিয়ে মোটা রাংতা-কাগজে বেঁধে কাপড় দিয়ে সেলাই করেছে অম্বিকাপদ বসে বসে—তার পর ওর ঘরের দেওয়াল থেকে ইট খসিয়ে নিয়ে চুন-সুরকি দিয়ে সেই টাকার ইট গেঁথে রাতারাতি বালির কাজ করে মায় চুনকাম পর্যন্ত করে দিয়েছে নিজের হাতে। সে-ও সারারাত জেগেছে—মহাশ্বেতাও তাই। প্রমীলা অত ধার ধারত না, সে পড়ে পড়ে ঘুমোত। 'ঘুমোবে না কেন, ওর যে বুক-পোঁতা আছে! জানে ওর ঘরের দেওয়ালেই তো গাঁথা রইল।' আপন মনে গজ্‌গজ্‌ করত মহাশ্বেতা।

শুধু কি টাকা। সোনার বাট কাকে বলে জানত না সে। এবার চোখে দেখলে। সে বাট তো তৈরী করিয়ে নিয়ে এল এই আহাম্মকটাই। এনে ধরে দিলেন লক্ষণ ভাইকে! উঃ! এর চেয়ে যদি সে একটা মুখ্‌খু মুটে-মজুরের ঘরে পড়ত—সেও ঢের ভাল ছিল। এ জগতে সবাই নিজের স্বার্থ বোঝে, কেবল বিধাতা কি বেছে বেছে তার জন্যেই নির্জনে বসে এই মানুষটি গড়েছেন!

অবশ্য হ্যাঁ—এর মধ্যে গয়না ওদের কিছু হয়েছে বটে। দু বৌয়ের সমান ওজনের এক প্যাটার্নের গয়না হয়েছে—যা হয়েছে সবই দু সেট করে। কিন্তু এর চেয়ে ঢের কম সোনাও যদি অভয় নিজে হাতে করে এনে দিত তো ঢের বেশী খুশী হ'ত মহাশ্বেতা। 'মুখপোড়া মিন্‌সের কি একটা এক কড়ার জিনিসও কোন দিন আনতে ইচ্ছে করে না!'···এই সোনার গয়না শুধু দেওরের হাত দিয়ে আসে বলেই বিষ মনে হয় ওর। পরলে যেন জ্বালা করতে থাকে সর্বাঙ্গ। মাঝে মাঝে পরে, আবার একটু পরেই হয়তো ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আপন মনেই বকে, 'কেন, কিসের জন্যে আমি পরের হাত-তোলায় থাকব? আমার বরই তো বেশী রোজগার করছে, টাকা তো আমার!···ও কলকাতার অফিসে বসে থাকে, এক পয়সা উপরি আছে ওখানে? তবে? উনি হাত-তুলে দেন—যেন দয়া করে দিচ্ছেন, ভিক্ষে দিচ্ছেন। কেন কিসের জন্যে? আমার সমান গয়নাই বা ওর বৌ পরবে কেন? এটা হুঁশ থাকে না যে কার ভাতারের টাকা!'

পরাজয় এক দিক দিয়েই নয়—বহু দিক দিয়ে।

মাঝে মাঝে এ বাড়ি এসে মনের সব বিষ উজাড় করে সে মায়ের কাছে কিংবা মার অনুপস্থিতিতে পিঁটকীর কাছে। বলে, 'মেজ বৌটা আসলে গুণ জানে, বুঝলে। ওর মা-মাগী তো ভীষণ জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ, আমি তাকে দেখেছি। নিশ্চয়ই গুণতুক করে মেয়ের হয়ে। নইলে সবাই ওর হাতের

মুঠোয় যায়? যেমন আমি বোকা—তেমনি আমার মা। কিছুই করতে শিখলুম না কখনও। সেই জন্যেই আরও আমাকে কেউ গেরাহ্যি করে না। সবাই যেন ওর ভেড়ুয়া। আমার শাশুড়ী মাগী আমাকে কি কম জ্বালিয়েছে —কিন্তু কৈ এখন বলুক দিকি মেজবৌকে কিছু! একখানা বললে দশখানা শুনিয়ে দেবে সে। চুপ করে জুজু হয়ে বসে থাকে।'

আবার হয়তো খানিক থেমে কপালে করাঘাত করে বলে, 'কী বলব, আমার ভাতারও যে তেমনি। ওর সুখের কপাল, ভাতার ওর কথায় ওঠে-বসে। আমার একটা কথা কি এ মিন্‌সে শোনে! তা হলে আর ভাবনা ছিল কি!'

তার পর আরও গলাটা নামিয়ে বলে, 'শিবপুরের দিকে শুনেছি কে এক জন গুণিন আছে, একটু খোঁজ কর না মা। খরচা যা লাগে আমি দেব। যদি একটু ওষুধ-বিষুধ দিতে পারে—'

শিউরে উঠে শ্যামা উত্তর দেয়, 'না মা, খবরদার ওসব করতে যেও না। ঐ চট্টখণ্ডীদের একটা বৌ নিবড়ের ত্রিগুণা বুড়ীর কাছ থেকে কী ওষুধ এনে বরকে খাইয়েছিল—তার বর তাকে নিত না, কে এক দূর সম্পর্কের মামীকে নিয়ে পড়ে থাকত, লোক দেখিয়ে ছোঁড়া তাকে বলত মামীমা অথচ—। যাক্ তা সে ওষুধ তো খাওয়ালে, ফলও হল—সে মাগীকে ছেড়ে দিলে একদম। কিন্তু তার পরই কি হল, গুম খেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক দিন পাগল হয়ে গেল, একেবারে উন্মাদ পাগল!'

শিউরে ওঠে মহাশ্বেতাও—কথাটা শুনে। শ্যামা সেটা লক্ষ্য করে সমর্থন-সূচক ঘাড় নেড়ে বলে, 'তাই তো বলছি, ওসবে যাস্ নি। কী থেকে কি হয় তা কি বলা যায়। তোর কপালে থাকে—হক্কের ধন হয়—এক দিন পাবিই!'

'ছাই পাব!' মুখটা ভার করে উত্তর দেয় মহাশ্বেতা—'পাব একেবারে কাঠে-খড়ে উঠলে, তার আগে নয়।'

কিন্তু গুণতুকের দিকে যেতে আর সাহসে কুলোয় না ঠিকই।

আরও অসহ্য হয়েছে ওর দুর্গাপদর ব্যাপারটা। ওরও ঐ শ্রীচরণে আত্মসমর্পণটা।

ইদানীং সেও, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রমীলার একান্ত অনুগত হয়ে উঠছে ক্রমশ। এইতে আরও অবাক লাগে ওর!

'মুয়ে আগুন! সব শেয়ালের এক রা! সব কটা ভাই ঐ এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে বসে আছে গা! জোয়ান হয়েছিস, ডবকা হয়েছিস—তাই বে-থা কর! নয় তো এদিক-ওদিক চন্‌মন্ করে বেড়া, তা নয় বয়সে-বড় দিদির-বয়সী বৌদির আঁচলে আঁচলে ঘুরছেন। এ আবার কি!…আমার হয়েছে জ্বালার ওপরে জ্বালা। এ যেন গোদের ওপরে বেঁজি!…আচ্ছা, কী দ্যাখে ওর মধ্যে এরা বলতে পারিস? কী আছে ওর? গায়ের রং আমার চেয়ে অন্তত তিনপুরু ময়লা। মুখচোখ গড়ন-পেটনও এমন কিছু ভাল নয়। ঐ তো মদ্দাটে মদ্দাটে চওড়া চওড়া গড়ন, আর মদ্দাটে ভাব, এই গাছে উঠছে, এই জলে ঝাঁপাই ঝুড়ছে—আর যখন তখন হি-হি হাসি।…তাইতেই সবাই যেন মজে আছে।…যেমন ভাতার, তেমনি ছোট দেওর।…আমার এক এক সময় সন্দ হয় কী জানিস খেঁদী, তোর দাদাবাবুও ঐতেই মজেছে। ওকেও নিশ্চয় গুণতুক করেছে ছুঁড়ী। নিহাত ভাসুর-ভাদ্দরবৌ সম্পক্ক, তাই হাতে হাতে যথাসব্বস্ব ওকে তুলে দিতে পারে না, ওর ভাতারের হাতে দেয়। ও আমাদের সকলের সব্বনাশ করবে বুঝলি, স-পুরী এক গাড় করবে একেবারে। ও আস্ত রাক্কুসী, হাড়মাস চিবিয়ে খেতে এসেছে সক্কলকার!'

ঐন্দ্রিলা হয়তো হেসে জবাব দেয়, 'তোমার তো খুব বুদ্ধি দিদি, দেওর-ভাজে যদি না সম্পক্কে আটকায়, ভাসুর-ভাদ্দরবৌতে কি সেই জন্যেই আটকে আছে? বলি ভাসুর-ভাদ্দরবৌতে কেলেঙ্কার কি কখনও শোন নি কোথাও?'

কিছু-পূর্বের কথাও ভুলে গিয়ে অমনি সগর্বে জবাব দেয় মহাশ্বেতা, 'তেমন বান্দা তোর দাদাবাবু নয় বুঝলি! কখনও কোন মেয়েছেলের দিকে চেয়ে দেখে না। ওদিকে ওর খেয়ালই নেই। বলে যে কখনও এক দিনের তরে ভাল খেলে না, ভাল পরলে না, বিছানায় শুল না—সে করবে মেয়েছেলে নিয়ে কেলেঙ্কার! তা করলে তো বুঝতুম। যেন আমার কপালেই কোথায় এই গেরস্ত সন্নিসী তৈরী হয়ে বসে ছিল। সন্নিসীরও মন টলে—এর তাও টলবে না বুঝলি। শিবেরও কলঙ্ক হতে পারে—এর হবে না কোন দিন!'

'তবে আর মজেছে বলছিস কেন?' হাসে ঐন্দ্রিলা।

'কে জানে!' মুখটা বিকৃত করে কাঁধটা হেলিয়ে উল্টো জবাব দেয় মহাশ্বেতা, 'তবে আর গুণতুকের কথা বলেছে কেন! ওষুধ-বিষুধ মন্তর-তন্তরে কী না হয়—বল্!'

সত্যিই দুর্গাপদর আচরণটা দিন দিন দৃষ্টিকটু হয়ে উঠছে। দিনরাতই দেওর-ভাজে গুজগুজ, ফষ্টিনষ্টি। চাপা হাসি, চোখে চোখে কৌতুক। অন্ধকার বাইরের বাগানে বাঁশবনে ঘোরাফেরা। দুর্গাপদর ইদানীং চাকরি হয়েছে, অভয়পদই বলে-কয়ে রেল অফিসে একটা কাজ যোগাড় করে দিয়েছে —সেই জন্যেই দিনরাত থাকতে পারে না বাড়িতে—কিন্তু চাকরির সময়টুকু ছাড়া আর এক দণ্ডও দুর্গাপদ বাড়ির বাইরে কাটায় না। ওর বন্ধুবান্ধব আড্ডা সব গেছে, এখন দিনরাতই বাড়িতে থাকে, মায় ছুটির দিনও। ছোট ননদের বিয়ের পর ওরা বাড়ির পাট পালা করে নিয়েছে। এক জন ছড়া-ঝাঁট দেয়, গোয়াল কাড়ে—আর এক জন বাসন মাজে, রান্নার যোগাড় করে। প্রমীলার যেদিন ছড়া-ঝাঁটের পালা পড়ে, সেদিন ভোর থেকে দুর্গাপদ ওর পেছনে পেছনে ঘোরে, গোবরছড়ার হাঁড়ি এগিয়ে দেয়, নয়তো ঝাঁটাটা খুঁজে আনে, গোয়ালে গিয়ে গরু বাছুর বার করে বেঁধে দেয়। আবার যেদিন ওর বাসন মাজার পালা, সেদিন একটা দাঁতন মুখে দিয়ে গিয়ে পুকুরের পাড়ে বসে, অথবা তালগুঁড়ির পইটেতে এক ধাপ উঁচুতে বসে প্রমীলার আঁচলটা নিয়ে খেলা করে—ওর অজ্ঞাতে আঁচলে ঢিল বেঁধে দেয়, অথবা চুলে কাঁটাফল আটকে দেয়। অজ্ঞাত কিন্তু থাকে না কোন দিনই, গোড়া থেকেই অবহিত থাকে প্রমীলা, কাজেই ঠিক ঘটনাটির মুখেই হাতে-নাতে ধরে কৃত্রিম তর্জন করে, দু জনেই হেসে খুন হয়।

এ সবই দেখে মহাশ্বেতা, আর জলে জলে মরে।

'বুড়ীও কি দেখতে পায় না এসব?' শাশুড়ীর উদ্দেশে বলে সে, 'না কি ছোট ছেলের দোষ দেখতে গেলেই দুটি চোখ কানা হয়ে যায় কানীর!··· এমন ঢলাঢলিও চোখে পড়ে না, আশ্চর্য!'

পাড়াতে কানা-ঘুষো হয় বৈকি!

আশপাশেই জ্ঞাতিদের বাড়ি, সেখানেও গুঞ্জন ওঠে। কিন্তু এরা নির্বিকার। যেমন মা, তেমনি ছেলেরা।

সব চেয়ে বিস্মিত হয় মহাশ্বেতা অম্বিকাপদর আচরণে।

ওর দাদা না হয় চিরদিনই নির্বিকার, উদাসীন, পাথরের ঠাকুর। তা ছাড়া তার প্রত্যক্ষ ক্ষতির কোন ব্যাপার নয়, অন্তত তার নিজের গায়ে তত জ্বালা ধরাবার মত ঘটনা নয়—কিন্তু ও চুপ করে থাকে কী করে? তবে কি ওরা ভাইয়ে ভাইয়ে সবাই পাথর?

মায়ের কাছেই মনের কথাটা বলতে পারে খুলে, 'তুমি যে বল মা! ঘেন্নায় ঘেন্নায় আমি পাথর হয়ে গেলুম, কিন্তু ওদের ঘেন্নাপিত্তি হায়া কি কিছু নেই! গণ্ডারের চামড়া, এ কি কোন পুরুষে সহ্য করতে পারে? অন্য বাড়ি হলে এতদিনে খুনোখুনি হয়ে যেত!'

শ্যামা বলে, 'ওলো খুনোখুনি ওদেরও হত, যদি না দুগ্‌গো মাস মাস মাইনের সমস্ত টাকাটি এনে ধরে দিত ঐ মেজ ভায়ের হাতে। ও কি অমনি সহ্য করে? টাকাতে সব সয়ে যায় মা—সব সয়! কত লোকে টাকার জন্যে ঘরের মাগ পরের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে, তা জানিস না!'

মহাশ্বেতার কথাটা তত পছন্দ হয় না। টাকার এতটা মূল্য নিজের জীবন দিয়ে সে অনুভব করতে পারে নি এখনও। তাই খানিক চুপ করে থেকে ঘাড় নেড়ে বলে, 'উহুঁ, তুমি যাই বল বাপু, ওর মা-মাগী অনেক কিছু জানে, আসলে গুণ করেছে সবাইকে। ঐ যে কী সুপুরি খাওয়ায় না কি, তাই খাইয়েছে নিশ্চয়! শাশুড়ী, ভাসুর মায় ভাতার সুদ্ধ এত বড় অনৈরন চোখ বুজে সহ্য করে—এ অমনি হয় না মা! আমি তোমাকে বলে দিলুম, এক দিন এ কথাটা বাজারে বের হবেই, দেখে নিও। ঐ মা-মাগীর কাজ এসব। সব গুণতুক্। কী বলব তুমি ভয় দেখিয়ে দিলে, নইলে আমিও একটা গুণিনের কাছে যেতুম। একটা ভাল গণৎকারের সন্ধান পেলে আমি চার-পাঁচ টাকাও খরচ করতে রাজী আছি।'

শ্যামার 'টাকা' সম্বন্ধে সদা-জাগ্রত কান খাড়া হয়ে ওঠে, 'জামাই তো তোকে কিছুই দেয় না বলিস, তবে টাকা পাস কোথা থেকে?'

'আমি যে আজকাল সরাই ওর পকেট থেকে। এসে হাত-মুখ ধুয়ে গিয়ে তবে তো বসে দু ভাই। সে যা বাহার! ওধারে ওরা হয়তো রান্নাঘরে, নয় তো পালা না থাকলে, বাইরের দাওয়ায় মুখোমুখী—এধারে এঁরা মেজকর্তার ঘরে দোর দিয়ে মুখোমুখী। দু দলই গুজগুজ ফুসফুস! তা সেই মুখ-হাত ধোবার ফাঁকেই আমি যা পাই হাতিয়ে নিই। তায়ও মধ্যে মধ্যে দু-একটা টাকা, আজকাল আমি মুখ ধরেছি তো, চেঁচামেচি করি, তাই হাত-খরচ বলে দু-এক টাকা ঠেকায়। বাকী হাত-সাফাই! তবে টের পায় ও, ওর গোনাগোনতি হিসেবের টাকা, এক পয়সা ইদিক-উদিক হবার উপায় নেই বাবা—বলে, তোলা তোলা লাউয়ের পাতা, তোমার ভেয়ের গোনা গাঁথা! টের পায়, তবে কী ভাগ্যি কিছু বলে না। আগে আগে বোধ হয় ওঘরে গিয়ে অপ্রস্তুত হত

—এদান্তে তাই পকেট থেকে বার করে আগে গুনে নিয়ে যায়। পেথম পেথম বুক ঢিব্ ঢিব্ করত, সরে যেতুম সামনে থেকে। এখন সোজা দাঁড়িয়ে থাকি। বলি অত ভয় কিসের? এ তো আমারই হক্কের টাকা! তা কম দেখলে এক বার চেয়ে ছাখে শুধু, একটু মুচকি হাসে, কিছু বলে না।··· তবে কি আর বেশী নিতে ভরসা হয়—সিকিটা আধুলিটা দু আনিটা! টাকা—সে দৈবে সৈবে!'

শ্যামা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাগ্রহে প্রশ্ন করে, তা কত জমালি!'

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায় যেন মহাশ্বেতা, উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলে, 'কত আর! ছাই জমিয়েছি। ব্যাঙের আধুলি!'

শ্যামা অপ্রসন্নমুখে বলে, 'থাক। বলতে হবে না। তবু যে বুদ্ধি হয়েছে, নিজেরটা বুঝতে শিখেছিস—এইতেই আমার সুখ। আমি কি আর তোর টাকা নিতে যাচ্ছি—না চাইছি!'

অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে যায় মহাশ্বেতা, তবু যে সংবাদটা শোনবার জন্য শ্যামা সাগ্রহে ভেতরে ভেতরে ছট্‌ফট্ করে—সে সংবাদটা কিছুতেই সে দেয় না। সংসারের শিক্ষাই এমন যে কিছু দিন সেখানে পাঠ নেবার পর অতি বড় নির্বোধও খানিকটা সতর্ক হয়ে যায়, স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। ঘা খেয়ে খেয়ে আত্মরক্ষার প্রাথমিক পদ্ধতিগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

॥ ২ ॥

কথাটা অবশেষে এক দিন মহাশ্বেতাই পাড়ে শাশুড়ীর কাছে। ঠাকুরঘরের বন্ধ দরজার সামনে অন্ধকার দালানে পা ছড়িয়ে বসে নিঃশব্দে মাতগুড় আর নারকোলকোরা দিয়ে মাখা চালভাজার গুঁড়ো খাচ্ছিলেন ক্ষীরোদা—মহাশ্বেতা এসে কাছে বসল। সংসারের কাজ সারা হয়ে গেছে, মায় কাল ভোরের জন্যে উনুনে কলা-বাসনা, সুপুরির বেলদো পর্যন্ত সাজানো, চাল ধোয়া—সব তৈরী করে রেখে রান্নাঘরে চাবি দিয়ে এসেছে। রাত এগারোটা বেজেও গেছে কখন কুণ্ডুদের ঘড়িতে—রোজই এমনি হয় ওর। যেদিন মেজবৌর পালা থাকে সেদিন দুর্গাপদ অর্ধেক কাজ করে দেয়—ওর তো আর সে সহায় নেই। তবু ভাগ্যি মেয়েটা এখনও পর্যন্ত ওঠে নি। সন্ধ্যে হতে না হতে ঘুমোবে মুখপোড়া মেয়ে আর রাত ঠিক-যাই এগারোটা বাজবে অমনি উঠে

চিল-চেঁচাতে শুরু করবে। তার পর তাকে খাইয়ে ঘুম পাড়াতে যার নাম একটি ঘণ্টা। আজ এই একটা মস্ত সুযোগ মিলেছে। আজ কর্তারাও সব ঘুমিয়ে পড়েছে, মেজবৌ আর দুর্গাপদ উঠেছে ছাদে—আজকাল সিঁড়ি হয়ে এ একটা সুখ বেড়েছে ওদের—এখন আর সহজে নামছে না।

'কী মা?' প্রশ্ন করেন ক্ষীরোদা, একটু বিস্মিতই হন। বড় বৌ ছেলেপুলের মা গিন্নী হবার পর থেকে এ সৌভাগ্য তাঁর বড় একটা হয় না।

'না, এমনিই। খুকীটা আজ ওঠে নি এখনও, তাই বলি যে মা খাচ্ছেন একটু কাছে গিয়ে বসি। একলা বসে খান—তা একটু আলোয় বসলেও তো হয়!'

'কী আর হবে আলো মা—কাঁটা-খোঁচা তো নেই। বুড়োমাগী রাতদুপুরে খাচ্ছি, এ আর এমন দেখাবার মত কী ঘটনা বল! খাবে নাকি মা একটু?'

'না মা, আপনি খান। দুপুরের ছিষ্টি পান্তা পড়েছিল—এক পেট খেয়ে এসেছি—এখন ঐ গুড়মাখা জিনিস খেলেই অম্বলে বুক জ্বলে উঠবে!'

এও এক অপ্রসন্নতার কারণ শাশুড়ীর সম্বন্ধে। প্রতিদিন জোর করে চাল বেশী নেওয়াবেন। বলবেন, 'গেরস্ত বাড়ি থেকে খাবার সময় অতিথ-ভিখিরী ফিরে গেলে বড় অকল্যেণ মা, বড় লজ্জারও কথা। ভগবানের ইচ্ছেয় শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তোমাদের তো তেমন অভাবও নেই আর—থাক না দুটো ভাত বেশী! ফেলা তো যাবে না। জল দিয়ে রাখলেই চলবে!'

'হ্যাঁ তা তো চলবেই।' মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে মহাশ্বেতা। সে ভাত খেতে হবে ওকেই। অতিথ-ভিখিরী আসে কদাচিৎ কোন দিন—তাও ওদের খাওয়া হয়ে গেলে আর দেওয়া চলবে না, সে নাকি দিতে নেই! ফলে রোজই সেই পান্তা তুলতে হয় ওকে। মেজবৌ সাফ বলে দিয়েছে, 'ও আমার পোষাবে না। আর তুমিই বা খেয়ে মরতে যাও কি জন্যে? পুকুরে ঢেলে দাও গে না চুপি চুপি! যেমন-কে-তেমনি!'

সেইটেই পারে না মহাশ্বেতা—জন্মাবধি দীর্ঘকাল অভাবের সংসারে কাটিয়েছে সে, এক মুঠো ভাতের মূল্য সে হাড়ে হাড়ে বোঝে। জানে যদিও যে, এ পয়সা বাঁচালে তার ঘরে উঠবে না কানাকড়াও, তবু পারে না।

শাশুড়ী এ খোঁচাটা নীরবে হজম করলেন, অথবা খোঁচাটাই টের পেলেন না। শুধু বললেন, 'অ। তা শুনেছি মা মুড়ি কি চালভাজার সঙ্গে গুড় খেলে নাকি অম্বল হয় না!'

'না মা। আমার হয়। ও আপনি খান। তা ছাড়া পেটে আমার জায়গাও নেই।'

তার পর মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে বসে, 'হ্যাঁ মা, তা ছোট-ঠাকুরপোর বিয়ে দেবেন না?'

ক্ষীরোদা কেমন যেন থতমত খেয়ে যান, 'তা কী জানি, কৈ অভয়াপদ তো কিছু বলছে না!'

'দেবেন আপনি ছেলের বে, তা মেজকর্তা কি বলবে শুনি? ছেলে আপনার না—মেজকর্তার?'

'না—তা নয়।' আরও যেন থতমত খান ক্ষীরোদা, কেমন একটু অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলেন, 'তা দিতে হবে বৈকি।...দেখি না হয় এক বার মেজবৌকে বলে!'

'হাড় জ্বালা করে মা আপনার কথা শুনলে!' অনেক দিনের নিরুদ্ধ রাগ আর চাপতে পারে না মহাশ্বেতা, দাঁতে দাঁত চেপে অনুচ্চকণ্ঠে বলে, 'বলি গিন্নী কে এ বাড়ির, আপনি না মেজবৌ? আপনি বেঁচে থাকতে ও কিসের গিন্নী শুনি? সব তাইতে মেজকর্তাকে আর মেজবৌকে টানেন কেন? বেশ তো আপনি না পারেন আমাকে বলবেন—আমি তো হাজার হোক এ বাড়ির বড় বৌ!'

'বেশ তো, তা দাও না বাপু। আমার কি আর অসাধ ছোট ছেলের বৌ দেখা! তা ওরাই সব করে তো—তাই বলি। তা দাও না তুমিই। না হয় ওদেরই বল না এক বার, ওরা আবার না কিছু ভাবে!'

সভয়ে, সসংকোচে যেন কথাগুলো বলেন ক্ষীরোদা।

'বলবই তো! জোরের সহিত বলব। অত ভয় কিসের!'

এই বলে দুম্ দুম্ করে পা ফেলে উঠে যায় মহাশ্বেতা।

শাশুড়ী এখনও একা বসেই খাচ্ছেন এবং খুকীও ওঠে নি—একথাটাও যেমন মনে থাকে না তার, তেমনি মেজবৌ ও মেজকর্তাকেই শেষ পর্যন্ত বলতে যে ও রাজী হয়ে গেল সেটাও মাথাতে যায় না!

•

পরের দিন খেতে বসে বলতে গেলে দুম্ করেই কথাটা পাড়লে মহাশ্বেতা, 'একটা ভাল মেয়ে-টেয়ে খোঁজ কর্ মেজবৌ, ছোট্ ঠাকুরপোর বিয়ে দেব!'

প্রমীলা কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। তার পর বলে, 'ছোট কর্তার

(মহাশ্বেতার থেকে 'কর্তা' কথাটাই এ বাড়িতে চালু হয়ে গেছে!) বিয়ে দেবে? তুমি?'

ওর সেই দৃষ্টিতে বিস্ময়ের সঙ্গে ঈষৎ প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল কিনা, তা মহাশ্বেতার নজরে পড়ে না—শুধু অকারণ জোর দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ—তা তোরা যখন কিছু উয্যুগ-সঙ্গুগ করছিস না—তখন আমাকেই দিতে হবে বৈকি!... আর ভাল দেখাচ্ছে না।... তা ছাড়া সোমত্থ হয়েছে, যা হোক দু পয়সা রোজগার-পাতিও করছে, দেব না-ই বা কেন বল্।'

'তা তো বটেই। দেওয়াই উচিত।' এই বলে মুখ টিপে হেসে বাটি-চচ্চড়ির লঙ্কাটা অকারণেই থালার ওপর টিপতে থাকে প্রমীলা। কেন যে আর ভাল দেখাচ্ছে না...সে কথাটাই শুধু জিজ্ঞাসা করতে পারে না কিছুতে।

সেদিন প্রমীলার রান্নার পালা। দুর্গাপদ অফিস থেকে এসে জামা-কাপড় ছেড়ে সবে রান্নাঘরে ঢুকেছে, প্রমীলা বড় জায়ের মতই দুম করে বলে উঠল, 'শুনছ, বড়গিন্নী তোমার বিয়ে দিচ্ছেন যে!'

আসলে কথাটা আর চাপতে পারছিল না প্রমীলা।

দুর্গাপদ কিন্তু কিছু-মাত্র ব্যস্ত হল না। এদিক ওদিক চেয়ে সন্তর্পণে ট্যাঁক থেকে একটা ছোট্ট পুরিয়া বার করে বললে, 'শুনব'খন—এখন চুপিচুপি একটু চা তৈরী কর দিকি! সেদিনের চিনি একটু আছে না? নইলে বড় গিন্নীর মেয়ের মিছরি থেকে একটু হাতসাফাই কর!'

এখনও এ অঞ্চলে চায়ের তত রেওয়াজ হয় নি। কলকাতায় চলছে বটে খুব—কিন্তু বড় মেজ দুই কর্তাই হাড়ে-চটা ও অভ্যাসের ওপর, তা দুর্গাপদ জানে। মেজকর্তার রাগটাই বেশী, সে প্রায়ই বলে, 'যাদের লক্ষ্মীছাড়ার দশা, তাদেরই ঐসব বদ্-অভ্যেস ত্যাখ গে যাও! কলকাতার বাবুদের সব কোতো-নবাবি। এধারে অবস্থা তো জানতে বাকি নেই আমার! দেনার দায়ে মাথার চুল বিকিয়ে আছে—নবাবিটুকু চাই ষোল আনার ওপরে আঠারো আনা! সায়েবরা খায়! আরে তোরা আর সায়েবরা সমান হলি? তাদের রোজগার আর তোদের রোজগার? তারা পায় তিন হাজার টাকা মাইনে, তোরা পাস তিরিশ টাকা। তাদের যা সাজে তা কি তোদের মানায়?'

হয়তো ছোট ভাইয়ের 'কোতো-নবাবি'র দিকে এক-আধটু টানের আভাস পেয়েই কথাগুলো বলে অম্বিকাপদ, কে জানে!

তাই লুকিয়ে-চুরিয়েই চালাতে হয়। যেদিন প্রমীলার পালা না থাকে, সেদিন সুবিধা হয় না। মেজ বৌকেও ধরিয়েছে সে জোর করে। মেজ-বৌ অবশ্য রোজই আপত্তি করে। বলে, 'নেশা কি এক দিন অন্তর করলে চলে! তার চেয়ে আমার পানদোক্তাই ভাল। কেউ বলবার নেই!'

দুর্গাপদও ছাড়ে না। বলে, 'না বাপু, চা আবার একা একা খেয়ে সুখ হয় না।...একটু খাও, নইলে মৌতাত জমবে না! রোস না—একটু সইয়ে নিই ব্যাপারটা, তার পর ডোন্‌টো কেয়ার—সামনেই খাব!'

আজ কিন্তু প্রমীলার কাছে এ সব ব্যাপার তুচ্ছ হয়ে গেছে। সে জল চড়াবার কিছুমাত্র আয়োজন না করে, ছোটকর্তার মুখের দিকে বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বললে, 'ঠাট্টা নয়—সত্যি বলছি। বড় গিন্নী বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে!'

'ব্যস্ত হওয়াচ্ছি!...বড় গিন্নীর কি, আমি বিয়ে করি না-করি? বলে এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে ভিন্ গাঁয়ে মাথাব্যথা!... আমার জন্যে এত দরদ উথলে উঠল কেন হঠাৎ!'

'এর আর দরদ উথলে ওঠা-উঠির কি আছে!' একটা ছোট বাটি করে কাঠের উনুনের আঙরার ওপর জল চড়াতে চড়াতে বলে প্রমীলা, 'সত্যিই তো, বিয়ের কি আর বয়স হয় নি তোমার? সে বড়, তার একটা কর্তব্য আছে তো? আর তার কথাই বা বলি কেন—আমারও তো কর্তব্য! এখন কি রকম মেয়ে পছন্দ তাই বল!'

'নাও নাও—সারাদিন পরে বাড়ি এলুম, এখন ওসব বেয়াড়া ঠাট্টা ভাল লাগছে না।...দুটো অন্য কথা বল!'

'ঠাট্টা কিসের?' প্রমীলা যেন অকস্মাৎ জ্বলে উঠল, 'ঠাট্টাটা কিসের দেখলে? আমরা তোমার গার্জেন নই? বিয়ের কথায় আবার ঠাট্টা এল কোথায়? আমরা বলছি বিয়ে করবে।'

'ওসব হবে-টবে না। বিয়ে আমি করতে পারব না। এই সাফ বলে দিলুম। বেশী ঘাঁটিও না আমাকে। শেষ অবধি একটা কেলেঙ্কার করব!'

'কেন? কেন করতে পারবে না শুনি?'

'পারব না, ব্যস্। তার আবার অত কৈফিয়ত কি?'

তার পর কতকটা যেন অর্ধ-স্বগতোক্তি করে—'ন্যাকা!'

'ন্যাখো—এই আমিও সাফ্ বলে দিলুম—ওসব ঢ্যাটাগিরি ছাড়। বিয়ে

তোমাকে করতেই হবে। আর ভাল দেখাচ্ছে না। বয়স হয়েছে—রোজগার-পাতি করছ, এখনও বিয়ে না দিলে পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে।'

'তা বলুক। পাঁচ জনের কি ধার ধারি আমি ?'

জল ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না। এখনই হয়তো কে এসে পড়বে। তাই সামান্য বুজকুড়ি কাটতেই কাগজের মোড়ক থেকে চা পাতাটুকু ঢেলে দিয়ে একটা রেকাব চাপা দেয় প্রমীলা, তার পর বলে, 'তুমি না ধারো, আমরা তো ধারি! আমরা মুখ দেখাব কি করে ? বেশ, বিয়ে না করতে চাও করো না—তবে এও বলে দিচ্ছি, আমাদের সঙ্গে আর তা হলে কোন সম্পর্ক থাকবে না, আমি অন্তত আর কথা কইব না তোমার সঙ্গে। এইখানেই ইতি!'

দুর্গাপদ এবার রীতিমত হকচকিয়ে যায় যেন। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ প্রমীলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'ঐ নাও। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।'

মেজবৌ কাঁসার গেলাসে দুধ চিনি ঢালতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে বসল এদিকে। দুই চোখে তার আগুন। বললে, 'তার মানে ? তার মানে তুমি আমার জন্যে বিয়ে করতে চাইছ না ?... তার মানে কি ? লোকে একথা শুনলে কি বলবে ?... কী বলতে চাইছ স্পষ্ট করে খুলে বল দিকি!'

আরও কিছুক্ষণ সেই প্রজ্বলন্ত মুখের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবার পর দুই হাত জোড় করে দুর্গাপদ বললে, 'আমার ঘাট হয়েছে। তোমার যা খুশি তাই কর। আমি আর কিছু বলব না'

'ঘাটই তো। এক শ বার ঘাট হয়েছে।'

প্রমীলা চা ছেঁকে প্রায় ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গীতে গেলাসটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে জোরে জোরে উনুনে ফুঁ পাড়তে থাকে। শুকনো কলার বাসনা ঠেলে দেয় তারই ফাঁকে—দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জলে ওঠে উনুনটা।

দুর্গাপদ আর সাহস করে কিছু বলতে পারে না। শুধু এক বার উঁকি মেরে দেখে নেয় যে বাটির তলায় একটু চা অবশিষ্ট আছে। প্রমীলা নিজের রেখেছে।

আশ্বস্ত হয় কতকটা। ভাগ্যিস্ নিজেই রেখেছে তাই, নইলে অন্য দিনের মত পীড়াপীড়ি করতে সাহসে কুলোত না ওর।

॥ ৩ ॥

বিয়ের কথাটা আগেই তুলুক, আর ওর নিজের ভাষায় 'জোরের সহিত'ই তুলুক—শুধু ওঠার অপেক্ষা, তার পরই মহাশ্বেতা তার যথাস্থানে অর্থাৎ পিছনে পড়ে গেল। প্রমীলাই সহজে এবং অনায়াসে কর্ত্রী হয়ে বসল এ ব্যাপারেও।

সে-ই হাঁক-ডাক করে পাড়ায় সবাইকে বলে এল মেয়ে খুঁজতে, আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি লিখতে বসল। এক কথায় তোলপাড় তুলল চারিদিকে।

ওর এ ব্যবহার মহাশ্বেতার বুদ্ধির অগম্য। তবে কি তার সন্দেহটাই ভুল?—আসলে মেজবৌর মনের ভেতরটা পরিষ্কার? 'কে জানে বাপু—বুঝি না!' আপনমনে হতাশ ভাবে শুধু বলে বার বার।

ওর এত দূর কর্মক্ষমতাও নেই। বিয়ের কথা সে তুলেছিল বটে, তাই বলে তার জন্যে যে এত করতে হয় তা সে জানত না।

যথাসময়ে চারিদিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল হু-হু করে। ওদের এখন অবস্থা ভাল, ছেলে সুপুরুষ, রেল অফিসে চাকরি করে—এ পাত্র দুর্লভ।

ক্ষীরোদা এক বার ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন, 'তা পাড়ার নীরো ঘট্‌কীকে এক বার খবর দিলে না কেন মেজবৌমা?'

প্রমীলা তাতে উত্তর দিয়েছিল, 'না মা। ঘট্‌কীর সম্বন্ধে ভাল মেয়ে পাওয়া যায় না। খোঁজখবর কিছু জানি না, যাকে তাকে এনে কি বাড়িতে ঢাকানো ভাল?…জানাশোনা ঘরের মেয়ে চাই, যাদের বাড়ির নাড়ী-নক্ষত্র সব জানা যাবে—তবে না!'

তার পর একটু থেমে মুচকি হেসে বলেছিল, 'চাই কি তা হলে আমরাও দেখে পছন্দ করে আসতে পারি।'

ক্ষীরোদা চমকে উঠে বলেছিলেন, 'ওমা সে কি, মেয়েরা আবার পরের বাড়ি ছুট্ করে মেয়ে দেখতে যাবে কি?'

'সেই জন্যেই তো একেবারে নিস্পরের বাড়ির মেয়ে আনতে চাইছি না মা। আপ্ত-কুটুমের বাড়ি যাব, তার আর কথা কি, সে তো এমনিও যেতে পারি।'

'তাই বুঝি যাচ্ছে আজকাল সব? কে জানে বাপু। আমরা তো জানতুম মেয়েদের এসব কথায় থাকতে নেই।'

'কলকাতায় তো হামেশা যাচ্ছে। একেবারে অজানা-অচেনা লোকে বাড়িতেও যাচ্ছে। শাশুড়ী-ননদের মেয়ের বাড়ি গিয়ে কনে দেখা খু চল হয়ে গেছে মা, আপনি ওসব খবরও রাখেন না।'

'তা হবে!' মিট্‌মিট করে তাকান শুধু ক্ষীরোদা, তার পর বলেন 'তবে যে শুনেছি ঘট্‌কী এলে মেয়েরা ঘিরে ধরে তাকে, হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে, কনে কেমন যদি একটু শুনতে পায় এই লোভে!'

'ও কবেকার কথা বলছেন মা। ওসব ছিল আপনাদের আমলে। সে সব দিন আর নেই।'

অগত্যা ক্ষীরোদা চুপ করে যান। কথাটা তাঁর বিশ্বাস হয় না—কিন্তু ভরসা করে প্রতিবাদও করতে পারেন না।

কুটুম্বদের ঘর থেকেই সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেল শেষ অবধি।

ক্ষীরোদারই বড় মেয়ের মামাতো ভাসুরের শালার মেয়ে।

অত দূর-কুটুম্বদের বাড়ি যাওয়া চলল না বটে, কিন্তু প্রমীলা বুদ্ধি করে মেয়েকে ননদের বাড়ি আনাবার ব্যবস্থা করলে। মহাশ্বেতা আর ও গিয়ে দেখে এল অম্বিকাপদকে সঙ্গে করে। দেখে আর কারুর মত না নিয়েই একেবারে পাকা কথা দিয়ে এল। মহাশ্বেতার সামনেই দিলে, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিবাদ করা বা সবাইয়ের সামনে নিজের জাকে তিরস্কার করা উচিত কি না ভাবতে ভাবতে আর মহাশ্বেতার কিছুই করা হয়ে উঠল না। একথা সেকথার মধ্যে এক সময় বিদায়ের সময় হয়ে এল।

ফেরবার পথে মহাশ্বেতা কথাটা তুলল অবশ্য, 'তুই যে হুট্ করে কথা দিয়ে এলি, শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলি না, কারুর মত নিলি না, কাজটা কি ঠিক হল? বাড়িতে ফিরে একটু সব দিক ভেবে দেখা উচিত ছিল না?'

'তুমি থাম দিকি দিদি! মেয়ে দেখলুম আমরা, শাশুড়ী কি বলবেন তাই শুনি? তা ছাড়া আমরা দুই বড় জা মত করলুম, এর ওপর আর কথা কি? আমরাই তো ঘর করব—না বেটাছেলেরা ঘর করতে আসবে?'

দুই জা যে একমত হয় নি, অন্তত মহাশ্বেতা যে মত দেয় নি, সংকোচে এটুকু কিছুতেই বলতে পারল না মহাশ্বেতা। কথাটা ঘুরিয়ে বলল, 'তা এত মেয়ে দেখে এই কষ্টি পাথরের মত কালো মেয়ে তুই পছন্দ করলি কেন?'

'শুধু বুঝি রংই দেখলে? কালো তো আমরাও—উনিশ আর বিশ! গড়ন-পেটন ভাল, কেমন একটা লক্ষ্মীছিরি এসব দেখলে না। রং নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? মেয়েটার কথাবার্তা চালচলনও বেশ ভাল, কেমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। শুধু রূপ দেখে উগ্রচণ্ডা মেয়ে এনে বাড়িতে ঢুকিয়ে পোড়াস্তি হোক আর কি!'

'তা হোক বাপু, এ যেন বড্ড কালো। ছোটকর্তার অমন সাহেবদের মত রং, তার পাশে এই কয়লার বস্তা, লোকে কি বলবে বল দিকি!'

'সেই তো ভাল। বলি কালো মেয়েগুলোও তো পার হওয়া চাই। তারা যাবে কোথায় বল দিকি? তা ছাড়া ছেলেমেয়ে হলে বাপের অত রংয়ের কিছুও তো পাবে—অত কালো থাকবে না। কালোর সঙ্গে কালোর বিয়ে হলে ছেলেমেয়েগুলো যে আবলুস কাঠ হত একেবারে।'

'সে যাদের ঘরে হত তাদের ঘরে হত, আমাদের কি?' মহাশ্বেতা অপ্রসন্নকণ্ঠে বলে।

'দেখব দেখব, বলি তোমারও তো মেয়ে হয়েছে, বাপের ধাতে তো যায় নি। এমন কি মায়ের রং-ও পাবে না, তখন পার কর কি করে বুঝব!'

কথাটা এই প্রসঙ্গে এসেই শেষ হয়ে যায়। মহাশ্বেতার যে এ মেয়েতে অমত, সেটা কিছুতেই স্পষ্ট করে জানাতে পারে না।

বাড়িতে ফিরে শাশুড়ীকে বুঝিয়ে দেয় প্রমীলা, 'রংটা একটু চাপাই হল মা, কিন্তু সব দিক তো দেখতে হবে। শুধু কটা চামড়া নিয়ে কি করব? বংশটা খুব ভাল। ঠাকুরঝি বললে, ওদের সবাই অমনি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, খুব মিষ্টি স্বভাব। আমাদের ঘরে ও-ই ভাল। নইলে বাপু ঘর করতে পারতুম না।··· বৌ আসতে না আসতে তিন ভাই-তিন ঠাঁই হওয়া কি ভাল? তা ছাড়া বেশ গোলালো গোলালো গড়ন, মুখছিরিও মন্দ নয়। সব দিক ভেবে ও আমি মত দিয়েই এলুম। এখন দেনাপাওনা আপনারা বুঝুন!'

'তা ছাখো, তোমাদের যা মত হয়।···তোমরাই ভেবে ছাখো, যা ভাল বোঝ সবাই। আমি আর কি বলব? অম্বিকাপদ যদি মত করে—'

তিনি ঐখানেই থেমে গেলেন। প্রমীলা শেষের কথাটার উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন মনে করলে না···

অগত্যা রাত্রে স্বামীর কাছেই কথাটা পাড়লে মহাশ্বেতা, 'কালো কুচকুচে, কয়লার মত রং। তোমাদের মেজগিন্নী গিয়েমো করে একেবারে কথা দিয়ে

এল। আমাকে এক বার জিজ্ঞেস নেই, বাদ নেই, দুটি ঠোঁট ফাঁক করতে দিলে না।...এর পর যেন দুষো না আমাকে!

অভয়পদ একটা পুরনো হ্যারিকেন লণ্ঠন সারাচ্ছিল বসে বসে প্রদীপের আলোতে; বাড়িতে কেরোসিনের আলো ঢুকেছে বহুদিন, কিন্তু এ ঘরে তা জ্বালতে দেয় না অভয়পদ। বলে, 'অত চড়া আলোয় চোখ খারাপ হয়।' সে কাজ থেকে মুখ না তুলেই বললে, 'দু জনে দেখতে গিয়েছিলে, মত দিয়ে এসেছ। আমরা এ-ই জানি। তোমার যদি এতই অমত ছিল, সেখানে বল নি কেন? মার কাছেও তো বলতে পারতে। আমাকে বলে কি হবে?... তা ছাড়া, কালো রং এইটেই বড় আপত্তির কারণ বলে আমিও মনে করি না!' তার পর একটু থেমে, অনেকদিন পরে একটু মুচকি হেসে (কাজ থেকে মুখে না তুলেই অবশ্য) বললে, 'তোমার রং যতই হোক, আমার চেয়ে তো ঢের নিরেস, কৈ তাতে তো তোমাকে পছন্দ করতে আটকায় নি আমার। আর মেজবৌমা ও কথাটা ঠিকই বলেছেন, বৌ আনতে হয় বংশ দেখে, ঘর দেখে—শুধু রূপটাই বিচার করতে নেই।'

সম্ভবত বার বার নিজের রং সম্বন্ধে ইঙ্গিত হতেই মহাশ্বেতা ক্ষেপে গেল একেবারে। বাল্যকাল থেকেই এটা তার বড় দুঃখ, মা-ভাই-বোনদের মধ্যে তার রংটাই সব চেয়ে নিরেস, এখানে এসেও স্বামীর কাছে নিজেকে বড়ই ময়লা লাগে। (এত অযত্নেও 'মিন্‌সে'র গায়ের রং যেন অন্ধকারে জ্বলে!) সে প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, 'বেশ বেশ, মেজ বৌমা যখন বলেছেন তখন তো বেদবাক্যি হবেই—ঐ মেয়েই নিয়ে এস এরে-বেরে। আমারই ভুল হয়েছিল মহারাণীর কথার ওপর কথা কইতে যাওয়া। এই নাক-কান মলছি, আর যদি কখনও এমন অন্যায় করি। তোমরা তিনটি ভাই যে এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে বসে আছ তা তো জানিই, বোকা বলে তাই আবার গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাই!'

বলতে বলতে সে ঘুমন্ত মেয়েটাকেই সজোরে ঘুম পাড়াবার ভঙ্গিতে চাপড় মারতে থাকে, ফলে সেটা জেগে উঠে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করে। এই বার সব রাগটা গিয়ে পড়ে তার ওপর, সজোরে তার গালটা মুচড়ে দিয়ে বলে, 'মুয়ে আগুন! হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলে একেবারে। মর্ মর্ শত্তুরের দল যত সব।'

অভয়পদর কিন্তু এসব কিছুতেই শান্তি ভঙ্গ হয় না, সে আপনমনেই ভাঙা

লণ্ঠনটা মেরামত করে যায়। মেয়েটা যে অকস্মাৎ কেন অমন করে একেবারে ককিয়ে কেঁদে উঠল, সে কারণটাও জিজ্ঞাসা করে না।

ওর মুখ থেকে সব শুনে পিঁটকী মন্তব্য করেছিল, 'ওলো, ইচ্ছে করে কালো মেয়ে আনছে, বুঝলি? পাছে সোন্দর মেয়ে এলে ওর ওপর থেকে সোহাগ কমে যায়—এই ভয়ে।'

কিন্তু প্রমীলার অন্য আচরণে সে মনোভাবটা খুঁজে না পেয়ে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করে মহাশ্বেতা।

পাত্রী-পক্ষের কাছে এঁরা চেয়েছিলেন নগদ টাকাই বেশী। অর্থাৎ বিয়ের খরচটা যাতে ঘর থেকে বার করতে না হয়। অনেক দর-কষাকষির পর আট শ এক টাকা নগদ ও পঁচিশ ভরি সোনা ঠিক হয়েছিল। কিন্তু প্রমীলা বেঁকে বসল, তা হবে না। আমাদের দুই জায়ের যা গহনা আছে ওরও তাই সমান হওয়া দরকার। তা নইলে খারাপ দেখাবে।'

ফলে আরও প্রায় দশ ভরি সোনা ঘর থেকে বার করতে হল। তার ওপর আবার মেজ বৌ ধরে বসল, 'আর তো সবাই পার হয়ে গেছে, মার এই শেষ কাজ, ছোট কত্তার বিয়েতে রসুন-চৌকি বসাতে হবে!'

'পাগল নাকি, সে যে অনেক খরচ!'

'কী আর খরচ? আমি খোঁজ নিয়েছি, দশটা টাকা হলেই হয়ে যাবে।'

অম্বিকাপদ অবশ্য আর বিশেষ আপত্তি করে নি, শুধু খোঁচা দিয়ে বলেছিল, 'এটা তো তোমাদের দুই জায়ের কারুর বেলাই হয় নি, তবে এটা করতে চাইছ কেন?'

তার জবাবে মেজবৌ বুঝিয়েছিল, 'তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা সমান হল? গয়না তো বরং আরও বেশী দেওয়া উচিত ছিল, সে সবচেয়ে ছোট, আমাদের আদরের জিনিস। বুঝতে পারছ না, একসঙ্গে ওঠা-বসা, একসঙ্গে ধর নেমন্তন্ন যাওয়া, সেই সময়টাই বড় দৃষ্টিকটু লাগে। আমরা বড়, আমরা পরে যাব, আর ও পরবে না—খারাপ লাগবে না? সবাই জানে যে এ বাড়িতে যে যার সে তার গয়না গড়ায় না—যা হয় সংসার থেকেই হয়। তখন তো সবাই বলবে যে ছোট ভাইটাকে ছেলেমানুষ বলে ঠকাচ্ছে এরা!'

এর পর অম্বিকাপদ কথা বলে নি। কিন্তু শানাইয়ের প্রস্তাবটা অভয়পদ

এক কথায় নাকচ করে দিলে। মেজভাইকে ডেকে সংক্ষেপে শুধু বললে, 'কী শুনছি, মেজ বৌমা নবৎ বসাতে চাইছেন? ওসব করতে যেও না। পাড়াঘরে সবাই ভাববে, এদের খুব পয়সা হয়েছে। এমনিতেই কানাঘুষো হয়।…শেষ অবধি ডাকাত পড়বে।'

ভাসুরের কথার ওপর কথা খাটবে না, প্রমীলা তা ভাল করেই জানে। অগত্যা চুপ করে যেতে হয়।

কিন্তু শানাই ছাড়া ঘটা করবার আর যা যা ব্যবস্থা আছে, কোনটারই ত্রুটি ঘটল না। প্রতিবারেই 'ভেতো-যজ্ঞি' হয়, অর্থাৎ বৌভাতের হাঙ্গামাটা দুপুরে সেরে নেওয়া হয়, এবারে মেজবৌ লুচির ব্যবস্থা করলে, লোকও নিমন্ত্রিত হল অনেক বেশী। তা ছাড়া আয়োজনটা হল এবার রাত্রে। প্রমীলা বললে, 'পাতা পেড়ে বসে খেয়ে যায় তো ভাল। সেই জনাজাত ছাঁদা তো দিতেই হয়, মিছিমিছি দুপুরে বলে লাভ কি? আপিসের সময়, সবাই আসতে পারে না, কিছু না!'

অভয়পদ এক বারই আপত্তি করেছিল, আর কোন ব্যবস্থাতে প্রতিবাদ জানায় নি। তবু মহাশ্বেতা তাতেই খুশী। মেজবৌর 'দপ্প' যে চূর্ণ হল, এই আনন্দে সে পরবর্তী এত সমারোহের সব জ্বালা ভুলে গেল। অবশ্য খুব বেশী একটা ঈর্ষা ছিলও না।…তার বেলা যেমন হয় নি, তেমনি মেজবৌর বেলাও তো হয় নি, সেটাই কি কম সান্ত্বনা! ও ছোট, ওর বেলা হয় হোক।… শুধু মেজবৌর মনের ভাবটাই বুঝতে পারছিল না বলে মনে মনে ছট্‌ফট্ করছিল।

বিয়ের সব ব্যাপারেই প্রমীলা শাশুড়ীকে সম্পূর্ণ পিছনে ফেলে গিন্নী হয়ে বসল। এমন কি বরণের সময় সে যে বড় জাকে ডাকল, এটাও যেন মহাশ্বেতা আশা করে নি। কতকটা কৃতার্থ ভাবেই ছুটে এগিয়ে গেল সে। এতটা দাপট যে মহাশ্বেতা আর এক জন্ম ঘুরে এলেও দেখাতে পারত না, সেটা মনে মনে সে-ও স্বীকার করে।

'ওরই সাজে, সত্যি! কেমন পারে ও।' আপন মনেই বলে।

মহাশ্বেতা কেন, ক্ষীরোদা মরে গেলেও যা পারতেন না, প্রমীলা সেটাও পারে অনায়াসে। বৌ আসবার সময় হতে উপস্থিত কুটুম্বিনীদের বেশ হেঁকেই শুনিয়ে দেয়, 'বৌ আসছে বাপু কালো; তা আগে থেকেই শুনিয়ে দিচ্ছি। কেউ যেন না তখন তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিপ্‌টিনি কেটে কোন কথা বলে।

আগে থাকতে সাবধান করে দিচ্ছি। আমি তা হলে কিন্তু কাউকে ছেড়ে কথা বলব না!'

ওর এই দুঃসাহসে সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। এমন কি সেটা নিয়ে আলোচনা করারও যেন শক্তি থাকে না কারুর! মৃদু গুঞ্জন একটা ওঠে বটে, তবে সে অনেক পরে।

॥ ৪ ॥

বৌভাত নির্বিবাদে চুকলেও ফুলশয্যাতে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা এ পাড়া-ঘরে কেন, কলকাতাতেও কেউ কখনও কল্পনা করেছে কিনা সন্দেহ।

ক্ষীর-মুড়কি এবং হাতের সুতো খোলার পালা শেষ হবার পর, হঠাৎ দেখা গেল মেজবৌ নেই।

সামান্য একটু খোঁজাখুঁজির পরই সবাই চলে গেল ঘর থেকে। সকলের মুখেই একটু চাপা হাসি। অর্থাৎ মেজবৌয়ের অন্তর্ধানের ব্যাপারে কারুর তেমন কোন দুশ্চিন্তা নেই। কারণটা সকলেই অনুমান করে নিতে পারে।

দেখা গেল সকলের সঙ্গে ছোট কর্তারও ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় নি। সবাই চলে গেলে দুর্গাপদ তড়াক করে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলে, তার পর হেঁট হয়ে তক্তপোশের তলা থেকে টেনে বার করলে কালো-কাপড়-মুড়ি দেওয়া প্রমীলাকে। এই গরমে পুঁটুলির মত বসে থেকে আধ-সেদ্ধ হয়ে গেছে সে।

খুব এক চোট হাসাহাসি হল বৈকি।

এমন কি কনে-বৌও ওপাশে মুখ ঘুরিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেললে।

টেনে বাইরে এনেও আসামীকে শক্ত করে ধরে ছিল দুর্গাপদ; বেঁকে চুরে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে দরজার কাছে পৌঁছল প্রমীলা, 'বেশ ভাই বেশ, আপদবালাই চললুম, মনের সুখে পীরিত কর—হল তো?'

কিন্তু দুর্গাপদ তারও আগে গিয়ে বন্ধ কপাটে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল।

'উঁহু, তা হবে না। ছিলে যখন, এখানেই থাকতে হবে।'

'ছাড় ছাড়, কী ইয়ার্কি হচ্ছে।'

'ইয়ার্কি আবার কি? থাকই না।'

'হ্যাঁ, তোমার ফুলশয্যেয় আমি কাঁটা হয়ে থাকি আর কি। ছোট বৌ শাপমন্যি দিক শেষে!'

'ফুলে তো কাঁটা থাকেই, এ আর এমন নতুন কথা কি? না হয় কাঁটাই হয়ে থাকলে।'

'এই ছাড়, সত্যি। লোকে কি বলবে। ছোট বৌই বা কি মনে করবে। ফুলশয্যের রাত বলে কথা, এ তো আর ওর জীবনে দু বার আসবে না।'

'লোকে আবার কি ভাববে। আর এক জন মানুষ তো আছে। এসো সবাই মিলে গল্প করে কাটিয়ে দিই। কতটুকুই বা রাত বাকী আছে। এসো, এসো!'

এক রকম জোর করেই হাত ধরে বিছানার কাছে টেনে আনে দুর্গাপদ। হয়তো প্রমীলাও শেষ পর্যন্ত খুব জোর দেখায় না। ছোট বৌকে মাঝখানে ঠেলে দিয়ে এক পাশে শুয়ে পড়ে সত্যি-সত্যিই।

তার পর ওরা দু জনে বেশ গল্প জমিয়ে তোলে। এটা-ওটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা। বিয়ে-বাড়িতে সমাগত আত্মীয়-কুটুম্বিনীদের বিচিত্র আচরণ নিয়ে হাসিঠাট্টাই বেশী। মনে হতে লাগল ওদের মাঝখানে আড়ষ্ট কাঠ-হয়ে-শুয়ে-থাকা আর একটি মেয়ের অস্তিত্ব ওরা ভুলেই গেছে।

বাইরে যারা আড়ি পাতবার আশায় ছিল, আড়ষ্ট হয়ে গেছে তারাও। এমন অভাবনীয় কাণ্ড আর এমন প্রচণ্ড দুঃসাহস স্মরণকালের মধ্যে কেউ কখনও শুনেছে বলে কারুর মনে পড়ে না। আড়ি পাতবার মজাটা না হওয়ায় তাদের আক্রোশ আরও বেশী। কিন্তু সে শুধুই ব্যর্থ আক্রোশ, মেজ বৌকে যে তাদের কোন আঘাত কখনও লাগবে না, তা তারা জানে।

ছোট বৌ তরলার ঠিক কি অনুভূতি হচ্ছিল, তা বলা শক্ত। দুঃখ বা বেদনার চেয়েও বেশী যেটা, সেটা বিস্ময়! এক রকমের নাম-না-জানা আতঙ্ক-মিশ্রিত বিস্ময় শুধু! পনেরো বছর বয়স হল তার, এর মধ্যে বহু মেয়ের ফুলশয্যার বহু বিবরণ সে শুনেছে, কৈ কোনটার সঙ্গেই তো মেলে না এ অভিজ্ঞতাটা! এ তার কী হল?

অবশ্য মেজ বৌ সকাল পর্যন্ত রইল না ওদের ঘরে। হাসিগল্পের মধ্যেই দূরের চটকলে চারটের ভোঁ বাজা শুনতে পেয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ

এক লাফে উঠে, দুর্গাপদ ব্যাপারটা কি বোঝবার বা বাধা দেবার আগেই, বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কপাটটায় শেকল তুলে দিলে।

তার পর এক মুহূর্ত সেইখানে দাঁড়িয়েই ইতস্তত করল। মেজকর্তা নিশ্চয় দোর দিয়েই ঘুমোচ্ছে, ডাকাডাকি করতে গেলে বাড়িসুদ্ধ জেগে উঠবে। এত হাঙ্গামা করে লাভ নেই, ওপাশের দালানে বিছানা করে ওর বড় ননদ ঘুমোচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত সেইখানেই গিয়ে এক পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

রতনের বাড়ি কান্তি সুখেই আছে বলতে হবে, কিন্তু শান্তিতে নেই। অথচ কেন যে শান্তিতে নেই, কেন যে সে সর্বদা একটা অস্বস্তি বোধ করে—তা সে নিজেও তেমন ভাল করে বুঝতে পারে না।

রতনদি তাকে খুবই যত্ন করে অবশ্য। পাছে আশ্রিত মনে করে ঠাকুর-চাকররা অবহেলা করে বা তাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত ভাবে—এই জন্যে সে ছুটির দিনে দুপুর বেলায় কান্তিকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসে। কারণে অকারণে মোক্ষদাকে উপলক্ষ করে সবাইকে শুনিয়ে বলে, 'দেখিস—কুটুম মানুষ, যত্ন করিস। নিন্দে না হয়!'

রতনদি মানুষ ভাল, খুবই ভাল। এমন মিষ্টি কথাবার্তা, এমন সস্নেহ মধুর ব্যবহার কান্তির কাছে অবিশ্বাস্য। রতনকে দেখে বড়লোক সম্বন্ধে ধারণাটাই তার পালটে যাচ্ছে। বড়লোক বলতে কান্তিরা এত কাল সরকারদেরই জানত, এখানে এসে কান্তি বুঝেছে যে এরা সরকারদের চেয়ে ঢের বড়লোক। কিন্তু তবু তাদের মত একটুও নয় তো! সরকার-বাড়ির ছেলেমেয়েদের দেখে ওর মনের মধ্যে বড়লোকত্বের সঙ্গে রূঢ় কর্কশ কথা এবং উদ্ধত অবহেলা অঙ্গাঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। তাই, এখানে এসে প্রথম প্রথম এদের, বিশেষত রতনদির কতাবার্তা শুনে, তার সঙ্গে সংসারের চারিদিকে ছড়ানো প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের চিহ্নগুলোকে খাপ খাওয়াতে পারত না। সবটাই যেন মাথার মধ্যে গুলিয়ে যেত।

তবু রতনদি যেন কেমন!

ওর মধ্যে যেন দুটো মানুষ আছে।

একটা দিনের বেলা—মানে বেলা আটটার পর থেকে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত তার সঙ্গে সদয় মধুর ব্যবহার করে; মিষ্টি কথা বলে, লেখাপড়ার খোঁজ নেয়, কত কি গল্প বলে, ভাল ভাল বই থেকে গল্প পড়ে শোনায়—ওর সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখে; কিন্তু রাত আটটা বাজলেই অন্য একটা মানুষ যেন ওর মধ্যে ভর করে। সে যেন একেবারে আলাদা। তাকে দেখে

ভয় হয় এবং বলতে নেই—ভাবতে গেলে মনের মধ্যে একটু লজ্জাই অনুভব করে কান্তি—ঘৃণাও হয়।

রতনদিও তা জানে বোধ হয়। সে তেতলার একটা ছোট্ট ঘরে কান্তির থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এবং প্রথম দিনই বলে দিয়েছে—'সন্ধ্যের পরই তোমার ঘরে উঠে যেও, লক্ষ্মী ভাইটি। বিশেষ দরকার না পড়লে নীচে নেমো না। রাত্রের খাবার যাতে আটটার মধ্যেই হয়ে যায় বামুন ঠাকুরকে বলে দিয়েছি—খেয়েদেয়ে ওপরে চলে যেও—পড়াশুনো করে ঘুমিও। ভয় পেও না, মোক্ষদাকেও এখন থেকে রাত্তিরে ওপরে শুতে বলেছি। তোমার পাশের ঘরেই সে থাকবে—ভয়-টয় পেলে তাকে ডেকো!'

তার পর একটু থেমে ঢোঁক গিলে বলেছে যে—'তোমার ভগ্নীপতি বড় রাগী মানুষ, তা ছাড়া কারণে-অকারণে বড় হৈ-হল্লা করে—তাই হয়তো চেঁচামেচি শুনবে, কিন্তু তাতে ভয় পেও না। নীচে নামবারও দরকার নেই। কী জানি কি মেজাজে থাকবে, কোনদিন কি বলবে-টলবে—সে তোমারও অপমান আমারও অপমান! দরকার কি?'

কান্তি সে নির্দেশ সাধ্যমতই পালন করত অবশ্য। ইস্কুল থেকে ফিরে দোতলায় রতনদির ঘরে বসে একটু-আধটু গল্প করত—তার পর সন্ধ্যে হলেই ওপরে গিয়ে পড়তে বসত। সাড়ে সাতটা নাগাদ মোক্ষদা আসত ডাকতে—'খাবে চল গো দাদা, তোমার খাবার হয়ে গিয়েছে।' এক বার গিয়ে খেয়ে আসত নীচে থেকে। তার পরই যে ওপরে এসে ঢুকত—আর বড় একটা নামত না। কেবল প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এক-আধ দিন নামতেই হত—সে দৈবাৎ, কিন্তু তাতেই সে নীচের একটা বীভৎস জীবনের আভাস পেত। শুধু হৈ-হল্লা চেঁচামেচি নয়—আরও সব কত কি। কী একটা উগ্র গন্ধও পেত, প্রথম দিন সে গন্ধে বমি এসে গিয়েছিল ওর। অনেকদিন পরে মনে পড়েছিল—এই গন্ধ এক দিন ও শিবপুর থেকে মার সঙ্গে হেঁটে ফিরতে ফিরতে পেয়েছিল। ওদের পাড়ারই পেঁকো মল্লিক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল কেমন একরকম টলতে টলতে—তার গা থেকেও এমনি গন্ধ পেয়েছিল। মা বলেছিল, 'উঃ, পেঁকো মল্লিক মদ খেয়েছে!' এটাও তাহলে মদের গন্ধ।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, 'রতনদির বর মদ খায়! ছিঃ!'

একটু দুঃখও হয়েছিল তখন, 'ঐ জন্যেই রতনদি নীচে নামতে বারণ করে। লজ্জা পায় বলে। আহা বেচারী!

কিন্তু যেদিন আবিষ্কার করল যে শুধু রতনদির বর নয়—রতনদিও নেশা করে, ওর সেদিনের দুঃখ ভোলবার নয়।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে, কান্তির দু চোখে ঘুম এসেছে জড়িয়ে। মোক্ষদা অবশ্য শেজ-এর আলোটা জেলে দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ—এটা সারা রাত জলে, কান্তি আসার পর রতনই এ ব্যবস্থা করে দিয়েছে, বলে, 'ছেলেমানুষ একা শোবে, আলো না থাকলে ভয় করবে'—সুতরাং হাত বাড়িয়ে ওর পড়বার আলোটা নিবিয়ে দিয়ে চোখ বোজার অপেক্ষা, আর কিছুই করবার নেই। তা-ই করতে যাবে, হঠাৎ নীচে বিরাট একটা হৈ-চৈ গণ্ডগোল উঠল। এসব অবশ্য আজকাল ওর কতকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, এমন কি রাশি রাশি কাচের বাসন বা বোতল ভেঙে পড়বার শব্দেও বড় একটা ওর শান্তিভঙ্গ হয় না—তবে আজকের এ হৈ-হল্লাটা যেন বিশেষ রকম। অভ্যস্ত শব্দগুলো আজ একটু বেশী হচ্ছে—তাতেও হয়তো কান্তি অত বিচলিত হত না; কিন্তু—কে কাঁদছে না? আর একটু কান পেতে শুনতেই মনে হল—রতনদিই কাঁদছে।

আর চুপ করে থাকতে পারলে না কান্তি, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে নেমে এল। নীচে আসতেই নজরে পড়ল, ওরই ঘরের সামনে বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে রতনদি—কপালটা কাটা, তা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে বুকের কাছে কাপড়টা পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠেছে। চারিদিকে ভাঙা ডিশ ও বোতল ছড়ানো। ভেতর থেকে কে এক জন জড়ানো জড়ানো গলায় তখনও চেঁচামেচি করছে। ঠাকুর-চাকররা ছুটে এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছে, আর মোক্ষদা এসে হাত ধরে টানছে রতনদিকে। শুধু—ওরই মধ্যে এক ফাঁকে দেখে নিলে কান্তি, নীচে কর্তাঠাকুরের ঘরে তখনও আলো জলছে, কিন্তু তিনি বেরিয়ে আসেন নি।

রতনকে ঐ অবস্থায় দেখে কান্তি আর থাকতে পারলে না, কাচ বাঁচিয়ে খানিকটা এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলে, 'কী হয়েছে রতনদি, কেটে গেল কী করে?'

রতন কান্না থামিয়ে উগ্র কণ্ঠে ওকে তেড়ে উঠল, 'তুই কেন রে ছোঁড়া এখানে? এক শ বার বলেছি না নীচে নামবি না!—এঁচোড়ে-পাকা হয়ে

উঠেছ এরই মধ্যে? বালামচালের ভাত* পেটে পড়তে না পড়তেই পিপুল পেকে গেছে?…যা বেরো—ওপরে যা! ফের যদি ডেঁপোমি করতে আসবি তো দূর করে দেব—যেখানে ছিলি সেখানে!'

ভয়ে, অপমানে, লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পা পা করে পিছিয়ে গেল কান্তি। কিন্তু তবু তারই মধ্যে একটি জিনিস লক্ষ্য করে গেল—রতনদির মুখেও সেই বিশ্রী গন্ধটা। তারও পা টলছে!

তা হলে রতনদিও!

চোখের ঘুম কোথায় চলে গেল ওর। বহু রাত্রি পর্যন্ত ছাদে জেগে বসে রইল কান্তি। প্রথমে অপমানটাই খুব লেগেছিল ওর, ওরও কান্না পেয়ে গিয়েছিল—দাসী-চাকরের সামনে এ কী অপমান! সে যে আশ্রিত, সে যে অন্নদাস, নিরুপায়—যে কথাটা রতনদি নিজেই এত দিন ঢাকবার চেষ্টা করত, সেইটেই প্রচার করে দিলে নিজেই! এর পর ওরা কী চোখে ওকে দেখবে—কি করুণা ও বিদ্রূপের চোখে—সেইটে কল্পনা করেই ওর কান মাথা গরম হয়ে উঠল, চোখ ফেটে জল এল। অপমান ও লাঞ্ছনা ওদের নতুন নয়—কিন্তু এখানে এসে এত আদরযত্ন এত সম্মান পাবার পর এ আঘাতটা যেন বড় বেশী বাজল!

নীচের গোলমাল শান্ত হয়ে এসেছে। মোক্ষদা ঝাঁট দিয়ে ভাঙা কাচগুলো সরাচ্ছে আস্তে আস্তে—নীচে রান্নাঘরে সামান্য খুটখাট আওয়াজ, ঠাকুর দ্রুত কাজ সেরে নিচ্ছে তার। একটু পরেই ওদেরও খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবে—বাড়ি শান্ত ও নিস্তব্ধ হয়ে আসবে।

তবু ঘুম এল না কান্তির। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবার পর নিজের অপমানের জ্বালাটা গেছে, কিন্তু রতনদির কথাটা ভুলতে পারছে না। কান্নার ফলে রগের পাশ দুটো দপ্ দপ্ করছে, মাথাটা ধরে উঠেছে—তবু ঘুম নেই।

আর একটু পরেই মোক্ষদা শুতে এল। হাতে অভ্যস্ত কেরোসিন তেলের পাত্র। শোবার আগে হাজায় দিতে হয় ওর। কিন্তু কান্তিকে দেখে আর ঘরে গেল না, সেইখানেই পা ছড়িয়ে বসল পায়ে তেল দিতে।

'ওমা, এখনও ঘুমোও নি বুঝি দাদাবাবু? আহা, দিদির ব্যাপারটা বড়

* সেকালে বাখরগঞ্জ বা বরিশালের বালামচাল কলকাতায় খুব বেশী চালু ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এর চলন কমতে থাকে। কিন্তু নামটা ছিল অনেক দিন।

নেগেছে, না? তা তুমি ওসব গায়ে মেখো নি, বুঝলে? ওকি আর ও বলেছে, নেশায় বলিয়েছে। নইলে মানুষ তো ছাখো—ঐ সব কথা বলবার কি মানুষ? এই বাপু তোমাকে বলা রইল, নীচে যাই হোক না কেন, অক্তগঙ্গা কি পেলয় ঘটে যাক—তুমি নীচে নেমো নি!'

কান্তি আর থাকতে পারলে না, আস্তে আস্তে মোক্ষদার পাশে এসে বসে প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা রতনদি ঐসব ছাইভস্ম নেশা করে কেন মোক্ষদাদি? ওতে যে শুনেছি শরীর খারাপ হয়ে যায়। মানুষ আর মানুষ থাকে না!'

'করে কেন! আ আমার কপাল!' ফিস ফিস করে বলে মোক্ষদা, 'ও কি আর সাধ করে করে? ওকে যে জোর করে করায়! কী করবে বল! আগের যে বাবু ছেল সে ছেল দেবতা। আসত যেত কাকে-পক্ষীতে টের পেত নি! আত নটার পর আসত, ওদিকে আত থাকতে থাকতেই চলে যেত।…কপাল খারাপ তাই সে বাবু গেল।…তা কি দুটো দিন নিস্তার আছে. কি একটু খোঁজখবর করে বেছেবুছে নেবার জো আছে? ঐ যে দত্যিদানা আছে ঐ নীচের ঘরে শুয়ে—মুয়ে আগুন, মাকণ্ডির পেরমাই নিয়ে এসেছে যেন, মরণও নেই! না ওর না ঐ মাগীর—বসে বসে মেয়ে-বেচা পয়সায় খাচ্ছে, তবু মরবার নাম নেই।…ঐ মিন্‌সে গো—ঐ কত্তাবাবু কি চোখে-কানে দেখতে দিলে, আত না পোয়াতে পোয়াতে নিজে কক্করে দুটি হাজার টাকা গুণে নিয়ে এই মিন্‌সেকে জুটিয়ে দিলে। এ কি মানুষ, আক্কস! নিজে পিপে পিপে মদ গিলছে, মেয়েটাকে সুদ্দু মাতাল করে ছাড়ছে! নইলেই মেজাজ, ভাঙবে চুরবে মারধোর করবে—যাচ্ছেতাই কাণ্ড, বেলেল্লাগিরির একশেষ। তবে হ্যাঁ—দুটো গুণ আছে, পয়সা ঢা... অজচ্ছল, একটা ভাঙলে তিনটে পাঠিয়ে দেবে পরের দিন আর ভোরটি হবে, দুটি কাপ চা গিলবে পর পর—তার পরই পালাবে। মেয়েটার ছুটি, পরের দিন আত আটটার আগে আর টিকি দেখাবে না। ছুটির দিনেও দোপরে আসে না। সেখানে নাকি এক খাণ্ডারনী আছে, তাকেও ভয় করে খুব শুনেছি!'

মোক্ষদা বোধ করি নিঃশ্বাস নেবার জন্যেই থামল একটু।

কান্তির তখন মাথা ঘুরছে যেন। এসব কথা ওর কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য, জটিল!

'বুড়োকত্তা' অর্থাৎ রতনদির বাবা এক জন আছেন বটে—শুনেছে, ঠাকুরের আর মোক্ষদার কাছেই শুনেছে, বড্ড বদ্‌মেজাজী রাগী—সেই জন্য তাঁর ত্রি-

সীমানায়ও যায় না কান্তি। আর বুড়ো-মত মেয়েছেলেও এক জন আছেন—তিনিই নাকি রতনদির মা—রোগা ক্ষয়া-ঘষা একরত্তি। তাঁকে এক দিন মাত্র দেখেছিল, তিনি নাকি ঠাকুরঘরের বাইরে বেরোন না। তিন-চার দিন অন্তর সামান্য হবিষ্যি খান। মোক্ষদা বলে, 'বেরোয় না তাই বেঁচে গিয়েছি। যা ছুঁচিবাই, মাগো, তাইতেই আমার এই হাতেপায়ে ঘা ধরে গেছে। নিত্যি বেরোলে তো পাগল হয়ে যেতুম!'

কান্তির কানে গেল মোক্ষদা কেরোসিন তেল পায়ে ঘষতে ঘষতে তখনও বলে চলেছে, 'তেমনি জব্দ হয়েছে মিন্‌সে। আগে ওঁরও অমনি ছিল, কথায় কথায় আগ, কথায় কথায় দম্ভযিয্, থালাবাসন ছোঁড়াছুঁড়ি—এ বাবু আসবার পর একেবারে কেঁচোটি।' এক দিন কি করেছিল চেঁচামেচি, অমনি তেড়ে নীচে গিয়ে বলে দিলে, "দ্যাখো, চুপচাপ থাক তো থাক, নইলে দারোয়ান দিয়ে বার করে দেব। মেয়ের পয়সায় খাচ্ছ, অত আবার মেজাজ কিসের? নজ্জা করে না?"—সেই দিন থেকে একেবারে ঠাণ্ডা! থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে তো!···বেশ হয়েছে। মুয়ে আগুন। অমন বাপের মুখে নুড়ো জেলে দিতে হয়!'

কান্তির কিন্তু এসব কথায় তত কান ছিল না। তার মনের মধ্যে যে সমস্যাটা প্রবল হয়ে উঠেছিল সেইটেই আর চেপে রাখতে পারলে না। আস্তে আস্তে বললে, 'আচ্ছা মোক্ষদাদি আগের বাবু এ বাবু কি আলাদা?···মানে রতনদির কি দুটো বিয়ে?'

'বে!' মোক্ষদা যেন থতমত খেয়ে যায়, 'হ্যাঁ তা বে-ই বলতে পার।···আমার হয়েছে যেন মরণদশা, কি বলতে যে কী বলে ফেলি। মুয়ে আগুন, বুড়ো হয়ে মরতে চললুম এখনও হস্যিদীগ্যি জ্ঞান হল না। মুখে লাগাম এল না।···হেই দাদাবাবু এসব কথা যেন ঘুনাক্ষরে বলো নি কাউকে—তা হলে আমার চাকরি থাকবে না। মরে যাব একেবারে। সাত দোহাই তোমার!'

মোক্ষদা কেরোসিনের হাতেই কান্তির হাত দুটো চেপে ধরে।

তাড়াতাড়ি হাতটা টেনে নিয়ে সে বলে, 'ছি! কী ভাব আমাকে তুমি মোক্ষদাদি! আমি এসব কথা কাকে বলতে যাব? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি কাউকে বলব না!'

'দেখো বাপু!' তার পর নিজের গালে নিজেই দুই চড় মারে মোক্ষদা, 'এই, এই!···এই নাককান মলা খাচ্ছি।···তবু যদি চৈতন্যি হয়!'

তার পর নীরবে আর কিছুক্ষণ পায়ে তেল ঘষে মোক্ষদা প্রচণ্ড একটা হাই তুলে বলে, 'যাই, আবার তো সেই ভোরে উঠে চোদ্দ বাটি চা দেওয়া। বলি দাসী-চাকর তো পঞ্চাশ গণ্ডা! অথচ যা কিছু সবই তো এই মুকী ছাড়া চলে না! দেখছ তো নিজের চোখে?'

॥ ২ ॥

কিন্তু শুধু রাত্রেই নয়, সকালেও স্নানের আগে পর্যন্ত রতনদির মেজাজ যেন কেমন থাকে। কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে না কান্তি। সাতটায় ওঠে, বিছানা থেকেই চা খেয়ে আটটা নাগাদ কলঘরে ঢোকে, বেরোয় পুরো দেড় ঘণ্টা পরে। তখন একেবারে নতুন মানুষ। কিন্তু বিছানা থেকে ওঠবার পর আর কলঘরে ঢোকার আগে অবধি মেজাজ যেন চড়েই থাকে। যাকে সামনে পায় খিঁচোয়, ঝি-চাকরদের সঙ্গে বকাবকি করে, তুচ্ছ কারণেও রেগে আগুন হয়। এক দিন সেই সময়টা নিতান্ত প্রাকৃতিক কারণেই কান্তিকে নীচে নামতে হয়েছিল, ওর সামনে পড়তেই যেন তেড়ে মারতে এল, 'এই ছোঁড়া, দিন নেই রাত নেই তুই যখন-তখন নীচে ঘুরঘুর করিস কেন বল্ তো? পড়াশুনো নেই তোর? মা এই করতে পাঠিয়েছে এখানে?'

কান্তি তো আড়ষ্ট। প্রথমটা ভয়ে কথাই বেরোয় না, অতিকষ্টে বললে, 'না—আমি তো মানে এই আজই—'

'আজই!' ভেঙিয়ে বলে রতন, 'আজই! যেদিন দেখি সেইদিনই আজ! না? যা পড়তে বস গে যা!'

প্রাকৃতিক কাজটা মাথায় তুলে ফিরে আসতে হয়েছিল কান্তিকে।

কিন্তু একটু পরেই রতন কলঘরে ঢুকল। মোক্ষদাকেও রোজ প্রথমটা ঢুকতে হয় ওর সঙ্গে, তারই মধ্যে এক ফাঁকে সে ওপরে উঠে বলে গেল, 'যাও গো দাদা, এবার নীচেয় চলে যাও। আর কিছু বলবে না, চান করে যখন বেরোবে—তখন দেখো নতুন মানুষ!'

সত্যিই তাই। স্নান করে ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম সেরেই রতন ওর ঘরে এসে দাঁড়ায়, 'কান্তি কিছু মনে করিস নি ভাই।' বলে হঠাৎ পাশে বসে পড়ে দুটো আঙুলে করে ওর দাড়িটা তুলে ধরতেই কান্তি আর সামলাতে পারে না নিজেকে, ওর চোখে জল এসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল হয়ে রতন নিজের

মূল্যবান ধোপদস্ত ফরাসডাঙ্গার শাড়ির আঁচল দিয়েই ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে, 'এই ত্যাখো ··পাগল! একেবারে চোখে জল এসে গেল!···ওরে তখন বড্ড মাথা ধরেছিল, কী বলছি কী করছি—সে কি জ্ঞান ছিল কিছু?·· রাগ করিস নি লক্ষ্মীটি!'

আরও অনেক মিষ্টি কথা বলে চলে গিয়েছিল রতন।

কান্তির কাছে এ আচরণ বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু বুঝিয়ে দেয় মোক্ষদাই—সন্ধ্যেবেলা এক ফাঁকে এসে হঠাৎ পা ছড়িয়ে বসে বলে, 'সকালে বুঝি গিন্নী এসে আবার তোমার কাছে ঘাট মেনে গেল? · দেখলে? আমি বলি নি তোমাকে যে চান করে বেরোবে নতুন মনিষ্যি!'

'আচ্ছা অমন কেন হয় মোক্ষদাদি?' প্রশ্ন না করে পারে নি কান্তি।

'ওরে বাবা, সকালে যে মাথা ধরে থাকে। পেচণ্ড মাথাধরা, ও আমি জানি যে!···দিনকতক আমার মানুষও ঐসব ছাইভস্ম ধরিয়েছিল কিনা··· ঐ ত্যাখো আবার কি বলতে কী বলে ফেলি। মরণদশা আমার!'

'রোজ মাথা ধরে থাকে?'

'রোজ! পেত্যহ!··আসল কথা খোঁয়াড়ি ভাঙে না তো! আবার যদি সকালে একটু ঢুকুঢুকু চালাত তো চাঙ্গা। তা তো চালায় না। ঐ চান করে দেড় ঘণ্টা ধরে, কলের নীচে মাথা পেতে বসে থাকে—অন্তত দশ-পনেরো মিনিট—তবে ছাড়ে। তখন আবার মনিষ্যিজন্ম ফিরে আসে!'

একটু চুপ করে থেকে কান্তি বলে, 'আচ্ছা অতক্ষণ ধরে জলে থাকেন অসুখ করে না?'

'অব্যেস। তবে আর অব্যেস বলেছে কেন? অব্যেসে সব হয় রে ভাই!'

'ওঁর সঙ্গে তুমিও থাক কেন?'

'ওমা তেল মাখাতে হয় যে! চান করার কত পব্ব তা তো জান না। ঐ যে দেখছ মাছি-পিছলে পড়ছে ভেলভেট সাটিংয়ের মত মোলাম চামড়া, ওকি অমনি হয় নাকি? কত ছেলাবত ওর, অমন ছেলাবতে থাকলে আমাদের চামড়াও অমনি হত! শোন, পেথম তো আমি সুদ্দ কলঘরে ঢুকে তেল মাখাতে বসব—অমন একটি ঘণ্টা ধরে চুপচুপে করে তেল মাখবে, ঐ যে কলঘরে বড় সাদা পাথরের জলচৌকি আছে, দেখেছ তো? ওটা শুধু তেল মাখবার জন্যেই। তার পর বেসম দিয়ে সেই তেল আবার তুলতে হবে। তার পর তো আমি বেরিয়ে আসব, উনি তখন বেশ করে সাবান মাখবেন।

তার পর চান-টান সারা হলে গা মাথা মুছে গন্ধ-তেল মাখা হবে। গায়েও সেই তেল পড়বে, তবে আল্‌তো। তার পর আবার দু-চার ঘটি জল গায়ে ঢেলে গা মুছে তবে বেরোবে। ছাখ না—যখন বেরিয়ে আসে কেমন ভুরভুর করে খোসবো—গা থেকেও অমনি খোসবো বেরোয়!'

তার পর উঠে যেতে যেতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কতকটা স্বগতোক্তিই করে মোক্ষদা, 'যে ব্যবসার যা! নইলে পয়সা আসবে কেন?'

সত্যিই—রতনদির গায়ের চামড়া একটা দেখবার মত—ভাবে কান্তি, তার মাও তো কত ফরসা, মেজদির তো কথাই নেই, কিন্তু অমন চামড়া কারুর নয়।...ঐ জন্যেই অত বড় কলঘর লাগে রতনদির—ঐ কলঘরে রতনদি আর জামাইবাবু ছাড়া কারুর যাবার হুকুম নেই। এক দিন শুধু ঢুকে দেখেছিল কান্তি। কী বড়—একেবারে একটা শোবার ঘরের মত। এক দিকে চৌবাচ্চা, ঝাঁঝরি কল, তার মধ্যেই এক কোণে একটা চেয়ারের মত—ঐটে নাকি পাইখানা। জলচৌকিই আছে দুটো। একটা কলের নীচেই—আর একটা শ্বেতপাথরের চৌকি, কিছু দূরে। এক ধারে তাকে সাজানো সার সার তেল সাবান—আরও কত কি, শিশিতে শিশিতে কৌটোয় কৌটোয়! একটা মানুষের এত কি লাগে চান করতে ভেবে পায় না কান্তি। তার মা-দিদিরা তো মাথার মাঝখানে একটু তেল থাবড়ে দিতে দিতে ছোটে পুকুরঘাটে। তাই মেজদির কি মেঘের মত এক ঢাল চুল!...

মোক্ষদার শেষ কথাটা ভাল বুঝতে পারে না কান্তি—ওটা কি বলে গেল? মোক্ষদাদিটা আস্ত পাগল!

॥ ৩ ॥

কিন্তু ক্রমশ একটু একটু আঁচ পায় বৈকি!

আশপাশের বাড়িগুলোও যেন কেমন কেমন। দিনের বেলা সব নিথর—চুপচাপ। রাত হলেই জেগে ওঠে। ঘরে ঘরে আলো, হাসি-তামাশা, মধ্যে মধ্যে কোন কোন বাড়ি থেকে গানবাজনারও শব্দ আসে। কিন্তু আবার সকাল হলেই ভোঁ ভাঁ, নিবান্ধাপুরী। সেই রূপকথার ঘুমন্ত দেশের মত।...তা ছাড়া কোন বাড়িতেই যেন পুরুষ নেই—থাকলেও দু-এক জন। পুরুষ বলতে চাকর—তাও ঝিই বেশী। তারাই বাজার করে, তারাই দোকানে

যায়, সব। এক-একটা বাড়িতে বোধ হয় অনেক ঘর ভাড়াটে থাকে, এক ঝিই কিন্তু সব ভাড়াটের বাজার করে। সে এক মজার কাণ্ড, কত দিন ইস্কুল যেতে যেতে দেখেছে কান্তি, ওধারের বড় রাস্তায় কারুর রকে বসে হিসেব মিলোচ্ছে। একটা ঝি তো পেয়ে বসেছে তাকে, দেখতে পেলেই ডাকবে, 'ও খোকা শুনে যাও, লক্ষীদাদা আমার—হিসেবটা একটু বুঝ্ করে দিয়ে যাও না!' আসলে সবার বাজার থেকেই চুরি করে—কান্তি হিসেব 'বুঝ করতে' গিয়েই বুঝে নিয়েছে। পাছে ওখানে গিয়ে হিসেব গোলমাল হয়ে যায় তাই রাস্তা থেকে হিসেব বুঝে চুরির পয়সা আলাদা পেটকাপড়ে বেঁধে নেয়। যা ফেরত পয়সা হবে—তাও আলাদা নেয়, তার পর বাড়ি ফিরে সেই নতুন হিসেব বুঝিয়ে দেয়। এক-এক দিন কান্তির মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে বলে, 'দুটো পয়সা এই থেকে না সরালে খাব কি বল দাদা? পেটটা চলা চাই তো! মাইনে যা দেয় তা তো বুঝতেই পার। তা থেকে আর কত পয়সা জমে! বলি গতর যতদিন আছে ততদিনই, তার পর কি আর কেউ পুছবে, না বসিয়ে খাওয়াবে? তখন খাব কি?···তাই কী আর এমন হয়, এখন সব স্যায়না হয়ে গেছে। আর বাজারও তো ভারি, চার গণ্ডা পাঁচ গণ্ডা পয়সার বাজার জনাযাতের—তা থেকে দুটো পয়সা রাখতেই কষ্ট হয়!'

তবু পাড়াটায় যে কোন বিশেষ 'চিহ্ন' আছে তা কান্তি বুঝতে পারে নি অনেক দিন। এক দিন হঠাৎ কী কথায় কথায় ওর ক্লাসের একটা ছেলে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'তুই কোথায় থাকিস রে কান্তি?' কান্তি সরল ভাবেই পথটার নাম বললে। অকস্মাৎ আশেপাশে যারা ছিল—পাঁচ-ছ জন ছেলে বেশ জোরে হেসে উঠল। তার পর কেমন একটা যেন নতুন কৌতূহলে চেয়ে রইল ওর দিকে, তখনও তাদের ঠোঁটের কোণে ঈষৎ কৌতুকের হাসি!

সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন ওদের এক মাস্টারমশাই—ধীরেনবাবু, বিরাট গোঁফ, প্রথমটা দেখলেই ভয় করে—কিন্তু ভারি ভালমানুষ—তিনি যেন বাতাসে কি একটা অঘটন টের পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে একটা ছেলেকে প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে রে জগু?'

জগু মুচকি হেসে বললে, 'কিছু না স্যার; এই কে কোথায় থাকে, তাই জানা হচ্ছিল। কান্তি স্যার রামবাগানে থাকে!'

'আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, এঁচোড়ে-পাকা ডেঁপো ছেলে সব। ফের যদি এই-

সব প্রাইভেট কথা নিয়ে আলোচনা শুনি তো পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেব এক-একটার বেতের চোটে !'

তখনকার মত সবাই চুপ করে গেল—কিন্তু কান্তির পিছনে যে তাই নিয়ে আরও অনেকক্ষণ হাসাহাসি এবং গুজগুজ চলল তা কান্তি বেশ টের পেলে।

টিফিনের সময় ধীরেনবাবু ওকে এক ফাঁকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে দিলেন, 'তোমাকে যদি কেউ বাড়ির ঠিকানা-টিকানা জিজ্ঞেস করেন তুমি আসল ঠিকানা বলো না।'

'কেন' সে কথাটা আর জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না কান্তির। সে কেমন করে যেন বুঝল যে এর মধ্যে একটা গণ্ডগোল আছে। শুধু বলল, 'তা হলে কী বলব ?'

'যা হোক বলো—বিডন স্ট্রীট, কি মানিকতলা স্ট্রীট, যা হয় বলো ! ঠিক পথটার নাম বলো না !'

বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ ভাবল কান্তি, কথাটা রতনদিকে বলা উচিত হবে কি না। আপনা-আপনিই মনে হল ওর, হয়তো এর মধ্যে লজ্জার কোন কারণ আছে, রতনদি হয়তো দুঃখিত হবে। কিন্তু চেপেও রাখতে পারল না শেষ পর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা রতনদি ছাদে এসে ওকে কাছে ডেকে যখন আকাশের তারা চিনিয়ে দিচ্ছেন—তখন, ভয়ে ভয়ে—সংকোচের সঙ্গে হলেও, কথাটা বলেই ফেললে।

সব শুনে রতনদির মুখটা যে ম্লান হয়ে গেল তা সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারেই টের গেলে কান্তি। মনে মনে অনুতাপের শেষ রইল না ওর। কিন্তু তখন আর উপায় কি ? রতন খানিকটা চুপ করে থেকে বললে, 'মাস্টারমশাই ঠিকই বলেছেন ভাই, কেউ জিজ্ঞেস করলে তুমি বলো ঐ হেদোর কাছে থাকি, নিতান্ত কেউ ঠিকানা জানতে চাইলে মানিকতলা স্ট্রীটই বলো। এ পাড়াটার একটা দুর্নাম আছে ভাই। সেই জন্যেই তো তোমাকে অত দূরের ইস্কুলে ভর্তি করেছি। কাছাকাছি না থাকাই ভাল।'

কান্তি চুপ করে যায়। কিসের দুর্নাম সেটা প্রশ্ন করার ইচ্ছা থাকলেও করতে পারে না। মনে মনে বোঝে যে রতনদি তাতে আরও অপ্রস্তুত হবেন।

আরও নানা কারণে কান্তির এখানটা খারাপ লাগে।

এক দিন ইস্কুল থেকে ফিরছে. দারোয়ান ডেকে বললে, 'ও খোকাবাবু, শোন—তোমার বাবা এসেছিল!'

বুকটা ছাঁৎ করে উঠল ওর। বাবা এখানে!

কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারল না—অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল ওর, শুধু বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল।

দারোয়ান যা বললে তার সরল অর্থ হচ্ছে—ওর কাছ থেকে নরেন চার আনা পয়সা ধার নিয়ে গেছে। বলে গেছে যে, 'দিদিবাবুকে বলবার দরকার নেই, এই বাড়িতে আমার ছেলে থাকে কান্তি তার কাছে চাইলেই দিয়ে দেবে। বলো যে তার বাবার বিশেষ দরকার পড়েছিল নিয়ে গেছে। মানে আত্মীয়ের মধ্যেই তো—মিছিমিছি এই সামান্য কটা পয়সার জন্যে তোমাদের কত্তাবাবু কি দিদিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই না!'

শুনে পাথর হয়ে গেল কান্তি। মুহূর্তে ঘেমে উঠল সে। বয়স যতই কম হোক- এর মধ্যে যে অপমানটা আছে তা বোঝবার শক্তি ওর হয়েছে। খানিকটা আমতা আমতা করে বললে, 'কিন্তু আমি তো—আমার কাছে তো কিছুই পয়সা নেই দারোয়ানজী, আমার কাছে তো থাকে না!'

প্রায় কেঁদে ফেলবার মত অবস্থা তার।

দারোয়ান নিমেষে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললে, 'আচ্ছা আচ্ছা, তার জন্যে কিছু নয়। এ আমি দিদিবাবুকে বলতেও যাচ্ছি না। কটা বা পয়সা, দিলাম না হয় বাহ্‌মনকে! তুমি ভেবো না যাও। যখন তুমি লিখাপঢ়ি করবে, দফ্‌তরে নোক্‌রি করবে, তখন আমাকে গোটা এক টাকা দিয়ে দিও, কেমন?'

সে পিঠ চাপড়ে ভেতরের দিকে ঠেলে দিলে কান্তিকে।

অতিকষ্টে চোখের জল সামলে কান্তি শুধু বললে, 'কিন্তু তুমি আর কোন দিন এমনি দিও না দারোয়ানজী!'

'আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে!'

নিজের বাবার সম্বন্ধে এমন কথা বলা আরও লজ্জার, তবু না বলাও অনুচিত, এটা মনে মনে বোঝে কান্তি।···প্রকৃতিই কতকগুলো শিক্ষা দিয়ে দেয় মানুষকে।··

কিন্তু নরেন অত সহজে ছাড়ে না। আর এক দিন ইস্কুলে যাবার মুখে বড় রাস্তার মোড়টাতে দেখা।

'এই যে—ভাল হয়েছে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে—দে দিকি গণ্ডা-চারেক পয়সা !'

আজও যেন চোখে জল এসে যায় কান্তির, রাগে, দুঃখে, অপমানে—মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে ওর। তবু অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে বলে, 'আমার কাছে তো পয়সা থাকে না ! পয়সা আমি পাব কোথায় ?'

'সে কি রে ! অত বড়লোকের বাড়ি থাকিস, হাতে পয়সা নেই ? জল-খাবারের পয়সা দেয় না ?'

'না। সঙ্গে জলখাবার দিত—অত ছেলের সামনে খেতে লজ্জা করে বলে নিয়ে যাই না। তার পর পয়সা দিতে এসেছিল, আমি নিই নি। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দুপুরের ভাত থাকে—খাই। আমার জলখাবার দরকারই হয় না—অত বার খাওয়া তো আমার অভ্যেস নেই !'

'হুঁ। তা এদিক-ওদিক হাতাতে পারিস না কিছু ? তবে আর ওখানে পড়ে থাকবার মানে কি ?… ওখানে তো পয়সা গড়াগড়ি যায় শুনেছি !'

'যাক্ গে ! আমি কি চোর নাকি ?'

দুঃসহ রাগে সাহস বাড়ে কান্তির, আবারও বলে, 'আপনি খবরদার ওখানে আর যাবেন না—অমন করে চাকর-বাকরের কাছে পয়সা ভিক্ষে করেন কেন ? আমি বারণ করে দিয়েছি, এবার আর চাইলেও পাবেন না !'

'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে ! কস্‌বী-বাড়ির ভাত খেয়ে খুব ট্যাকটেঁকে কথা শিখেছ—লেখাপড়া যত হোক না হোক ! চড়িয়ে গাল লাল করে দেব একেবারে, আমাকে তো চেনো না !'

কিন্তু কান্তি আর ভয় পায় না। আশেপাশে লোক জমে যাচ্ছিল তাইতেই যা লজ্জা।

সে প্রায় মরীয়া হয়ে বলে ফেলে, 'ফের যদি আপনি কোনদিন ওখানে যান—আমি মা আর দাদাকে বলে দেব। দাদা কলকাতাতেই থাকে।'

নরেনের রুষ্ট ভাব নিমেষে বদলে যায়, 'ও, কলকাতাতেই থাকে বুঝি ?… চাকরি হয়েছে তা হলে ? কোথায় থাকে রে ? আপিসটা কোথায় ?'

'জানি না।' বলে কান্তি হন হন করে এগিয়ে যায়।

যেতে যেতেই শোনে, পিছনে দাঁড়িয়ে তার বাবা দাঁত কিড়মিড় করে বলছে, 'উঃ, কলের জল আর বালামচাল পেটে পড়ে বড্ড তেল হয়েছে ! তেল

বার করছি! গোরবেটার জাতকে যেদিন ধরব, সেদিন একেবারে শেষ করে দেব।…আমাকে তো চেনো না!'

দাদাকে বলে দেবার ভয় দেখালেও শেষ পর্যন্ত কে জানে কেন, বলতে পারে না। এর পরে যেদিন হেম ওর সঙ্গে দেখা করতে এল, মাঝে মাঝে আসে আজকাল, শুধু বললে, 'আমার কি অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা হয় না দাদা? এখানে—এখানে আমার ভাল লাগে না থাকতে! এরা অবিশ্যি যত্ন করে খুবই, কিন্তু তবু—কেমন যেন—'

হেম কি বুঝলে কে জানে, হয়তো কোন অপ্রিয় কথা শোনবার ভয়েই কিছু প্রশ্ন করলে না, খুব যত্ন করা সত্ত্বেও কেন ভাল লাগছে না সেটা জানতে চাইলে না। শুধু বললে, 'কী আর উপায়, দেখছি না তো। আমার যা মাইনে—তাতে তো কিছুই হয় না। মাসীর ওখানেও আর থাকার উপায় নেই। আর কিছু দিন কাদায় গুণ ফেলে থাক—একটা পাকা চাকরি-বাকরি না হলে কোথায় নিয়ে যাব বল্!'

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

হেম মুখে যাই বলুক, এ চাকরি ওর খুব ভাল লাগছে। মাইনে অবশ্য খুবই কম। আলাদা মেসে থাকতে হলে মাকে আর কিছু পাঠাতে পারত না। নিহাত বড় মাসীর কাছে আছে তাই। মাসে পাঁচ-ছ টাকা দিলেই চলে যায়। মাসী কিছু নিতে চান না—শ্যামারও ইচ্ছা নয় যে ওখানে কিছু খোরাকি দেয় হেম—উমা রোজগার করছে, বলতে নেই গোবিন্দও যা হয় আনছে—আবার ওখানে ঘুষ দেবার দরকার কি? কিন্তু হেমের লজ্জা করে বড্ড। এদের অবস্থা তো নিজেই দেখছে। গোবিন্দর বিয়ে হবার পর আর একটা ঘর ওদের নিতে হয়েছে। সেও খুপরির মত, তবু দুটো ঘর মিলিয়ে আট টাকা ভাড়া। তাও ওঁরা সুবিধেই করে দিয়েছেন বলতে হবে। বাড়িওলারা খুব একটা লোক খারাপ নয়। হেমকে ওঁরা রাত্রে ওঁদের বৈঠকখানা ঘরে শোবার অনুমতি দিয়েছেন। তার জন্য কিছু নেন না। অবশ্য ওঁদের জামাই-টামাই এলে ছেড়ে দিতে হয়। তখন ভেতরের রকে শোয়। যাই হোক--কিছু না দিয়ে খাওয়া সম্ভব নয়। আয় এবং ব্যয় দুটোই চোখের ওপর দেখছে। মাছ আসে কদাচিৎ কখনও। ডাল, বড়াবড়ি আর পোস্ত-চচ্চড়ি এই তো ভরসা। দেওয়া-নেওয়া দুই-ই লজ্জার ব্যাপার বলে হেম নগদ টাকা হাতে করে দেয় না, পয়সা-কড়ি এলে এক দিন বড়বাজার গিয়ে পাইকিরী দরে কিছু কিছু ডাল-মশলা-পোস্ত এনে দেয়। কুলোলে কোন মাসে এক-আধ সের ভাতুয়া ঘিও নিয়ে আসে। কমলা আপত্তি করে মুখে, কিন্তু খুশীই হয়।

পয়সা-কড়ি এলে কথাটার অর্থ আছে বৈকি!

মাইনে তো ঐ সামান্য—তাও সবটা এক সঙ্গে পাওয়া যায় না। কেশিয়ার-ম্যানেজার বাবুর কাছে (দুই-ই এক ব্যক্তি) গিয়ে মাথা চুলকে দাঁড়াতে হয়, 'কিছু খরচা দেবেন?' হেম গোড়াতে অবাক হয়ে গিয়েছিল, হকের পাওনা তার আবার 'খরচা' কি? কিন্তু এখানের নাকি এ-ই চাল। কোন দিন ম্যানেজারবাবু সে খরচা দেন, কোন দিন দেন না। দিলেও চার-পাঁচ টাকার

বেশী এক সঙ্গে পাওয়ার উপায় নেই। ফলে সে টাকাতে আয় দেয় না। তবু ওরই মধ্যে যে মাসে যা পারে—সাত-আট টাকার বেশী হয়ে ওঠে না প্রায় কোন মাসেই—এক দিন গিয়ে মাকে দিয়ে আসে। মা ফি-বারই গজগজ করে—কিন্তু সে গজগজানি গায়ে মাখতে গেলে হেমের চলে না।

শ্যামা শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে নিজের বাড়িতেই চলে এসেছে। আধ সের চাল বাঁচাতে গিয়ে এ বাগানের ফসল যাবে—হয়তো দরজা-জানলাই কে খুলে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া ওখানে বাস করার লাঞ্ছনাও যেন আর সহ্য হচ্ছিল না। ফলে কিন্তু কষ্টের সীমা নেই। নিত্য-সেবার চাল দুধ বন্ধ, এদিকেও হেম যজমানি করে যা দু-চার পয়সা আনত, তাও আসে না। আয় বলতে তো হেমের ঐ ক-টা টাকাই। আনাজপাতি অবশ্য কিছুই কিনতে হয় না। অভাব এক আলুর—তা হেম কলকাতা থেকে নিয়ে এলে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখে—এক-আধটা করে খরচ করে। নারকেল-সুপুরি থেকে কিছু আয় হয়—এ ছাড়া পেঁপে আছে কলা আছে। হেম এখন মধ্যে মধ্যে যাওয়া-আসা করায় কিছু সুবিধা হয়েছে। বড় বড় নারকেল আর পেঁপে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয় শ্যামা। এখানে নারকেল তেইশ টাকা হাজার। কলকাতার বাজারে অনেক বেশী দাম মেলে। তাও এখন আর হেমকে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতে হয় না। উমা ওদের অবস্থা বুঝে সে ভার নিজের হাতে নিয়েছে। প্রথম কথায় কথায় ছাত্রীদের বাড়ি কথাটা পেড়েছিল—তাঁরা সাগ্রহে নিতে চান অনেকেই। ফলে এখন সব বোঝাটাই তার ঘাড়ে চেপেছে অবশ্য, কিন্তু সত্যিই দামে অনেক তফাত হয়। বড় বড় নারকেল শ্যামার বাগানের—এক-একটা পাঁচ-ছ পয়সা দরে বিক্রি করে উমা। এমন কি খুব বড়গুলো দু আনা পর্যন্ত দাম ওঠে। পেঁপের তো কথাই নেই, দু আনা দশ পয়সায় এক-একটা বিক্রি হয়। হয়তো বাজারের থেকে দাম কিছু বেশীই পড়ে, তবু তাঁরা পছন্দ মত জিনিস দেখে তাতে আপত্তি করেন না। সাত-আট দিন অন্তর হেম যেদিন বাড়ি যায়—এক-এক বার দু টাকা আড়াই টাকা পর্যন্ত জমে যায়। তবে ফেরার সময় তেমনি বোঝা বইতে হয়। ইদানীং শ্যামা লোভ পেয়ে কলার কাঁদিও চালান করতে শুরু করেছে। বড় বড় কালী-বৌ কলা ওদের, যে খাবে সে ভুলতে পারবে না, এ জোর তার মনে আছে। যেমন বড়, তেমনি মোলায়েম আর তেমনি মিষ্টি।

তবু অভাবও তো কম নয়। এখন ঐন্দ্রিলা আর তার মেয়ে এসে ঢুকেছে, তরু আছে, একটা রুগ্ন বাচ্ছা ছেলে আছে। বাজার না করুক, চাল তেল নুন তো কিনতেই হয়। হপ্তায় পাঁচ ছটাকের বেশী তেল কেনে না শ্যামা ঠিকই—কিন্তু মাথায় দেবার এক ছটাক নারকেল তেল কিনতে হয়। এ ছাড়া একটু-আধটু গুড় আছে, লঙ্কা ফোড়ন আছে—কাপড়-গামছা তো আছেই। বাড়ির চৌকিদারি, সেস্ এগুলোও না দিলে নয়। প্রাণপণ কার্পণ্য করেও শ্যামা পারত না—যদি না অভয়পদ কিছু কিছু সাহায্য করত। কেরোসিন তেল তো তার ওপর দিয়েই চলে, এটা নাকি সে অফিস থেকে পায়। এ ছাড়া মাসকাবারী ডাল-মশলাও কিছু কিছু দিয়ে যায়। ওদের নিজেদের জিনিস যখন কেনে—তখনই এদের জন্যে খানিক খানিক সরিয়ে রাখে। আগে এদের বাড়িতে সে পুঁটুলিটা ফেলে দিয়ে নিজের বাড়িতে যায়।

এ দেওয়ার কথা অভয়পদ কাউকেই বলে না অবশ্য। সে নিজে ছাড়া এ-ইতিহাস কেউ জানতে পারে না—এমন কি মহাশ্বেতাও নয়। তেমন দেখলে কোন কোন দিন একখানা বা এক জোড়া কাপড় কি গামছাও দিয়ে যায়। কিছুই বলে না, হাতে করে এসে বসে, অন্য কথা বলে যাবার সময় ফেলে রেখে চলে যায়। শ্যামাও প্রশ্ন করে না। জামাইয়ের কাছ থেকে হাত পেতে নেবার লজ্জা এখনও তার আছে—সেটা জামাইও জানে, তাই কোন কথা না বলেই শুধু রেখে যায়। যেদিন ডাল মশলা কি কেরোসিন তেল নিয়ে আসে সেদিনও এসে তরুর খোঁজ করে—'কৈ গো ছোড়দি কোথায় গেলে, এগুলো তুলে রাখো।' কিংবা বলে, এগুলো আজড়ে নাও গো ছোড়দি, ঝাড়নে আমার কাজ আছে।' কোন দিন এ-কথা শাশুড়ীকে বলে না।

তবু—এও এক রকম ভিক্ষা বৈকি!

জামাইয়ের কাছে সাহায্য নেওয়া—পরের কাছ থেকে নেওয়ার চেয়ে ঢের বেশী লজ্জার। জামাই পারত পক্ষে কাউকে জানতে দেয় না সত্যি—কিন্তু লজ্জা তো তার কাছেই।

হেমও তা বোঝে। তার যে উঠে-পড়ে লেগে একটা ভাল চাকরি, অন্তত বাঁধা মাইনের কাজ একটা যোগাড় করে নেওয়া দরকার—তা বাড়ি গেলে প্রত্যেক বারই অনুভব করে। মনে মনে সেজন্য লজ্জা ও আত্মগ্লানিরও

শেষ থাকে না। কিন্তু এখানে এলেই সে সব যেন চাপা পড়ে যায়, আর যেন কোন উদ্যম থাকে না।

এ কি শুধুই আলস্য, শুধুই উদ্যমহীনতা ?

নিজেকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পেত হেম যে এর মূলে আছে এই নতুন —তার কাছে একেবারে অপরিচিত—এই জগৎ, এই থিয়েটারটা।

অনাবিষ্কৃত জগতে প্রথম পদক্ষেপের মতই সে দিশাহারা, রোমাঞ্চিত, বিস্ময়-বিহ্বল!

সত্যিই এ একটা আলাদা জগৎ।

মনে আছে ওদের হেড্ গেট-কীপার (এবং সাট- ও পার্ট-লেখকও* বটেন—হাতের লেখা ভাল বলে) দক্ষিণাবাবু প্রথম দিনই বলেছিলেন, 'দূর থেকে যা ভাব ছোকরা—তা নয়। দুটো দিন ভেতর থেকে ত্যাখো, রস ছুটে যাবে, ঘেন্না হয়ে যাবে একেবারে!'

তার পরই নিভে-আসা বিড়িতে একটা শেষ টান দিয়ে বলেছিলেন, 'তবে ছাড়াও পাবে না বাবা—এ চিটে গুড়ের আটা, পাখা জড়িয়ে যাবে, নট্ নড়ন নট্ চড়ন নট্ কিচ্ছু!'

কথাটা মিথ্যে নয়। রস ছুটে, স্বপ্ন ভেঙে ঘেন্না হয়ে যাবারই কথা—তবু যেন কোথায় একটা টান থাকে, একটা মোহ থেকেই যায় শেষ পর্যন্ত!

সে তো নতুন, বয়সেও কাঁচা, তার মোহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দক্ষিণাবাবুর বহুদিন কাটল এখানে, বয়সেও ওর চেয়ে ঢের বড়—তবু তিনি মুক্তি পান কৈ? সত্যিই যেন তাঁর পাখা আটকে গেছে এখানের চিটেগুড়ে।

বিচিত্র লোক দক্ষিণাবাবু।

বাড়িতে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়েও আছে চার-পাঁচটি। তাদের খরচ চালাতে পারেন না। নিহাত একান্নবর্তী সংসার বলেই তারা বেঁচে আছে, এবং ছেলেমেয়েগুলোও কোনমতে লেখাপড়া করছে কিছু কিছু। তাদের কথা যে চিন্তা করেন না দক্ষিণাবাবু তাও নয়। কিন্তু তবু অন্য কোন চাকরি খোঁজা বা অপর কোন উপার্জনের পথ ধরার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না।

*মুদ্রিত নাটক ও অভিনীত নাটকে অনেক রকম তফাত থাকে। নাট্য-অধিকর্তার মর্জি ও প্রয়োজন-মাফিক ছাঁটকাট অদল-বদল হয় প্রায়ই। শেষ পর্যন্ত যেমনটি দাঁড়ায়—প্রম্প্ট্ করার সুবিধার জন্য একটা খাতায় লিখে নেওয়া হয় বড় বড় হরপে—তাকেই বলে সাট!

অথচ এখানে পা দিলে পুরুষের যেটা সর্বাগ্রে হবার কথা সে দোষ অর্থাৎ চরিত্র-দোষ তাঁর নেই। মেয়েরা—থিয়েটারে যারা সখী সাজে, যাদের 'সখীরা' বা 'ছুঁড়ীরা' বলে উল্লেখ করা হয় সাধারণত—তাঁরা সবাই ওঁকে দাদা বলে—আর বড় অভিনেত্রীদের উনি দিদি বলেন—পদবী এবং বয়স নির্বিশেষে। সখীদের 'তুই তোকারি' করেন, ধমক দেন যখন-তখন, মধ্যে মধ্যে আদি-রস-ঘেঁষা রসিকতা করতেও ছাড়েন না—আবার সাধ্যমত উপকারও করেন, যার যা প্রয়োজন হয়, ওঁর নিজের দ্বারা যতটুকু সম্ভব, করে দেন। আর বড় অভিনেত্রীদের ফায়-ফরমাশ যেন দক্ষিণাবাবুর জন্যেই তোলা থাকে, যার যত কিছু বেগার দেওয়া দরকার, সবই তিনি। তার ফলে তাঁরাও স্নেহের চোখে দেখেন।

কিন্তু এ স্নেহ বা প্রীতিতে পেট ভরে না। মাইনে তো বাড়েই না—নিয়মিতও পাওয়া যায় না। যখন কিছু আদায় হয় তখন বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসেন। নেশায়-টেশায় বিশেষ অপব্যয় নেই, সেটা যতটুকু পরের ঘাড়ে চলে ততটুকুই। যখন এমন হয় যে দশ-বারো দিনের মধ্যেও কিছু আদায় হল না, তখন লজ্জায় গা-ঢাকা দেন ভদ্রলোক—অর্থাৎ বাড়িতে যান না। থিয়েটারেই কাটান কিংবা কোন মেয়ের বাড়ি কোন বাড়তি জায়গা থাকলে অথবা কারুর কোন দিন 'বাবু' না আসার কথা থাকলে তার বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকেন। খাওয়াও ঐভাবে চলে। মেয়েরা এমনিই এটা-ওটা বাড়ি থেকে নিয়ে আসে, সারারাত অভিনয় থাকলে এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা তো থাকেই।

মেয়েদের বাড়ি, এমন কি—দক্ষিণাবাবু দিব্যি গেলে বলেছেন—তাদের সঙ্গে এক ঘরেও শুয়েছেন, কিন্তু চরিত্রদোষ যাকে বলে তা তাঁর ঘটে নি।

'মাইরি বলছি তোকে, তুই বামুনের ছেলে তোর গা ছুঁয়ে বলছি, পৈতে ছুঁয়েও বলতে পারি—পিরবিত্তি হয় না। দাদা বলে ডাকে, ভক্তিছেদ্দা করে, বিশ্বাস করে—ওদের মায়েরাও ভরসা করে এক ঘরে ছেড়ে দেয়—সেখানে সে বিশ্বাসটা নষ্ট করা কি ঠিক! না ভাই, ও কাজ কোন দিন করি নি, হলপ করে বলছি!'

এক-এক বার এই গা-ঢাকা দেওয়ার সময়টা যখন লম্বা হয়ে পড়ে তখন ওঁর স্ত্রী ধৈর্য হারান। ছেলেকে সঙ্গে করে থিয়েটারে হানা দেন। ভিতরে আসেন না অবশ্য—ওধারের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছেলেকে দিয়ে ডাকতে পাঠান, তার পর শুরু হয় জবাবদিহির পালা। দক্ষিণাবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে

গিয়ে দাঁড়ান—বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে আসেন অনেক কষ্টে। সে লজ্জাও বড় কম নয়, স্ত্রী-পুরুষের চেঁচামেচিতে এক-এক দিন রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে যায়। থিয়েটার সুদ্ধ লোক এ ইতিহাস জানে, অনেকেই বুঝিয়ে বলে, কেউ কেউ টিটকিরিও দেয়—তবু দক্ষিণাবাবু এ চাকরি ছাড়তে পারেন না। ওঁর এই দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে কর্তারা ভূতের মত খাটিয়ে নেন, যখন বাড়ি যান না, তখন সারা দুপুর ধরে একা বসে বসে সার্ট লেখেন—এটা তাঁর করার কথা নয়, অন্তত ঐ মাইনেয়, তা দক্ষিণাবাবু জানেন, অবিচারটা অনুভব করেন—তবুও ছাড়তে পারেন না। জায়গাটা ভূতের মতই পেয়ে বসেছে ওকে। মাঝে মাঝে বলেন, 'জানিস—উপরি উপরি দু দিন এখানের এই ভ্যাপসা গন্ধটা নাকে না গেলে হাঁপিয়ে উঠি। ভূতেই পেয়েছে বোধ হয়। নইলে এমন হয়!'

হেমেরও এক-এক সময় ভয় হয়—তাকেও কি এই থিয়েটারের ভূতে পাচ্ছে না কি? তখনই প্রতিজ্ঞা করে যে এবার উঠে পড়ে লাগবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উদ্যম থাকে না। মনকে প্রবোধ দেয়, 'অনেক দিন তো টো টো করে ঘুরলুম। ঘুরলেই কি কাজ হয়? ভেতরে লোক থাকা চাই। দেখি—!'

সে দেখাটা যে কোথায় এবং কী ভাবে হবে তাও সে জানে না।

॥ ২ ॥

দক্ষিণাবাবুর ভেতরে যতই দহরম-মহরম থাক হেমের ভেতরে যাওয়ার বিশেষ সুযোগ ছিল না। মাঝে মাঝে এক-আধটা ছোট-খাটো ফাই-ফরমাশের কাজে ভেতরে গেছে, দু-একটা কথা যে দু-এক জনের সঙ্গে না হয়েছে তাও নয়—কিন্তু তাকে পরিচয় বলে না।

এক দিন হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল।

সেটা থিয়েটারের দিন নয়। অর্থাৎ সেদিন কোন অভিনয় ছিল না। হেম এমনি এসেছিল, মাইনের তাগাদায়। ম্যানেজার বাবুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে—মেজাজ বুঝে ভেতরে ঢুকবে বলে—হঠাৎ স্বয়ং মনিব বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সম্ভবত যাদের খুঁজছিলেন তাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে ফিরেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নজর পড়ল হেমের দিকে।

'এই ছোকরা শোন—এদিকে এস এক বার!' বলে ইঙ্গিতে ডাকলেন রমণীবাবু।

হেমের বুক দুর দুর করে উঠল। মনিবকে এখানে সকলেই ভয় করে, অকারণেই করে—সেই সঙ্গে হেমও। রাশভারী চেহারা ও গম্ভীর গলা। যদিও শুনেছে সে যে রমণীবাবু লোক খুব খারাপ নন বরং কর্মচারীরা বিপদে-আপদে পড়লে যথাসাধ্য সাহায্যই করেন—তবু বাইরেটা এমন রুক্ষ ও কর্কশ যে ওঁর মুখের দিকে চাইলে কিংবা গম্ভীর গলার আওয়াজ কানে গেলেই বুক শুকিয়ে ওঠে।

আজও তার ব্যতিক্রম হল না—তবে ওরই মধ্যে আড়ে এক বার তাকিয়ে দেখে নিলে যে যদিও ভ্রূ কুঞ্চিত, মুখভাব রুষ্ট নয়।

ঘরে গিয়ে নিজের চৌকিতে বসে বললেন, 'শোন কী যেন নাম তোমার, হেম না? একটা কাজ করতে পারবে?'

পারবে! মনিবের মুখে এ কী কথা! হেম একটু অবাকই হয়ে গেল।

ওঁর নাম হুকুম—তাদের নাম তামিল—কতকটা তো এই অবস্থা। তবে?

প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে সে।

'এমন-কিছু নয়, দারোয়ান দিয়েই হয় কিন্তু ব্যাটারা যে গেল কোথায় সব তা জানি না—'

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন আবার। কেমন যেন সংকোচ।

তার পর অন্য দিকে মুখ কিরিয়ে বললেন, এক জায়গায় একটা চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু খুব সাবধান, কাউকে বলবে না কি গল্প করবে না। যদি আমার কানে যায় কখনও যে কাউকে বলেছ—সেই দিনই তোমার চাকরিতে জবাব হয়ে যাবে—মনে থাকে যেন।'

এবার চোখ ফিরিয়ে ওর দিকে কতকটা কটমট করেই চেয়ে রইলেন খানিকটা। তার পর আবার বললেন, 'কম্বুলেটোলা জান? শ্যামবাজারের কাছে? ঐখানে একটা বাড়িতে চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। নাম ঠিকানা সব লেখা আছে। রাস্তার ওপরই বাড়ি, খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না। দিয়েই চলে এস। যাও।...দাঁড়াও—এই নাও, দু গণ্ডা পয়সা, বরং ট্রামেই যেও না হয়। এখানে কাজ ছিল কিছু?'

তিনি পাশের হাত বাক্স খুলে খুচরো পয়সা বার করতে করতে প্রশ্ন করলেন।

'না এমন কিছু নয়।'

হাত বাড়িয়ে চিঠি আর পয়সা নিয়ে সে বলতে গেলে ছুটেই বাইরে বেরিয়ে এল। ট্রামে সে চড়বে না এত জানা-কথাই—সুতরাং একটু জোরে হাঁটতে হবে বৈকি!

বাইরে এসে খামটার নাম-ঠিকানায় নজর পড়ল। নলিনীবালা দাসী।

নলিনীবালা! ওদেরই তো অভিনেত্রী এক জন। খুব একটা উঁচু দরের নয়—তবে বয়স কম, দেখতে-শুনতেও ভাল।

হেমের একটা কথা মনে পড়ে যায়। হঠাৎ কিছু দিন আগেই কথাটা উঠেছিল—এই নলিনীরই অভিনয় দেখতে দেখতে এক দিন ও হঠাৎ সত্য বলে আর এক গেটকীপারকে বলে ফেলেছিল, 'আচ্ছা, এত বড় পার্টটা হরিভূষণবাবু একে দিয়েছেন কেন বল্ তো, এটা নয়নতারাকে দেওয়াই উচিত ছিল!' তার জবাবে সত্য ওর হাতে একটা চিমটি কেটে বলেছিল, 'চুপ কর—শুনতে পেলে চাকরি থাকবে না তোর!'

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল হেম, 'কেন বল্ তো—ব্যাপার কি?'

'তুই যেমন উজবুগ! বাবুর গিন্নী বদল হয়েছে জানিস না? নইলে ঐ পার্ট ও পায়! ওটা আসলে নয়নতারারই পার্ট!'

'তার মানে?' কিছুই বুঝতে পারে নি হেম তখনও। কিন্তু কথাটা সেইখানেই বন্ধ করতে হয়েছিল। পাশেই ছিলেন দক্ষিণাবাবু, প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠেছিলেন সত্যকে।

আজ কথাটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল—এখন হেমের মনে হয়। কারণ আর একটা কথাও মনে পড়ে যায় ওর।

সব মেয়ে যে গাড়িতে যাতায়াত করে—নলিনী তাতে করে না। নলিনীর জন্যে খোদ বাবুর গাড়ি পাঠানো হয়। এটা তো কত দিনই লক্ষ্য করেছে ও—অর্থটা বোঝা উচিত ছিল।

যত অল্প দিনই এ জগতে আসুক সে—এর অর্থ না বোঝার কথা নয়। অভিনেত্রীদের প্রায় সকলেরই 'বাবু' আছেন এক-এক জন। নলিনীর বাবু তা হলে স্বয়ং কর্তাই!

'এই

॥ ৩ ॥

বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হেম একটু ইতস্তত করল। ওর কপালটা একটু ঘেমেও উঠল সামান্য। এর আগে সে এ ধরনের বাড়িতে কখনও আসে নি—অবশ্য এ ধরনটা যে ঠিক কি সে সম্বন্ধেও ওর স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না—তবু নম্বরটা মিলিয়ে পাবার পর বুকটা একটু ছাঁৎ করেই উঠল।

তবে পাড়াটা খারাপ নয়, রতনের বাড়ি যাতায়াতের সময় যে অঞ্চল দিয়ে যেতে হয়, সে রকমও নয়। বেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রপাড়া বলেই মনে হল ওর। আর বাড়িটাও আশপাশের বাড়ির মতই—এমন একটা অসাধারণ কিছু নয়। শান্ত নিস্তব্ধ। বরং রাস্তার দিকের দোর-জানলা বেশির ভাগই বন্ধ।

খানিকটা এদিক ওদিক তাকিয়ে হেম বোধ করি একটু বল সঞ্চয় করেই নিলে মনে মনে। তার পর পকেট থেকে ময়লা রুমালটা বার করে কপাল ও গলার ঘাম মুছে নিয়ে—এক রকম মরীয়া হয়েই কড়া নাড়ল দরজার।

দরজা খুলল হিন্দুস্থানী বেহারা গোছের এক জন লোক।

ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'কী চাই আপনার ?'

'এ বাড়িতে—এ বাড়িতে নলিনীবালা দাসী বলে কেউ থাকেন ?'

যেটুকু ভরসা সে এনেছিল মনে মনে, ওর প্রশ্ন করার ধরনে সেটুকু লোপ পেতে বসেছে তখন।

'হ্যাঁ—থাকেন। কী দরকার তাঁকে ?'

'এই—মানে তাঁর নামে একটা চিঠি আছে।'

'কে রে গিরধারী ?' এই বার ওপর থেকে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হয়।

'কে এক জন আপনার নামে চিঠি এনেছে দিদিবাবু।'

'আমার নামে চিঠি ? কে দিয়েছে ?' সেই ভাবেই প্রশ্ন হল।

গিরিধারী জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইল হেমের দিকে।

'বল যে আমাদের বাবু, বড়বাবু দিয়েছেন। রমণীবাবু।'

কিন্তু গিরিধারীকে কিছু বলতে হল না। ওপর থেকেই বোধ করি কথাটা শোনা গিয়েছিল—এবার সে মেয়েটি তরতর করে নেমে এল।

'কে রে গিরধারী—থিয়েটার থেকে কেউ এসেছে বুঝি ? ওমা আপনি? আপনি চিঠি এনেছেন ? কি হবে !...কেন শিউরতন কোথা গেল ? আমাদের দারোয়ান ?'

হেম আরও ঘেমে উঠেছে ততক্ষণে। মাটির দিকে চোখ রেখে জবাব দিল, 'ওরা কেউ ছিল না—তাই বাবু বললেন—আমাকেই দিয়ে যেতে।'

'তা বেশ ভালই হয়েছে। তবু তো আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। আসুন আসুন, ওপরে আসুন।'

'আর ওপরে—মানে এই চিঠিটাই দেওয়ার দরকার ছিল তো—আমি বরং এখন যাই। এই যে চিঠিটা—'

'ওমা, সে কখনও হয়! কখনও তো আসেন না—কোন দিন। আজ প্রথম দিনটা এলেন—এমনি এমনি চলে যাবেন! আসুন। আসুন—একটুখানি অন্তত বসে যান!'

হেমের গলা শুকিয়ে উঠেছে। পা দুটো ওর কাঁপছে বুঝি।

'না—মানে বাবু হয়তো ভাবছেন। ফিরে গিয়ে খবরটা দিতে হবে কি না।'

'আচ্ছা আচ্ছা সে হবে। আপনি আসুন তো। একটুখানি বসে গেলে কিচ্ছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আপনি অত সংকোচ করছেন কেন—আমরা এক জায়গায় কাজ করি—বন্ধু হলুম তো সম্পর্কে, আপনিও তো ওখানে কাজ করেন—আমি আপনাকে দেখেই চিনেছি। এই গিরধারী—একটা মিষ্টিজল নিয়ে আয় তো ঠাকুরের দোকান থেকে।'

অগত্যা হেমকে ভেতরে ঢুকতে হল, নলিনীর পিছনে পিছনে ওপরেও যেতে হল।

বাইরে থেকে যতটা নির্জন মনে হয়েছিল বাড়িটা—দেখা গেল ঠিক ততটা জনহীন নয়। নীচের সব ঘরেই লোক আছে। আর তার অধিকাংশই মেয়ে। মেয়েরা কেউ কেউ ওদের কথাবার্তার শব্দে বেরিয়ে এসেছিল, তারা নীরব কৌতূহলে তাকিয়ে দেখতে লাগল হেমকে—সেটা মাথা না তুলেই বেশ বুঝতে পারল সে। ফলে আরও যেন রাজ্যের লজ্জা তাকে পেয়ে বসল। সিঁড়ি দিয়ে যখন সে ওপরে উঠছে তখন পা দুটো তার যেন আর স্ববশে নেই, প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছে পড়ে যাবে সে হুমড়ি খেয়ে।

ওপরের যে ঘরে হেমকে নিয়ে গিয়ে বসাল নলিনী—সে ঘরটা বেশ প্রশস্ত। রাস্তার দিকের সবটা জুড়ে টানা ঘর একটা। এক পাশে প্রকাণ্ড বড় পালঙ্কে পুরু গদির বিছানা। এছাড়া মেঝেতেও একটা বিছানা পাতা আছে—ওপরের বিছানার চেয়েও এটা বড়। অত পুরু না হলেও, এর

তলাতেও গদি আছে। এ বিছানায় মাথার বালিশ বা পাশবালিশ নেই—শুধুই চারদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আটটা তাকিয়া সাজানো।

নলিনী ওকে সেই বিছানাটার কাছেই এনে বসাল, 'বসুন ভাল হয়ে। আমি আসছি।'

কিন্তু সে বিছানার দিকে তাকিয়ে ওর সংকোচের অবধি রইল না। ফরসা ধপ্ ধপ্ করছে বিছানা—বকের পালকের মত। সে ওখানে বসবে কি? ক্ষারে কাচা লাল্চে কাপড়জামা তার, জুতোটা ফুটো হওয়ার ফলে পথের ধুলো জমেছে আঙুলের খাঁজে খাঁজে। বিছানাটাই হয়তো শেষ পর্যন্ত ময়লা হয়ে যাবে। তখন মুখে কিছু না বললেও মনে মনে নিশ্চয় রাগ করবে—হয়তো কটূক্তিও করবে। হয়তো—

আরও অনেক সম্ভাবনাই মনে হল। এর আগে নিজের বেশভূষার দীনতার জন্য এত লজ্জা আর কখনও অনুভব করে নি। ওর মনে হতে লাগল ধরিত্রী দ্বিধা হয় তো সে সীতাদেবীর মত তাতে প্রবেশ করে বেঁচে যায়!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে—একটা কাচের গ্লাসে লেমোনেড নিয়ে আবার ঘরে ঢুকল নলিনী।

'ওমা কি হবে, আপনি এখনও ঠায় দাঁড়িয়েই আছেন। বসুন, বসুন। বেটাছেলের এত লজ্জা কি? না, না—মাটিতে নয়। ছিঃ, মেজেয় কি বসতে আছে? বিছানাতেই বসুন ভাল হয়ে।'

অগত্যা হেমকে বসতে হয়—তবু সে ভরসা করে পুরোপুরি বিছানায় বসতে পারে না। দেহের বেশির ভাগই মেঝেতে রেখে কোনমতে বিছানাটা ছুঁয়ে বসে শুধু।

প্রথমটা মনে হল—বসবার সময়—নলিনী বুঝি ওর হাতটা ধরে জোর করেই বিছানাতে বসিয়ে দেবে, নলিনী এগিয়েও এসেছিল যেন সেইভাবেই, কিন্তু কী ভেবে নিজেকে দমন করে নিলে।

'নিন্ জলটা ধরুন। আপনার আবার যা লজ্জা!'

'এ—এ জল—শুধু জল দিন না!'

'কেন—আপনি বোতলের জল খান না বুঝি?'

'না, মানে কখনও খাই নি। আমাদের পাড়াগাঁয়ে বলে ওসব মুসলমানে তৈরী করে, বামুনদের খেতে নেই।'

'আপনি ব্রাহ্মণ বুঝি? ভাগ্যি ভাল আমার! ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের পায়ের

ধুলো পড়ল। তবে থাক—এ জল খেয়ে কাজ নেই। আপনি বরং এমনি একটু জল খেয়ে যান। গিরিধারীকেই না হয় আনতে বলি—ও ভাল জাতের লোক। দেখুন বাধা নেই তো?'

আরও ঘেমে ওঠে হেম।

'না, না। সে সব কিছু না। দিন না হয় ঐটেই খাই। নষ্ট হবে।'

'না থাক। আমার এখানে একদিন এসেছেন, আপনার জাতটা মেরে দেব কেন? ও আর কেউ খেয়ে নেবে। আমার হাতে জলটা চলবে তো? না কি গিরিধারীকেই আনতে বলব?'

'না, না। খুব চলবে। আপনার চেয়ে কি ঐ খোট্টা বেয়ারা ভাল?'

একটু যেন বেশী ঝোঁক দিয়েই বলে ওঠে হেম—আর বলার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় আগুন-বর্ণ হয়ে ওঠে।

নলিনী ওর সেই সুগৌর কপোলের রক্তোচ্ছ্বাস যেন একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে দেখে কিছুকাল। বেশভূষা মলিন, গেট-কীপারের চাকরি করে—এত দিন তাই ভাল করে তাকিয়ে দেখার কথাও তার মনে হয় নি। আজ সামনাসামনি কাছ থেকে বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করলে যে হেম রূপবান—বেশ একটু অসাধারণ রকমেরই রূপবান।

অবশ্য তাকিয়ে রইল সে মুহূর্ত দুই-এর বেশী নয়—তার পরই আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেশ ভাল ভাল আসবাব ঘরে। অবস্থা ভালই। অবশ্য থিয়েটারের মাইনেতে এ সব হয় না। নিশ্চয় রমণীবাবু দিয়েছেন। আয়না বসানো আলমারী, বুককেস, পাথর দেওয়া টেবিল, তার ওপর কাচের ঢাকায় শৌখিন ঘড়ি, দেওয়ালে সোনালী ফ্রেমে আঁটা আয়না, বড় বড় ছবি, আরও কত কি!—

ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে তখনও, নলিনী একটা আসন আর পাখা নিয়ে ঘরে ঢুকল আবার। পিছনে গিরিধারীর হাতে একটা রেকাবিতে গোটাকতক রসগোল্লা, সাদা পাথরের গ্লাসে জল।

'নিন, আসুন দেখি। একটু জল খেয়ে নিন।'

'এসব আবার—। না না, থাক, শুধু জল দিন একটু। আমার মানে—একটুও ক্ষিদে নেই। সত্যি বলছি।'

'এসব খাবার ক্ষিদে না থাকলেও খাওয়া যায়। এমন কিছু হাতীঘোড়া

নয়। শুধু জল খেতে নেই—তাই। আসুন আসুন। কত ভাগ্যিতে পায়ের ধুলো পড়ল, আবার কবে আসবেন—আসবেন কি না তারও ঠিক নেই। আমি বুঝি অমনি অমনি ছেড়ে দেব? ব্রাহ্মণ-ভোজনের একটা পুণ্যিও তো আছে।··আসুন, উঠুন। হাত ধোবেন? বাইরেই জল আছে। গিরিধারী, জল ঢেলে দে তো একটু।'

অগত্যা উঠে এসে আসনে বসতে হয়।

এমনিই খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে হেমের লজ্জা একটু বেশী—তার ওপর অপরিচিত মেয়েছেলেদের সামনে বসে এক রাশ রসগোল্লা খাওয়া। প্রতি গ্রাসেই গলায় বেধে বেধে যেতে থাকে ওর।

তারও ওপর নলিনী সামনে বসে হাওয়া করে!

'থাক থাক।' অতি কষ্টে এক বার বললে ও—কিন্তু সে প্রতিবাদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না নলিনী।

'ওমা, একটু হাওয়া করলে কি আমার হাত ক্ষয়ে যাবে? যা গরম আজ! আপনি তো গলগল করে ঘামছেন। অবশ্য গরমের চেয়েও লজ্জাই বেশী—কিন্তু তবু গরমও পড়েছে বাপু।··টানাপাখার ব্যায়রাটা আসে রাত্তির বেলা। বাবু থাকেন তো, হাওয়া না হলে ওঁর এক দণ্ড চলে না। দু বেলা আর কিছু টানাপাখা চালানো যায় না। কী বলেন?'

গলায় আটকে গেলেও হেম কোনমতে জল দিয়ে দিয়ে সেই আটটা রসগোল্লাই গলাধঃকরণ করে। ভাল জিনিস ফেলবার অভ্যাস নেই—তায় এঁটো পড়ে থাকলে ফেলাই যাবে হয়তো, সেই সম্ভাবনার কথাটা মনে করেই আরও জোর করে খায় সে—কষ্ট করেও।

খাওয়া শেষ হলে নলিনী অন্য কথা পাড়ে।

'দেখুন আমার একটা উপকার করবেন? বাবু লিখে পাঠিয়েছেন বাবুর জন্য তিন-চার বন্ধু আসবে রাত্তিরে, এখানেই খাবে। আমার গিরিধারী মোটে মাংস মাছ চিনতে পারে না। বাজার করে ঠিকে ঝি—সে আসবে সেই সন্ধ্যের পর। তা ছাড়া সে বিকেলে বাজার করতেও চায় না। আপনি গিরিধারীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার সময় মাংসটা আর মাছটা একটু কিনে দিয়ে যাবেন?'

'তা—না, আর কিছু নয়। দেরি হলে বাবু রাগ করবেন না তো? তিনি হয়তো ভাবছেন—চিঠিটা পৌঁছল কি না!'

'আমার বাজার করে দিয়ে গেছেন শুনলে কিছু বলবেন না!'

বলে মুখ টিপে হাসে একটু নলিনী।

'তা হলে দিন।'

'বাঁচা গেল! পাঁচ পো মাংস আর আধ সের ভাল বাগদা চিংড়ি মাছ। পোয়াখানেক কাটা-পোনাও। বুঝলেন? বাকী যা দই প্যাঁজ—সে আমি গিরিধারীকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

গিরিধারী বাজারের ঝুড়ি টাকা প্রভৃতি বুঝে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এলে হেমের পিছু পিছু নলিনীও নীচে নেমে আসে। দোরের কাছে এসে চাপা গলায় বেশ একটু আন্তরিক ভাবেই বলে 'আলাপ-পরিচয় তো হয়ে গেল, এবার আসবেন কিন্তু মধ্যে মধ্যে।⋯ এখানে এলেই কিছু লোক খারাপ হয়ে যায় না। আমরা বাঘ-ভালুকও নই।⋯ তা ছাড়া সবাই এক জায়গায় কাজ করি, বন্ধুর মতই। না কী বলেন? আসবেন কিন্তু। না এলে আমি ভারি দুঃখ করব।'

ওর মত হতদরিদ্র দীনহীন ব্যক্তির জন্য এই আকিঞ্চনে খুশী হবার কথা। হেমও খুশী হল। এই আদর-যত্ন, এই আন্তরিকতা, কণ্ঠে এই মিনতির স্বর অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা মধুর রেশ জাগিয়ে রাখল ওর মনে। সবচেয়ে এই সাধারণ সহজ ব্যবহারটাই ওকে মুগ্ধ করেছে বেশী। এই সব মেয়েদের এবং তাদের বাড়ি সম্বন্ধে একটা যে অজ্ঞাত আতঙ্কের ভাব ছিল, সেটাও কেটে গেছে—এখন বরং সে আতঙ্কের জন্য একটু লজ্জাই বোধ করছে মনে মনে।

সত্যিই তো, মানুষ মানুষই—বাঘ-ভালুক তো নয়! এত ভয়ই বা কেন হত ওর?

আর—এক পয়সার মুরোদ নেই যখন তার, তখন পয়সার লোভে তাকে যত্ন করেছে বা ভোলাচ্ছে, এমন মনে করবারও কোন কারণ নেই।

আসলে মানুষটা ভালই। বেশ সরল। বেশ মিষ্টি কথাবার্তা।

আরও খানিকটা পরে ওর মনে হল—নলিনী কেমন দেখতে তাও ভাল করে বলতে পারবে না কাউকে। এতক্ষণের মধ্যে এক বারও ভরসা করে চাইতে পারে নি তার মুখের দিকে।

মনে মনে ঠিক করলে, থিয়েটারের দিন এবার ভাল করে দেখবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

গোবিন্দর বৌ কালীতারা বরাবরই খুব সপ্রতিভ—বেশ একটু ভারিক্কী চালের গিন্নী-বান্নী গোছের মেয়ে। সে সংসার করতে চায়—আর করতে জানেও। বিয়ের পর প্রথম বার বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে এসেই রান্না করা জলতোলা, বাসনমাজা—এক কথায় সংসারের যাবতীয় কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। যেমন তেমন করে যে করত তাও না—বরং শাশুড়ীর চেয়েও এসব কাজে তার পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা বেশী ছিল। সংসার ভালবাসে যে সব মেয়ে—কালীতারা সেই দলেরই এক জন।

বিনা সম্মতিতে ছেলের বিয়ে হলে প্রত্যেক ছেলের মায়েরই বিদ্বেষটা আগে গিয়ে পড়ে বধূর ওপর। কমলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি—তবে সহজাত ভদ্রতা ও সুশিক্ষায় সে বিদ্বেষটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি হয়তো। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে মূল আপত্তি এবং সেই চাপা বিদ্বেষটা কাটতেও যে খুব বেশী দেরি হয় নি তার কারণ বোধ হয় বধূর কর্মদক্ষতা। বৌকে নিয়ে সে বেশ সুখীই হয়েছিল। কমলা নিজে অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে অবস্থাপন্ন স্বামীর ঘরে গিয়ে পড়েছিল—কাজকর্ম গুছিয়ে করার শিক্ষা বা অভ্যাস কোনটাই উমার মত পাকা হয় নি। সে বেশ অসুবিধাই বোধ করত প্রথম প্রথম নিজে হাতে কাজ করতে গিয়ে। এখন বৌয়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে—অথবা ছেড়ে দিতে পেরে সে নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। বধূ সম্বন্ধে তাই স্নেহ ও প্রশ্রয়ের অভাব ছিল না তার মনে।

কিন্তু কে জানে কেন গোবিন্দ খুব খুশী হতে পারে নি। অন্তত উমার তাই মনে হত।

তার যে খুব নালিশ করার মত কিছু ছিল তাও নয়। বরং প্রতিটি প্রয়োজনের জিনিস মুখে মুখে যুগিয়ে কালীতারা তাকে বেশ খানিকটা অকর্মণ্য আর বাবু করেই তুলেছিল। তবু স্ত্রীর সামনে এলেই গোবিন্দ যেন কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করত। কালীতারা বোধ হয় তার সমবয়সী—উমা সন্দেহ করত সামান্য একটু বড়ই হবে হয়তো—তার ওপর ওর ঐ

ভারিক্কী চালচলনে ওকে দেখলেই একটা সম্ভ্রমের ভাব আসত গোবিন্দর মনে—প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও স্বামীর সহজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না। অথবা বলা চলে স্ত্রীকে সমীহ না করে পারত না। তার ওপর দৈহিক গঠনেও কালীতারা—পূর্ণযুবতী মেয়ের যেমন হওয়া উচিত, তেমনিই ছিল; বরং তার যৌবন যেন একটু বেশী প্রস্ফুট বলে মনে হত বাড়ির অন্য মেয়েদের কাছে। ঠিক মোটা না হলেও, স্বাস্থ্যটা ছিল একটু বেশী রকমের ভাল—তার জন্যও বোধ হয় আচমকা দেখলে নবযৌবনা তরুণী বধূ নয়, পূর্ণযৌবনা নারী বলে মনে হত। আর এই সব কারণেই সম্ভবত গোবিন্দর নিজের অজ্ঞাতসারেই মাঝে মাঝে কালীতারাকে মনে হত ওর দিদি। ওর নিজের দিদি নেই কেউ—দিদি সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণাও যে ছিল তাও নয়—তবু ঐ ধরনেরই যে একটা অনুভূতি হত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কালীতারারও স্বামী সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, ভক্তি বা স-কাম প্রেমের অনুভূতি থাকলেও প্রচ্ছন্ন ছিল খুবই। যেটা সবচেয়ে স্পষ্ট এবং প্রকট ছিল—সেটা হচ্ছে একটা সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাব। বয়স্থা বিবাহিতা দিদিদের অনুজ সম্বন্ধে যেমন হয় তেমনিই। উৎকণ্ঠা উদ্বেগের অভাব ছিল না—বরং হয়তো একটু বেশীই ছিল। কোনদিন গোবিন্দর বাড়ি ফিরতে দেরি হলে প্রকাশ্যেই বিচলিত হয়ে পড়ত সে, তবু তার মধ্যেও—উমার যেন কেমন মনে হত—বাৎসল্যভাবই বেশী।

তখনও দিনের বেলায় কিংবা গুরুজনের সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা বলার খুব চলন হয় নি। কড়াকড়িটা কমেছে—আগের মত বিধিনিষেধের বেড়াটা অত উঁচু নেই—তবু একেবারে সমভূমও হয় নি সেটা। তখনও পাড়াঘরে আশপাশে কিছুটা সংকোচ কিছুটা কুণ্ঠা ছিল, কিন্তু কালীতারা যেন সেটুকুরও ধার ধারত না। প্রয়োজন হলেই অভ্যস্ত ঘোমটাটা শুধু আর আধ ইঞ্চি মাত্র সামনের দিকে টেনে শাশুড়ীদের সামনেই নিঃসংকোচে কথা কইত সে। শুধু কথাই নয়, ওঁদের সামনে ধমক-ধামকও করত অনায়াসে। আর সে ধমক গোবিন্দ মা-মাসীর তিরস্কারের মতই নিঃশব্দে হজম করত। কখনও বা নিতান্ত কুণ্ঠার সঙ্গে মাথা চুলকোতে চুলকোতে অথবা ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে কৈফিয়ত পেশ করত।

এসব কোন কিছুই কমলা কোনদিন লক্ষ্য করে নি। অত শত তার মাথাতেও যেত না। সে সবটাই সহজ ভাবে নিয়েছিল। কিন্তু উমা সব লক্ষ্য করত। ওদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কোন অসঙ্গতিই তার চোখ

এড়াত না। যেখানেই এতটুকু বেসুর বাজত, ঘটত এতটুকু ছন্দপতন, সেখানেই সচেতন হয়ে উঠত সে। নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখত ওদের দিকে আর কেমন একটা নাম-না-জানা আশঙ্কা অনুভব করত ওদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। গার্হস্থ্য সুখের অভাব নেই—সহস্রবিধ আরামে আর সেবায় অভিভূত করে রেখেছে কালীতারা তার স্বামীকে—কিন্তু দাম্পত্যসুখ যাকে বলে তা ওরা পুরোপুরি উপভোগ করতে পা ছে কি? ওরা কি পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রীর মত ভালবাসতে পেরেছে? এমনি নানান্ প্রশ্ন মধ্যে মধ্যে দেখা দিত উমার মনে—কিন্তু তার কোন সদুত্তর কোথাও খুঁজে পেত না সে। সেই নিরুত্তর সমস্যা তার নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তার মধ্যে আর একটা বোঝার মত চেপে বসে থাকত।

অবশেষে এক দিন সে দিদির কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসল, 'দিদি, বৌমা তো প্রায় দু বছর বাপের বাড়ি যান নি—এবার ওকে এক বার পাঠানো দরকার।'

'কেন বল্ দিকি?' কমলা সবিস্ময়ে, কিছুটা সশঙ্কচিত্তেও তাকায় ওর মুখের দিকে, 'বৌমা বলেছেন কিছু?'

'না, বৌমা বলেন নি—আর হয়তো কোন দিন বলবেনও না। কিন্তু আমাদের একটা বিবেচনা আছে তো। ছেলেমানুষ একটানা এতদিন এই দেড়খানা ঘরে আটকে আছে আর কলুর বলদের মত একঘেয়ে সংসারের ঘানি ঘোরাচ্ছে!'

কমলা কথাটা শুনে খুব খুশী হল না। হবার কথাও নয়। বৌমার আরা যাওয়া মানে সংসারের সহস্রবিধ কাজ নিজেদের ঘাড়ে পড়া। অপ্রসন্ন মুখে বললে, 'ও, আমাদের বিবেচনা! তা সেখানেও তো শুনেছি বেয়াইয়ের অবস্থা ভাল নয়—তার ওপর আবার ঘাড়ে গিয়ে পড়া—'

'অবস্থা এমনও খারাপ নয় যে নিজের মেয়েকে খেতে দিতে পারবে না। সেই বাড়িরই তো মেয়ে!'

'তা বটে।' একটু থেমে বলে আবার কমলা, 'আমাদের যে এদিকে আতান্তর।'

'এটা বড্ড স্বার্থপরের মত কথা হল না দিদি! ছেলেমানুষ মেয়েটা কি আমাদের সংসারে কেনা বাঁদীর মত খাটতেই এসেছে শুধু? এত কাল তো চলছিল আমাদের—তেমনিই না হয় চলবে। আমিই চালিয়ে নেব—'

কমলা আর কথা কইল না। কথাটা সেখানেই চাপা পড়ে গেল।

উমা কিন্তু বেশী দিন চাপা পড়তে দিলে না। আবারও তুললে।

আসলে একটা নতুন চিন্তা তার মাথায় এসেছে। এদের নিয়ে একটা নতুন খেলা খেলাতে চায়। বিচ্ছেদের বিরহে এদের মনে—অন্তত গোবিন্দের মনে সকাম তৃষ্ণা বা আবেগ জাগে কিনা তাই দেখতে চায়। যাকে সহজে, না চাইতে হাতের কাছে পাওয়া যায়—তার সম্বন্ধে আমাদের থাকে সহজাত অবহেলা। দূরে গেলে দাম বাড়ে। গোবিন্দর কাছে কালীতারা একটা পুরনো অভ্যাস মাত্র দাঁড়িয়ে গেছে—তাই হয়তো তার সেবাটাও চোখে পড়ে না। সরে গেলে সেই সেবার অভাবটাই হয়তো প্রেম বা তৃষ্ণা জাগাতে সহায়তা করবে।

নিজের দুর্ভাগ্যে উমা এই বিষয়টায় অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে পড়েছে, কিন্তু সেই কারণেই কথাটা খুলে বলতেও পারে না সে কাউকে। শুধু কালীতারার বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়।

কালীতারার কানে কথাটা যেতে সে-ই প্রতিবাদ করে সব চেয়ে বেশী। আকাশ থেকে পড়ে বলে, 'ওমা আমি গেলে এখানে চলবে কি করে? মার শরীর খারাপ—আপনার তো এই টোটো ঘোরা চাকরি—ঠাকুরপো সুদ্ধ এখানে এসে রয়েছেন—সে কখনও হয়?'

'খুব হয় মা। তুমি যখন ছিলে না তখন কি আর আমাদের সংসার চলত না? আমি তো আছি—চালিয়ে নেব এক রকম করে। তুমি মাসখানেক কাটিয়ে এসো গে অন্ততঃ!'

তবু না কালীতারা আর না কমলা—কথাটা কেউই গায়ে মাখে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো উমাকে শ্রান্ত হয়েই চুপ করে যেতে হত—কারণ আর বেশী পীড়াপীড়ি করলে দৃষ্টিকটু হয়ে উঠত—কৈফিয়তের হেতু তো হতই। কিন্তু হঠাৎ কালীতারার এক জেঠামশাই কী এক মোকদ্দমার ব্যাপারে কলকাতায় এসে পড়লেন এবং দেখা করতে এসে—পশ্চিমে-বাঙালীর অভ্যস্ত কাঠখোট্টা চালে বলে ফেললেন, 'কী রে, তারা, যাবি নাকি আমার সঙ্গে আরায়? ছাখ যাস তো চল। কী বলেন বেয়ান—ছাড়বেন, না কোন অসুবিধা আছে—কাজ-কর্মের?'

সত্য কথাটা বেশী স্পষ্ট করে বললে অনেক সময় রূঢ় শোনায়, এমন কি কমলার কানেও তা শোনাল। সে একটু চাপা রাগের সঙ্গেই বললে,

'আপনাদের মেয়ে কি আমাদের ঝি যে কাজকর্মের জন্যে তাকে আটকে রাখব? ওকে ঘরের লক্ষ্মী করেই ঘরে তুলেছি বেয়াই—ঝি হিসেবে নয়। কাজকর্ম ও আসবার আগেও কিছু আটকে থাকত না—এখনও থাকবে না। আমরাই বরং ওকে কত দিন বলছি, অনেক দিন যাও নি—এক বার ঘুরে এস দিনকতক। আপনাদের মেয়েই যেতে চায় না!'

বেয়াই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। বলেন, 'তা তো বটেই—তা তো বটেই। না, আমি সেভাবে কিছু বলি নি। নিজের ঘরে নিজের কাজ করবে—সে আর এমন বড় কথাই বা কি! কী রে যাবি নাকি তারা?'

সপ্রতিভ তারা বাজে কথার মধ্যে না গিয়ে দরকারী প্রশ্নটিই করে শুধু, 'তার পর? ফিরব কবে? কার সঙ্গে?'

'কেন জামাই যেতে পারবেন না? বাবাজীও তো যান নি ওখানে অনেক দিন!'

'না, উনি যেতে চান না। যা ব্যাভার তোমরা করেছ ওঁর সঙ্গে!'

মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে কালীতারার জেঠামশাই বলেন, 'আচ্ছা, সে যা হয় হবে এখন। না হয় আমরাই কেউ এসে পৌঁছে দিয়ে যাব।'

আর কোনও পথ খোলা থাকে না কোথাও।

কালীতারা মুখটা গোঁজ করে বলে, 'আমি কিন্তু বেশী দিন থাকব না। তা বলে দিচ্ছি!'

'আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। দেখেছেন বেয়ান—মেয়েদের যদি বিয়ে হল তো আর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে দুটো দিনও বাপের বাড়ি থাকতে চায় না। বিয়ে হল কি পর—না কী বলেন! হা-হা-হা!'

তিনি নিজেই জোরে হেসে উঠে আবহাওয়াটাকে হাল্‌কা করে দেন।

॥ ২ ॥

কালীতারা আরা যাবার দিন পনের পরেই ঘটনাটা ঘটল।

রাত তখন বোধ হয় তিনটে হবে, উমা আর কমলা একসঙ্গেই ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসল বিছানায়।

'কী দিদি? কি হল?' প্রশ্ন করলে উমাই।

'বড় একটা বাজে স্বপ্ন দেখলুম রে। দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ! দুর্গা দুর্গা!'

'কি স্বপ্ন দিদি ?' উমা ও বিছানা থেকে এ বিছানায় উঠে আসে। কণ্ঠস্বরটাও তার অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ শোনায়।

'দেখলুম, বৌমা যেন এসে আমার মশারির মধ্যে ঢুকে পা ঠেলে ডাকছেন, বলছেন—মা, ঘরে তো আর ঠাঁই দিলেন না—তবে পায়ের ধুলো দিন - আমি যাই !'

'দুর্গা দুর্গা', শিউরে উঠে উমাও বলে অস্ফুট কণ্ঠে।

'কেন বল্ দিকি ? তোরই বা ঘুম ভাঙল কেন ?'

'দিদি, আমারও যেন মনে হল বৌমা এসে পা ঠেলে ডাকছেন মশারীর মধ্যে। যেন বলছেন—এক বার উঠুন না মাসীমা, একটু পেন্নাম করে যাই !'

'সে আবার কি !··· তুইও—এক সঙ্গে এক সময়ে ! এর মানে কি ? কৈ এমন তো কখনও শুনি নি।'

'কে জানে বাছার কী হল ! ভালয় ভালয় ফিরলে বাঁচি !'

এর পর আর ঘুম অসম্ভব। দুই বোনই বাইরের রোয়াকে বেরিয়ে আসে। আর বাইরে আসতেই প্রথম নজরে পড়ে রকের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে গোবিন্দ !

'এমন করে বসে আছিস কেন রে খোকা ?'

আর্তনাদের মত শোনায় কমলার কণ্ঠস্বর।

গোবিন্দ শুষ্ক মুখে যা বলে তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে সে এইমাত্র তার স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখেছে—কালীতারা যেন এসে ওকে ঠেলে বলছে, 'ওগো তোমার আপদবালাই জন্মের মত বিদেয় হয়ে যাচ্ছি এখন যাও দিকি, তাড়াতাড়ি নতুন কস্তাপেড়ে শাড়ি একখানা আর একখান সিঁদুর কিনে আনো দিকি। এক পাতা আল্তাও এনো অমনি। সেজেগুজে যাব বাপু বেশ করে—তা বলে রাখছি !'

এবার কমলার অশ্রু আর বাধা মানে না। ডুকরে কেঁদে ওঠে। উমার দুই চোখেও জল ভরে আসে। কালীতারাকে সেও ভালবাসত। তার ওপর তার একটা অপরাধীর কুণ্ঠা আছে মনের মধ্যে—বলতে গেলে সে-ই জোর করে পাঠিয়েছে।

কান্নার শব্দে বাড়িওলারা উঠলেন। হেম অনেক রাত্রে এসে শুয়েছে, তবু তারও ঘুম ভাঙল। তখনই একটা মন্ত্রণা-সভা গোছের বসল। বহু আলোচনার পর স্থির হল যে সকালেই স্টেশনে গিয়ে গোবিন্দ আবার গাড়ির খবর নেবে

এবং প্রথম ট্রেনেই চলে যাবে। জানাশোনা অফিস, ছুটির জন্য চিন্তা নেই —হেম গিয়ে একটা খবর দিয়ে এলেই হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাও যাবার প্রয়োজন হয় না।

আলোচনা করতে করতেই ভোর হয়ে যায়। আর সামনের বিশ্বাসদের বাড়ির তেতালার কার্নিসে উষার প্রথম আভাস লাগার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজায় ঘা পড়ে।

কালীতারার জেঠামশাই।

দোর খুলতেই আছড়ে পড়লেন তিনি।

অতি কষ্টে সেই বুকফাটা কান্নার মধ্য থেকে যেটুকু সংবাদ আহরণ করা গেল তা এই :

আজ তিন দিন থেকে কালীতারা এখানে আসার জন্য কান্নাকাটি করছিল। কাল কতকটা জোর করেই সে জেঠার সঙ্গে রওনা হয়। পথে আসানসোল পেরোবার পরই ভেদবমির লক্ষণ দেখা দিল। দু বার দাস্ত এবং এক বার বমি· তার পরই শেষ। রেলের ডাক্তার দেখে বলেছেন এসিয়াটিক কলেরা। মৃতদেহ হাওড়াতেই পড়ে আছে। এরা না গেলে ছাড়বে না বোধ হয়।

মরবার আগে শেষ অনুরোধ জানিয়ে গেছে কালীতারা ওর জেঠামশাই বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন,—লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি আর আল্‌তা-সিঁদুরে যেন সাজানো হয় তাকে শ্মশানযাত্রার আগে, আর গোবিন্দ যেন নিজে হাতে সাজায়!

॥ ৩ ॥

মৃত্যুপথযাত্রিণীর শেষ অনুরোধ কোনটারই অন্যথা হল না। ভাল লাল পাড় ফরাসডাঙার শাড়ি এল—সিঁদুর আলতা ফুলের মালা—হেমই চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে নিয়ে এল। উমা ও কমলার কারোরই তখন কিছু দেখবার অবস্থা নয়, উমা মূর্চ্ছাহত, স্তম্ভিত; কমলা আছাড় খেয়ে খেয়ে কাঁদছে—বাড়িওয়ালা গিন্নীই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলেন, গোবিন্দ অপটু হাতে সাজিয়ে দিল। মায় আলতা পর্যন্ত পরিয়ে দিল সে-ই।

কালীতারার শেষ অনুরোধ।

স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানিয়ে গেছে সে।

গোবিন্দ যথাসাধ্য যত্নের সঙ্গেই সে অনুরোধ রাখবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু যা করছে সে—যন্ত্রচালিত পুতুলের মত। আসলে গোবিন্দ যেন কেমন বিমূঢ়, স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ঘটনাটা তার কাছে এখনও কেমন অবাস্তব, স্বপ্নের মত ঠেকছে।

এই বয়সে বিয়েই হয় না কারুর কারুর—সে বিপত্নীক হল।

তা ছাড়া, ক বছরে কালীতারা কেমন যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে থাকবে না—কোন দিন সে কোথাও চলে যাবে একেবারে—এমন যেতে পারে—এইটেই তো অবিশ্বাস্য। আর এই আকস্মিক মৃত্যু—এমন সহসা চির-বিচ্ছেদ—এখনও তার স্পষ্ট বিশ্বাস বা ধারণা হচ্ছে না।

হাওড়া গিয়ে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে, সাজানো, হরিধ্বনি দিয়ে কাঁধে তোলা, মায় মুখাগ্নি পর্যন্ত সবই তাই কতকটা সে তেমনি স্তম্ভিত ভাবেই করলে। তার পর সেই ভাবেই একটু দূরে এসে বসল সে—উদাসীন নিস্পৃহবৎ।

তার এই বিমূঢ় ভাব অনেকেই ভুল বুঝল।

আসবার সময় হাহাকার কান্নার মধ্যেই কমলা হেমকে বলে দিয়েছিল, 'ওকে একটু কাঁদতে বল হেম, কোন মতে ওকে কাঁদিয়ে দে—নইলে বুক ফেটে মরে যাবে যে!'

এখন কালীতারার জেঠামশাইও আবার ভুল করলেন।

আস্তে আস্তে কাছে এসে বসে বললেন, 'বাবাজী—কান্না পাচ্ছে না? একটু কাঁদবার চেষ্টা কর না। এত কাল ঘর করেছ, সতীসাধ্বী স্ত্রী জন্মের মত চলে যাচ্ছে—এর পর আর মাথা খুঁড়লেও দেখতে পাবে না। কথাগুলো ভাববার চেষ্টা কর—কান্না পাবে নিশ্চয়ই। না কাঁদতে পারলে বড্ড কষ্ট পাবে যে বাবা!'

ওঁর কথায় বিস্মিত হল গোবিন্দ। সম্ভবত এই প্রথম তার মাথায় গেল যে ওর এই স্তম্ভিত ভাবটাকে ওঁরা দুঃসহ আঘাতের শুব্ধতা বলে ভুল করছেন!

এইবার ওর সেই বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবটা—সেই অবিশ্বাসের—স্বপ্নের ভাবটা কেটেও গেল খানিকটা। একটা বিস্ময়ের আঘাতে আর একটা বিস্ময়ের ঘোর বুঝি কাটল। সে এবার নিজের মনের দিকটা তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল।

কিন্তু সেখানেও নবতর বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্য। বিস্ময় আর তার সঙ্গে সামান্য একটু লজ্জাও।

কৈ, খুব একটা শোকাভিভূত তো সে হয় নি।

খুব একটা কষ্ট তো হচ্ছে না। হাহাকার করে তো তার কাঁদতে ইচ্ছা যাচ্ছে না। বুক ফেটে যাবে এই আঘাতে এমনও তো মনে হচ্ছে না তার!

বরং—লজ্জার সঙ্গে হলেও—বার বার এ বিশ্বাসটা মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলেও—এক সময় মানতে বাধ্য হল সে—কেমন যেন একটা স্বস্তির ভাব, একটা অব্যাহতির ভাবই মনে জাগছে। তার যেন বোঝা নেমে গেল মাথা থেকে, যেন একটা—খুব কষ্টকর না হলেও—বন্ধন থেকে মুক্তি পেলে সে!

তবে কি কালীতারার কোন স্থান ছিল না তার মনে?

ছিল বৈ কি! সে যে নিত্যকার সহস্র অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। সেই অভাববোধ, শূন্যতা তো আছেই। সেই সঙ্গে একটা বিপন্ন ভাবও।

কালীতারা না থাকলে খুব অসুবিধা হবে তার—যেমন এই কদিন হয়েছে। দৈনিক জীবনযাত্রা বিড়ম্বিত হবে।

একা-একা থাকাও বড় অসুবিধা।

সারাদিনের পর ঘরে এসে একটু সেবা, একটু স্বাচ্ছন্দ্য—রাত্রে পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করা, তার নানা কথা শুনতে শুনতে আরাম ও তৃপ্তির স্বাদের মধ্যে তন্দ্রায় চোখটি বুজে আসা—এটা যেন শুধু অভ্যাস নয়, প্রয়োজনও হয়ে পড়েছে তার।

কিন্তু কৈ, খুব একটা কান্না তো পাচ্ছে না।

অথচ কান্নাটাই যে শোভন এবং সঙ্গত সেটা সে বুঝতে পারছে।...

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে স্ত্রীর চিতার কাছে এসে দাঁড়ায় গোবিন্দ।

পুড়ে যাচ্ছে—এই দৃশ্যটা সামনাসামনি দেখে যদি কান্না পায়!

আরও দু-তিনটি চিতা জ্বলছিল। কালীতারার চিতার আশেপাশে।

তাদেরই শবযাত্রীদের মধ্য থেকে এক জন পাশে এসে দাঁড়ালেন। মধ্যবয়সী একহারা গড়নের একটি ভদ্রলোক। ব্রাহ্মণ—উত্তরীয়ের মধ্য থেকে মোটা পৈতার গোছা বেরিয়ে আছে।

'বাবাজীরই বুঝি অর্ধাঙ্গিনী গেলেন ?'

একটু অবাক হয়েই তাকাল গোবিন্দ। কিন্তু অস্বস্তিকর চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে কিছুটা কৃতজ্ঞতাও বোধ করল লোকটি সম্বন্ধে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সংক্ষেপে বললে সে।

'আহা-হা। কীই বা বয়স, তেইশ-চব্বিশ হল বোধ হয়—না হয় সামান্য একটু বেশীই হবে। এই বয়সে—বড়ই অসুবিধা, সত্যি।'

এ কথার উত্তর নেই, অগত্যা চুপ করেই থাকে গোবিন্দ।

'আমার দেখুন না—সংসারের নানা ঝকিতে তিত-বিরক্ত হয়ে দুটো দিন শ্বশুরবাড়ি জুড়োতে আসা—তা এসে পড়ে এই বিভ্রাট। শালার ছেলেটি—বললে বিশ্বাস করবেন না বাবা, সাতদিনের জ্বরে! কে আর জানে বলুন, খবর তো পাই নি, হঠাৎ এসে পড়েছি—বলি শহর-বাজার জায়গা, তাও শহরের মত শহর—কলকেতা। ক দিন একটু আরাম করে আসি গে। তা এসে দেখি এই কাণ্ড! কাল এসেছি, আজই এই—!'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করে যান ভদ্রলোক। গোবিন্দও চুপ করে থাকে। এমনিতেই সে খুব আলাপী নয়—তা ছাড়া এই মানসিক অবস্থায় সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কী কথা কইবে তাও ভেবে পায় না। শোকের সংবাদ—সান্ত্বনা দেওয়াই উচিত। কিন্তু তাকেই কে সান্ত্বনা দেয় তার ঠিক নেই—সে অপরকে কী দেবে ?

অনেকক্ষণ পরে—বোধ করি কোন কথা খুঁজে না পেয়েই প্রশ্ন করে, 'আপনি থাকেন কোথায় ?'

'দেশে থাকি বাবা। নিকটেই দেশ।' উৎসাহিত হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক, 'খুব একটা দূর কোথাও নয়। বি. এন. আর লাইন দিয়ে যেতে হয়, নতুন ইষ্টিশান হয়েছে আবাদা—তার কাছেই মানিকপুর।...আমরা ব্রাহ্মণ, শ্রীগোপীনাথ চক্রবর্তী আমার নাম, ঠাকুর ছিলেন ঈশ্বর জানকী চক্রবর্তী। মানিকপুরের চক্কোত্তী-বাড়ি ডাকসাইটে—এককালে দোল-দুর্গোৎসব দুই-ই হত। এখন আর কি, আসলই নেই—বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া সাপ হয়ে বসে আছি, কিছুই আর হয় না, পাল-পাব্বন বলতে আর কিছু নেই। কোনমতে দিন গুজরান করা। তবু গুপী চক্কোত্তী বললে ও অঞ্চলের সবাই চিনবে। ইষ্টিশানে নেমে জিজ্ঞেস করলে কানাও দেখিয়ে দেবে আমার বাড়ি।'

তার পর যেন দম ফেলবার জন্যেই কতকটা থেমে বললেন, 'আপনারাও

তো ব্রাহ্মণ দেখছি, সবাইকার কাঁধেই সুতোটা ঝুলছে—তা আপনাদের পরিচয় ?'

গোবিন্দ সংক্ষেপে নিজের নাম বলে।

'থাকা হয় কোথায় ? সিমলে ? কলকাতার সিমলে ? ও তো ধরুন আমার শ্বশুরবাড়িরই পাড়া। আমার শ্বশুরবাড়ি হল ভালুকবাগান ! নিজের বাড়ি ? ভাড়া— ? তা কলকাতায় আর কটা লোকেরই বা বাড়ি আছে ! সবই তো ভাড়া। কত তা-বড় তা-বড় লোক ভাড়া বাড়িতেই কাটিয়ে দিলে সারা জীবনটা ! করা হয় কি ? চাকরি ? তবে আর কি ? মাস গেলে যার বাঁধা আয় আছে তার আর বাড়ি-ভাড়াতে ভয় কি ?'

ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে অঙ্গারবর্ণ দেহটা।

ভরা যুবতী কালীতারার পুরন্ত দেহ বহ্নিরূপী রাক্ষসটা যেন লেলিহান জিহ্বা মেলে লেহন করছে—তাতেই ক্ষয়ে যাচ্ছে সেটা একটু একটু করে।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে যেন অবাক লাগে, ভয়-ভয়ও করে।

হেম গিয়ে হাত ধরে অল্প টান দেয়—

'এদিকে সরে এসে বসো না বড়দা।'

'হ্যাঁ, বাবাজী তাই চল। এসব দৃশ্য না দেখাই ভাল, বুঝলে না ? কাঁচা বয়স—এখন কি আর এসব দেখার কথা—না দেখা উচিত। এসো এসো !'

তার পরই সামান্য একটু জিভ কেটে বলেন গুপী চক্কোত্তী, 'ঐ যা ! তুমিই বলে ফেললুম। অবিশ্যি তাতে দোষই বা কি, তোমার ডবলের ওপর বয়স আমার—তবে না কি আজকালকার ই° বেঙ্গলরা আবার রাগ করে শুনেছি।'

উত্তর না দিলেও গোবিন্দ তাঁকে এড়াতে পারে না—কারণ সে তাঁর পাশে গিয়ে না বসলেও গোপীবাবুই এসে বসেন।

'তা কতকাল ঘর করলে বাবাজী মায়ের সঙ্গে ?'

গোবিন্দ উত্তর দেয় না। এবার ও যেন কেমন ক্লান্তি বোধ করছে—সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণাও। কিন্তু তাতে গুপী চক্কোত্তীর উৎসাহ কমে না। তিনি বলেন, 'তা বছর পাঁচ-ছয় হল নিশ্চয়—কী বল ? ইস—তা হলে তো বড্ড কষ্ট লাগবে। ফাঁকা লাগবে—তা লাগুক, কিন্তু অসুবিধে হবে কষ্ট হবে, সেইটেই বড় কথা। তেল, তামাক, বৌ—এসব

অভ্যেস হয়ে গেলে ছাড়া শক্ত। তোমার তো দেখছি বাবাজী অবিলম্বে আবার সংসার করতে হবে!'

গোবিন্দ এবারও চুপ করে থাকে—কিন্তু কথাটা শুনে যতটা বিরক্তি বোধ করার বা চমকে ওঠবার কথা—ততটা কিছু লাগে না ওর। বরং নিজের মনের অবচেতনে যে অনুভূতিটা সুপ্ত আছে, প্রকাশের পথ খুঁজছে—গুপী চক্কোত্তীর কণ্ঠে সেইটের প্রতিধ্বনি শুনে কেমন একটা বল পায় মনে মনে, অনুভূতিটা স্বীকার করতে যে সংকোচ বোধ করার কথা—সে সংকোচের কারণও দূর হয়ে গিয়ে যেন স্বস্তি অনুভব করে।

গুপী চক্কোত্তী একটু থেমে মেরজাইয়ের পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করেন।

'বাবাজী কিছু মনে করো না—এখানে বসেই স্বার্থের কথা তুলছি—কিন্তু আর তো সময়ও পাব না, এখানেই যখন ভগবান দেখা করিয়ে দিলেন তখন এটাকে বিধাতারই যোগাযোগ মনে করতে হবে। আমার একটি ভাগ্নী আছে বাবা, বিধবা বোনের মেয়ে, সে মেয়ে ইস্তক সমস্ত আমার ঘাড়ে—তা ঘাড়ও তো আমার এই—পল্‌কা, কখন মট্‌কে ভেঙে পড়ে তার ঠিক নেই—কিন্তু যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তো আমাকেই দেখতে হবে। বয়স ঠিক যেমনটি মানানসই হয়—তেরো পূর্ণ হয়েছে—ভা-রি ফুটফুটে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, আর তেমনি বুদ্ধি; ব্যাটাছেলে হলে জজ-মেজেস্টার হতে পারত। কী বলব বাবা, এ মেয়ে রাজারাজড়ার ঘরেই মানায়। তা আমায় তো বুঝতেই পারছ, না অর্থবল না লোকবল। সম্বন্ধ করছেই বা কে, আর রেস্তর জোরই বা কোথায়! তা এক বার দেখবে না কি বাবা? মেয়েটাকে? মাইরি বলছি—দেখলেই পছন্দ হবে!'

হেম পাশেই বসেছিল। সবই শুনেছে। মানুষ যে এত হৃদয়হীন হতে পারে তা তার ধারণার অতীত। সর্বাঙ্গ রাগে রি-রি করতে লাগল তার।

কিন্তু গোবিন্দর কাছ থেকে এ প্রস্তাবের যে প্রতিক্রিয়া আশা করছিল সে—তার কিছুই দেখতে পেল না। যে কড়া উত্তর গোবিন্দর দেওয়া উচিত ছিল—যা হেমের গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছিল প্রকাশের জন্য, তা অনুক্তই রয়ে গেল। গুপীর কথায় যতটা অবাক সে হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশী অবাক হল, যখন শুনল যে গোবিন্দ ধীরে ধীরে উত্তর দিচ্ছে, 'এ সব

কথা আমাকে বলে কী লাভ বলুন, বরং যদি কথা পাড়তে চান তো মার সঙ্গে দেখা করবেন। মা আছেন, মাসী আছেন—তাঁরাই আমার গার্জেন।'

কানে শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না হেমের, সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে যে কথাগুলো ঠিক গোবিন্দর মুখ থেকেই বেরোচ্ছে না আর কারুর- কিন্তু গুপী চক্কোত্তীর উৎসাহের অবধি থাকে না। তিনি প্রায় গোবিন্দর মুখের কথা কেড়ে নেন, 'বটেই তো, বটেই তো! আমারই ভুল ওটা। তা ভুল তো সব মানুষেরই হয় বাবা—ইংরেজরা নাকি বলে। তাঁদের কথাই খোঁজ করা আমার আগে উচিত ছিল। তা তাঁদের ঠিকানাটা বাবাজী—? মানে তোমারই ঠিকানা ধর। মাসীমা ওখানেই থাকেন? তোমাদের সঙ্গে? বিধবা নাকি?'

অসহ্য ক্রোধ সামলাতে না পেরে হেম বলে বসে, 'অত কথায় আপনার দরকার কি? এখনই হাঁড়ির খবর না নিলে চলছে না? আগে দেখুন তাঁরা এখন ছেলের বিয়ে দেবেন কিনা—এখন থেকেই অত আত্মীয়তা করছেন কেন?'

গুপী চক্কোত্তী কয়েক মুহূর্ত তাঁর শান্ত কোটরগত চোখ দুটি মেলে মিট্‌মিট্ করে তাকিয়ে রইলেন হেমের মুখের দিকে—যেন ওর সমস্ত পরিচয় ও মনোভাব একসঙ্গে সেই এক নজরেই জেনে নিলেন, তার পর বললেন, 'ঠিক বলেছ বাবা, আমারই অন্যায়। আসল কথা কি জান—বুড়ো হলে সব জ্ঞানগম্যি লোপ পেতে থাকে।...তা ঠিকই হয়েছে—তোমার কথাটা বলা কিছু অন্যায় হয় নি। শিক্ষার বয়সও নেই। বয়স হলে সন্তানদের কাছ থেকেই শিক্ষা নিতে হয়। ধর না কেন—শাস্তরেই তো বলেছে যে স্বয়ং বেম্মাও তাঁর সন্তানদের কাছ জ্ঞানলাভ করেছিলেন। সনৎকুমার না কে যেন ধমক দিয়ে শিখিয়ে গিয়েছিল তাঁকে।...তা সে কিছু নয়। এখন তোমার ঠিকানাটা শুধু দরকার। কাগজ প্যান্সিল কারুর কাছে কিছু আছে? নেই? কাগজ এক টুকরো বোধ হয় হবে—কিন্তু উট্‌প্যান্সিল একটা চাই যে!...দাঁড়াও খুঁজে নে আসছি—কারুর কাছ থেকে চেয়ে!'

এই বলে—আর উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করে প্রায় লাফিয়ে উঠে চলে গেলেন এবং বোধ হয় কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কোথা থেকে একটা পেন্সিল সংগ্রহ করে ছুটতে ছুটতে ফিরে এলেন।

তার পর পকেট থেকে কাগজ বার করে পেন্সিলসুদ্ধ গোবিন্দর শিথিল হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'বেশ গোটা গোটা করে লিখে দাও দিকি বাবাজী ঠিকানাটা—আমার আবার চশমা নেই কিনা!'

॥ ৪ ॥

দিন তিনেক পরেই গুপী চক্কোত্তী এসে হাজির হলেন।

বিকেলের দিক—পুরুষরা কেউ বাড়ি নেই, উমাও পড়াতে গেছে। খবরটা নিয়ে এসেছিল নীলা—বাড়িওলার ছোট মেয়ে। তার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে কমলা বললে, 'আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে? বুড়োমত বেটাছেলে? দূর পাগলী—খোকাকে খুঁজছে নিশ্চয়। বল্ গে যা গোবিন্দবাবু বাড়ি নেই, রাত আটটার পর দেখা হবে।'

'উঁহু—সে আমি বলেছিলুম। লোকটা বলছে, আমি গোবিন্দবাবুর মার সঙ্গেই দেখা করতে চাই। বিশেষ দরকার আছে।'

কমলার এখনও অপরিচিত পুরুষের সামনে বার হতে বিষম সংকোচ বোধ হয়—এখনও পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত হয় নি সে। ছেলের বন্ধু বা কেউ বাড়ি এলে একগলা ঘোমটা টেনে বসে থাকে।

সে বিপন্ন কণ্ঠে বললে, 'আমার সঙ্গে কী দরকার—না না বল্ গে যা, কথাবার্তা যা আছে যেন গোবিন্দবাবুকেই বলেন।'

গুপী চক্কোত্তীর কান খুব সাফ্। বাইরের দালান থেকেই কমলার অনুচ্চ কণ্ঠ তাঁর কানে গেছে। তিনি সেখান থেকেই হেঁকে বললেন, 'ওঁকে বল খুকী যে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা আমার হয়ে গেছে—এখন দরকার ওঁয়াকেই। বল যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বহু দূর থেকে এসেছি, বিশেষ প্রয়োজনেই। তোমার সঙ্গেই উনি একটি বার বাইরে এসে পায়ের ধুলো দিন, তোমার মারফতই কথাবার্তা চলতে পারবে।...কিংবা এ বাড়িতে যদি আর কোন ছেলেপুলে থাকে—তাকেই সঙ্গে করে আসুন না হয়!'

অগত্যা কমলাকে বাইরের দালানে আসতে হয়।

তার আগে জানালার ফাঁক দিয়ে মানুষটাকে দেখে নেয়—নিতান্তই সাধারণ চেহারার মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। খাটো মেরজাইয়ের মধ্য থেকে পৈতের গোছা ঝুলছে, পাত্লা উড়ুনির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেটা।

না, লোকটাকে খুব ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে না। গুণ্ডা বদমাইশের মত চেহারা নয়।

নীলাকে দিয়ে একটা আসন পাতিয়ে দিয়ে—নিজে একটু দূরে মেঝেতেই বসল কমলা। নীলাকে টেনে কোলের কাছে বসিয়ে তার একটা হাত ধরে

রইল। সাত বছরের মেয়ে হলেও সে-ই এখন যেন ওর প্রধান ভরসা ও অবলম্বন।

কিন্তু অতঃপর গুপী চক্কোত্তী মশাই যথোচিত ভূমিকা করে যে প্রস্তাবটি পাড়লেন—আর যাই হোক সে কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না কমলা। হেম কিছুই বলে নি—হয়তো বলবার মত কথা নয় বলেই বলে নি—অথবা এত তাড়াতাড়ি গুপী বাবু এসে হাজির হবেন তা সে কল্পনা করে নি। সুতরাং কমলার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আর সেই অবিশ্বাস্য রকমের বিস্ময়ের প্রবল আঘাতে স্থানকালপাত্রের হিসেব ভুলে গেল সে– নীলাকে মধ্যস্থ করে কথা বলবার সংকল্পটাও মনে রইল না। সে তার বিস্ফারিত চোখ সোজা গুপীবাবুর দিকেই মেলে প্রশ্ন করল, 'গোবিন্দ রাজী হয়েছে! সে নিজে ঠিকানা দিয়েছে!· না না, এ কী বলছেন আপনি?'

'আজ্ঞে মিছে কথা কি আর বলছি? আর এসব ক্ষেত্রে মিছে কথা কতক্ষণ বজায়ই বা থাকবে বলুন? ছেলে বাড়ি ফিরলেই তো সব জানতে পারবেন! তা ছাড়া বাবাজী না বললে আমি আপনার ঠিকানাই বা জানব কি করে! দেখুন না কেন তার নিজের হাতে লেখা ঠিকানা। তার হাতের লেখাটা আমি পাব কি করে?···তার হাতের লেখা তো চেনেন!'

মেরজাইয়ের পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার করে সগর্বে মেলে ধরেন গুপী চক্কোত্তী। সামান্য একটু বিজয়ের হাসিও বুঝি ফুটে ওঠে ওঁর মুখে।

হাতের লেখাটা সত্যিই গোবিন্দর। সেদিকে এক বার মাত্র চেয়েই বুঝতে পারে কমলা। অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত শূন্য দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে কমলা ধীরে ধীরে উত্তর দেয়, 'তা তার সঙ্গে যখন সব কথাই হয়ে গেছে, তখন আর মিছে আমার কাছে এসেছেন কেন? বাকী যা কথা তার সঙ্গেই শেষ করবেন!'

দুঃখের চেয়ে অভিমানই যেন বেশী ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে।

সঙ্গে সঙ্গে এতখানি জিভ কেটে দু কানে হাত দেন গোপীনাথ চক্রবর্তী!

'বাপ্ রে! তাই কখনও হয়। সে ছেলে আপনার নয় · বলেই দিয়েছে যে মাথার ওপর মা আছেন মাসী আছেন তাঁরাই গার্জেন। আপনাদের ছাড়া কিছুই হবার জো নেই। তবে তার অমত নেই—এই হল কথা।··· কী জানেন বেয়ান ঠাকরুন—বেয়ানই বলি, মেয়েটার অদেষ্টে থাকে এমন

শাশুড়ী পাবে—না পায় তবু সম্বন্ধটা পাতিয়ে রাখতে ক্ষেতি কি—অনুগ্রহ করে যখন কথাই কইলেন আত্মীয় ভেবে - কী জানেন—বিধবা বোনের মেয়ে, নিজের মেয়ের চেয়ে বেশী দায়িত্ব, তা ছাড়া আমার সাধ্যি তো এই—কাজেই দিনক্ষণ সময়-অসময় বিচার করতে গেলে আর চলে না। শ্মশানেই কথাটা পাড়া যে আমার উচিত হয় নি তা কি আর জানি না—না কি এই অশৌচের মধ্যেই এখানে আসা যে কত অন্যায় তাও বুঝি নি! কী বলব, নিরুপায়। কাল ভোরের টেরেনে দেশে ফিরব, এখন আর হয়তো আমার যোগাযোগই হবে না কত কাল। তবে যদি আপনার দয়া পাই তো—এই জন্যেই আসব। খরচাপত্তর করে শুধু শুধু আসবার মত আমার অবস্থা নয় বেয়ান!'

কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় ও বলবার সেই একান্ত দীন ভঙ্গীতে নরম হয়ে আসে কমলা। মাটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'তা আমিও তো এখন কিছু পাকা বলতে পারব না চক্কোত্তী মশাই—বোন আছে, এক বোনপো আছে। তারা আসুক, ছেলেও আসুক তার সঙ্গে কথা কই, পরামর্শ করি, তবে তো! এখন কোন কথা দিতে পারব না আপনাকে!'

'ব্যস্! ব্যস্! এই ঢের! এইটুক যে দয়া করেছেন এতেই আমি কৃতার্থ। নারাজ হন নি একেবারে, এইটেই বড় কথা। তবে আজ আমি উঠি—এধারেও আপনাদের অশৌচটা চলে যাক—দিন দশেক পরে একেবারে এসে মেয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করব। আপনারা তো আর সে ধাধ্বাড়া গোবিন্দপুরে যেতে পারবেন না—এখানেই আমার শ্বশুরবাড়িতে এনে দেখাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। চাই কি বলেন তো এখানে এনেও দেখাতে পারি, একেবারে আপনার শ্রীচরণের কাছে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তি।...তবে আসি, প্রণাম হই!'

অনেকগুলো বিপরীত মনোভাবের সংঘাতের মধ্যে সাধারণ ভদ্রতা ও লৌকিকতারই জয় হয়। কমলা ইতস্তত করে বলে—'অশৌচ চলছে, এখানে তো—মানে আপনাকে কিছু খেতে-টেতে বলতে পারলুম না—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গুপীবাবু বলেন, 'না না সে কি কথা। খাওয়া-দাওয়ার ঢের সময় মিলবে। কুটুম্বিতে যদি হয়—তখন আপনার কাছে চেয়ে প্রসাদ পেয়ে যাব।... মেয়েটার কি এমন ভাগ্যি হবে—আপনার মত দেবীকে শাশুড়ী পাবে!...তবে কি জানেন, ভগবান এক কূল ভাঙেন এক কূল গড়েন।

বোনটাকে অনেক দুঃখ দিয়েছেন, মেয়েটার একটা ভাল বিয়ে করেও দিতে পারেন!'

স্মিত প্রসন্ন মুখে বিদায় নেন গুপীবাবু।

থিয়েটারের দিন নয়—শুধু একটু আড্ডা দিতে আর অভ্যাস মত বাকী মাইনের তাগাদা করতে যাওয়া—হেম সকাল করেই ফিরল, প্রায় গোবিন্দরই সঙ্গে।

কমলা গোবিন্দকে সোজাসুজি প্রশ্ন না করে হেমকেই নিয়ে পড়ল, 'হ্যাঁরে হেম, গুপী চক্কোত্তী মশাই লোকটা কে—কৈ তুই তো কিছু বলিস নি!'

হেম নিমেষে জ্বলে উঠল, 'এসেছিল নাকি সেই বদমাইশ বাস্তুঘুঘুটা? লোকটার সাহস তো কম নয়! পাজীর পাঝাড়া বেটা!···কী বললে? ইস্—আমি থাকলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতুম!'

'ছিঃ বাবা, ভদ্রলোককে অমন করে বলতে নেই। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ তায় গরীব—ওদের কি আর অত ভাবতে গেলে চলে! বিপদে পড়ে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান হারিয়েছে। ওর দোষ কি?···তা ছাড়া খোকার মত না থাকলে সে ঠিকানাই বা দিলে কেন?'

শেষের কথাগুলো বলবার সময় আড়ে এক বার ছেলের মুখের দিকে তাকায় কমলা।

গোবিন্দ রাঙা হয়ে ওঠে—সেটা হ্যারিকেনের আলোতেও টের পাওয়া যায়। সে জড়িয়ে জড়িয়ে আমতা আমতা করে বলে, 'বা রে—তা আমি কি করব—জোর করে বললে ভদ্দরলোক—আর সত্যিই তো—গার্জেন আছে মাথার ওপর তাই বলেছি। এমন তো কিছু—'

হেমও গোবিন্দর কথা সমর্থন করে।

'সত্যিই তো—দাদার কি দোষ। যা ছিনে-জোঁক লোকটা! তা ছাড়া সেখানে দাঁড়িয়ে তখন কী আর কথা কাটাকাটি করতে ইচ্ছে করে?···তা তুমি তাকে একেবারে হাঁকিয়ে দিয়েছ তো?'

বেশ বাবা তোমরা। ছিনে-জোঁককে তোমরা বেটাছেলে হয়ে ছাড়াতে পারলে না—আমি ছাড়াব। কিছুই বলি নি, এখন এসব কথা আলোচনা করা যাবে না—শুধু এইটুকুই বলেছি। সেও পরে আসবে বলে চলে গেছে!'

'আসাচ্ছি! উঃ—কী স্বার্থপর লোকটা! এই শোকের সময়—এখনও বোধ হয় সে মানুষটার চিতে জুড়োয় নি!'

কমলা তখনকার মত কথাটা বন্ধ করে দিলে অন্য প্রসঙ্গ পেড়ে। এই আলোচনার সময় কিন্তু গোবিন্দর কণ্ঠে বা মুখের রেখায় যে কোন প্রতিবাদ বা বিতৃষ্ণা ফোটে নি এক বারও—এটুকু তার চোখ এড়াল না!

সারাদিনের পর ক্লান্ত উত্ত্যক্ত হয়ে ফেরে উমা - সাত-আট ঘণ্টা বকে বকে তার মাথা ঠিক থাকে না—এটা সবাই জানত। তাই উমার সামনে প্রসঙ্গটা কেউই তুললে না। কমলা ওকে খবরটা দিলে একেবারে রাত্রে—বিছানায় শুয়ে।

কিন্তু সে যতটা আশা করেছিল উমা অতটা উত্তেজনা প্রকাশ করলে না। বরং শান্ত ভাবেই প্রশ্ন করলে, 'তা তুমি এখন কি করবে ভাবছ? যা শুনছি, সে লোক তো শ্রাদ্ধের দিন গুনছে।··কটা দিন গেলে মেয়ে নিয়েই এসে হাজির হবে।

একটুখানি চুপ করে থাকে কমলা। বোধ হয় একটু সংকোচই অনুভব করে। তার পর বলে, 'দেখিই না মেয়েটা—যদি সত্যিই ভাল হয়—।· বিয়ে তো দিতেই হবে। এই বয়স থেকে তো সন্ন্যিসী হয়ে থাকতে পারে না ছেলে।'

'তা থাকতে পারে না ঠিকই—' কণ্ঠে তিক্ততা আর চাপা থাকে না উমার, 'তবু দিদি মনুষ্যত্ব বলে একটা কথা তো আছে। সে মেয়েটা তোমার সংসারে ক বছর কেনা বাঁদীর মত খেটেই গেল শুধু—না পেলে এদিকের কোন সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর না পেলে স্বামীর তেমন ভালবাসা। তোমার সংসারের ভাবনাতেই সে বাপের বাড়িতেও যেতে চাইত না—চায়ও নি শেষ পর্যন্ত—সেই মেয়েটা অমন বেঘোরে মারা গেল, তার জন্যে ছটা মাসও তোমরা অপেক্ষা করতে পারছ না! অশৌচটা কাটতেও তর সইল না। লোকে কি বলবে! মানুষের চামড়া আছে—তাই যে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

কমলা অপ্রতিভ হয়, একটু বিরক্তও হয়। খানিকটা চুপ করে থেকে বলে, 'বলছে বলেই যে এখনই হচ্ছে তাও তো নয়। মেয়ে দেখে পছন্দ হলেও তো আমরা দু মাস চার মাস সময় নিতে পারি। তা ছাড়া সত্যিই তো, সংসারেরও তো লোক চাই। আর খোকারও হাতে হাতে পান-জল

কাপড়জামা কে যোগায়। হরেক রকম তোয়াজ ওর—আমার তো বয়স বাড়ছে দিন দিন—না কি কমছে ?'

'সবই ঠিক দিদি—তবু মানুষ পারে না এটা। ভাব দিকি—যদি তোমার মেয়ে হত ?'

কমলা চুপ করে যায়। খানিকটা পরে অসংলগ্ন খাপছাড়া ভাবে হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'স্বামীর ভালবাসা পেলে না—এ কথা বললি কেন ? গোবিন্দ তো বৌমাকে কোনদিন অযত্ন করে নি !'

'অযত্ন না করলেই ভালবাসা হয় না দিদি। আমাদের তো চোখ আছে—গোবিন্দ এক দিনের জন্যেও মনে প্রাণে বৌ বলে নিতে পারে নি তাকে তুমিও কি আর তা লক্ষ্য কর নি !'

কমলা এ কথার কোন জবাব দেয় না।

গলির প্রান্ত থেকে তেরছা ভাবে একফালি গ্যাসের আলো এসে পড়েছে ওদের ঘরে—সামনের বুককেসটার ওপর। কাচের মধ্য দিয়ে দেখা যায় ওপর ওপর সাজানো—বিবর্ণ-হয়ে-যাওয়া লাল কাপড়ে বাঁধা ওর স্বামীর তন্ত্রের পুঁথিগুলো। এগুলো তাঁর বুকের হাড় ছিল বলে কমলা প্রাণ-ধরে ফেলতে পারে নি। ছেলেকে বলে রেখেছে, 'আমি মলে এগুলো গঙ্গায় দিস। তোর তো কোন কাজেই লাগবে না—আর ও কাজে লেগে দরকারও নেই।' এখন চুপ করে সেই দিকে চেয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে অনেকক্ষণ পরে আপনিই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন। এসব কথা নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতেই বা হবে কেন !

॥ ৫ ॥

গুপী চক্রবর্তী বোধ হয় সত্যিই দিন গুনছিলেন। কালীতারার শ্রাদ্ধ মিটে যাবার ঠিক পরের রবিবারটিতেই তিনি একেবারে পাত্রী নিয়ে এসে হাজির হলেন।

পাত্রী আর তার সঙ্গে তার বিধবা মাও। আটঘাট বেঁধেই কাজ করতে অভ্যস্ত গুপীবাবু।

তখন বেলা তিনটে। সকলেই বাড়িতে আছে। সম্ভবত গুপীবাবু সেটাও হিসেব করেই এসেছিলেন। গোবিন্দ তখনও ঘুমোচ্ছে—হেম উঠে বসে গল্প

করছে মাসীদের সঙ্গে, আর একটু পরে সে থিয়েটারে যাবে। উমা ও কমলা অনন্ত চতুর্দশীর সলতের সুতো কাটছে টেকোতে।

বাইরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ হয়েছিল—কিন্তু সেদিকে কেউ কান দেয় নি। কারণ ছুটির দিন এ গলিতে গাড়ি আসা কোন বিচিত্র ঘটনা নয়। সামনের বাড়ি, পাশের বাড়ি—এ বাড়িতেও বাড়িওয়ালার আত্মীয় কুটুম আসতে পারে। কিন্তু গাড়ির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই যখন গুপী চক্কোত্তীর ঈষৎ মেয়েলী ধরনের গলাটি নিখাদে বেজে উঠল—'কৈ গো বেয়ান ঠাকরুনরা, দরজাটা খুলবেন দয়া করে?'—তখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না।

কমলা বিপন্ন উদ্বিগ্ন মুখে প্রথমেই এক বার উমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল—দেখল ব্যাপারটা অনুমান করতে তার এক মুহূর্তও দেরি হয় নি এবং সমস্ত চেহারাটা সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবর্ণ ধারণ করেছে। আর সে রক্তিমার কারণ যে আর যাই হোক লজ্জা নয়—তাও বুঝতে বাকী রইল না কমলার।

কিন্তু তখন আর সেদিকে তাকাবার অবকাশ নেই।

অর্ধাবগুণ্ঠিতা বিধবা এবং তার পেছনে একটি কিশোরী মেয়ে উঠান পেরিয়ে রোয়াকে এসে উঠেছে। অগত্যা অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে যেতেই হয়। উমাকে কিছু বলবার সাহস নেই—কমলাই উঠে তাড়াতাড়ি মাদুর এনে বিছিয়ে দেয়।

গুপী চক্রবর্তী সময়ের মূল্য বোঝেন। গাড়োয়ানের সঙ্গে তকরার করলে আরও দু আনা বাঁচত, কিন্তু সে দু আনার চেয়ে বর্তমানকালে একটি মিনিটের দাম অনেক বেশী। তিনি নির্বিবাদে হাওড়া থেকে আসার ভাড়া আট আনার জায়গায় পুরো দশ আনাই দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকলেন এবং অপেক্ষাকৃত চাপা অথচ তেমনি তীব্র নিখাদে নির্দেশ দিলেন, 'করছিস কি নিস্তার, পায়ে পড়, পায়ে পড়—এমন পা আর পাবি না। সাক্ষাৎ মা দয়াময়ী—ওঁর দয়া হলে তোর রাণীর আর কোন ভাবনা থাকবে না। রাণী তোর সত্যিই রাজরাণী হবে—।'

নিস্তার অর্থাৎ নিস্তারিণীও প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। তিনিও আর কালবিলম্ব করলেন না, সত্যিসত্যিই কমলার পায়ের কাছে বসে পড়ে আর্দ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বড় জ্বালায় জ্বলে শীতল হতে এসেছি দিদি, আপনি তো আমার মতই দুঃখী, দুঃখীর ব্যথা বুঝবেন! মেয়েটাকে পায়ে ঠাঁই দিয়ে আমায়

বাঁচান। ইহজীবনে আর কোন সাধ আহ্লাদ নেই—ওর সদ্গতি হলেই আমার সব হল।…এখন আমার এই ধ্যানজ্ঞান, এই চিন্তা। আমাকে রক্ষা করুন দিদি—করতেই হবে। নইলে এ পা আর ছাড়ব না!'

কিন্তু এ নাটকের সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল না। ততক্ষণে নিস্তারিণীর পশ্চাদ্‌বর্তিনী সেই কিশোরী মেয়েটির দিকে চেয়ে এরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেছে।

রাণী যেন সাক্ষাৎ রাধারাণী।

বুঝি বা এই কিশোরীকে দেখেই সাধক মহাজনরা পদাবলী রচনা করেছিলেন—ভগবানের কিশোরীভজন লীলা কল্পনা করেছিলেন!

শ্বেতপদ্মের মত ঈষৎ হরিদ্রাভ শুভ্র বর্ণ, পদ্মের পাপড়ির মতই বিশাল বিস্ফারিত চোখ, তার সঙ্গে মানানসই টিকলো নাক, সুকুমার চিবুক। তেরো বছরের মেয়ে—যৌবনের সুঠামতা এখনও লাভ করে নি তার তনু-দেহ—কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কী হবে, তা কী হয়েছে দেখেই বোঝা যায়। ছিপছিপে অথচ গোলালো গড়ন, ছোট ছোট রক্তাভ হাতে চম্পক-কোরকের মত আঙুল, কৃষ্ণনগরের মূর্তির ছাঁচে ঈষৎ বেঁকে আছে। শুধু রূপ নয় মনটিও যে নির্মল, এখনও কাঁচা—গুপী চক্রবর্তীর আওতায় থেকেও অকালে পাক ধরে নি তাতে—বোঝা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মার কীর্তি দেখে—সম্ভবত পথে আসতে আসতে মামার রিহার্স্যাল কল্পনা করেই—মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল। আর তাতে দেখা গেল দাঁতগুলিও তার মুক্তার মতই সাজানো—এমন কি শিল্পী বিধাতা সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখে টোলটি দিতেও ভুল করেন নি।

নিস্তারিণী মেয়ের নির্বুদ্ধিতায় জ্বলে উঠলেও সে উষ্মা বাইরে প্রকাশ করলেন না—শুধু এক হ্যাঁচকায় মেয়ের হাত ধরে টেনে এনে চাপা তর্জন করে উঠলেন, 'পেন্নাম কর হতভাগী—স্বগ্গের দেবতা এঁরা—এঁদের পায়ে হাত দিবি—এ তোর জন্মান্তরের পুণ্যি।'

ততক্ষণে মেয়েটিও নিজেকে সামলে নিয়েছে। ছেলেমানুষ হলেও এই রকম ক্ষেত্রে তার পক্ষে হাসাটা যে উচিত নয়—সেটুকু বোঝাবার মত জ্ঞান বুদ্ধি তার হয়েছে। সে এবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কমলাকে প্রণাম করতে গেল।

কিন্তু কমলা তাকে পুরোটা হেঁট হতেই দিল না—তার আগেই তাকে

নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার চিবুক স্পর্শ করে সুগভীর স্নেহে বলে উঠল, 'তোমার আর পায়ে হাত দিতে হবে না মা, তুমি যে আমার মা-জননী!

তার পর উমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'এঁকেও প্রণাম কর মা- আমার বোন।'

উমাকে প্রণাম করে মেয়েটি অবশিষ্ট উপস্থিত ব্যক্তি হিসেবে হেমকেও প্রণাম করতে যাচ্ছিল, কমলা তাকে ধরে ফেলে বললে, 'উঁহু—উঁহু, ওকে প্রণাম করতে হবে না, ও যে সম্পর্কে তোমার দেওর হবে মা!'

ভাবের উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে এরা সকলেই ভাসছে তখন—কে কি বলছে, কী আচরণ করছে কারুরই তখন সে সম্বন্ধে কোন সচেতনতা নেই। কমলারই যদি এই রকম মুগ্ধ অবস্থা হয়—হেমের যে কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। মুখের কাছে যে কড়া কড়া কথাগুলো তৈরী হয়েছিল গুপীবাবুর উদ্দেশে—সেগুলো যে কখন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে তা হেম বুঝতেই পারে নি। এই ত্রয়োদশী কিশোরীর রূপের মোহ জাদু বিস্তার করেছে তার মনে মস্তিষ্কে চৈতন্যে—সে বিহ্বল হয়ে গেছে। কী করা উচিত, কী বলা উচিত কিছুই বুঝতে না পেরে ঘেমে লজ্জায় রাঙা হয়ে বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। রাণী তাকে স্পর্শ করে নি—কিন্তু তাকে প্রণাম করতে, স্পর্শ করতে আসছিল এইটে অনুভব করেই অকারণে কণ্টকিত হয়ে উঠল।

কিন্তু গুপীবাবুর বুদ্ধি, দৃষ্টি কিংবা শ্রুতিশক্তি কিছু মাত্র আচ্ছন্ন বা মুগ্ধ হবার কারন ঘটে নি। তিনি এই সুযোগ মুহূর্ত কালের জন্য নষ্ট হতে দিলেন না, কমলার মুখের কথার শেষটুকু শেষ হবার আগেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জয় মা ব্রহ্মময়ী, জয় গৌর আনন্দময়। বাস্—জবান পেয়ে গেছি, আর কিছু ভাবি না বেয়ান, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে যে ভিক্ষাটি দিলেন আর এই অনাথা বেওয়া বিধবাকে—এর জন্যে মা আনন্দময়ী আপনার প্রাণ পুরে মনস্কামনা পূর্ণ করাবেন। নিস্তার কার মুখ দেখে উঠেছিলি আজ, তোর মেয়ের হিল্লের মত হিল্লে হয়ে গেল!'

বিচার শুরু হবার আগেই যদি আসামী অপরাধ কবুল করে বসে থাকে, তা হলে পরে আর সওয়াল জবাব জমে না। মামলা চলারও আর কারণ থাকে না।

এক্ষেত্রে কমলারও হল তাই।

কোন্ এক দুর্বল মুহূর্তে এমন কথাই বেরিয়ে গেল যে পরে আর কোন ওজর আপত্তি ওঠাবার অবসর রইল না। গুপীবাবু এবং তাঁর উপযুক্ত বোন নিস্তারিণী দু জনে পালা করে এমনই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ শুরু করলেন যে এ পক্ষ আর কোন কথা কইবার বিশেষ ফাঁকও পেলে না। তাঁরা বিবাহের প্রতিশ্রুতি তো নিয়ে গেলেনই—এক দিন ঠিক করা ছাড়া বলতে গেলে আর কোন কথাবার্তাও বাকী রইল না। কমলা বা হেমের পক্ষ থেকে সামান্য একটু দ্বিধার ভাব দেখাবার ক্ষীণতম চেষ্টাও কোথায় উড়ে চলে গেল এঁদের আন্তরিকতার প্রবল বাতাসে। দেনাপাওনার কথাও তোলা গেল না,—এঁরা বিশেষ কিছুই চাইবেন না এক রকম এই কথা আদায় করেই নিয়ে গেলেন গুপীবাবু। বাকী রইল শুধু দিনটা ঠিক করা—সেটা গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করে ঠিক হবে—এই স্থির রইল, অর্থাৎ শোভনতার জন্য কতটা অপেক্ষা করা যায় সেইটে ভেবে দেখতে হবে। তা ছাড়া—কমলা মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল—হয়তো আর্থিক প্রশ্নও উঠবে, গোবিন্দকে ওর বন্ধু মনিবের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু টাকা ধার করতেও হবে।

সে কথাটাও এখন সারতে পারলে গুপীবাবু খুশী হতেন কিন্তু মানুষের কোন সার্থকতাই পরিপূর্ণ ভাবে দেওয়া বুঝি বিধাতার ইচ্ছা নয়—তাই সেটা আর হয়ে উঠল না। এঁরা আসাতেই গোবিন্দর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল—সে ওধারের দরজা দিয়ে প্রায় তখনই সরে পড়েছে।…

উপযুক্ত জলযোগের পর গুপীবাবুরা বিদায় নিতে কমলা উমার মুখের দিকে তাকাবার অবকাশ পেল। বড় রকমের একটা ঝড়ই সে আশঙ্কা করেছিল সেদিক থেকে, কিন্তু প্রাথমিক রোষরক্তিমা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখে যে একটা ভাবলেশহীনতা ফুটে উঠেছিল—তার আর কোন পরিবর্তন হল না। অভদ্রতা করার মানুষ সে নয়, নিস্তারিণীর দু-চারটে প্রশ্নের উত্তর ভদ্রভাবেই দিয়েছে—তবে সেটা কমলার কাছে খুব বড় আশ্বাস নয়। সে সারা সন্ধ্যাটা বার বার ভয়ে ভয়েই তাকাতে লাগল উমার মুখের দিকে, কিন্তু সেখানে কোন বৈলক্ষণ্য টের পাওয়া গেল না। তার শান্ত উদাসীন মুখভাবে বা সহজ আচরণে কোথাও এতটুকু রূপান্তর ঘটল না।

তবু কমলার ভয় সবটা যায় নি—রাত্রে শুতে গিয়ে একান্তে হয়তো কথাটা উঠবে এ আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু রাত্রেও সহজ ও স্বাভাবিক দু-চারটে কথাবার্তার মধ্যেই উমা এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। নিজে থেকে বিকেলের

কথাটা তুলবে এত সাহস কমলার হল না—তবু এইবার সে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হল।

মনকে সে আশ্বাস দিলে, আর যাই হোক—কোন বড় রকমের তুফান আর উঠবে না।

এর পর মাস দুই কাটল নিরাপদেই। এর মধ্যে গুপীবাবু বার কতক এসেছেন, দিনও ঠিক হয়ে গেছে, বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হয়েছে। সামনের অঘ্রানেই বিয়ে। কমলার মনে যেটুকু আশঙ্কা ছিল সেটুকুও আর নেই। বিবাহের আয়োজনে উমা কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নি বটে কিন্তু তার তরফ থেকে কোন অসহযোগেরও আভাস পাওয়া যায় নি।

বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই একেবারে প্রথম সে আভাস পাওয়া গেল পাকা-দেখার হাঙ্গামাও মিটে যাওয়ার পরের দিন—বিবাহের যখন আর মাত্র সাতটি দিন বাকী আছে।

উমা সহজভাবেই সন্ধ্যার পর পড়িয়ে ফিরে—আহ্নিক করতে যাবার আগে দিদির কাছে কথাটা পাড়লে, 'দিদি, আমার এক ছাত্রী থাকে এই কাছেই, ক্রিশ্চানদের হোস্টেলটার পেছনে—তারাও ব্রাহ্মণ, দু-তিনটি বিধবা আছেন বাড়িতে। তাঁরা একটা ছোট ঘর ভাড়া দেবেন—বাড়ির মধ্যে, ভাড়াও খুব কম—মনে করছি এই মাসের পয়লা থেকে আমি সেখানে গিয়েই থাকব!'

খুব স্বাভাবিক ভাবে, একান্ত শান্তকণ্ঠে কথাগুলি বললে উমা,—কিন্তু তাতেই আরও দুর্বোধ্য ঠেকল কমলার কাছে। সাধারণ শব্দেরও যেন অর্থ গ্রহণ করতে পারলে না সে—হাঁ করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

অবশেষে যখন ওর কণ্ঠে কথা ফুটল, তখন শুধু বিহ্বল ভাবে এই প্রশ্নটুকুই করতে পারলে, 'তুই—তুই একলা থাকবি? আলাদা ঘরভাড়া করে? কী বলছিস?'

'দোষ কি? আর অন্তত আমার স্বভাব-চরিত্রের দোষ কেউ দেবে না। দশ বাড়ি মেয়ে পড়িয়ে খাই, সে দোষ দিলে এত কাল ঢের দিতে পারত। তা ছাড়া সে বয়সও আর নেই!'

'কিন্তু তার দরকারটা কি পড়ল…সেইটেই তো বুঝছি না!'

'সব কথা সবাই বুঝতে পারে না দিদি!…সে মেয়েটাকে আমিই একরকম জোর করে পাঠালুম, আমি না পাঠালে সে হয়তো যেত না—মরতও না।

সেজন্যে তার কাছে চিরদিন আমি অপরাধী হয়ে থাকব।·· তার বড় সাধের সংসার—সংসার করবারও তার বড় শখ। তার জায়গায় এই ঘরে এই সংসারে তার সতীন এসে ঢুকবে—তিন মাস না যেতে যেতে—এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। মনে হবে আমিই তাকে খুন করেছি—এই মতলবে। তার আত্মা আমাকে অভিসম্পাত করতে থাকবে স্বর্গ থেকে। না দিদি মাপ কর আমাকে—এখানে আর আমি থাকতে পারব না! এ ঘরে আর একটা মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ দেখলে এখানে আমার মুখে অন্ন রুচবে না।' বলতে বলতে নিজেকে সংযত করবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও উমার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এসেছিল, সম্ভবত সেই আসন্ন চোখের জল গোপন করতেই সে আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়ে নিজের পূজোর আসনে গিয়ে বসে চোখ বুজল।

ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের অশ্রুর মধ্যে অনুশোচনা ও আত্মগ্লানির অশ্রু আত্মগোপন করতে পারবে—সুলভ ভাবাবেগ প্রকাশ হয়ে পড়ার লজ্জায় পড়তে হবে না!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

কথাটা কেমন করে রাষ্ট্র হয়ে গেল তা হেম বুঝতে পারলে না। সম্ভবত কম্বুলে-টোলা থেকে ফিরে এসে রুষ্ট এবং উৎকণ্ঠিত রমণীবাবুকে যখন দেরি হওয়ার কৈফিয়ত দিচ্ছিল, সেই সময়ই কেউ শুনে থাকবে।

বাবু বেশ একটু তেতে ছিলেন, আর তাতাই স্বাভাবিক—সেটা হেমও মনে মনে স্বীকার করে। বাড়িটা সে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলে কি না—চিঠিটা ঠিকমত পৌঁছল কিনা—সে সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা বোধ করারই কথা; কারণ কয়েক জন সম্ভ্রান্ত বন্ধু যাবেন তাঁর সঙ্গে, তাঁদের আতিথেয়তার দায়িত্ব আছে। কিছু জরুরী কাজও ছিল—খবরটার জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে সময় পার হয়ে গেল, কাজটা নষ্ট হল। সুতরাং ঝাঁজটা অনেকক্ষণ থেকেই মনের ভেতর জমা হয়েছে, তার ফলে চাপা গলায় কথা কইবার অর্ধ-আন্তরিক ক্ষীণ চেষ্টাটা প্রথম দুটো-চারটে শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় ভেসে চলে গেল—বেশ চড়া গলাতেই কথা শুরু করলেন। নিজের কাজ পণ্ড হওয়ার তিক্ততা, ওর নির্বুদ্ধিতার জন্য বিরক্তি এবং সবটা জড়িয়ে অতিরিক্ত একটা উষ্মা—গলার আওয়াজে এক সঙ্গে উপ্‌চে বেরিয়ে এল যেন।

বাবু প্রচণ্ড রাশভারী মানুষ। তাঁর এই উচ্চ কণ্ঠস্বরের সামনে বহু দিনের পুরনো কর্মচারীদেরই মাথার ঠিক থাকে না—হেম তো সেদিনের লোক। তাঁর চোখমুখের চেহারা দেখেই এক নিমেষে ঘেমে উঠেছিল—এখন ধমক খেয়ে গলাতে যেন আওয়াজটাই জড়িয়ে গেল, প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিলম্ব হওয়ার কারণটা গুছিয়ে বলতে পারলে না। ফলে যে কৈফিয়তটা এক মুহূর্তে দেওয়া যেত সেইটে বলতেই তার বহু সময় লাগল এবং ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা চড়া চড়া ধমক খেতে হল।

যাই হোক—বিলম্বের কারণটা শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে তার সেই জড়ানো-গলার আওয়াজ এবং উল্‌টো-পাল্‌টা কথার মধ্যে থেকে উদ্ধার করে বাবু খুশীই হলেন। আরও খুশী হলেন হেমের এই অহেতুক ভয় দেখে। কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রীতি বা শ্রদ্ধার চেয়ে ভয়টাই তাঁর বেশী পছন্দ। তাঁর দাপট

আছে, তাঁকে ওরা যমের মত ভয় করে এইটে জানলে তিনি খুশী ও নিশ্চিন্ত হন।

আজও তাঁর মুখ প্রসন্ন হতে দেরি হল না। তবু প্রচ্ছন্ন একটা আশ্বাস-মিশ্রিত মৃদু ধমকের স্বরেই বললেন, 'এই তো—এই কথাটা এতক্ষণ বলে ফেললেই তো হয়ে যেত। বাজারটা করে দিয়ে এসেছ—কাজটা তো কিছু অন্যায় কর নি। তার জন্যে এত ভণিতা কেন? তা মাছ-টাছ বেশ ভাল দেখে কিনে দিয়ে এসেছ তো? পচা পাচ্‌কো হলে খুব মুশ্‌কিল হবে কিন্তু—বড় বড় লোক সব যাবে, দু জন ব্যারেস্টার, এক জন হাকিম। সাবধান! দেখো বাপু, আমাকে ডুবিও না যেন!'

এ কণ্ঠস্বরে খানিকটা আশ্বস্ত হল হেম। মাথা হেঁট করেই জবাব দিলে, 'আজ্ঞে না—টাটকা দেখেই কিনেছি। জিনিস কোনটা খারাপ হবে না।'

'বেশ বেশ—তা হলেই হল!' তার পর জামাটা উল্‌টে ট্যাঁক থেকে একটা আধুলি বার করে ওর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এটা রাখো—বাড়ির জন্যে মিষ্টি কিনে নিয়ে যেও!'

পকেটে মনিব্যাগ থাকে, তাতে টাকারও অভাব নেই—তবু সর্বদা ট্যাঁকে কিছু রেজগি রাখা রমণীবাবুর অভ্যাস। বলেন, 'এক শ বার ব্যাগ বার করে পয়সা দেওয়া বড় হ্যাঙ্গাম! তা ছাড়া কেউ তুলে নিলে তো সব গেল—একটা পয়সার আজীর!'

দুখানা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও রমণীবাবু হামেশাই ট্রামে যাতায়াত করেন—সুতরাং পকেটমারের ভয় থাকাটা স্বাভাবিক।

সেই চেঁচামেচির ফলে দু-চার জন বাবুর ঘরের বাইরে এসে জমাটা আশ্চর্য নয়—আর দু জনের কথাবার্তা থেকে ঘটনাটা অনুমান করতেও কারুর অসুবিধা হবার কথা নয়।

তার ফলে হেমেরই প্রাণান্ত। একটা ঘাড়ে কারও দুটো মাথা নেই যে বাবুর সামনে রসিকতা করবে। আড়ি-পাতার ইতিহাসটাও তাঁর জানার সম্ভাবনা ছিল না—কারণ তাঁর বাইরে আসার আভাস মাত্র পেয়ে সবাই পালিয়েছিল। হেমও প্রথমটা তাই বুঝতে পারে নি! বুঝতে পারলে একেবারে যখন চারিদিক থেকে বাক্যবাণ বর্ষিত হতে শুরু হল—তখনই।

প্রথমেই শুরু করল নন্দ—ওরই এক সহকর্মী গেট-কীপার।

চোখ মট্‌কে মুচকি হেসে বললে, 'আর কি হেমচন্দর—তোমার কপাল তো খুলে গেল—দেখো বাবা, সুসময়ে গরীবদের কথা একটু মনে রেখো—একেবারে পায়ে ঠেলো না!'

ওরা যে কেউ অপরাহ্ণের ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানে—এ অনুমান হেমের স্বপ্নের অগোচর। সে বিহ্বল হয়ে খানিকটা নন্দর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, 'তার মানে?'

'না—তাই বলছি!' আবারও মুচকি হাসে নন্দ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানাই এসে পড়ে।

'বাবা ডুবে ডুবে জল খাও—ভাবো শিবের বাবা টের পাচ্ছে না! হুঁ-হুঁ—সবাই বলে পাড়াগেঁয়ে মেড়া, ভূত, বোকা। আমি চির দিন বলে এসেছি পাড়াগাঁয়ের লোকেরা আমাদের এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারে। তা ভাল ভাল—নিজের আখের দেখবে বৈ কি। তবে একটু সাবধানে চল ধন—এক দিকে মেয়েমানুষ আর এক দিকে বড়লোক। দুই-ই সমান। লোকে কথায় বলে—বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষেণে হাতে দড়ি ক্ষেণেকে চাঁদ! আর মেয়েমানুষ? আরও সাংঘাতিক—ও হল শাঁখের করাত, যেতেও কাটে আসতেও কাটে!'

হেম আরও বিহ্বল হয়ে পড়ে। একটা অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা-মত সন্দেহ যে মনের কোণে উঁকি না মারে তা নয়—তবু সে অবাকই হয় সত্যি-সত্যি। বলে, 'কী যে তোরা বলছিস—বুঝতেই পারছি না!'

'ইল্‌-লো!' কানাই ওর দাড়িটা ধরে নেড়ে দিয়ে বলে, 'কচি খুকী একেবারে! কিচ্ছু জান না।—অত বড় ঘুঘু কন্‌ট্রাক্‌টারকে ঘায়েল করে তার মেয়েমানুষের দিকে হাত বাড়িয়েছ—তুমি কিছু জান না! ন্যাকা!'

'এই কেলো—কী করিস। চুপ কর্।' সতর্ক করে দেয় নন্দ।

একটু পরে দক্ষিণাবাবুর সঙ্গে দেখা হতে তিনিও মুখ টিপে হাসেন। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'দেখো হে ছোকরা, সাবধান!...বেশী বাড়াবাড়ি করতে যেও না যেন। ও হল নৈবিদ্যির মোণ্ডা—কুকুরের ওতে মুখ দিতে নেই!'

লাল হয়ে ওঠে হেম—লজ্জাতেও বটে, অপমানেও বটে। কিন্তু এতকাল এখানে থেকে এইটুকু বুঝেছে যে এ ধরনের কথা নিয়ে বাদানুবাদ বা তর্কের

ক্ষেত্র এটা নয়। পাঁকে নাড়া দিলে, পাঁকই ঘুলোয়—পরিষ্কার জল মেলে না তাতে।

সে শুধু আস্তে আস্তে বলে, 'কী বলছেন দক্ষিণাদা তা বুঝছি না—মনিব হুকুম করেছিলেন—তামিল না করে উপায় ছিল না। এতে এত টিটকিরির কী আছে তাও বুঝি না!'

দক্ষিণাবাবু আর কথা বাড়ান না, ওর পিঠে গোটা দুই মৃদু চাপড় মেরে বলেন, 'রাগ হয়ে গেল অমনি! ঠাট্টা করছিলুম রে! তবে ভাই সাবধানে থাকিস একটু। এখানে অনেক বছর কাটল তো—অনেক দেখলুম!'

কিন্তু এধারে যতই যা রাষ্ট্র হোক—হেম নিজের ভাগ্যের কোন পরিবর্তনই দেখতে পায় না। বরং উল্‌টোটাই দেখে।

কৃতজ্ঞতা সে আশা করে নি—কী-ই বা সে করেছে কৃতজ্ঞতা পাবার মত? তা কিছু নয়—তবে পরিচয়ের স্বীকৃতিটা অন্তত আশা করেছিল! কিন্তু দিন-তিনেক পরেই কী একটা কাজে ভিতরে যাবার দরকার হতে এবং (হয়তো নিজের সচেতন মনের অগোচরে সে রকম একটা চেষ্টাও ছিল) নলিনীবালার সামনে পড়ে যেতেও, সে অবাক হয়ে দেখলে, সামান্য-মাত্র ব্যক্তিগত পরিচয়ের দীপ্তিও ফুটল না তার চোখে। যেমন সাধারণ ভাবে অন্য দিন নির্লিপ্ত স্মিতমুখে চেয়ে বসে থাকে—তেমনিই রইল নলিনী।

শুধু অবাক হল না হেম—আহতও হল।

এতটা সে আশঙ্কা করে নি। হলেই বা বাবুর প্রেয়সী—তা বলে চিনতে পারবে না, এত অহঙ্কার কিসের!

অপমান-বোধ, ক্ষোভ অথবা ঈর্ষা—কারণ যা-ই হোক, হেমের কান দুটো আগুনের মত গরম হয়ে উঠল। বিশেষ করে তার মনে হল চারিদিক থেকে অসংখ্য কৌতূহলী দৃষ্টি বিদ্রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

সে স্থান কাল পাত্র সব ভুলে সম্পূর্ণ অকারণেই, নলিনীর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে বোকার মত হেসে বললে, 'এই যে, ভাল আছেন?'

নলিনী একটু যেন বিস্মিত হয়েই ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, তার পর তেমনি থতমত ভাবেই বললে, 'ভাল—হ্যাঁ—তা—। অ, আমাদের হেমবাবু! পোড়া কপাল আমার। সেদিন বুঝি বাবুর চিঠি নিয়ে গিছলেন! ঠিক বটে। হ্যাঁ ভাই, বেশ ভাল আছি। আপনার খবর ভাল সব? আহা, আপনি সেদিন কষ্ট না করলে বড় বিপদে পড়তে হত!'

এই বলে চারিদিকে একবার বিচিত্র অমায়িক ভঙ্গীতে তাকিয়ে নিয়ে পাশের আর এক অভিনেত্রীর দিকে হাত বাড়াল, 'দেখি লা নেড়ী তোর ডিবেটা—আমার চাকরটা আজ আবার এমন ঝাল পান এনেছে, মোটে মুখে দিতে পারছি না!'

হেম তখন পালাতে পারলে বাঁচে—শুধু এখান থেকে নয়—এই থিয়েটার থেকেও। মনে হচ্ছে আরও উপহাস এবং টিটকিরি নির্বোধের মত সেধে নিজের ওপর টেনে আনলে সে।

অন্ধের মত হোঁচট খেতে খেতে এবং প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে একটা উইংস-এর পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছছে—কানের পাশ থেকে হিস্ হিস্ করে উঠল দক্ষিণাদার কণ্ঠস্বর, 'ইষ্টুপিড্। সেধে অপমান হতে না গেলে বুঝি চলছিল না? ঐটুকু কথা কয়ে কী স্বগ্গ-লাভ হল তাই শুনি!... নিজেও মরবি ঐ ছুঁড়ীটাকেও মারবি যে—এটাও বুঝিস না?'

আরও বিস্মিত হল হেম—কিন্তু তবু ওঁর এই মন্তব্যের অর্থটা জিজ্ঞাসা করতে পারল না দক্ষিণাদাকে। অপমানে লজ্জায় কেমন এক ধরনের অবর্ণনীয় গ্লানিতে কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল—গলা দিয়ে একটু স্বরও বেরোল না।

॥ ২ ॥

দক্ষিণাবাবুর কথাগুলোর অর্থ বুঝল হেম—আর কদিন পরে।

সেদিন বহুরাত্রি পর্যন্ত জেগে এপাশ ওপাশ করতে করতে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে—আর নয়! চাকরি করতে গেছে, চাকরিই করবে। বাইরে তার কাজ—বাইরে থাকাই ভাল—কোন দিন কোন ছুতোয় সে ভেতরে যাবে না, কোন মেয়েছেলের সঙ্গে কথাও কইবে না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রইল না—দিন পনেরো পরেই আবার এক অপরাহ্ণে বাবু ওকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে।

ভয়ে ভয়েই গেল হেম—যদিচ অনেক ভেবেও এমন কোন অপরাধের কথা তার মনে পড়ল না যাতে ভয় পাবার কারণ থাকে—কিন্তু বাবু ডাকলেই বুকটা ধড়াস করে ওঠে। এইরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে সকলের।

যাই হোক—ঘরে ঢুকে দেখলে বাবুর মুখ অনেকটা প্রসন্ন। নিজের

ডেস্কের সামনে বসে একটা কাগজ মেলে আগের দিনের হিসেব দেখছিলেন—কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'এসেছ ? দাঁড়াও।' তার পর হিসেবটা দেখা শেষ হতে ওর দিকে খানিকটা নিঃশব্দে চেয়ে থেকে বললেন, 'ও, হ্যাঁ—তোমাকে ডেকেছিলুম বটে। কী যেন তোমার নাম—হেম না ?··· তা শোন, একটা কাজ করতে পারবে ? সেদিন যে বাড়িটায় গিছলে, মনে আছে তোমার ?···আজও এক বার সেখানে যেতে হবে।···মানে—আজও ক জন লোক খাবে, একটু বাজার দরকার। সেদিন নাকি তুমি বেশ ভাল বাজার করেছিলে—অনেক সস্তায়ও। সাজার ঝিকে দিয়ে বাজার করানো—সে বেটী দু হাতে চুরি করে ; তা পারবে বাজারটা করে দিতে ?'

প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে পড়ে বৈকি !

তবুও মনিবের মুখের ওপর 'না' বলতে পারে না। মাথা হেঁট করে বলে 'পারব।'

'বেশ, বেশ। এই তো চাই, কোন কাজেই না বলতে নেই। আমি—আমাকে আজ এই দেখছ। এক দিন গামছা কাঁধে করে ফিরি করেছি এই কলকেতার রাস্তাতেই, মেড়োদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আজও—লাখ লাখ টাকার ঠিকেদারি করি বটে—কিন্তু নিজে ছাতি মাথায় দিয়ে রোদে জলে দাঁড়িয়ে মিস্তিরী খাটাই।···তোমার উন্নতি হবে।···এই নাও ফর্দ। দু রকম মাছ, একটু মাংস—আর আদা পিঁয়াজ টকদই, আলু হিসেব মত। সবই লেখা আছে, এই দশটা টাকাও ধর—বেশ ভাল দেখে জিনিস কিনো—বিশিষ্ট ভদ্দর-লোকেরা খাবেন।'

তার পর কী ভেবে ট্যাঁক থেকে আরও দুটো টাকা বের করে দিয়ে বলেন, "এটাও রাখো—যাচ্ছ যখন তখন অমনি তিনকড়ি ময়রার কাছ থেকে দই সন্দেশও কিনে নিয়ে যেও—দশে বোধ হয় কুলোবে না, আরও লাগবে।'

হেম ফর্দটায় এক বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, 'কিন্তু এত বাজার নিয়ে যাব কী করে ? ঝাড়ন কি গামছা একটা—। ও বাড়িতে কি আগে যেতে হবে ? গিরিধারীকে সঙ্গে নেব ?'

'তোমার তো খুব মনে থাকে হে ছোকরা ! গিরিধারীর নামটাও মনে করে রেখেছ ?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক বার তাকান রমণীবাবু ওর মুখের দিকে, 'না তার দরকার নেই। একেবারে এই নতুন বাজার থেকে বাজার করে একটা ঝাঁকামুটের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে যেও।···কতই বা নেবে—চারটে পয়সা বড়

জোর! তার জন্যে আর দোকর আসা-যাওয়া করে লাভ কি?...নতুন বাজারে মাল কিনলে কিছু ওয়ারাও পাওয়া যাবে—তাতেও মুটের পয়সাটা উসুল হবে!'

মুটের পয়সা ওর ট্রামভাড়াতেও উসুল হবে, মনে মনে গজগজ করতে লাগল হেম, মুটের মাথায় মাল চাপিয়ে কিছু ট্রামে যেতে পারবে না। মাঝখান থেকে ওর পয়সাটা মাটি!

কিন্তু সেটা মুখে বলা সম্ভব নয়। 'যে আজ্ঞে' বলে কোঁচার খুঁটে টাকা কটা বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে পড়তে হল তখনই।

করতেই হবে—তাই করা। কিন্তু মনটা অপ্রসন্ন হয়ে রইল সারাক্ষণ। আবার নলিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—এই ভেবেই আরও বিশ্রী লাগছিল।

মুটের মাথায় মোট চাপিয়ে, নিজের দু হাতে দইয়ের খুলি আর সন্দেশের হাঁড়ি নিয়ে ভাদ্রের খর-রৌদ্রে হেঁটে যেতে যেতে বার বার নিজের মনকে শাসাল, 'খবরদার, আর কোনও রকম ঘনিষ্ঠতা করা নয়।... দোরের কাছ থেকে গিরিধারীকে ডেকে বুঝিয়ে দিয়েই চলে আসতে হবে। বসতে বললেও বসব না!'

কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে কড়া নাড়তে দোর খুলে দিলে গিরিধারী নয়—নলিনী স্বয়ং।

'আসুন, আসুন। আপনার জন্যেই সেই থেকে নীচে বসে আছি হা-পিত্যেশ করে। আসুন, আসুন—ভেতরে আসুন। যা রোদ আজ বিকেল অবধি! '

হেম এ আত্মীয়তায় ভিজবে না—সে শুষ্কস্বরেই বলবার চেষ্টা করলে, 'থাক্, আমি আর এখন ভেতরে যাব না। জরুরী কাজ আছে একটা—আপনি গিরিধারীকে ডাকুন—মালগুলো নামিয়ে নিক্। এই ফর্দ বাবু দিয়েছিলেন, মিলিয়ে নেবেন—'.

'আচ্ছা আচ্ছা! হয়েছে। অত রাগ করতে হবে না। দয়া করে ভেতরে আসুন দিকি। ঘাট হয়েছিল আমার, গলবস্ত্র হয়ে মাপ চাইছি। ...নিন্—কী অবস্থা হয়েছে বলুন তো—এই ভাদ্দরের রোদটা মাথার ওপর দিয়ে গেল—তা একটা ছাতাও কি নিতে নেই? অবিশ্যি ছাতা থাকলেই

বা কি হত—দু হাত তো বোঝাই। ···বাবুর যেমন কাণ্ড! এখানে এসে গিরিধারীকে ডেকে নিয়ে গেলেও হত। আসুন।'

অগত্যা ভেতরে আসতে হয়।

দইয়ের খুলি আর সন্দেশের হাঁড়ি নলিনীই নামিয়ে নেয় হাত থেকে।

'কৈ রে কোথায় গেলি—অ গিরিধারী। এই নে, এগুলো ধর—ভাল করে চাপা দিয়ে রাখ গে যা মার ঘরে।···দেখিস বেড়ালে না খায়। মুটেটাকেও অমনি নিয়ে যা; রান্নাঘরে মালগুলো নামিয়ে রাখ সাবধানে। ···ওকে চারটে পয়সা দিয়ে দিস—'

'না, না, ওর পয়সা আমার কাছে আছে।'

'থাক গে যাক্!' গলা নামিয়ে বলে নলিনী, 'এই ঠেকো রোদ্দুরে এতটা পথ হেঁটে এসেছেন—ট্রামভাড়া বলেও তো বাবু কিছু দেয় নি। ওটা আপনিই রাখুন।'

তার পর গলাটা আরও নামিয়ে বলে, 'হ্যাঁ রে গিরিধারী, মা ঘুমোচ্ছে তো—না?

'না তো দিদিবাবু—মা তো মাসীমার ওখানে বেড়াতে গেছে!'

'যাক্ নিশ্চিন্তি—তা হলে সন্ধ্যের আগে আর এ-মুখো হচ্ছে না। আসুন আসুন, ওপরে আসুন।'

আপত্তি এবং প্রতিজ্ঞা যেন কোন্ বহু দূর অতীতের কথা, এরই মধ্যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে। মানুষটার সহৃদয়তা শুধু নয় অন্তরঙ্গতা এবং আত্মীয়তাই—মুগ্ধ করল হেমকে। সে ওর পিছু পিছু অভিভূতের মতই উঠে গেল।

সে-ই পূর্ব-পরিচিত ঘর। মেঝেতে একটা মাদুর বিছানো রয়েছে—তার সঙ্গে একটা ছোট বালিশও কার শোবার চিহ্ন বহন করছে—সম্ভবত গরমের জন্যে নলিনীই এখানে শুয়েছিল। হেম সেই মাদুরেই বসতে যাচ্ছিল, নলিনী খপ করে একটা হাত ধরে ফেললে।

'না-না, ওখানে নয়। ভাল হয়ে বসুন—বিছানায়।'

এক রকম জোর করেই টেনে নিয়ে গিয়ে ঢালা বড় বিছানাটায় বসাল সে।

হেম আরও অভিভূত। সুগৌর মুখ তার অঙ্গার-বর্ণ ধারণ করেছে, ঘামে সমস্ত দেহটার অবস্থা হয়েছে ভিজে গামছার মত—কিন্তু সে কতটা

ভাদ্রের রৌদ্রে আর কতটা এখন লজ্জায় সংকোচে—তা বলা শক্ত। বার বার নিজের ছোট ময়লা রুমালটা দিয়ে মুখ মোছবার চেষ্টা করছে কিন্তু সেটা ইতিমধ্যেই ভিজে সপ্ সপে হয়ে উঠেছে বলে তাতে আর কোন কাজ হচ্ছে না।

নলিনী এতক্ষণ ওর মুখের দিকেই চেয়েছিল—কেমন এক রকমের মুগ্ধ দৃষ্টিতে—এখন রুমালের বদলে কোঁচার খুঁটে ঘাম মোছবার চেষ্টা করতেই তার সংবিৎ ফিরে এল—সে তাড়াতাড়ি আলনা থেকে একটা ফরসা তোয়ালে টেনে নিয়ে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'এইটে নিন। একেবারে ধোপদস্ত—কাচা। আমাদের কারুর ব্যাভার করা নয়।··· ইস্ কী হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন বালতি করে কে জল ঢেলে দিয়েছে। লোকটা মানুষ নয়, চামার—চামার!···কেন আর একটু রোদ পড়লে পাঠানো যেত না!'

সে একটা পাখা এনে জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল। তাতে হেম আরও বিব্রত বোধ করল—হাত বাড়িয়ে পাখাটা টেনেও নিতে গেল এক বার, কিন্তু আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ডান হাতটা সরিয়ে নিয়ে বাঁ হাতে ওর হাতটা চেপে ধরল নলিনী, 'অত কিন্তু হচ্ছেন কেন বলুন তো! ব্রাহ্মণ মানুষ, একটু সেবা করলুমই বা—কত পাপ করেছিলুম গেল জন্মে, তাই এই সব ঘরে জন্মেছি, আবার এ জন্মে ব্রাহ্মণকে দিয়ে ব্যাগার খাটিয়ে পাপে ডুবব! একটু সেবাও করি—যদি সেই পুণ্যে পাপটা খণ্ডায়!'

ইতিমধ্যে সাদা পাথরের গ্লাসে কী একটা পানীয় নিয়ে প্রবেশ করে গিরিধারী। সম্ভবত প্রস্তুতই ছিল।

'দাঁড়া, ওখানে রেখে যা। ঘামটা আর একটু মরুক। বেশী করে বরফ দিয়েছিস তো?'

গিরিধারী কিছু দূরে গ্লাসটা রেখে চলে যেতে নলিনী বললে, 'এ মোচলমানের জল নয় ঠাকুর। আমি নিজে মিছরি ভিজিয়ে শরবত করে রেখেছিলুম। বলা ছিল আপনি এলেই বরফ আনিয়ে দিয়ে যাবে।··· নিন্—এবার বরং খেয়ে ফেলুন। রোদ্দুরের তাতটা কমেছে বোধ হয় একটু। তাতের ওপর ঠাণ্ডা খেলে সর্দিগর্মি হয় শুনেছি!'

শুধু শরবত নয়—একটু পরে এক থালা ফল এবং সন্দেশ রসগোল্লাও বসে খেতে হল ওকে। কিছুতেই ছাড়লে না নলিনী। এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে জোরজবরদস্তি করতে লাগল যে চেষ্টা করেও এড়াতে পারল না হেম!

সমস্তটাই স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে ওর! এই ঘর, এই শয্যা, শ্বেত পাথরের রেকাবে এমন দেবভোগ্য জলযোগের আয়োজন, এমন একটি মেয়ে বসে বাতাস করছে, সবটাই অবিশ্বাস্য, অবাস্তব, স্বপ্নের মত। তবু—হয়তো অসম্ভব অবিশ্বাস্য বলেই, ক্ষণেক পরে রূঢ় বাস্তবে নেমে আসতে হবে বলেই—এই ক্ষণিক সুখস্বপ্নটুকুর মায়া কাটাতে পারে না হেম। তার অদৃষ্টে কোনদিনই তো এ সব জুটবে না—যদি স্বপ্নেও এটুকু ভোগ করে নিতে পারে তো মন্দ কি?…

অবশ্য বেশীক্ষণ বসে থাকতে সাহসে কুলোয় না। স্বাভাবিক সংকোচ তো আছেই, বাবু হয়তো ওর প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করছেন সেদিনের মত। বাজারে যতটা দেরি হতে পারে—তার সমস্ত কাল্পনিক সীমা ছাড়িয়ে এসেছে বহুক্ষণ। এমনিতেই এখন ট্রামে ফিরতে হবে—নইলে অশোভন হয়ে পড়বে।

'চললেন? আচ্ছা আসুন আজকের মত। আবার আসবেন কিন্তু—এ তো আমি অছিলে করে ডেকে আনলুম। বাজারের সুখ্যেত করে, দাম কমের কথা বলে—কত কাণ্ড করে। নইলে তো আসতেন না। দুপুরে ডুটোর পরে—মানে মা খেয়ে ঘুমোলে (গলার স্বরটা নামিয়ে আনে নলিনী) হয়তো অকারণেই যে কোন দিন চলে আসবেন। তার পর এই পাঁচটা পর্যন্ত নিশ্চিন্তি। বেলা দুপুর থেকে থিয়েটারেই বা গিয়ে পড়ে থাকেন কেন? বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে আসবেন—এখান থেকে বরং থিয়েটারে যাবেন!'

তার পর জোর করে একটু কেশে, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে কণ্ঠস্বরটা আরও নামিয়ে বলে, 'সেদিন খুব রেগে গিয়েছিলেন—না হেমবাবু? আপনি যে বড্ড ছেলেমানুষ!…নইলে এসব কথা কি আর বুঝিয়ে বলতে হয়।…ওখানে—ওখানে আলাপ-পরিচয় মাখামাখি না করাই ভাল, বুঝলেন না। সাত শ রাক্ষুসীর ঘর করি বলতে গেলে। নৈবিদ্যির কলা—সবাই টেঁকে বসে থাকে—এক বার একটা ছুতো পেলেই হল। লাগিয়ে ভাঙিয়ে মন ভারী করতে কতক্ষণ? বেশী কথা কি বলব, আমার মা-টিই অষ্টপ্রহর গোয়েন্দাগিরি করছে। তার ভয় আমি যদি এমন বাবুটা ক্ষুইয়ে বসি!…এসব লজ্জার কথা—বলতেও ঘেন্না হয়—তবে আপনি জানেন না বলেই…একটু সাবধান করে দিলুম।…মোদ্দা আসবেন আবার।…আমায় কথা দিচ্ছেন তো? বলুন আসবেন?'

হেমের কানের ডগা এমন কি পেছনের ঘাড়টা পর্যন্ত যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। কোনমতে মাথা নামিয়ে ছোট্ট একটা 'হ্যাঁ' বলে একরকম ছুটেই বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই। বাবু কী ভাবছেন কে জানে! আজ আবার কী মূর্তিতে থাকবেন!

॥ ৩ ॥

একেবারে রাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে দিনের ঘটনাগুলোকে মনের মধ্যে রোমন্থন করবার অবসর মিলল। সন্ধ্যাবেলাটা খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, কিছু ভাববার সময় বা সুযোগ পায় নি—তবু মনটা যে খুব খুশী-খুশী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এখন বিকেলের কথাটা ভাবতে ভাবতে ওর মনে হল—আসলে অনেকদিন পরে একটা মানুষের কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার পেয়েছে বলেই মনটা এত খুশী আছে। এইটেই তো তার জীবনে একটা অসাধারণ অননুভূত অভিজ্ঞতা। না—মেয়েটা যে ভদ্র খুব তাতে কোন ভুল নেই। খুবই ভাল। হেম এ কদিন তাকে ভুলই বুঝেছিল।

ক্রমে ক্রমে সেই ঘর, মেয়েটির সেবা, সমস্ত পরিবেশ—স্মৃতির পটে পরিষ্কার ফুটে উঠল। যতই সবটা পর্যালোচনা করে দেখল মনে মনে, ততই যে শুধু ঐ প্রত্যয়টা দৃঢ় হল তাই নয়—কেমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্যে মনটা আবিষ্ট হয়ে উঠল।

এক এক সময় গোপনবাসী কোন এক সত্তা তাকে একটু সতর্ক করে দেবার চেষ্টাও করল বৈ কি! মনে হল শেষ পর্যন্ত এটা গরীবের ঘোড়া-রোগেরই সূচনা নয় তো! কিন্তু সে অন্তরের সুদূরতম প্রান্তের কথা—তা ভাল করে শোনাও গেল না—তার আগেই সে হেসে উড়িয়ে দিল সম্ভাবনাটাকে। একটা মানুষ একটু ভদ্র ব্যবহার করেছে—তার ভাল লেগেছে! এর ভেতর আর এত মাথা ঘামাবার মত আছেই কি!

এবং শেষ পর্যন্ত এক সময়—নিজের অজ্ঞাতসারেই—আবার কবে ভদ্রভাবে, নিজের তরফ থেকে কোন অশোভন ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে ওর বাড়ি যাওয়া যায়, এই চিন্তাতেই তন্ময় হয়ে উঠল। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে বার বার নিজেকে এই কথাটাই বোঝাতে লাগল যে অত

করে অনুরোধ করেছে যখন—তখন এক-আধ বার যাওয়া যেতে পারে। তাতে এমন কিছু অশোভনতা প্রকাশ পাবে না।…

পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখনও মনটা বেশ প্রসন্ন আছে। অকারণেই খুব খানিকটা হৈ-চৈ করল, যেচে বাজারে গিয়ে নিজেরই পয়সাতে (গত বিকেলে সামান্য যা লাভ হয়েছিল তাইতে) বড় মাসীর জন্য করলা এবং গোবিন্দর জন্য মৌরলা মাছ কিনল। সেটা ওর কামাবার দিন নয়—সাধারণতঃ দু দিন অন্তর কামায় আর আগের দিনই কামিয়েছে—তবু পরিপাটী করে দাড়ি কামাতে বসল, এবং সেদিন দুপুরবেলা রিহার্স্যাল হবে মনে পড়ে যাওয়াতে খাওয়ার পরই থিয়েটারে ছুটল।

কমলা জিজ্ঞাসা করল, 'এমন সময় বেরোচ্ছিস যে!'

'কাজ আছে একটু—এই এই—এক জায়গায় একটা কাজের সন্ধান আছে, তাই যাচ্ছি!'

এমন সময় থিয়েটারে যাবার কোনও কৈফিয়তই দিতে পারবে না বুঝে মিথ্যার আশ্রয় নিল। রিহার্স্যাল আছে বলা চলবে না। 'রিহার্স্যাল তো তোমার কি?' এখনই এই প্রশ্ন উঠবে।

রিহার্স্যালের সময় যেমন ওদের যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না—তেমনি নিষেধও ছিল না। অনেকেই আসত এমন,—যারা থিয়েটারে কাজ করে থিয়েটারের বাইরে তাদের জীবনটা কোথাও যেন খাপ খেতে চায় না—তাই তারা সকালে দুপুরে যখন তখন এখানে আসে। ওকে দেখে সেজন্য কেউ বিস্মিতও হল না, কোন কারণও জিজ্ঞাসা করল —অকারণে এমন সময়ে আসবার!

হেম প্রথমটা একটু ভয়ে-ভয়েই ছিল—পাছে সহকর্মীদের জেরায় পড়তে হয়। কিন্তু কেউই যখন বিশেষ প্রশ্ন করল না তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল এবং পেছন দিকের একটা কোণ থেকে রিহার্স্যাল দেখতে লাগল।

রিহার্স্যাল নলিনীরও ছিল! থাকার কথাই—কারণ আজকাল ও বড় বড় পার্ট পায়।

অবশ্য হেমের রিহার্স্যালে তত মন ছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও নলিনীকেই ভাল করে দেখল। আর দেখতে দেখতে এক সময় মনে হল—সাজলে গুজলে নলিনীকে ভালই দেখায়।

তন্ময় হয়েই দেখছিল—হঠাৎ কানের কাছে দক্ষিণাদা যেন হিস্ হিস্

রে উঠলেন, 'এরই মধ্যে লটকেছে! ইস্—এরা একেবারে কাঁচা-খেগো।···
রে ছোঁড়া তোর কি প্রাণের ভয় নেই? গরীবের ছেলে—মরবি যে।'

ভারি বিরক্ত হয়ে উঠল হেম। দক্ষিণাদার কথাগুলো আদৌ ভাল লাগল
।। বড্ড ছোট মন ভদ্রলোকের! সব তাতেই খারাপটা আগে দেখেন—

সে কোন উত্তর দিল না, তেমনি আর দাঁড়ালও না। বাইরে বেরিয়ে
ন্দরা যেখানে বসে জটলা করছিল সেইখানে এসে দাঁড়াল।

এবং সাধারণত যেটা কোন দিন ওর নজরে পড়ে না—আজ সেইটেই
াড়ল—নন্দ বেশ চুনোট-করা কোঁচানো দেশী ধুতি পরে এসেছে। সে আর
াকতে না পেরে—কী বলছে তা বোঝবার আগেই—বলে উঠল, 'মাইরি—
থিয়েটারে গেটকীপারি করে এত পয়সা পাস কোথা থেকে নন্দ!'

'কেন—পয়সার কী দেখলে বাবা! খাচ্ছি তো এক পয়সায় দশটা বিড়ি।'

'না তা বলি নি। দামী দামী ধুতি পরছিস আজকাল—তাই বলছি।'

হো হো করে হেসে উঠল নন্দ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসল। তার পর বললে, 'এই কাপড় দামী! ওরে মুখ্খু—এ যে হেটো ধুতি। হাওড়ার হাটের ধুতি—এক টাকা দু আনায় একখানা।'

'যাঃ!' অবিশ্বাসের হাসি হাসে হেম, 'আঠারো আনায় দিশী ধুতি কী যে বলিস। বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস নাকি?'

'তাই তো দাঁড়াচ্ছে। তুই যে এত আনাড়ী তা জানতুম না। এ কী তোর ফরাসডাঙার ধুতি! দেখে বুঝতে পাচ্ছিস না?'

কানাই এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল, সে বলে উঠল, 'অত কথায় কাজ কি বাবা, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। আজই তো মঙ্গলবার, হাটবার—চ তোকে হাটটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি! কাপড় কিনেই নে একখানা, তা হলে তো সন্দেহ ঘুচবে!'

আঠারো আনায় এমন কুচ্‌কুচে কালাপাড় ধুতি!

তবু আঠারো আনাও কম নয় তার কাছে—চোদ্দ আনার ধুতিতেই বেশ চলে যায়!

মুখ ফুটে বললেও কথাটা, 'কী দরকার ভাই আমার অত নবাবিতে—এই সাত সিকে জোড়ার কাপড়েই তো আমার দিব্যি চলে যাচ্ছে!'

'তা যাচ্ছে বটে। তবে কী জানিস, তোর ও মিলের কাপড়ের চেয়ে এ ঢের বেশী দিন যাবে।'

হেম ঠোঁটটা চেপে ভ্রূ কুঁচকে ভাবে অনেকক্ষণ।

দু পয়সা এক পয়সা করে জমিয়ে তোরঙ্গের তলায় টাকা-দুই সে সরিয়ে রেখেছে। কেন রেখেছে তা অবশ্য অত ভাবে নি—নিজের কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে—এই ভেবেই জমিয়ে রেখেছে হয়তো। কিন্তু—

ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ মন স্থির করেই ফেলল হেম—বললে, 'তোদের কারুর কাছে একটা টাকা হবে? তা হলে না হয় যাই। বাড়িতে আছে, কাল দিতে পারব!'

'খুব মক্কেল ধরেছ বাবা। আমাদের বলে ট্যাঁক গড়ের মাঠ—সদাসর্বদাই। তবে দাঁড়া—এক বার হোটেলটা দেখে আসি, যদি রঘুদা থাকে তো দেবে—তুই কাল দিবি তো ঠিক!'

কানাই দোতলায় উঠে গিয়ে হোটেলওলার কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে এল। তিন-চার আনা পয়সা হেমের পকেটে আছে। সুতরাং এবার নিশ্চিন্ত হয়ে দু জনে হাওড়ার পথ ধরল।...

বাড়ি ফিরে আবারও মিথ্যে কথা বলতে হল কমলাকে।

কাপড়খানা দেখে সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কি রে, কী ব্যাপার! হঠাৎ একেবারে দিশী কাপড় কিনে হাজির করলি যে! আলটপকা টাকা এল নাকি কোথাও থেকে? নাকি তোর মা তো বের সম্বন্ধ করেছে কোথাও? পাকা দেখায় বসবার কাপড় নিয়ে এলি?'

মুখ টিপে একটু হাসলও সে।

হেম লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে জবাব দিল, 'কী যে বল মাসী—তোমার যেন আজকাল কি হয়েছে।...এটা হয়েছে কি—ছাখো না, ঐ আমাদের থিয়েটারের কানাই—ওর কে জানাশোনা তাঁতী ওকে জোর করে এক জোড়া কাপড় গছিয়েছে। তা ওরও তো আমারই মত অবস্থা—একেবারে দুখানার দাম কোথায় পাবে—তাই ও আবার আমাকে গছালে একখানা!'

'তা তুই-ই বা কোথায় পাবি?'

'না।—' আরও অপ্রতিভ, আরও বিব্রত হয়ে পড়ে যেন হেম, 'না—মানে সাত আট আনা আছে আমার কাছে, তুমি যদি আর আট আনা ধার দাও তা হলে ওর দামটা চুকিয়ে দিতে পারি। দামটা কমই—কী বল? সেই

জন্যেই আরও—। যোগে-যাগে যদি একখানা ভাল কাপড় হয়ে যায় এমনি করে—এই আর কি!'

এর আগে এদের বহু প্রয়োজনে কাঠ হয়ে থেকেছে সে, তোরঙ্গের কাগজের নীচে জমানো পয়সার কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় নি কাউকে! তাই আজও সে কথা বলা চলল না। একটা মিথ্যা ঢাকতে বহু মিথ্যার অবতারণা করতে হল।

প্রয়োজন-মত কেমন একটার পর একটা মিথ্যা মুখে এসে গেল ভেবে হেমের নিজেরই খুব অবাক লাগল।

॥ ৪ ॥

এর পর চার-পাঁচটা দিন হেম যেন কতকটা ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াল। খেয়ে বসে কিছুতেই যেন তার স্বস্তি নেই, কারুর সঙ্গে কথা কইতেও ইচ্ছা হয় না। বিশেষ করে থিয়েটারে সহকর্মীদের সঙ্গ যেন আরও অসহ্য। ওদের সেই সব অর্থহীন রসিকতা এবং নিরুদ্যম একঘেয়ে আড্ডা যেন বিষ মনে হতে লাগল। অথচ ওখান ছেড়েও কোথাও থাকতে পারে না সে। বরং ঐ নন্দ-কানাইদের মতই সেও যখন-তখন থিয়েটারে যেতে শুরু করল।

তার এই অস্থিরতা আর ভাবান্তর ক্রমে এতই প্রকট হয়ে উঠল যে কমলার মত শিথিল স্বভাবের মানুষও তা লক্ষ্য না করে পারল না। সে এক দিন সোজাসুজিই প্রশ্ন করে বসল, 'তোর কী হয়েছে বল্‌ তো হেম? অমন করে মুখ শুকিয়ে দিনরাত কি ভাবিস?'

'কৈ, কী আবার ভাবব!' বলে উড়িয়ে দেয় বটে, কিন্তু কেন কে জানে —তার কানের ডগাগুলো সুদ্ধ যেন লাল আর আগুন হয়ে ওঠে।

ধরা পড়ে দক্ষিণাদার কাছেও। তিনি শুধু ওকে দেখে মুখ টিপে হাসেন আর হাতের বিচিত্র একটা ভঙ্গী করেন। কখনও হয়তো একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেন—'নিয়তি!' কিন্তু ঐ হাসিটাই অসহ্য বোধ হয় হেমের। সে আজকাল প্রাণপণে ওঁর সংসর্গ এড়াবার চেষ্টা করে।···

বিকেলের দিকে কদিন সে কারণে-অকারণে বার বার মনিবের ঘরের সামনে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু এর মধ্যে এক দিনও তাঁর আর ওকে স্মরণ করবার দরকার হল না। এমন কি এক দিন ঘর থেকে বেরোবার মুখে ওর

সঙ্গে চোখোচোখিও হল, কিন্তু রমণীবাবু ওকে চিনতে পারলেন বলেও মনে হল না। এমন কি যেন ওর দিকে চেয়েই চোখটা সরিয়ে নিলেন।

অবশেষে রবিবার দিন সে এক কাণ্ড করে বসল। কেন করলে তা সে নিজেও জানে না, আর কেউ জানতে চাইলেও বলতে পারত কিনা সন্দেহ; সে অভিনয়ের মধ্যেই এক সময় স্টেজের ভেতর ঢুকে পড়ল।

কাজটা যে খুব ভাল করে নি তা হেমও জানে। কর্তাব্যক্তি কারুর সামনে পড়ল ধমক খেতে হবে। ম্যানেজারবাবু জানতে পারলে তো কথাই নেই—লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। হয়তো খোদ বড় কর্তার কানেও উঠবে কথাটা। অথচ দেবার মত একটা জুতসই কৈফিয়তও ওর ছিল না, আগে থাকতে কিছু ভেবে নিতেও পারে নি। হঠাৎ একটা োঁকের মাথাতেই ঢুকে পড়েছিল।

যাই হোক—ভাগ্যটা সেদিক দিয়ে সেদিন ভালই ছিল। তেমন কারুর সামনেই পড়ে নি। উইংসের আশেপাশে, পর্দার পেছনে দু চার জন করে জটলা যে না করছিল তা নয়, কিন্তু তারা কেউ ওকে লক্ষ্যও করল না। এক পাশে কতকগুলো অল্পবয়সী মেয়ে বসে গুলতানি ও নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল, তারা কেউ কেউ একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল—এক-আধ জন বোধ হয় কিছু মন্তব্যও করলে। কিন্তু হেম জানে যে ওরা ধর্তব্যের মধ্যে কেউ নয়। ওরা নিতান্তই—দক্ষিণাদার ভাষায় 'ছুঁড়ীরা' এবং কেশিয়ার বাবুর ভাষায় 'সখীরা'। সে ওদের গ্রাহ্য না করেই এগিয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় যাবে তাই যে ও জানে না। কেন ঢুকেছে সেটাও তো স্পষ্ট নয় ওর কাছে।

তা ছাড়া দিনের বেলার স্টেজ একরকম। সবটা খোলা থাকে। রাতে বিশেষত অভিনয়ের সময় ও বিশেষ কখনও ঢোকে নি এর ভেতর। এ যেন গোলকধাঁধা বলে মনে হয়। একটু পরেই হাঁফিয়ে উঠল, ভয়-ভয়ও করতে লাগল। এবং সেই—কতকটা দিশাহারা অবস্থাতেই সে ওদিক দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করতে গিয়ে খোদ দানীবাবুর ঘরের দরজার সামনে এসে পড়ল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর সামনের আর একটা ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল নলিনী।

মুহূর্তে ধড়াস করে উঠল ওর বুকের মধ্যেটা। আগেই এর মধ্যে ঢোকবার জন্যে ঘামতে শুরু করেছিল—এখন যেন একেবারে নেয়ে উঠল এক নিমেষের মধ্যে।

কিন্তু আজ আর নলিনী অপরিচয়ের ভান করল না। সম্ভবত এদিকটা কেউ ছিল না বলেই। মধুর হেসে বরং একটু এগিয়েই এল ওর দিকে; বললে, 'এই যে হেমবাবু, কৈ গেলেন না তো আমাদের ওদিকে আর এক দিনও।...আমি বলে রোজ দুপুর বেলা আপনার আশায় হা-পিত্যেশ করে জেগে বসে থাকি।'

অভিমানে-আবদারে-সোহাগে-মেশা সে নারীকণ্ঠ সেই মুহূর্তে হেমের কাছে একান্ত মোহনীয় এবং দুর্নিরোধ্য বলে মনে হল। সে কোন উত্তরই দিতে পারল না। বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু।

কিন্তু নলিনীর তখন আর অপেক্ষা করলে চলে না। সে আর একটু কাছে এসে এক হাতে ওর একটা বাহুমূল ধরে প্রায় ফিস ফিস করে বলল, কবে আসবেন বলুন ঠিক করে। কথা দিন। এবার কিন্তু একটা দিন বলতে হবে—আমি আর কোন কথা শুনব না।'

হেম কোন মতে ঢোক গিলে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'দেখি—কাল কি পরশু—এর ভেতর এক দিন—'

'না না। ওসব দেখি-টেখি আমি শুনব না। কালই আসুন তা হলে। আসবেন তো? লক্ষ্মীটি—'

এই বলে ওর হাতের যেখানটা ধরা ছিল সেখানটায় একটু চাপ দিয়ে ব্যস্তভাবে স্টেজের দিকে চলে গেল সে।

এর পর আর ইতস্তত করবার কোন কারণ রইল না। যে দ্বিধা সংকোচ এবং শোভনতা-বোধ পথ রোধ করে ছিল এ কদিন, সে সবই কালকের সেই মধুর কণ্ঠস্বরের মিনতিতে সরে গেছে। এতটা আন্তরিকতা যেখানে, সেখানে আর না যাবার কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। এখন আর অন্তত তাকে লোভী বা 'হ্যাংলা' মনে করার কোন কারণ নেই।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই আগের সেই অস্থিরতা ও অন্যমনস্কতা অনেকটাই কমে গেল। বাড়ল একটু অধীরতা। সে রাত্রিটা ভাল করে ঘুম হল না—ওধারেও ভোর না হতে ঘুম ভেঙে গেল। সে সেই সাত-সকালেই উঠে আগে গোবিন্দর চটিটায় কালি মাখিয়ে চকচকে করলে। ওর নিজের জুতোটার প্রায় শতছিন্ন অবস্থা, কয়েকটা তালি তো পড়েইছে, আরও গোটাকতক পড়া দরকার। তার চেয়ে গোবিন্দর নতুন চটিটাই

ভাল। একটু বড় হয় ওর পায়ে—কিন্তু সেটা তত চট করে ধরা পড়বে না। ছুটির দিন না হলে গোবিন্দর চটির দরকার হয় না। ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে স্নান করতে করতেই তার সাড়ে আটটা বেজে যায়—নটায় বেরোতে হয়। চটি পায়ে দিয়ে আর কোথায় যাবে।

শার্টটা ফরসাই ছিল, মাত্র শনিবারই সাবান দিয়েছে—তবু সেটায় আর এক বার সাবান বুলিয়ে নিলে। কমলা ওর ধরন-ধারন দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, 'ব্যাপার কি বল্ তো? কোথায় যাবি আজ যে সকাল থেকে এত সাজগোজের ঘটা?'

উত্তর প্রস্তুতই ছিল, এক কথায় জবাব দিয়ে দিলে, 'আজ এক জায়গায় যেতে হবে—একটা আপিসে চাকরির খোঁজ আছে!'

কমলার পক্ষে এই উত্তরই যথেষ্ট। কিন্তু গোবিন্দ একটু বিপদে ফেললে, ঘরের মধ্যে থেকেই হেঁকে হেঁকে প্রশ্ন করতে লাগল, 'কী আপিস রে? কাদের ফার্ম? কী চাকরি?'

অতি কষ্টে—তাড়াতাড়ি অন্য কী একটা প্রসঙ্গ এনে কথাটা চাপা দিলে হেম।...

সবচেয়ে কষ্টকর হচ্ছে খাওয়ার পর ছুটো অবধি অপেক্ষা করাটা। এগারোটার মধ্যেই ওদের বাড়ির ও-পাট চুকে যায়। তার পর এতখানি সময় কী করে? ঘুমোতে সাহস হল না—যদি বেশী ঘুমিয়ে পড়ে? তা ছাড়া ছুপুরে ঘুমিয়ে ওঠার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখচোখ ফুলে থাকে, বিশ্রী দেখায়।...

কোনমতে বেলা একটা পর্যন্ত ছটফট করে—একটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল সে। নতুন কেনা ধোয়া দেশী ধুতিটা বার করলে আজ। তার সঙ্গে অবশ্য সাবানকাচা শার্টটা ঠিক মানাল না—মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল একটু—কিন্তু সে আর উপায় কি? তবু অন্য দিন বিছানার নীচে চাপা দিয়ে রেখে ইস্ত্রির কাজ সারে—আজ নিজে ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়ে সেই হালসীবাগানে ওদের ধোপানীর কাছ থেকে ইস্ত্রি করিয়ে এনেছে।

সবে একটা; এখনই কিছু যাওয়া যায় না। হাঁটতে হাঁটতে এসে হেদোতে বসল খানিকটা। কিন্তু সেখানেও বসে থাকতে পারল না বেশীক্ষণ। ওখান থেকে উঠে থিয়েটারের সামনেটা এড়াতে রামবাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে আবার কোম্পানির বাগান। তাও—একটা দোকানের ঘড়িতে

থলে দেড়টার বেশী হয় নি তখনও। কোন মতে আরও দশটা মিনিট থানেই কাটিয়ে এবার সোজা কম্বুলেটোলার পথ ধরল। আস্তে আস্তে লে ঠিক দুটোতেই পৌঁছুতে পারত। কিন্তু এই চড়া রোদে হেঁটে গেলে মে ভিজে জামা কাপড়ের যে অবস্থা হবে তা অনুমান করে আজ ট্রামেই চড়ে ল। তিনটে পয়সা খরচ হবে—তা হোক। বড্ডই রোদ আজ।

॥ ৫ ॥

ড়া নাড়বার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আজও নলিনী নিজেই এসে দোর খুলে দিলে। ম্ভবত ওর জন্যে চলনটাতেই বসে অপেক্ষা করছিল সে!

'আসুন আসুন। কী ভাগ্যি আমার!…আপনি যে সত্যি সত্যিই কথাটা ন করে আসবেন শেষ পর্যন্ত—এ ভরসা আমার ছিল না। আমি ভেবেছিলুম নিশ্চয়ই ভুলে বসে থাকবেন।'

'না না। তা কেন। এরই মধ্যে—বা!' এমনি ধরনের কতকগুলো কী লোমেলো কথা বললে হেম—তা তার নিজের মাথাতেও গেল না। নলিনীও বশ্য তার উত্তরের জন্য বিশেষ অপেক্ষা করল না, ওর একটা হাতে একটু ন দিয়ে বলল, 'ও কি, তা বলে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? চলুন চলুন, পরে চলুন।'

হেম অভিভূতের মতই ওর পিছু পিছু চলল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপরের রান্দায় পড়তে গলাটা একটু নামিয়ে নলিনী বলল, 'একটু আস্তে আসুন াই, মা আবার বেছে বেছে ঠিক আজকের দিনটিই পাড়া বেড়াতে বেরোল , ঘরে শুয়ে আছে!'

আজ আর ঘরে মাদুর পাতা ছিল না। গৃহকর্ত্রীর শোবার প্রয়োজনই হয় সম্ভবত। হেম সামান্য একটু ইতস্তত করে প্রথম দিনকার মত বিছানার র ঘেঁষে মেঝেতেই বসতে যাচ্ছিল, নলিনী 'ও আবার কি হচ্ছে, ভাল হয়ে সুন,' বলে হাত ধরে জোর করেই নীচের ঢালা বিছানাতে বসিয়ে দিলে। ার পর একটা হাতপাখা নিয়ে নিজে ওর গা ঘেঁষে মেঝেতে বসে হাওয়া রতে লাগল।

'ইস্, কী ঘেমেছেন আপনি! বড্ড কষ্ট হয়েছে, না? সত্যি এই ঠেকো াদ্দুরে মানুষকে ঠিক দুপুরবেলা আসতে বলাই অন্যায়।'

হয়তো এই মৃদু অনুশোচনার সুরের জবাবে প্রবল প্রতিবাদ করাই উচিত ছিল, কিন্তু হেম কিছুই করতে পারল না। তার কণ্ঠ এমন কি তালু সুদ্ধ যেন শুকিয়ে উঠেছিল—নির্বাক হয়ে বসে বসে ঘামতে লাগল। যে ঘাম এড়াতে সে নগদ তিনটে পয়সা খরচা করে ট্রামে এল—সে ঘাম কিছুতেই এড়ানো গেল না। এ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কে বালতি বালতি জল গায়ে ঢেলে দিতে আরম্ভ করেছে। জামা-কাপড় সব যেন গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে গেছে। সে অসহায় ভাবে রুমাল দিয়ে বার বার কপালটা মোছবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু ফল কিছুই হল না।

নলিনী হাওয়া করতে করতেই সেটা লক্ষ্য করেছিল। বললে, 'জামাটা খুলে ফেলুন না। এ পাখার হাওয়া তো আর ঐ মোটা জামা ভেদ করে গায়ে পৌঁছচ্ছে না। তাতেই অত ঘাম হচ্ছে। জামাটা খুলুন—বেশ আরাম করে বসুন!'

জামা খুলবে! সর্বনাশ। হেমের ঘাম আরও বেড়ে গেল। ভেতরের গেঞ্জিটার যা অবস্থা! ভদ্রসমাজে সেটা প্রকাশ করা যায় না কোনমতেই।

কিন্তু নলিনী ততক্ষণে নিজেই ওর জামার বোতাম খুলতে শুরু করেছে। 'নিন নিন, অত লজ্জা করার মত কিছু নেই। জামাটা খুলে দিন, আলনায় মেলে রাখছি। ও কি জামা চেপে ধরছেন কেন? ও, গেঞ্জিটা ময়লা বুঝি? তাতে আর কি হয়েছে। ও আমরা জানি!'

এর পর আর বাধা দেওয়া যায় না। হাতটা ছেড়ে দিতে হয়। নলিনী জামাটা বলতে গেলে নিজেই খুলে নিয়ে গিয়ে আলনায় মেলে দিয়ে আসে। তার পর হঠাৎ নিজের আঁচল দিয়েই ওর মুখটা মুছিয়ে দিয়ে জোরে জোরে হাওয়া করতে থাকে।

এর ভেতর বহু কথা হতে পারত। কিন্তু হেমের কণ্ঠ ভেদ করে যেন আজ একটা কথাও বেরোতে চাইছে না। তার বুকের ভেতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে, হাত-পায়ে বল নেই। এমন অবস্থা তার কখনও হয় নি এর আগে। এক সময় তার মনে হল যে তার শরীরটাই নিশ্চয় খারাপ হয়ে পড়েছে, এখানে থাকলে হয়তো আরও খারাপ হয়ে পড়বে। আর হয়তো সে যেতেই পারবে না।

সে সহসা—যেন মরীয়া ভাবেই সোজা হয়ে বসল। প্রাণপণ চেষ্টাতে কথাও ফুটল; বললে, 'আমি যাই আজ—'

'ও মা। সে কি! এই পাঁচ মিনিটের জন্যে বুঝি এত কাণ্ড করে
ানালুম!'

'না—শরীরটা—শরীরটা যেন কেমন করছে।'

'বুঝেছি। ও অমন হয়।' মুখ টিপে একটু হাসে নলিনী। সে হাসি
ন কেমন ধারা—হেমের ভাল লাগে না। আর সেটা বুঝতে পেরেই সঙ্গে
ঙ্গে সামলে নেয় নলিনী। বলে, 'এই রোদে এতটা এসেছেন তো!…দাঁড়ান,
াব আমি আনিয়েই রেখেছি। এবার দিতে বলি। তা হলেই অনেকটা
স্থ হয়ে উঠবেন! বসুন—ততক্ষণ নিজে নিজেই হাওয়া খান।'

সে ত্বরিত লঘুপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং আজ আর গিরিধারী
ারফত নয়, মিনিট কয়েক পরে নিজেই পাথরের গ্লাসে বরফ দেওয়া ডাবের
ল নিয়ে ঢুকল। তার পর দরজাটা একেবারে ভেজিয়ে দিয়ে কাছে
সে—বলতে গেলে ওর গায়ের ওপর বসে মুখের সামনে সেটা বাড়িয়ে
রে বললে, 'নিন, এবার এটা খেয়ে নিন তো। জলখাবার কিন্তু এখন
ানলুম না। এখন খেতেও পারবেন না—যাবার সময় বরং খেয়ে যাবেন,
কমন?'

হেম প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে বলতে গেল, 'না না। রোজ রোজ খাওয়া
ক? আর আমি এই তো খেয়ে এলাম। ওসব—'

নলিনী আবারও মুখ টিপে হেসে বললে, 'এখন এটা তো খেয়ে নিন।
সব নৌকতা পরে হবে'খন। ডাবের জলে বাতাস লাগতে নেই।'

ঠাণ্ডা ডাবটা খেয়ে সত্যিই কিছু প্রকৃতিস্থ হল হেম। কিন্তু অস্বস্তিটা
গল না। তা ছাড়া সহজ ভাবে কথা বলতে না পারাতেই যেন আরও
স্বস্তি। কী যে হয়েছে আজ, কথা কইতে গেলেই ভেতরে ভেতরে যেন
লা কেঁপে যাচ্ছে, ঠিকমত কথা যোগাচ্ছেও না।

নলিনী কিন্তু অনর্গল বকে যেতে লাগল। ওর বাড়ির কথা, মায়ের কথা,
াড়াটেদের কথা, থিয়েটারের কথা। এই বাড়িতে এক কালে ও-ও ভাড়াটে
ছল, এই মোটে গত সন বাড়িটা কিনে নিয়েছে। বাবুই টাকা দিয়েছেন।
াবু বলেছেন আরও একটা বাড়ি কিনে দেবেন। ওর ইচ্ছে এবার কাশীতে
একটা বাড়ি কেনে, তা হলে মাকে সেখানে রাখতে পারবে; ইত্যাদি—এমনি
কত কি!

হেম কিন্তু কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হতে পারল না। তার বুকের মধ্যে আজ

যেন কী করছে! শরীরটা বড়ই দুর্বল ঠেকছে। নিজের নাড়ীর চাঞ্চল্য যেন সে নিজেই টের পাচ্ছে।

অবশেষে এক সময় সে আবারও উঠতে যায়। কোনমতে প্রাণপণে বলে, 'আজ তা হলে আমি উঠি।'

"না, না, এরই মধ্যে উঠবেন কি? বারে, এই তো এলেন! এখনও এক ঘণ্টাও হয় নি।'

'না, মানে একটু কাজ আছে কি না—এই সাড়ে তিনটেতেই—'

কথাগুলো মুখের মধ্যেই যেন কেমন এড়িয়ে যাচ্ছে। তবুও বলে—থেমে থেমে, ঢোঁক গিলে গিলে।

'থাক গে কাজ! কাজই বুঝি এত বড়। কাজ নিয়ে এলেন কেন?... তা তো নয়, আমার সঙ্গে বসে কথা কইতেই ভাল লাগছে না আসলে। এই তো? সেইটেই পষ্ট করে বলুন না!'

'না না। এ কী বলছেন! আপনি এমন বলেন যা তা!'

হেম ওঠবার চেষ্টা ত্যাগ করে বসে পড়ে।

নলিনী পাখাটা নামিয়ে রাখে। তার পর কণ্ঠে আশ্চর্য রকমের অভিমান ঢেলে দিয়ে বলে, 'তবে কেন আপনি এসে এস্তক উঠি-উঠি করছেন? দু দণ্ড বসলে কি হয়?'

এবং হেম সেই অননুভূত অভিজ্ঞতার বিস্ময় কাটিয়ে ওঠবার আগেই সহসা সে নিবিড় ভাবে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বুকের ওপর এলিয়ে পড়ে ওর চোখের দিকে কেমন এক রকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে 'তোমাকে আমি এখন ছেড়ে দেব না। কিছুতেই না। কৈ যাও দিকি, কেমন করে যাবে!'

ওর সেই দৃষ্টিতে আর সেই কণ্ঠস্বরে কেমন যেন মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে যায় হেমের। সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন সম্মোহিত হয়ে পড়ে। তার পর কখন যে এক সময় এই মোহিনী নারীর জাদু তাকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করে—তা সে বুঝতেও পারে না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

তরুর বিয়ে যে আর না দিলেই নয়, সেটা শ্যামাও বোঝে, কিন্তু কী করে যে কি করবে সেইটেই বুঝতে পারে না। পাড়াপড়শী আত্মীয়স্বজন অবশ্য তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে এতটুকুও অনবহিত নন—তাঁরা প্রথম প্রথম শুধু কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কিংবা মৃদু অনুযোগ করে ক্ষান্ত থাকতেন, এখন গঞ্জনা ও ধিক্কার দেন। তার বেশী তাঁদের কাছ থেকে কীই বা আশা করা যায়? শ্যামা তা করেও না—শুধু যখন নিজের বিপুল দুশ্চিন্তার মধ্যে কেউ এসে পড়ে চিপ্‌টেন কেটে কেটে কথা বলেন—তখন আর চুপ করে থাকতে পারে না, সেও বেশ চাট্টি কথা শুনিয়ে দেয়। বলে, 'বলি পাত্তর কি আমার বাড়িতে জাওয়ানো আছে তবু আমি মেয়ের বে দিচ্ছি না? না কি তোমরা পাঁচ-সাতটা পাত্তর এনে কথা বলছ—আমি কানে তুলো দিয়ে বসে আছি? না ন শ পঞ্চাশ টাকাই কেউ দিয়ে রেখেছে! আমি মেয়েছেলে একা—বলতে গেলে অবীরে—পাত্তরটাই বা খুঁজে দেয় কে আমার হয়ে—আর কোমর বেঁধে দাঁড়ায়ই বা কে? টাকাও তো চাই এতটি—শুধু হাত তো আর মুখে উঠবে না? তোমাদের আর কি বল না—বলেই খালাস। যাকে এ বাজারে মেয়ের বে দিতে হয় সে-ই জানে। বলে কত তালেবর তালেবর লোকই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে—তবু তে তারা পুরুষ, তাদের কোমরের জোর আছে। আর আমি কি? সোয়ামী থেকেও নেই—ছেলে সেও এক রকম বলতে গেলে খরচের খাতায় লিখে রাখা। রোজগার করে কি করে না ভগবান জানেন—আমি তো তার কিছু চোখে দেখতে পাই না! দৈবে সৈবে পাঁচ-সাতটা টাকা ভিক্ষের মত ফেলে দেয়, এই পর্যন্ত!—বলে আছে গরু না বয় হাল—তার দুঃখ সর্বকাল! তোমরা তো বলেই খালাস—আমি কি করব কেউ বলে দিতে পার?'

তবু—বাইরে যতই মুখসাপোট করুক, এত কাল যে বিশেষ কিছু চেষ্টা করতে পারে নি বা করে নি তা শ্যামাও জানে। করে নি তার প্রধান কারণ অর্থাভাব। অনেকগুলি টাকা লাগবে। সংসার চালিয়ে বাড়ির দেনা শোধ

করতেই তার প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে। হেম যা দেয় তাতে তার চালটাও পুরো কেনা হয় না। ভরসার মধ্যে তো ঐ কটা গাছের নারকোল আর সুপুরি। পেঁপেও দু-চারটে পাওয়া যায় বটে—তবে সব সময় তা বেচা যায় না—কারণ লোকাভাব। হেম বাড়ি আসে বহু দিন অন্তর। নারকোল সুপুরি জমিয়ে রাখা যায় কিন্তু কলার কাঁদি বা পেঁপে পাকলে রাখা যায় না। তারা শ্যামার সময় হিসেব করেও পাকে না। এখানে বাজার আছে, কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েছেলে বাজারে গিয়ে বসে কলা পেঁপে বেচতে পারে না। কান্তিও নেই যে তাকে পাঠাবে। অনেক সময় ঘরেই খেতে হয়—কিন্তু এগুলো বেচে কত পয়সা আসতে পারত সেকথা ভেবে পাকা কালী বৌ কলার বা বড় পেঁপের অমৃত-স্বাদও বিষ লাগে তখন।

দেনা অবশ্য বাইরের কিছু আর নেই—যা আছে জামাইয়ের কাছে, তাতে সুদ লাগছে না এটাও ঠিক—তবু তা দেনাই। তা ছাড়া সেটা শোধ না হলে আর চাওয়াও যাবে না তার কাছে, এটাও বড় কথা। সুতরাং পাত্র দেখেই বা লাভ কি!

ঐন্দ্রিলাটা যদি ঘাড়ে না চাপত তো এত ভাবনা ছিল না। খরচ বেড়েছে—কিন্তু আয় বাড়ে নি। কুটি ভেঙে দুটি করবে না মেয়ে। কত মেয়ে আজকাল ঠোঙা গড়ে বেশ দু পয়সা রোজগার করছে—সে কথা ওর কাছে তোলবারই জো নেই। এমন কি, নারকেল পাতাগুলো গাদা হয়ে পড়ে আছে—পচে মাটি হয়ে যাচ্ছে বলে এক বার বলতে গিয়েছিল—'পাতা-কটা চেঁচে রাখবি মা?' তাতে সাফ জবাব দিয়েছিল—'ওসব উঞ্ছ কাজ আমার দ্বারা হবে না।' আবার তেজ কত—বলে, 'গতর খাটিয়েই যদি খাব তো তোমার কাছে বিনি মাইনেয় খাটব কেন মা, অপর জায়গায় কাজ করলে পেট-ভাতা ছাড়াও মাইনে মিলবে।' এক বার শ্যামার মনে হয়েছিল বলে—ঠোঁটের কাছে জবাবটা এসেও ছিল—'তাই যা না, কোথায় ঐ বাচ্চা মেয়ে সুদ্ধ তোকে কাজ দেয় আর দুটো পেট ভরিয়ে আবার বাড়তি মাইনে দেয় দেখি!' কিন্তু সাহস হয় না বলতে; যা তেজ মেয়ের, হয়তো সত্যিই চলে যাবে। যাবে আর কোথায়—দিন কতক পরেই ফিরে আসতে হবে তা জানে শ্যামা—তবে রূপের খাপ্‌রা মেয়ে কোথায় গিয়ে পড়ে কী কেলেঙ্কারি করে আসবে—তখন ভুগতে তো হবে শ্যামাকেই। ও মেয়ে এক দিনও চোখের আড়াল করে নিশ্চিন্তি থাকা যায় না যে!

আয়ের দিক তো দেখেই না—ব্যয় সম্বন্ধেও সচেতন নয়। শ্বশুরবাড়ি থেকে বড়মানষী মেজাজ নিয়ে এসেছে। রান্নার দিকটা অনায়াসে দেখতে পারে—আর তাতে খুব আপত্তিও নেই হয়তো—কিন্তু হলে কি হবে—গরীবের সংসারের হিসেব একেবারেই মাথাতে ঢোকে না। এক দিন রাঁধতে বললে এক সপ্তাহের তেল কাবার করে বসে থাকে। কাজেই—পাতা কুড়িয়ে, বাগানের কাজ করে এগারোটা-বারোটায় এসে আবার রাঁধতে বসতে হয় শ্যামাকে। অত বড় মেয়ে শুধু নিজের মেয়েকে আদর করে সাজিয়ে নাচিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর কাজ না থাকলেই যা হয়—খুনসুটি করে বেড়ায় সবাইয়ের সঙ্গে। মুখ তো নয়—ক্ষুরের ধার একেবারে। সব চেয়ে আক্রোশ যেন তরুটার ওপরই। ওকে হাতে পেলে দুখানা করে কাটে যেন। দিনরাত ঝগড়া আর ঝগড়া—কাক চিল বসতে পারে না! অথচ এই মেয়েটাই—রূপে না হোক গুণে গর্ভের সেরা মেয়ে শ্যামার। মুখ বুজে গাধার খাটুনি খাটে—বাসন মাজা, জলতোলা, ঘরের পাট, ক্ষারকাচা সবই এখন তরুর ঘাড়ে। শুধু রাঁধতে দেয় না শ্যামা ইচ্ছে করেই—আইবুড়ো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, কাঠের বা পাতার জালে রান্না, হাতের লোম পুড়ে যায়, আঁচ লেগে লেগে কর্কশ হয়ে ওঠে হাতের চামড়া। একেই তো রংটা ওর হয়েছে মহাশ্বেতার মতই মাজামাজা—মা বা ঐন্দ্রিলা তো নয়ই—এমন কি হেম বা কান্তির রঙও পায় নি। গড়নপেটনও খুব যে একটা সাকারা তাও নয়। সুতরাং যেটুকু বাঁচানো যায় বাঁচিয়ে চলে শ্যামা। তবু রান্নার সময় এটা ওটা যোগাড় তো তরুই দেয়। ঐন্দ্রিলাকে ডাকতে সাহস হয় না শ্যামার—কাজ যা করবে বাক্যি শুনতে হবে তার ষোল গুণ। তার চেয়ে দূরে থাকে সে-ই ভাল।

তবু এক সময় সক্রিয় হয়ে উঠতেই হয়। এক ভরসা অভয়পদ—তাকেও বলে মধ্যে মধ্যে। পাড়া-ঘরেও দু-চার জনকে বলতে হয়। চট্টখণ্ডীরা মল্লিকরা চৌধুরীরা অনেক ঘরই ব্রাহ্মণ আছে, তাদের ঘরে যে ছেলে নেই তাও নয়, কিন্তু তারা কথাটা শুনেও কান দেয় না। কারণ জানে এখানে একেবারে শুধু-হাত মুখে তুলতে হবে, মেয়েও এমন কিছু আহা-মরি নয়। শ্যামা কলকাতাতে চিঠি লেখে গোবিন্দর কাছে। হেমকে বলে যে কিছু হবে—এমন মনে নেয় না, ও আজকাল সর্বদাই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে,

নেশাখোরের মত ভাবভঙ্গী হয়েছে ওর—যে-কোন কথাই শ্যামা বলুক না কেন, মনে হয় যেন ডান কান দিয়ে ঢুকে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাই ওর ওপর ভরসা না করে এক পয়সা খরচ করে একটা পোস্ট কার্ডই ফেলেছে শ্যামা। কিন্তু গোবিন্দ তো উত্তরও দেয় নি—সেখানে যে কিছু সুবিধে হবে এমন ভরসা পায় না।

এই যখন অবস্থা—হঠাৎ এক দিন মনে পড়ে গেল মঙ্গলার কথাটা। বলতে গেলে দুটো মেয়ের বিয়েই মঙ্গলা দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছেই যাওয়াটা উচিত ছিল। এখানে চলে আসার পর,—প্রথম প্রথম মঙ্গলা আসতেন মধ্যে মধ্যে, কিন্তু এখন আর আসতে পারেন না। অক্ষয়বাবু শরীর খারাপ বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন—ভরসার মধ্যে বড় ছেলের রোজগার—সে এমন কিছু নয়। পিঁটকীর ছেলেরা কেউ কিছু করে না—তাই নিয়ে নিত্য অশান্তি। ভাইয়ের গঞ্জনা সইতে না পেরে মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ি চলে যায় পিঁট্‌কী কিন্তু সেখানেও টিকতে পারে না। এত কাল তাদের অগ্রাহ্য শুধু নয়, অবজ্ঞা করে এসেছে—এখন তারা শোধ তুলতে ছাড়বে কেন? কাঁদতে কাঁদতে যায় আবার কাঁদতে কাঁদতে আসে। ভায়েরা আরও পেয়ে বসে, বলে, 'সধবা মেয়েকে চিরকাল বিধবা মেয়ের মত পুষে এসেছেন বাবা—সে তাঁর পয়সা তিনি যা খুশি করেছেন—এখন আর কেন! ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে—এত পুষতে আমরা পারব না। যেখানকার জিনিস সেখানে চলে যাক।'

মঙ্গলা হয়তো ক্ষীণকণ্ঠে বলতে যান, 'তোরা কি পুষছিস? এখনও তো সে-ই পুষছে। কত রোজগার করিস তোরা দু শ পাঁচ শ টাকা শুনি—!'

তারা আরও জোরে জবাব দেয়, 'সেই জন্যেই তো আরও তাড়ানো দরকার। বাবার তো রোজগার নেই, কলসীর জল ক্রমাগত গড়াতে গড়াতে কত দিন থাকবে? আমাদের চলবে কিসে? আমাদের হকের ধনে ওদের ভাগ বসাতে দেব কেন?'

এ ঝগড়ার শেষ হয় না। মেয়ের জন্যেই মঙ্গলাকে আরও বেশী করে খাটতে হয়—গতরে খেটে যতটা খরচা কমাতে পারেন। তার ওপর বিষম শুচিবায়ু বেড়েছে তাঁর। এক কর্ম দশ বার করেন। পঞ্চাশ বার পুকুর-ঘর করতে হয়। তাতেই আরও সময় পান না।

সুতরাং তাঁর ওপর ভরসা করে থাকলে চলবে না। শ্যামা নিজেই এক দিন কোলের ছেলেটার হাত ধরে হাঁটা দেয়। বুড়ো বয়সে এই এক পাপ

—তিন বছরের ছেলে কোলে। ফল-টানেই শুধু বাড়ি আসে যেন। নইলে আর খবরটা পর্যন্ত থাকে না। তার ছেলেমেয়ে—অথচ যত বোঝা বইতে হয় ওকেই। যেতে যেতে স্বামীর কথাই ভাবে শ্যামা। মনে মনে হিসেব করে দেখে এবার অনেক দিন বাড়ি আসে নি। কে জানে কী হল। এত দিন তো কখনও দেরি করে না। কে জানে কোথাও রোগে পড়ে আছে কিনা। কিংবা হয়তো বা—ভাবতেই শিউরে ওঠে শ্যামা। নিজের লোহা আর শাঁখার দিকে চায়। না না অমন বেঘোরে মরবে না কখনও। এত পাপ শ্যামা কিছু করে নি—। ভাবতে ভাবতেই হাঁটে সে। কেমন যেন একটু মন-কেমনই করে নরেনের জন্য।

॥ ২ ॥

মঙ্গলাদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই বুঝতে পারল সেখানে একটা ধুন্ধুমার ব্যাপার চলেছে। চেঁচামেচির অন্ত নেই। একসঙ্গে সবাই যেন চিৎকার করছে। কী একটা ব্যাপার নিয়ে সবাই কটু-কাটব্য করছে কোন এক জনকে। কিন্তু যে কোন উপলক্ষেই হোক না কেন—সব চেঁচামেচিতেই যার গলা সর্বাগ্রে শোনা যায় আজ তার গলা শোনা যাচ্ছে না কেন? তবে কি মঙ্গলা বাড়ি নেই? একটু উদ্বিগ্ন হয়েই বাড়িতে ঢুকল শ্যামা। কিন্তু উঠানে পা দিতেই কারণটা বোঝা গেল—এক্ষেত্রে আসামী খোদ মঙ্গলাই। তাঁকেই উপলক্ষ করে চারিদিক থেকে এত তিরস্কার এবং লাঞ্ছনা বর্ষিত হচ্ছে।

কারণটাও জানতে বেশী দেরি হল না। শ্যামাকে দেখেই আর এক দফা সকলে চেঁচিয়ে উঠল। ওকেই মধ্যস্থ মানলে সবাই—'বামুনদিই বলুক, এ মানুষকে নিয়ে কি সংসার করা চলে? একে খাঁচায় পুরে রাখা ছাড়া আর কী উপায়?'

চিৎকারটা একটু থিতিয়ে আসতে ব্যাপারটা বোঝা গেল। আগের দিন অক্ষয়বাবু কলকাতা থেকে সালু কিনে এনে নতুন লেপ তৈরী করিয়েছেন আসন্ন শীতের জন্য। যেহেতু মুসলমান ধুনুরী লেপ সেলাই করেছে এবং বাইরের বাগানে ফেলে তৈরী হয়েছে—সেখানে কুকুর-বেড়ালের বিষ্ঠা থেকে শুরু করে মাছের কাঁটা এবং পাঁঠার হাড় কী নেই—সেই হেতু গতকাল বা আজ সকালে কাউকে কিছু না বলে দুপুর বেলা চুপিচুপি সকলে শুয়ে পড়লে

সেটাকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ফেলেছেন, পরিতৃপ্তি করে কেচেওছেন—কিন্তু তার পর আর টেনে তুলতে পারেন নি। বেগতিক দেখে এসে পিঁটকীর শরণাপন্ন হয়েছেন কিন্তু সেও মায়ের এ কাজটা সমর্থন করতে পারে নি। তার ফলে এই জানাজানি ও চেঁচামেচি।

শ্যামারও কষ্ট কম হল না খবরটা শুনে। পয়সার অভাবে কত কাল তারা একটা বাঁদিপোতার লেপও গায়ে দিতে পারে নি। ছেঁড়া কাপড়ের কাঁথা গায়ে দিয়ে শীত কাটাচ্ছে। সে কাঁথাও স্থানাভাবে গরমের দিন বিছানায় পেতে রাখতে হয়—তার ফলে শুধু যে কতকগুলো ছারপোকার বাসা হয় তাই নয়—আট মাসের চাপে আরও ভারী হয়ে ওঠে এবং চিপটান খেয়ে যায়! অমন সালুর লেপখানা ছুঁচিবাইতে নষ্ট করে দিলে! কত খরচ পড়েছিল কে জানে!

যাই হোক—শ্যামা গিয়ে পড়ার জন্যই সে যাত্রা মঙ্গলা অল্পে অব্যাহতি পেয়ে গেলেন। সম্ভবত নিজে বাড়ি করে চলে যাওয়ার জন্যই—এখন এ বাড়িতে শ্যামার কিছু আদর হয়েছে, পিঁটকী মেয়েকে এক ঘটি পা ধোবার জল আনতে বলে তাড়াতাড়ি ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে দাওয়ায় বসালে, একটা পাখাও এনে দিলে।

মঙ্গলাও এতক্ষণে কিছুটা সহজ হয়েছেন—অবশিষ্ট অল্প কয়েকটি পান-দোক্তা-খাওয়া দাঁত মেলে হেসে বললেন, 'তার পর বামনী, কী মনে করে?'

'কী মনে করে আবার! কেন শুধু অমনি দেখতে আসতে নেই? মা না হয় খোঁজ নেয় না—তাই বলে মেয়ে কি ভুলে থাকতে পারে?' শ্যামা একটু হাসবারও চেষ্টা করে।

'ওমা—এখনও তোর এমনধারা মিষ্টি মিষ্টি বাক্যি আসে? তাই তো বলি পিঁটকীকে যে মেয়েগুলোকে লেখাপড়া শেখাতিস তো তবু কাজ হত। আজকাল ইস্কুলে-পড়া মেয়েদেরই কদর। দেখিস না বামুন-মেয়ে কীই বা দু পাতা লেখাপড়া শিখেছে—তারই জোর কেমন গুছিয়ে গুছিয়ে কথা বলে। আমরা যে ষাঁড়ের নাদ হয়ে রইলুম। থাকত পেটে একটু কালির আঁচড়, তা হলে দেখতুম কে মুখের সামনে দাঁড়ায়! তা হলে কি আর ভাতারেরই কথা সহ্য করতুম, না ছেলেদেরই হাতে এমন খোয়ার হতে পারত। কী বলব অদেষ্ট মন্দ—তাই অত বড় ঘরে জন্মে এই নাথি-ঝ্যাটা খাচ্ছি!'

বলতে বলতে চোখে জল এসে যায় মঙ্গলার।

শ্যামা বেগতিক দেখে পিঁটকীকে ধরেই কুশলপ্রশ্ন করে। পিঁটকীও আল্‌তো আল্‌তো জবাব দেয়। বেশ একটু বাঁকা-বাঁকা তার বলবার ভঙ্গিমা। একটু পরে তার কথাও অস্বস্তিকর পথ ধরবে বুঝে শ্যামা সোজাসুজি নিজের কথাই পাড়ে। ওদের পারিবারিক অশান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা ওর আদৌ নেই। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি পিঁটকী আর তার ছেলে-মেয়েদের দুর্গতিতে সে মনে মনে খুশীই।

সে মঙ্গলার দিকে ফিরে বললে, 'মা যা হোক করে তো দুটো মেয়েকে পার করলেন—এবার এটার একটা গতি করুন—নইলে তো জাতধম্ম থাকে না আর!'

'গতি—? ও তরুর বে'র কথা বলছিস। ওমা, এখনও কিছু করিস নি বুঝি? মেয়ে যে ধাড়ী হয়ে গেল। সময়ে বে হলে তিনটে চারটে নেণ্ডি-গেণ্ডি হয়ে যেত। আমি ভাবি এই বুঝি নেমন্তন্ন আসবে, এই বুঝি নেমন্তন্ন আসবে, তা মূলেই হাবাত!'

'আমি কি করব মা? জানেনই তো। ওর তো ঐ গতি। ভরসা এক ছেলে—তা তারও চাকরি-বাকরির কিছু হল না—থিয়েটারে পড়ে আছে, কী পায় আর কী পায় না তা তো বুঝি না—আমি তো কোন মাসে পাই সাতটি কোন মাসে পাই আটটি টাকা। যে মাসে খুব পেলুম—সে মাসে দশটি টাকা। তার চেয়ে এখানে থেকে যদি চালকলা বাঁধত তো বেশী রোজগার হত। টাকা কোথায় যে বে'র কথা ভাবব। ঐ তো কটা গাছের ফলফুলুরি ভরসা। তা থেকে সংসার চালাব, না ধার শোধ করব।'

'তা তবু তা থেকেই কিছু জমিয়েছিস বল—তাই এদ্দিন পরে পাত্তরের সন্ধান করতে বেরিয়েছিস! ধন্য মেয়েমানুষ তুই বামনী। তোর ক্ষুর-ধোয়া জল পেলেও আমার মেয়েটা বর্তে যেত!'

কেমন এক রকম ধূর্ত ভাবে শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে হা-হা করে হেসে ওঠেন মঙ্গলা। তাঁর সেই পানদোক্তা খাওয়া কালো বিরাট মুখগহ্বর আর পাকা উচ্ছেবীচির মত কয়েকটা অবশিষ্ট দাঁতের হাসিটা কেমন বীভৎস মনে হয়।

শ্যামা তাড়াতাড়ি বলে, 'টাকা জমাব! কী বলছেন মা—এখনও জামাইয়ের দেনাই শোধ করতে পারি নি। তবু আর তো রাখা যায় না—তাই। আবারও ধারই করতে হবে—নইলে ভিক্ষে! তাই বলছিলুম আপনার সন্ধানে যদি কিছু থাকে—'

মঙ্গলা ভ্রূটা কুঁচকে আকাশের দিকে চেয়ে কী ভাবেন খানিকটা, তার পর বলেন 'আড়পোড়ের ঘোষালদের সঙ্গে সম্বন্ধ করবি? মানে ওদের নয়—ওদেরই ভাগনাগুষ্টি। একটা ভাল ছেলে আছে। রেলে কাজ করে, এখনই প্রায় চল্লিশ টাকার মত মাইনে পায়—'

শ্যামা ওঁর কথা শেষ করতে দেয় না—হাত জোড় করে বলে, 'রক্ষে করুন মা—ওদের সংস্পর্শে আর আমি যাব না। তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেব সেও ভাল!'

'দিবি নি? তাই তো। আর কোথাও তো কিছু মনে পড়ছে না। হ্যাঁ—একটা সম্বন্ধ আছে বটে—কে যেন বলছিল সেদিন—নিব্ড়েতে একটা খুব ভাল পাত্তর আছে। চাকরিতে ঢুকেছে সবে—মা-বাপ কেউ কোথাও নেই, বুড়ী ঠাকুমা আছে, অগাধ বিষয়। অন্তত পাঁচ বিঘের ওপর ভদ্রাসনটাই। তবে একটা কথা—সতীন আছে!'

'সতীন!'

'না—না, সতীনকে নিয়ে ঘর করতে হবে না। তাকে ত্যাগ করেছে—দু বিঘে জমি তাকে লেখাপড়া করে দিয়ে ঠাকুমা মাগী তার বাবাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে যে আর কোন দিন সে ফিরে আসবে না, আসতে চাইবে না। বিষয়-সম্পত্তিতেও তার কোন কেলেম্ থাকবে না।'

'কিন্তু তাকে ত্যাগ করেছে কেন?'

'সে অনেক পব্ব। কী সব মনান্তর হয়েছিল তত্ত্বতাবাস নিয়ে—বুড়ী বলেছিল বৌ পাঠাব না। পাঠায়ও নি পুরো দুটি বছর। তার পর তার বড় ভেয়ের বে আসতে মেয়ের বাবা এসে হাতে পায়ে ধরলে, পাঠালে না। এধারে মা আছড়ে পড়ল—তাদের ঐ একটা মেয়ে, সে না এলে বড় ছেলের বিয়ে হবে না। তখন বেগতিক দেখে—আর বাপেরও প্রাণ তো—থানা থেকে পুলিস এনে মেয়েকে নিয়ে গেল সে। তাইতে বুড়ীর বড্ড অপমান হয়েছে, সে আর ও বৌ ঘরে তুলবে না। তা ছাড়া সে মেয়েটাও নাকি ভাল ছিল না। তবে—নিজে যখন দেখি নি, জানি না, তখন বদনাম একটা দেওয়া ঠিক নয়।—এই ব্যাপার, ছাখ্, দিবি তো দে!'

'অমন দজ্জাল দিদিশাশুড়ী—দেওয়া কি ঠিক হবে? যদি আমার সঙ্গেও অমনি করে—না পাঠায়?'

'ছাখ্ অত বাছ্তে গেলে কি তোর চলবে? এমন পাত্তর একবরে হলে

শুধু হাত মুখে উঠত না! এ তোর বেশী পয়সা খরচা হবে না। তা ছাড়া বার বার এমন করতে সাহস করবে না। দুর্নাম হয়ে যাবে যে।· আর বুড়ীই বা কদিন—পেরায় চারকুড়ি হতে চলল বয়েস।··না পাঠায় না-ই পাঠাল—তুই-ই বা কত এরে-বেরে মেয়েজামাই আন্‌তে পারবি? এইখান থেকে এইখানে, ছেলেরা গিয়ে দেখে আসবে এখন। আমার তো মনে হয়—এক বার এই কাণ্ড হয়ে গেছে, এখন সাবধানে চলবে।··ছাখ্ দিস তো কথা তুলি—ওরা একটু ডাগর-ডোগর মেয়েই চাইছিল, হয়তো নগদ কিছু দিতে হবে না। দানসামিগ্‌গিরও চাপ দিয়ে কমিয়ে নেওয়া চলবে!'

চুপ করে থাকে শ্যামা। উত্তর দিতে পারে না। 'না' বলতেও ভয় করে—'হ্যাঁ' বলতেও বাধে।

মঙ্গলা একটু অপেক্ষা করে থেকে বলেন, 'বেশ তো—একটু ভেবেই ছাখ না। কোমরের জোর থাকে অন্য পাত্তর ছাখ—নইলে এটা মন্দ নয়।··না হয় হেমের সঙ্গেও একটু পরামর্শ কর্ না!'

'হেম!' অকস্মাৎ হি-হি করে হেসে ওঠে পিঁট্‌কী। সে উঠে গিয়েছিল শ্যামাদের জন্যে জলখাবার আনতে। একটা পেতলের সরায় করে মুড়ি, বাতাসা, নারকোল নাড়ু এনে শ্যামার সামনে নামিয়ে রেখে ছেলেটার হাতে একটা নারকোল নাড়ু ধরিয়ে দিতে দিতে হেসে গড়িয়ে পড়ল পিঁটকী।

'হেম! তাকে খরচের খাতায় লিখে রাখ বামুনদি! বলে আগ-ন্যাঙলা যেমনে যায়, পেছ-ন্যাঙলাও তেমনে যায়। বাপের বেটা তো। গত মাসে শ্বশুরবাড়ি গিছলুম, শুনে এলুম··তোমার হেম আজকাল কম্বুলেটোলার কোন্ মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছে—নিত্যি দুপুরবেলা যায় সেখানে। আমার দেওর দেখেছে, দেওরেরও সেই বাড়িতেই বাঁধা রাঁড় আছে—শুনেছিল তার মুখেই—এক দিন হঠাৎ দুপুরে গিয়ে পড়ে নিজের চোখে দেখেছে!'

কাঠ হয়ে যায় শ্যামা। কতক্ষণ জবাবই দিতে পারে না।

'না না, এ হতে পারে না পিঁট্‌কী। মেয়েমানুষ রাখতে গেলে টাকার জোর চাই। সে বড়লোকরা রাখতে পারে। তোমার ছাওর তো কোন হৌসের মুচ্ছুদ্দী না কি বলেছিলে। সে যা পারে আমার হেম তাই পারবে? কাকে দেখতে কাকে দেখেছে—'

'না গো—এ পয়সা দিয়ে রাখা নয়। বেশির ভাগ বাজারের মেয়েমানুষেরই—যারা বাঁধা থাকে কোন বাবুর কাছে—একটা-দুটো করে শখের

পড়ি থাকে। বলি তাদেরও তো সাধ-আহ্লাদ আছে—মনের মানুষ দরকার! হেমও তেমনি হয়েছে তার—বুঝলে না? নইলে দুপুরে যাবে কেন—লুকিয়ে চুরিয়ে?'

এর পর আর মুড়ি বাতাসা গলা গিয়ে নামে না শ্যামার। চুপ করে জন্তুর মত বসে থাকে। যেন কিছু ভাবতেও পারে না।

'নে নে—মেয়ের কাণ্ড দ্যাখ্—দিলি বামনীকে ভাবনা ধরিয়ে। তুই ভাবিস নি বামনী—বড় জামাইকে ডেকে বল—তার পায়ে মাথা খোঁড়—ঠিক একটা সায়েববাড়ির চাকরি জুটিয়ে দেবে। তার পর ছেলেকে ও পেঁশের চাকরি ছাড়িয়ে নিয়ে আয়। নইলে আগেই নিয়ে আয়। কী হচ্ছে তোর ঐ সাত-আট টাকায়? ঘরে বসে বাগান দেখলে ওর চেয়ে বেশী রোজগার করবে। ঘন্টা না হয় নাই নাড়লে—যদিও ওতে খুব রোজগার। বাপের দেখে বোধ হয় ও কাজে ঘেন্না হয়ে গেছে। তা ছাড়া—সত্যিই কাকে দেখতে কাকে দেখেছে ওর দেওর তাই বা ঠিক কি! দু-এক দিন এখানে কাজকম্মের বাড়িতে দেখেছে হয়তো—অমনি তাইতেই কি আর এত চিনে রেখেছে? তুই মিছে এখন থেকে অত ভাবিস নি বামনী, ওঠ্—মুখে জল দে। আবার এতটা পথ যাবি!'

মঙ্গলা বেশ গলায় জোর দিয়ে কথাগুলো বলাতে শ্যামা সত্যি-সত্যিই যেন খানিকটা বল পায় মনে মনে।

তবু খেতে ইচ্ছে করে না কিছুই। কোন মতে দুটো নাড়ু মুখে পুরে এক ঘটি জল খেয়ে আবার বাড়ির পথ ধরে।

কোলে ছেলেটা আছে—কিন্তু এমন ভার বওয়া আর হাঁটা ওর নতুন নয়। এর চেয়ে ঢের বেশী হেঁটেছে ও। তবু কে জানে কেন—আজ যেন পা দুটো বড় ভারী বোধ হয়।

॥ ৩ ॥

ফেরবার পথে সিদ্ধেশ্বরীতলাতে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে আর মাথা কুটে ফিরেছিল শ্যামা। একটা মানতও করে ফেলেছিল বড় গোছের। হেম ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরে এসে বসলে, তার সুবুদ্ধি হলে—আর তার কোথাও একটা ভাল পাকা চাকরি হলে—প্রথম মাসের মাইনে থেকেই সোনার বিল্বপত্র

গড়িয়ে বুক চিরে রক্ত দিয়ে পুজো দেবে। প্রার্থনাও অনেকখানি অবশ্য—কিন্তু মানসিকও তার পক্ষে সাধ্যের অতীত প্রায়। কল্পনাতীত রকমেরই অনেকখানি।

হয়তো বা ওর মানসিকের জোরেই—হেম ফিরে এল।

অথবা ওকে ফিরতে হল। কিন্তু সেও ঐ মানসিকেরই জোরে হয়তো।

কারণ—হেমের ফেরার মূল কারণটা যেমন তুচ্ছ, তেমনি হাস্যকর।

নলিনীর ভাড়াটেদের মধ্যে ক্ষীরি বলে একটি মেয়ে ছিল। তার ভাল নাম একটা আরও ছিল—আশালতা, কিন্তু নলিনীর মা তাকে ছোটবেলা থেকে ক্ষীরি বলেই জানত—তাই ঐ নামটাই এখানে চালু। ক্ষীরির বাবু পূর্ববঙ্গের লোক, ব্রাহ্মণ। নিমতলার দিকে কাঠের গোলা আছে—অবস্থা মাঝারি। কিন্তু ক্ষীরিরও রং কালো—গোলগাল, অতি সাধারণ চেহারা—এর চেয়ে ভাল বাবু তার পাওয়া মুস্কিল। সুতরাং সে ঐতেই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে—সেই ভটচায বাবুটিও ইদানীং প্রায় আসছে না—ডুব মারছে। সম্ভবত তার প্রাণের পাখী অন্য কোন আকাশে উড়তে চাইছে, এ দাঁড়ে আর থাকতে চাইছে না। হয়তো কিছু দিন পরে একেবারেই শিকল কাটবে। ক্ষীরির এজন্যে দুঃখ আর দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না।

কিন্তু দুঃখ-দুশ্চিন্তা ছাড়াও বেদনার অন্য কারণ ছিল।

এ বাড়ির সব মেয়েই ক্ষীরির বাঙাল বাবু উপলক্ষ করে ওকে খেপাত। বরাবরই খেপিয়ে এসেছে। তাতে ওর এত দিন রাগের কারণ থাকলেও আঘাতের কারণ ছিল না। ইদানীং ওর মনে আঘাত লাগতেও শুরু করেছে। ওর কেমন মনে হয়—সত্যি সত্যিই তারা ওকে একটু কৃপার চোখে দেখে—ওর বাবু বাঙাল এবং সাধারণ ব্যবসায়ী বলে। এখন আরও একটু কৃপার চোখে দেখছে। হয়তো ওর এই দুর্গতিতে তারা মনে মনে উল্লসিত—হয়তো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বেশ একটু কৌতুকই উপভোগ করছে।

এই রকম মনোভাব থাকলে সাধারণ সহানুভূতিকেও লোক বিদ্রূপ বলে মনে করে।

ক্ষীরিও তাই মনে করত।

কার ঘরে বাবু এল কিংবা এল না—সে খবরটা রাত্রে জানা না গেলেও সকালবেলা টের পাওয়া যায়।

সুতরাং—'হ্যালা ক্ষীরি, ভট্‌চায বুঝি কালও আসে নি?' এ প্রশ্নটা আজকাল প্রায়ই শুনতে হয় ক্ষীরিকে— এবং এটাকে সে রীতিমত উদ্দেশ্য-প্রণোদিত (অপমানের বা ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য) বলে মনে করে। ফলে অতি সাধারণ প্রশ্নও তার কাছে অসাধারণ হয়ে ওঠে। কথাগুলো শোনামাত্র তার সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ধরে।

তবু মানুষ এক রকম। তার সঙ্গে যদি ইতর প্রাণীও যোগ দেয়,— সহ্যের সীমা অতিক্রম করে বৈকি!

সেদিন ভোরবেলা সবে বেচারী দোর খুলে ঘরের বাইরে এসেছে— (টাকাকড়ির টানাটানিতে ঠিকে ঝিয়ের বিলাসও ত্যাগ করতে হয়েছে ওকে, আর সেই কারণেই ভোর বেলা উঠে অন্য ভাড়াটেদের ঝি আসবার আগে কাজ সেরে নেয়। নইলে তাদের কাছেও অপমান—ভাড়াটেদের কাছে তো বটেই)—দোতালার বারান্দায় ঝোলানো খাঁচা থেকে নলিনীর পোষা ময়নাটা পরিষ্কার প্রশ্ন করে বসল, 'হ্যালা ক্ষীরি, ভট্‌চায বুঝি কালও আসে নি?'

একেই সেদিন নিয়ে পর পর চার দিন অনুপস্থিত ভটচায—নিয়মিত টাকা দেওয়া তো প্রায় পাঁচ-ছ মাসই বন্ধ করেছে, এলে জোর-জবরদস্তি করে যা দু-এক টাকা আদায় হয়—তাও চার দিন হয় নি, সকালে হাঁড়ি চড়বে কি করে এই দুশ্চিন্তায় সারারাত ঘুমোতে পারে নি বেচারী, তার ওপর সকাল-বেলা ঘর থেকে বেরোতেই এই অপমান—মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘার মতই বাজল।

দুঃসহ রাগে ক্ষীরির আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না। সেদিন ওরই সিঁড়ি এবং উঠান ধোয়ার পালা বলে—ঘর থেকে বেরিয়েই উঠোন ধোয়া ঝ্যাংরাটায় হাত দিয়েছিল সে—সেইটে হাতে করেই ওপরে উঠে গেল এবং দুদ্দাড় মারতে শুরু করলে।

'তবে রে হারামজাদা পাখি! তোমার এত বড় সাহস! এত আস্পদ্দা! এই! এই! এই!'

বকতে বকতে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে পাগলের মত খাঁচাটার গায়েই ঝ্যাংরা চালাতে লাগল সে।

খাঁচার ওপরেই ঝ্যাংরাটা পড়ছিল অবশ্য, পাখির গায়ে লাগে নি। তবে তাতে খাঁচাটা দুলছিল বিশ্রী রকম। সেই দুলুনিতে আর ঝাঁটার আস্ফালনে পাখিটা ভয় পেয়ে ক্যাঁ ক্যাঁ করতে লাগল।

ক্ষীরির চীৎকারে ও পাখিটার আর্তনাদে বাড়িসুদ্ধ সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল—সেই সঙ্গে নলিনীর মা কিরণেরও। দৈবক্রমে সেদিন নলিনী ছিল না, আগের দিন রমণীবাবুর কোন্ এক ব্যারিস্টার বন্ধুর বাগানে বাবুর সঙ্গে মাইফেল করতে গিয়েছিল—কথা ছিল সেদিন সকালে ফিরবে। কিন্তু তাতে ক্ষীরি অব্যাহতি পেল না। কিরণ বলতে গেলে সম্প্রতি বাড়িউলীর মা হয়েছে—সামান্য এক একতলা ঘরের ভাড়াটে—বিশেষ করে যে ভাড়াটের কাছে প্রায় তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে—তার এত ধৃষ্টতা কিরণের সহ্য হল না। সে একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে নেমে এল তেতলা থেকে!

'বলি তোমার আস্পদ্দা তো কম নয় বাছা। আজ শনিবার, সাতসকাল বেলা আমার নলুর শখের ময়নাকে তুমি খ্যাংরা মারতে এসেছ! এত সাহস কিসের তোমার! দোতলাতেই বা তেড়ে উঠেছ কিসের জন্যে! ভেবেছ কি? নলু বাড়িতে নেই বলে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছ নাকি!'

চারিদিকের দোর খুলে যাওয়ায়—এবং অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে তাদের বাবুরাও বেরিয়ে আসায়—ঝাঁটার আস্ফালনটা অনেকক্ষণই বন্ধ হয়েছে ক্ষীরির, কিন্তু তার আক্রোশটা তখনও যায় নি।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল, 'কেন, কেন ও পাখি অমন করে বলবে আমাকে? কেন বলবে তাই শুনি! পাখির এত বড় আস্পদ্দা ও সুদ্ধ আমাকে অপমান করবে! আমার ঘরে আমার বাবু আসে নি তা বাড়িসুদ্ধ ভাল-খাগীদের কি! আমার পেছনে না লাগলে কি চলে না তাদের! আবার পাখিকে সুদ্ধ শিখিয়ে দেওয়া!'

কিরণের কর্কশ কণ্ঠে ক্ষীরির গলা ডুবে যায়।

'আ মর ছুঁড়ী! বলে কিনা পাখিকে সুদ্ধ শিখিয়ে দিয়েছে! লোকের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—ওকে অপমান করবার জন্যে সবাই যুক্তি করেছে।...একটা অবলা পাখি—তার ওপর এত আক্রোশ! বলি অত যদি তোর মান মর্য্যেদাজ্ঞান তো তুই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যা না। অত বড় মহামানী রাজা দুর্যোধন আমাদের এ গরিবের বাড়ি থাকবার দরকার কি!

'যাবই তো। চলেই যাব। যাব না তো কি থাকব! অত কিসের! কেন, ঘর কি আর নেই?'

'তাই যাও না বাছা। আজই চলে যাও। আমি তোমাকে এই এখনই নোটিশ দিয়ে দিলুম।...কে তোমার আছে চোদ্দপুরুষের নাউখোলা—যে বিনা

ভাড়ায় থাকতে দেবে—তার কাছে যাও। তবু যদি না তিন-চার মাসের ভাড়া বাকী পড়ত! কিছু বলি নে বলে তাই। বলি, মানুষটার দুঃসময় পড়েছে—থাক না রয়ে বসেই নেব না হয়। এ নাইনের হাল জানি তো—অমন মাঝে মাঝে ক্ষ্যামাঘেন্না করতে হয়। ভগবানের ইচ্ছেয় নলুর আমার যখন কোন অভাব নেই।···তা দয়া কি করার জো আছে! বলে দয়া করে দেয় নুন, ভাত মারে সাত গুণ।···আর কিছু পেলে না তো আমার নলুর পাখিটাকেই খুন করতে এসেছে।···তুমি তো সাংঘাতিক মেয়েমানুষ দেখছি, পেলে কোন্ দিন বা আমাদের গলাতেই ছুরি বসাবে। এমন সব্বনেশে ভাড়াটেতে আমার দরকার নেই। আজই তুমি আমার বাকী ভাড়া বুঝিয়ে দিয়ে তোমার এস্টেট-পত্তর নিয়ে উঠে যাবে বাছা—এই সাফ্ বলে দিলুম!'

'বেশ বেশ। তাই যাব। তাই তো বললেই হত—তার জন্যে সাতগুষ্টি মিলে আমার এত লাঞ্ছনা করবার কী দরকার ছিল!' এতক্ষণে চোখে জল এসে গেছে ক্ষীরির—গলাটা গেছে ধরে—'তবে তাও বলে দিচ্ছি—যেমন বিনা দোষে আমার পেছনে আদাছোলা খেয়ে লেগেছ—তোমাদেরও ভাল হবে না। তিন দিন বাড়িউলী হয়ে বসে বড্ড তেজ হয়েছে তোমাদের মা-বেটীর! ও তেজ থাকবে না, তেজের মাথা খাবে শিগ্‌গিরি—এই বলে দিলুম।'

'দ্যাখ বাছা, সাত সকালে অমন শাপমন্যি দিও না বলে দিলুম, ভাল হবে না। দুগ্‌গতির শেষ করে ছাড়ব। ঘটি বাটি নিলেমে তুলব তবে আমার নাম। আমাকে এখনও চেন নি। ভাল চাও তো মুখটি বুজে সহমানে বিদেয় হও!'

কিরণ রুদ্রমূর্তি ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে আসে দু পা। মনে হয় বুঝি বা মেরেই বসবে।

কিন্তু ক্ষীরি তাতে ভয় পায় না, সমান তেজের সঙ্গে উত্তর দেয়, 'তুমিও ভাল চাও তো চোখ রাঙিও না বেথা—এই বলে দিলুম! তুমিও আমাকে চেন নি কিরণ মাসী। ভাল আছি তো আছি—কেনা গোলাম, রাগলে আমি কারুর নই। উঠে যদি যেতে হয় তো তোমার মেয়ের সর্বনাশ করে তবে যাব। সোজা গিয়ে উঠব তোমার জামায়ের কাছে—তোমার মেয়ের কীত্তি-কেলেঙ্কারি সব ফাঁস করে তবে ছাড়ব।'

কিরণ এবার যেন ধেই ধেই করে নেচে নেয় এক পাক।

'বলি অত কি ভয় দেখাচ্ছিস লা? মেয়ের আমার কী কীর্ত্তি কেলেঙ্কারি ফাঁস করবি তাই শুনি! সে কি আর একটা নাগর করছে।'

'করছেই তো। আর সে কথা এ বাড়ির না জানে কে।' গলায় জোর দিয়ে জবাব দেয় ক্ষীরি, 'জিজ্ঞেস কর না ঐ তো সব ভালমানুষটি সেজে মুখ বাড়াচ্ছে দোরে দোরে—কী বলে ওরা। জানতে কারুরই আর বাকী নেই। ...বাবুর মাইনে খাচ্ছেন আর দুপুর বেলা বাবুরই চাকরের সঙ্গে সোহাগ করছেন ঘরে দোর দিয়ে।...বাড়ি ছেড়ে যদি যেতে হয় তো এ হাঁড়ি হাটে না ভেঙে যাব না।'

'কী—কী বললি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। জিবের লাগাম রেখে কথা বলিস না হারামজাদী! যার আশ্রয়ে আছিস তার নামেই মিছে বদনাম দেওয়া।'

কিরণের মুখের চেহারা ভয়াবহ হয়ে ওঠে, কিন্তু বোধ করি অসহ্য ক্রোধেই এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারে না। অথবা ইতিমধ্যেই একটা কুটিল সংশয় দেখা দেয় ওর মনে—তাইতেই আরও নির্বাক হয়ে যায়।

ক্ষীরি কিন্তু একটুও দমে না, অথবা অত বড় গালাগালিটাও লক্ষ্য করে না। বলে, 'মিথ্যে বদনাম, তা তো বটেই।...নিজে যদি দুপুরবেলায় পাড়ায় পাড়ায় জুয়ো খেলে না বেড়াতে তা হলে নিজেই দেখতে পেতে চোখে—সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি। জিজ্ঞেস কর না তোমার পেয়ারের ঐ সব ভাড়াটেদের, ওরা কি বলে। সবাই তো আর চোখের মাথা খেয়ে বসে নেই তোমার মত।'

কিরণ স্তম্ভিত হয়ে গেল অকস্মাৎ। ঠিক জোঁকের মুখেই নুন পড়ল যেন। ভাড়াটেদের জিজ্ঞাসা করার উপায় ছিল না বটে—কারণ পাছে সাক্ষী দিতে হয় বলে ইতিমধ্যেই—ক্ষীরির কথা শেষ হবার আগেই—যে কটি মাথা বেরিয়েছিল বিভিন্ন ঘর থেকে—সে কটি মাথা আবার ঘরে ঢুকে গেছে, কিন্তু বোধ করি আর সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজনও ছিল না। বহু দিনের লোক কিরণ, ক্ষীরির মুখের চেহারায় আর গলার আওয়াজে সে যে সত্য কথা বলছে সে সম্বন্ধে ওর মনে আর সংশয় মাত্র রইল না।

মিনিট কয়েক তেমনি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আশ্চর্য কোমল কণ্ঠে ও বলে, 'কিছু মনে করিস নি মা ক্ষীরি, বুড়ো হয়েছি—হঠাৎ মাথা গরম হয়ে ওঠে। তুই নিজের ঘরে যা—যা হবার হয়ে গেছে—মনে কিছু রাখিস নি।

তোর ও বোঝার ভুল, ঠাট্টা তোকে কেউ করে না। কে করবে বল—এ তো আছেই, আজ তোর কাল আমার। যে নাইনের ষা!·· যা, মাথাঠাণ্ডা করে বাসি পাট সেরে নিগে যা।···আর ত্যাখ—আমাকে যা বললি বললি—নলু এলে কিছু বলিস নি, লক্ষী মা আমার!'

॥ ৪ ॥

হেম এসব ঘটনার কিছু জানতে পারে নি।

তার পক্ষে তখন কোন কিছুই জানতে পারার কথা নয়। চোখের সামনে কোন ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা ঘটলেও সে-ইঙ্গিত সে নিতে পারত না তা দেখে। কানের কাছে মুখ এনে কেউ হুঁশিয়ার করলেও বুঝতে পারত না। চোখ এবং কান দুই-ই তার তখন বন্ধ। সে তখন মধুর মরণে মরছে—পতঙ্গের মত তেজদীপ্ত মৃত্যুর দিকে উড়ে চলেছে দুই পাখা মেলে।

এক কথায় তাকে নেশায় পেয়ে বসেছে। মধুর, সাংঘাতিক, আশ্চর্য নেশা। সেই নেশায় বুঁদ হয়ে আছে সে। আর নেশা লাগবারই তো কথা। ভিখারীর সামনে হঠাৎ রাজপ্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে, দরিদ্রের সামনে অবারিত হয়ে গেছে কুবেরের ভাণ্ডার। যা সে কোন দিন কল্পনা করে নি, স্বপ্ন দেখে নি—এমন কি যা এই পৃথিবীতে আছে এমন কোন ধারণাও ছিল না—তাই তার জীবনে ঘটছে। অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা, অনাস্বাদিতপূর্ব সুখ।

সে সারা সকাল ছটফট করে, সারা সন্ধ্যা থাকে অন্যমনস্ক।

সকাল থেকে মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখে—কখন দুপুর হবে, বেলা একটা বাজবে, প্রতীক্ষিত লগ্ন আসবে। আর বিকাল সন্ধ্যা এবং রাত্রি—দ্বিপ্রহরের সেই অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার স্বপ্ন-রোমন্থনে তন্ময় থাকে। প্রতিটি ঘটনা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাবার্তা, সামান্যতম রসিকতার বিনিময়গুলিও মনে করে করে আবার সেই রসটা উপভোগ করতে চায়।

সবটাই তার কাছে আশ্চর্য। ঐ বাড়ি, ঐ শয্যা, ঐ সুশ্রী যুবতী নারী—সবই। ঐ নারী যে তাকে ভালবাসবে, কামনা করবে, যত্ন করবে, সেবা করবে—তা কে জানত! চোখে দেখে, উপলব্ধি করেও বিশ্বাস হতে চায় না তার। বার বার মনকে প্রশ্ন করে—এ কি সত্যি, এ কি সত্যি সত্যিই ঘটছে তার জীবনে—না স্বপ্ন দেখছে!

এ যেন রূপকথার মত। হঠাৎ এক রাজকন্যা আর রাজত্ব পাওয়া।

নলিনী শুধু তাকে ভাল খাওয়ায় না—পয়সাও দেয় মধ্যে মধ্যে।

ভাল দেশী ধুতি দিয়েছে, জামা দিয়েছে,—বিলিতী শাল পর্যন্ত কেনবার টাকা দিয়েছে। সে আরও এক যন্ত্রণা হয়েছে, অজস্র মিথ্যা কথা বলতে হয়—গোবিন্দ আর কমলার কাছে। কোনটা ব্রতের পাওনা, কোনটা বন্ধুর উপহার—এই বলে ঢাকতে হয়। কিন্তু বেশী দিন যে ঢাকতে পারবে বলে মনেও হয় না। ক্রমশই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে ওরা—বিশেষ করে গোবিন্দর নতুন বৌয়ের নজর বড় সাফ, তার সুডৌল ওষ্ঠাধরের হাসিটাও বড় বাঁকা। ওর মিথ্যা কথা যখন সবাই বিশ্বাস করে তখন সে-ই শুধু একটু মুখ টিপে হেসে টোল-খাওয়া গাল ও টেপা চিবুকের একটা বিচিত্র ভঙ্গী করে চলে যায়। তবু তো এ কাপড়-জামা পরে কস্মিন্‌কালেও বাড়ি যায় না হেম—কারণ সে জানে মা কোন কথাই শুনবে না—এমন কাপুড়ে-বাবুগিরি তার কাছে অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। হয়তো বা এগুলো বেচে টাকা করতে উপদেশ দেবে।

থিয়েটারেও পরে যায় না সে। এমনিই তো জানে দক্ষিণাদার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে কিছু এড়ায় না। যা সত্য তিনি তা অনেক দিনই অনুমান করতে পেরেছেন। তবু এও জানে যে দক্ষিণাদা তার অনিষ্ট যাতে হয় তা করবেন না। কিন্তু বাকী যারা আছে, তারা কোন মতে ঘুণাক্ষরে আন্দাজ করলেও ছেড়ে দেবে না—জীবন দুর্বহ করে তুলবে। এবং—সবচেয়ে যেটা ভয়—মনিবের কানে উঠবে কথাটা।

তাই যতটা সম্ভব সেখানে সে পূর্বের দীন ভাবটা বজায় রেখেছিল।

কিন্তু সে আরও বিপদ। দুপুর বেলা দু তিন ঘণ্টা কোথায় কাটিয়ে আসে সাজগোজ করে রাত্রে বেরোবার সময় আবার সাজ পাল্টায়—এসবের কোন ভাল জবাবদিহি ইদানীং আর খুঁজে পাচ্ছিল না। চাকরির খোঁজে যেতে গেলে একটু ভাল সাজ-গোজ করে যাওয়া দরকার—এ কৈফিয়তটা ইদানীং বড়ই মামুলী ও অর্থহীন হয়ে পড়ছিল।

এই যখন অবস্থা—দু দিক নয়—তিন দিক সামলাতে গিয়ে যখন প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা—তখনই এই ঘটনাটা ঘটল।

হেম কিছুই জানে না। সেদিনও বেলা বারোটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে

খানিকটা কোম্পানির বাগানের বেঞ্চিতে কাটিয়ে, এদিক ওদিক ঘুরে দেড়টা নাগাদ কম্বুলেটোলায় পৌঁছেছে। এটা ওর যাকে বলে নিতান্তই অকারণ কষ্ট পাওয়া—স্বচ্ছন্দে একটু ঘুম দিয়ে বেলা একটাতেই বেরোতে পারে—কিন্তু বেলা এগারোটা বারোটা নাগাদ এমনই অধীর হয়ে ওঠে সে, যে বাড়ি থেকে না বেরিয়ে পড়তে পারলে যেন যন্ত্রণা বোধ হয়।

আজও সে আসন্ন-মিলন-স্বপ্নে বিভোর হয়ে—প্রতিটি পদক্ষেপ উপভোগ করতে করতে এবং পথের দু ধারের ঘড়ি দেখতে দেখতে এসেছিল। কী হবে, কী ঘটবে—তা সে জানে। যে কোন দিনের ঘটনা অল্পবিস্তর অন্য দিনের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। ছোট্ট করে কড়াটি নাড়লেই গিরিধারী এসে দোর খুলে দেবে। নলিনীর শেখানো আছে তাকে, তার জন্যে মোটা বকশিশ পায় সে—এই সময়টা সে কোথাও যায় না, দরজার চলনে বসে অপেক্ষা করে।… বাড়িতে ঢুকে ওপরে উঠতে উঠতে নলিনীর সঙ্গে দেখা হবে। সে হেসে বলবে, 'আজ আর একটু সকাল করে এলেও ক্ষেতি ছিল না, মা আজ বারোটা বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে গেছে!' তার পর—

তার পর তো স্বর্গ—বাস্তব ও কল্পনায় মেশা সুখস্বর্গ। এক দীর্ঘ সুখ-স্বপ্ন।

আজও সে যথাসময়ে এসে স্বর্গের দরজায় পৌঁছল। আজও গিরিধারী এসে দোর খুলে দিলে, আজও সিঁড়ির মাঝে দেখা মিলল নলিনীর।

নলিনী ওর কাঁধের ওপর থেকে নতুন কেনা জার্মানের শালটা তুলে নিতে বললে, 'ইস্, এই রোদ্দুরে এখানা কাঁধে করে এসেছ কী বলে! ছাড় দিকি—অঘ্রান মাস বলেই কি আলোয়ান গায়ে দিতে হবে—শীত না পড়লেও! দরদর করে ঘামছ যে!'

হেম সে কথার জবাব না দিয়ে একটা হাত ধরেই ঘরে গিয়ে পৌঁছল। জুতোটা নিজেই খুলে ঢুকল বটে, কিন্তু তার পর আর কিছু করতে হল না। জামাটা নলিনীই খুলে নিলে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে। হেম সুখে ও আলস্যে ঢালা বিছানাটার ধারে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে এলিয়ে পড়ল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই রণরঙ্গিণী মূর্তিতে ঘরে এসে ঢুকল কিরণ!

কিরণ পাড়া বেড়াতে বেরোলে বেলা চারটের আগে ফেরে না—নলিনী তাই নিশ্চিন্ত থাকে। আজকের সকালের ঝগড়াটা তাকে কেউ বলে নি—কিরণের কড়া শাসন ছিল। সুতরাং সতর্ক হবার সময় পায় নি।

'বলি হ্যাঁ লা ও শতেকক্ষোয়ারী, হায়া পিত্তি বলতে কি তোর কিছু নেই। রাজ্যেশ্বর জামাই আমার—তার জায়গায় তারই খেজমতের চাকরটাকে বসিয়েছিস! ছি ছি! কী পিরবিত্তি তোর! যদি একথা তার কানে যায়? বলে, পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেধের—বাতাসে কথা ভাসে। কখন কানে গিয়ে পৌঁছবে তার ঠিক আছে! শত্তুর তো চারিদিকে। যেখানে রাণীগিরি কচ্ছিস, সেইখানেই তো বাঁদীগিরি করতে হবে। আর থ্যাটারের চাকরিই কি থাকবে? পাট তো যা করিস অপর জায়গায় হলে পঁচিশ টাকার বেশী মাইনে দেবে না কেউ। অমন তারা দু পায়ে জড়ো করতে পারে, গণ্ডা গণ্ডা ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। না কি বাবুই আবার অমনি পাবি! লোকটার চোখে লেগেছে তাই। ও বাবু গেলে আর অমন জুটবে না মনে রাখিস। ঐ ক্ষীরির মত গোলাদার বাবু খুঁজতে হবে!'

প্রথমটা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল নলিনীর মন। বহু বার ঠোঁটের ডগায় এসেছিল কথাটা—'তোমার কি? আমি যা-খুশি তাই করব। আমার বাড়ি, আমি রোজগার করি।' কিন্তু সাহসে কুলোল না। মাকে সে চেনে। কেউ না লাগায় মা-ই গিয়ে লাগাবে। লেজে-পা-পড়া সাপের মত হিংস্র হয়ে উঠবে মা—এত বড় রোজগারটা বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনাতে ক্ষেপে উঠেছে, তার ওপর অপমান করলে সইবে না। আর বাবুর কানে উঠলে—। মা যা বলছে তা যে কত দূর মর্মান্তিক সত্য তা ওর চেয়ে কেউ জানে না।

পাংশু বিবর্ণ নতমুখে বসে বসে ঘামতে লাগল নলিনী, প্রতিবাদের একটি কথাও বলতে পারল না।

অবশ্য তার কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ আশঙ্কাও করে নি কিরণ. সে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই হেমকে নিয়ে পড়ল এবার।

'আর বলি বাছা তুমিই বা কি রকম, বেইমান নেমোখারাম হারামজাদা লোক। যার খাচ্ছ পরছ—তারই সব্বনাশ করছ। এ-ও যা, মনিবের ঘরে সিঁদ কাটাও তো তাই। এ তো দুমস্ত বাপের বুকে ছুরি মারা। আর সাহসই বা কী তোমার! কুকুর হয়ে—ঠাকুরের নৈবিদ্যিতে মুখ দিতে চাও! বামন হয়ে চাঁদে হাত। পথের ভিখিরীর রাজরাণীতে সাধ। কী বলব তুমি শুনলুম বামুনের ছেলে তাই—নইলে ঐ স্তেংখানার ঝাঁটা এনে গুণে গুণে সাত বার মারতুম তোমার মুখে!'

এই পর্যন্ত বলে—ঝাঁটা মারবার মত করেই হাতের ভঙ্গী করে বোধ করি বা একটু দম নেবার জন্যই থামল কিরণ।

হেম অভিভূত, বিহ্বল। ভয়ে তার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে—হাতে পায়ে কোন জোর নেই—ঠক ঠক করে কাঁপছে। কিছু বলা তো দূরে থাক ব্যাপারটাই যেন ভাল করে অধিগম্য হল না তার—সে শুধু কিরণের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

তার সেই বিহ্বল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে যেন আরও ক্ষেপে উঠল কিরণ, 'নাও নাও ওঠো—আর অমন ন্যাকাবোকা সেজে চেয়ে থাকতে হবে না। ঢের হয়েছে। বামুন বলেই পার পেলে—কিন্তু বেশী যদি নেই-আঁকড়েপনা কর তো রেয়াত করব না এই বলে দিলুম। গায়ে হাত দেবার আগে সরে পড়—যদি ভাল চাও তো! আর কখনও এ-মুখো হবার চেষ্টা করো না। কাল থেকে আমি দুপুর বেলা দোরে তালা দিয়ে রাখব। আর ভেবো না বাইরে কিছু করেও পার পাবে। থ্যাটারেও আমার চোখ থাকবে—মনে করো না যে সেখানে কেউ পাহারা দেবার নেই। যদি শুনি যে আবার এদিকে হাত বাড়িয়েছ তো তোমারই এক দিন কি আমারই এক দিন। কৈ এখনও উঠলে না, বসে আছ কি জন্যে? দারোয়ান ডাকতে হবে না গলাধাক্কা দেবার জন্যে—তোমাকে আমিই তাড়াতে পারব, এটি মনে রেখো!'

হেম ইচ্ছা করে বসে থাকে নি—বিহ্বল হয়েই ব[illegible] ছিল। এবার সে বিহ্বলতা কাটিয়ে ওকে উঠতেই হল। হাত কাঁ[illegible]ছ, পায়ে জোর নেই। তা হোক, আরও বেশী অপমান হওয়ার আগেই যেতে হবে—এটুকু এরই মধ্যে ওর মাথাতে গিয়েছিল! কোনমতে জামাটা হাতে করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আলোয়ানটার কথা মনে রইল না। সেটা এক টানে আলনা থেকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ওর গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে কিরণ।

নলিনী কিছুই বলতে পারলে না, ভয়ে অপমানে বেদনায় সেও পাথর হয়েই গিয়েছিল।

প্রতি ঘরে কৌতূহলী, কৌতুকোৎসুক জোড়া জোড়া চোখ তাকে লক্ষ্য করছে তা হেম জানে। এই কটা সিঁড়ি এবং সামান্য রকটুকু—তাও যেন ফুরোতে চায় না। এর চেয়ে এই মুহূর্তে যদি মরে যেত সে তো এর চেয়ে ভাল

হত। কত লোকের তো এ রকম আঘাতে হার্ট ফেল করে মৃত্যু হয় শুনেছে সে—তার হচ্ছে না কেন!

না। কিছুই হল না। কোনমতে স্খলিত পদে টলতে টলতে বাড়ির বাইরে আসতে হল তাকে। পিছনের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। সম্ভবত চিরকালের জন্যই। তার উদ্‌ভ্রান্ত বেশভূষা ও কালিপড়া মুখ দেখে মধ্যাহ্নের সেই জনবিরল গলির স্বল্প দু-চার জন পথিকও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিলে হেম। জামাটাও গায়ে গলিয়ে আলোয়ানখানা কাঁধে ফেলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতেই গলিটা পেরিয়ে এল। কিন্তু শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত পৌঁছে আর চলতে পারল না, অবসন্নভাবে একটা বাড়ির রকে বসে পড়ল সে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

অনেকক্ষণ বিহ্বল অবস্থায় বসে থেকে—এখানেও সে ক্রমশঃ বিস্ময় ও কৌতূহলের পাত্র হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে—হেম এক সময় উঠে পড়ল। বাড়ি ফিরতে হবে, পোশাক বদলাতে হবে। থিয়েটারে যাবার সময় হয়ে এল—আজ সন্ধ্যায় অভিনয় শুরু হবে। আগে 'ক্যাণ্ডল্ লাইট' বলে বিজ্ঞাপন করা হত—তখন সুবিধা ছিল, আধ ঘণ্টা দেরি হলেও অত কথা উঠত না। এখন আবার সময় দিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু থিয়েটারে আর যাওয়া কি উচিত হবে ওর ?

অবশ্য কথাটা কিছু এখনই বাবুর কানে পৌঁছবে না। নলিনীর মায়ের সে সাহস হবে না নিশ্চয়—কারণ তাতে মেয়েরই বেশী অনিষ্টের সম্ভাবনা।

কিন্তু—যদি অন্য কোন ভাবে লাগায় ?

যদি—যদি চোর বলে ?

এত দিনের থিয়েটার মহলের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক শিক্ষাই তার হয়েছে, অনেক কথাই কানে এসেছে। এই শ্রেণীর মেয়েমানুষের অসাধ্য কিছুই নেই—এটুকু সে বুঝেছে বেশ।

নলিনী ? নলিনীও হয়তো ঐ 'গোড়েই গোড়' ...বে।

এই তো সে চুপ করে মাথা হেঁট করে বসে রইল। কেন—তার বাড়ি তার ঘর,.একটা কথাও কি সে বলতে পারত না ? হলেই বা মা—মার মুখের ওপর কি কোন কথা বলে না সে ?

দারুণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে হেম। চলতে চলতেই থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

নলিনী ! নলিনীও তো ঐ দলেরই মেয়েছেলে। তার আর কত ভাল হবে !

উত্তেজনাটা কিন্তু স্থায়ী হয় না। নলিনীর কথাটা মনে পড়তেই তার চেহারাটাও মনে পড়ে যায়—আর তার ফলে জীবনে প্রথম নারীসঙ্গের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও মনে পড়ে গিয়ে মনটা কোমল হয়ে আসে। ওর দোষ দিলে চলবে কেন ? আসলে ভয়ের কারণ তো যথেষ্টই আছে। ভাতভিক্ষা শুধু নয়—প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, শক্তি সবই হারাতে হবে—জানাজানি হয়ে গেলে।

না। নলিনীর পক্ষে প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল না।

ভবিষ্যতেও করতে পারবে না।

রমণীবাবুর কোপবহ্নি থেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাও সম্ভব হবে না তার দ্বারা। সে চেষ্টা করতে গেলে হিতে বিপরীতই হবে।

তা হলে এখন কী করবে সে? যাবে—না যাবে না?

মূল প্রশ্নটা রয়েই যাচ্ছে যে!

টাকাও পাওনা রয়েছে অনেকগুলো। একেবারে না বলে ডুব মারলে আর কোন দিনই সে টাকা আদায় হবে না।

ভাবতে ভাবতে কোম্পানির বাগান পর্যন্ত এসে গিয়েছিল হেম। ভেতরে ঢুকে আবারও অবসন্নভাবে বসে পড়ল একটা বেঞ্চিতে।

আরও খানিকটা ভাবলে বসে বসে।

শুধু পয়সার আকর্ষণও নয়—আরও কিছু আছে। মনের মধ্যে অপ্রতিহত আশা আবার মাথা তোলে একটু একটু করে।

বেশ তো। চোখে তো দেখতেও পাবে অন্তত নলিনীকে এক বার।

তার পর? তার পর আবার কোথাও কোন রকম সুযোগ-সুবিধা হতে কতক্ষণ? সত্যিই কিছু কিরণবালার গোবরের চোখ নেই!

না—যাওয়াই যাক। দেখা যাক না। চাকরি ছাড়িয়ে দিলে মাইনে দিয়ে ছাড়াতে হবে। বদনাম আর কী দেবে? ওদের যা বাজার-হাট করে মাঝে মাঝে—তাই থেকে চুরি করেছে—এই বলবে বড় জোর। কিংবা বলবে যে 'অমুক জিনিসটা কিনতে টাকা দিয়েছিলুম ফেরত দেয় নি!' বলুক গে। তার জন্যে বড় জোর ওখানে আর পাঠাবে না। সে তো এমনিই আর যাবে না। তার আর ক্ষতি কি? আসল কর্মস্থলের বাইরে বেগার দিতে গিয়ে কিছু সরিয়েছে—এ অভিযোগে এখানে তার চাকরি মারতে পারবে না কেউ!

মনকে এমনি প্রবোধ দিয়ে নিজেকে খানিকটা চাঙ্গা করে তুলল হেম।

তার পর দ্রুত বাড়ির পথ ধরল।

অগ্রহায়ণের বেলা ম্লান হয়ে এসেছে, থিয়েটারে পৌঁছতে হবে এখনই!

বাড়িতে ঢুকতেই প্রথম দেখা হল গোবিন্দর বৌয়ের সঙ্গে। সে তখন সন্ধ্যা দিতে চলেছে। ভেতরের রকের যে ঘেরা জায়গাটায় ওদের রান্না হয়—তারই এক কোণে, নীচে-নামবার পইঠেটার পাশে একটা ভাঙা টবে ওদের

তুলসী গাছ থাকে। সেইখানেই প্রত্যহ সন্ধ্যে দেওয়া হয়! সেই উদ্দেশ্যেই ছোট্ট একটি পেতলের পিদিমে ঘিয়ের সন্ধ্যা-দীপ জেলে নিয়ে দেওয়ালে টাঙানো মা কালীর পটের সামনে প্রণাম করছিল সে। সামনে হেমকে দেখে অভ্যাস মত মুখ-টিপে হেসে প্রশ্ন করলে, 'কী ঠাকুরপো—এত দেরি? আজ ওখানে যেতে হবে না?'

'হবে বৈ কি। দেরি হয়ে গেল একটু - এমনি—' থেমে থেমে উত্তর দিলে হেম। কারণ কথা বলতে বলতেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সে। তার মনে হল বড় বৌদিকে আজ নতুন দেখলে সে। রাণী সুশ্রী, খুবই সুশ্রী—কিন্তু তার যে এত দীপ্তি তা যেন এর আগে কখনও এমন ভাবে চোখে পড়ে নি। সুন্দর করে পাতা কাটা, শিল্পীর-হাতে-আঁকা দুই ভুরুর মধ্যে ছোট্ট একটি টিপ, উজ্জ্বল দুটি চোখের ভক্তিতদ্গত দৃষ্টি—সবটা জড়িয়ে সেই গলায় আঁচল দেওয়া মুখখানিকে কম্পমান দীপশিখার আলোকে ফ্রেমে আঁটা ছবির মতই মনে হল। আর সে ছবি যেন টাটকা ফোটা কোন দেবভোগ্য ফুলের!

অন্যমনস্ক, তন্ময় হয়ে গিয়েছিল বোধ হয় কয়েকটি মুহূর্তের জন্য।

হঠাৎ চমক ভাঙল রাণীরই কথায়, 'তোমার কী হয়েছে বল তো ঠাকুরপো?'

চমকে উঠল হেম, 'কেন, কী আবার হবে?'

'মুখে যেন কে কালি মেড়ে দিয়েছে, চোখ লাল—কোথাও মার-টার খেয়ে এলে নাকি?'

'না—না। তোমার এক কথা!'

কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে অথচ কণ্ঠস্বরে অকারণ জোর দিয়ে উত্তরটা দিতে দিতে সেখান থেকে সরে পড়ল সে। সময়ও আর নেই মোটে। ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাবার তো যথেষ্টই কারণ রয়েছে।

মেয়েটা বড়ই জ্বালালে। ওর ঐ উজ্জ্বল চোখে যে কিসের কৌতুক, কতটা দেখতে পায় ও—আজ পর্যন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারল না হেম। আর সেই জন্যেই বড় অস্বস্তি বোধ হয়।

আরও এক জনের অস্বস্তিকর দৃষ্টি এড়ানো যায় না। দক্ষিণাদার তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞ চোখও বাইরের সব আবরণ ভেদ করে একেবারে যেন মর্মস্থলে পৌঁছয়।

প্রথমটা অবশ্য অবসর মেলে নি কথা কইবার। হেম গিয়ে পড়েছিল একেবারে সময়ে সময়ে। দু-চার জন লোক এর মধ্যেই এসে গেছে, সে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ভিড় শুরু হয়ে গেল। নিঃশ্বাস নেবার সময় নেই তখন। তবুও তার ভেতরেই অনুভব করলে হেম যে দক্ষিণাদার চোখটা তার মুখের ওপর পড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে রইল।

সেইটুকুতেই হেম ঘেমে উঠেছিল।

কিন্তু ভয়টা যে মিছে নয় সেটা বোঝা গেল ক মিনিট পরেই— ঐ ভিড়েরই মধ্যে এক ফাঁকে কানের কাছে চুপি চুপি বলে গেল দক্ষিণাদা, 'প্লে আরম্ভ হলে মিনিট কতক পরে বাইরে আসিস্ এক বার, কথা আছে।'

তবু দাঁড়িয়ে ছিল হেম স্থাণুর মতই। প্রথম দৃশ্য শেষ হয়ে গিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হয়ে গেল। দর্শকরা যা আসবার মোটামুটি এসেই গেছে, এর পর এলেও এক-আধ জন হয়তো আসতে পারে—তার জন্য হেমের না দাঁড়ালেও চলবে, পাশের গেটের কেউ কাজ চালিয়ে নেবে—এ সবই জানে সে। তবু যেতে পারে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকা গেল না, দক্ষিণাদা এসে জামার আস্তিনটা ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। একেবারে সোজা বেরিয়ে খাবার জলের বড় চৌকো ট্যাঙ্কটার পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে কি? ধরা পড়ে গেছিস বুঝি? ··কে ধরলে, খোদ বাবু না বুড়ী?'

এর পর আর গোপন করতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

হেমও সে চেষ্টা করলে না। মাথা হেঁট করে প্রায় সব ইতিহাসই খুলে বললে,—অবশ্য সংক্ষেপে।

'ইস! কত করে বললুম তোকে ইস্টুপিড যে গরীব বামুনের ছেলে এ সবে জড়াস নি, তা তো শুনলি না। তা এখন কি করবি?'

ভয়ে ভয়ে পালটা প্রশ্ন করে হেম, 'ও—ও কি বলবে বাবুকে কিছু? বলতে সাহস করবে?'

'মেয়ের দোষ তো দেবে না। দেবে তোরই দোষ—মেয়েও সতীসাধ্বী সেজে ঠিক পার পেয়ে যাবে। মরতে তুই-ই মরবি। এমন একটা কাণ্ড হবে—অপমানের চূড়োন্ত করে ছাড়বে। এসব বাবুরা ঘরের মাগের সতীত্ব ছেড়ে দিয়ে আসে চাকর-বেয়ারার জিম্মেয়, বাইরের মেয়ে-মানুষের সতীত্বর ওপর ওদের কড়া নজর। বুঝলি, কানে গেলে ক্ষেপে উঠবে একেবারে। আর যতই হোক্,—ওরা ধনী, ওরা মনিব—ওদের হাতে শতেক ব্যবস্থা।

না ভাই, তোর আমি দাদার মত, আর দাদাই তো বলিস্—আমি বলছি তুই চাকরি ছেড়ে চলে যা। আর কীই বা হচ্ছে, এ যা রোজগার কচ্ছিস, দেশে গিয়ে শাঁকে ফুঁ দিলে এর চেয়ে ঢের বেশী হবে!'

হেম মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। তার অন্তরের আশঙ্কারই প্রতিধ্বনি তোলেন দক্ষিণাদা, সুতরাং উত্তর দেবার মত কোন কথা খুঁজে পায় না।

কিন্তু তাই বলে সায়ও দিতে পারে না ঠিক।

সব আশার সত্যি সত্যি পরিসমাপ্তি করে দিয়ে, এই অত্যন্ত অসময়ে তার প্রথম প্রণয়ের সমাধি রচনা করে চিরকালের মত চলে যেতে হবে? সত্যি-সত্যিই পূর্ণচ্ছেদ টানতে হবে তাদের সম্পর্কে?

এ মানতে চায় না তার মন। কল্পনাতেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

কাছাকাছি থাকলে, সামনাসামনি থাকলে কত সুযোগ ঘটতে পারে। এই তো থিয়েটারের মধ্যেও কত মেয়ে কত কি করে—তা ছাড়া ওর মাও কোথাও যেতে পারে তীর্থ করতে—বাবু কাজে যান অনেক সময়, বাইরে বাইরে ঘোরেন—কখনও কি ওরা দু জনে এক সময়ে বাইরে যাবে না কোথাও। সে সব সুযোগের তো সদ্ব্যবহার করতে পারবে তারা! তরুণ মন হেমের—নিমেষে বহু স্বপ্ন রচনা করে এগিয়ে যায়। বয়স হয়েছে, মরতেও তো পারে নলিনীর মা! বাবুরও তো এ রক্ষিতায় অরুচি ধরতে পারে। তিনি অন্য কাউকে ধরতে পারেন তো! দূরে চলে যাওয়া মানে একেবারেই যাওয়া!

অভিভূতের মত হেম আবার ভেতরে এসে দাঁড়ায়।

এখনই প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্য শুরু হবে। এই দৃশ্যে নলিনী বেরোবে প্রথম।

এক বার চোখের দেখার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে হেম। অনেক আশার দেখা তাদের অসমাপ্ত থেকে গেছে অপরাহ্ণে। মনে হচ্ছে যেন কত কাল দেখে নি সে নলিনীকে। এখান থেকে দেখতে তো দোষ নেই—এই দূর থেকে। এমন তো আরও চার-পাঁচ শ জোড়া চোখ দেখছে তাকে। সেও না হয় দেখল তার সঙ্গে।

ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করে সে।

নলিনী আসে। অভিনয় করে সে অন্য দিনের মতই। সহজ স্বাভাবিক আচরণ। তার ভাব-ভঙ্গীতে মনে হয় না যে তার চিত্তে আলোড়ন জাগবার

কোন কারণ ঘটেছে। শুধু—প্রতিদিনই অভিনয় করতে করতে মাঝে মাঝে এদিকে তাকায়—এই গেট্‌টার দিকে। সে জানে হেম এই দুটো গেটের একটাতেই থাকে; তাকায় তাকে দেখবার জন্যই—সেইখানেই যেন তার চেষ্টাকৃত ঔদাসীন্য ধরা পড়ল।

আজ চাইল না। কিন্তু তাতে দুঃখ নেই হেমের। বরং এই না চাওয়াতেই একটা সান্ত্বনা বোধ করল সে। এদিকে—তার দিকে চাইলে কষ্ট হবে বলেই চাইছে না। এই তো তার প্রেমের, প্রীতির লক্ষণ।

এইটে ভাবতে ভাবতেই তার অন্তর একটা অবর্ণনীয় আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে। বরং বলা যেতে পারে অপরাহ্ণেরই অসমাপ্ত আবেগ। সে যেন আর স্থির থাকতে পারে না। তার পা দুটো ভেতরে ভেতরে কাঁপে একটু, সে কাঁপন ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ সারা দেহেই। এক বার ভাল করে ওকে দেখবার জন্য, সামনাসামনি কাছে থেকে দেখবার জন্য, এক বার ওকে স্পর্শ করবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে সে।

কোন মতে সে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যেকার বিরতিটা কাটায়। অন্যমনস্ক ভাবে—আচ্ছন্ন অভিভূতের মত। ভুল হয় বার বার। ধমক খায় কানাইয়ের কাছ থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হয়ে যেতে—আর স্থির থাকতে পারে না কোন মতেই। কে যেন অপ্রতিহত বলে ওকে ভেতর দিকে টানে। এই সময়েই সুবিধা তা হেম জানে—এর পরের দৃশ্যটা বেশ বড়, সে দৃশ্যে অনেক চরিত্রই স্টেজে আসে—ভেতরে ভিড় থাকে খুব কম। অথচ নলিনীর প্রথমে যা দু-চার লাইন পার্ট, তার পরেই সে ভেতরে চলে যাবে। সম্ভবত একাই থাকবে। শুধু চোখের দেখা নয়—মুখের কথারও সুবিধা মিলতে পারে।

হেম বাইরে বেরিয়ে এসে আগেই পানের দোকানটার দিকে এগিয়ে যায়। এক খিলি পান তাদের প্রাপ্য প্রতিদিন, যুধিষ্ঠির পানওলা হাসিমুখেই এটা দেয়। এখানে এলে কেউ সন্দেহ করবে না। পান নিতে নিতে এক বার চারদিক তাকিয়ে নেয় হেম,,সকলেই এ সময়টা ভেতরে, শুধু সত্য বাইরে আছে—তা সে-ও যেন কী একটা পড়ছে গেটের মাথার ক্ষীণ আলোতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সকলের অলক্ষ্যে যাবার এই পরম সুযোগ।

কোন মতে সত্যর কাছটা সন্তর্পণে পার হয়ে হেম ত্বরিত লঘুপদে স্টেজের দোর পেরিয়ে ভেতরে চলে যায়।

২০

সেই দৃশ্যটা আরম্ভ হয়ে গেছে। নলিনীই পার্ট বলছে এখন। এখনই ভেতরে আসবে। দুরু দুরু কম্পিত বুকে হেম স্টেজ থেকে বেরিয়ে নলিনীর নিজস্ব ঘরে যাবার সরু পথটায় দাঁড়িয়ে থাকে।

নলিনী আসছিলও এদিকে। মাথা হেঁট করে কী একটা ভাবতে ভাবতে আসছিল সে—হঠাৎ সামনে একটা ছায়া দেখেই বোধ করি মাথা তুলে চেয়ে দেখল। আধা আলো আধা অন্ধকার—তবু হেমকে চিনতে ভুল হবার কোন কারণ নেই, সে অস্ফুট এবং অব্যক্ত কী একটা শব্দ করে দু পা পিছিয়ে গেল এবং নিমেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে যে সীনটা সাজানো রয়েছে এখন, তার পিছন দিয়ে সোজা চলে গেল ওধারে—যেখানে বসে 'সখী'র দল গুলতানি করছিল।

হেমের মুখের ওপর কে যেন এক ঘা চাবুক মারল সজোরে। ঠিক তেমনিই লাগল তার, তেমনিই জ্বালা করতে লাগল মুখটা। বাবুর 'ঘরণী' হবার পর থেকে নলিনীর এখানে একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠা হয়েছে—নলিনীর নিজের ভাষাতে 'পোজিশেন'—সে ঐ ছুঁড়ীদের সঙ্গে কথা বলে কদাচিৎ; তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোটা তো সম্পূর্ণ অভাবনীয়, কল্পনাতীত। এপার থেকে ওধারের ক্ষীণ আলোতেও পরিষ্কার দেখা গেল—ওদের দল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়েছেও।

হেম আর দাঁড়াল না। দাঁড়াতে পারল না। প্রায়-অবশ পা-দুটোকে টেনে টেনে কোন মতে বাইরে এসে দাঁড়াল।

আর যা-ই হোক—নলিনীর কাছ থেকে এ ব্যবহার সে আশা করে নি। ভয়ের কারণ তার যথেষ্ট আছে তা হেমও জানে কিন্তু সত্যি-সত্যিই কিছু গোবরের চোখ নেই এখানে কিরণের, অন্ধকারে নির্জনে নিভৃতে দাঁড়িয়ে একটা কথা বললে সেটা তখনই কিছু তার কানে উঠত না।

একটা ক্ষমা ভিক্ষা করারও কি ছিল না তার? একটা সান্ত্বনার কথা বলাও কি উচিত ছিল না? হেম নিজে সেধে যায় নি—নলিনীর আগ্রহেই গেছে—না-হক যে অপমানটা হল আজ, সে অপমানের পুরো না হোক বেশির ভাগ দায়িত্বই নলিনীর। সে কথাটাও কি এক বার ভেবে দেখল না?

একটা অবোধ মূঢ় অভিমানে হেমের চোখে জল এসে গেল।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই সে মন স্থির করে ফেললে।

এখানে থেকে দিনের পর দিন এই মার সে খেতে পারবে না—এ জ্বালা তার সহ্য হবে না। এক দিনের এই আঘাতেই মনে হচ্ছে বুকের ভেতরটা

ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রতিদিন এই যন্ত্রণা—চোখের সামনে থাকবে, বার বার দেখা হবে, মনের সমস্ত আবেগ ও বাসনা উত্তাল হয়ে উঠে ওর কাছে ছুটে যেতে চাইবে—চাইবে ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে, ওকে একটু স্পর্শ করতে, অথচ পারবে না—এ যন্ত্রণা অসহ্য।

না, দক্ষিণাদাই তার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী। সে-ই ঠিক বলেছে।

হেম আর দাঁড়াল না। কারুর সঙ্গে দেখাও করলে না। সকলের অলক্ষ্যে একেবারে থিয়েটার থেকেই বেরিয়ে এল।

ঠিক এখনই বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। অসময়ে ফেরার জন্য অজস্র জবাবদিহি করতে হবে, এখনও সকলে জেগে—রাণীর তীক্ষ্ণ চোখের সকৌতুক চাহনিকে আরও বেশী ভয়। সে খানিকটা ইতস্তত করে কোম্পানির বাগানেই গিয়ে বসল।

কিন্তু এখানেও ভাল লাগল না। এখানে বসার সঙ্গে সহস্র স্মৃতি জড়ানো! নলিনীর বাড়ি যাওয়ার পথে সানন্দ প্রতীক্ষার স্মৃতি। সে যেন অস্থির হয়ে উঠে পড়ল আবার। পথে পথেই ঘুরল খানিকটা। তার পর, ওদের শুয়ে পড়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে আন্দাজ করে বাড়িই ফিরে এল এক সময়।...

তার পরের দিন খবরটা ভাঙলে বড় মাসীর কাছে, বললে, 'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলুম মাসীমা! আর ওখানে যাব না।'

'সে কীরে, কেন? কী ব্যাপার।'

'এমনিই তো মাইনে দিতে চায় না ব্যাটারা, খামচা খামচা করে দেয়—সব জুড়লে আমার অমন ছ মাসের মাইনে পাওনা বেরোবে। তার ওপর আবার মেজাজ। কাল একটু যেতে দেরি হয়েছিল বলে যাচ্ছেতাই করলে সকলের সামনে। আমিও—এই রইল তোমার চাকরি বলে চলে এলুম।'

'তার পর? এখন কী করবি?' খানিকটা যেন আড়ষ্ট হয়ে বসে থেকে বলে কমলা।

'এখন তো দিন কতক বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। তার পর আবার চাকরির জন্যে উঠে পড়ে লাগা যাবে। একটা যা হোক বাঁধাধরা ছিল বলে অত গা ও ছিল না, এখন যা পাব তাই নেব!'

নানারকম ঘাত-প্রতিঘাতের মানসিক বৈকল্যে হেমের এক বারও মনে পড়ল না যে সে কিছু দিন ধরে সারা দুপুর বিকেল টো-টো করে ঘুরছে চাকরির জন্যেই—অন্তত এই কথাই এদের কাছে বলেছে।

• • •

কমলা পর্যন্ত একটু বিস্মিত হয়ে তাকাল এই কথায়। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। এই থিয়েটারের চাকরিটা একটা অস্বস্তিরই কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইদানীং—কিছু না বুঝেও অস্বস্তি হত তার। গেল, ভালই হল। বেটাছেলে মোট বয়েও খেতে পারবে। আরও কিছু একটা ঘটেছে, যা বলছে তা সবটা সত্যি নয়—তা বুঝেও তাই আর সে কিছু জেরা করলে না।

সেই দিনই বিকেলে বাড়ি চলে গেল হেম। মাকে গিয়ে বললে, 'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলুম মা। জাতও যাবে, পেটও ভরবে না—রাত জেগে জেগে শরীর কালি হতে বসেছে, অথচ তোমাদের দুটো টাকাও দিতে পারি না এক এক মাসে—অমন চাকরিতে দরকার কি? আর যদি কিছু না জোটে শাঁকে ফুঁই দেব না হয়। কী বল?'

শ্যামা উদ্দেশে দু হাত তুলে মা সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে।

॥ ২ ॥

মহাশ্বেতা অনেক দিন ধরেই অভয়পদকে খোঁচাচ্ছিল হেমের চাকরির জন্যে—এবার উঠে পড়ে লাগল।

'বলি নিজের ভেয়েদের জন্যে তো বেশ টুকটুক করে চাকরি যোগাড় করতে পার—আমার ভায়ের বেলাই আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না—না? এতটা বয়স হল, কবে বা কী কাজকর্ম পাবে আর কবেই বা বে-থা করে সংসারী হবে!'

প্রথম প্রথম অভয়পদ তার স্বভাবমত চুপ করেই থাকত, ইদানীং—বোধ করি বা উত্ত্যক্ত হয়েই—দু-চারটে কথা বলে। বলে, 'আমার ভাইদের যখন চাকরিতে ঢুকিয়েছি তখন দিনকাল অন্যরকম ছিল। এখন একটা পাস নইলে কোথাও নিতে চায় না, আর নেবেই বা কেন—পাস করা ছেলেরাই কত গণ্ডা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাও এত বয়স হয়েছে—এই প্রথম চাকরির চেষ্টা করছে তা তো আর বলা যাবে না—এর আগে কোথায় কাজ করেছে জিজ্ঞাসা করবেই—তখন কী পরিচয়টা দেব? সেখানেও তো মুখ পুড়িয়ে রেখেছে।'

'সে ওর বরাত! নইলে এই যে—তোমরাই কি চুরিটা কম করলে!

লোকে বলে পুকুর চুরি করা, তুমি তো বলতে গেলে বড় বড় দীঘিই চুরি করে মেরে দিলে।…বরাত, নইলে সামান্য দুটো শিশি চুরি করেই বা ধরা পড়বে কেন—আর তোমরা গাড়ি গাড়ি মাল চুরি করে মেজ বোয়ের বুক-পোঁতা করে পার পেয়ে যাবে কেন! সে ছেড়ে দাও। বলি যে যেমন—তার তেমনিও তো জুটবে। বেটা ছেলে—তার একটা মুটেমজুরের কাজও কি জোটে না?'

মেজবৌয়ের বুক-পোঁতা করবার অভিযোগটা প্রায় নিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—কোন দিনই এর কোন জবাব দেয় না অভয়পদ। শেষ কথাটারই জের টেনে বলে, 'মুটে-মজুরের কাজ আবার যোগাড় করে দিতে হবে কেন, সে তো পড়েই আছে। বড়বাজারে গিয়ে দাঁড়ালেই মোট মেলে। আর আমরা হলে থিয়েটারে চাকরি নেওয়ার আগে সেই চেষ্টাই দেখতুম।'

বার বার একই ইঙ্গিতে মহাশ্বেতা ক্ষেপে যায়। এ খোঁচা ঘরে বাইরে খেতে হয় তাকে। স্বামীর মুখেও সেই একই খোঁচার অনুবৃত্তি সহ্য হয় না। সে চাপা গলাতেই যথাসাধ্য চেঁচায়, 'কেন থ্যাটারে চাকরি করে কি সে একেবারে বয়ে গেছে নাকি? কী করছে সে তাই শুনি? কটা রাঁড় রাখার কথা শুনেছ? নাকি কাপ্তেনি করে মোট মোট টাকা ওড়াচ্ছে!'

এর জবাবে অনেক কথাই বলা চলত। বলা চলত যে, কাপ্তেনি করার মত চাকরি সে করে না, গেটকীপারের চাকরিতে পেটে খেতেও জোটে না। বলা চলত যে পুরো মাইনে কোন মাসেই ঠিক মত আদায় হয় না বলে যে নাকে কাঁদে, তার পরনে দেশী ধুতি এবং জার্মানির শাল মানায় না। কত মাইনে পেয়েছে সে আজ পর্যন্ত, আর তার কতখানি সংসারে উসুল দিয়েছে—তার হিসাবও কেউ দেখে নি কোন দিন।

কিন্তু অভয়পদ কোন দিনই এসব কথা বলে না। বলার অভ্যাস নেই তার। কোন দিনই কারুর সঙ্গে সে দুটোর বেশী তিনটে কথা বলে না—বিশেষত বিনা প্রয়োজনে। তা ছাড়া এর পরে কী শুনতে হবে তাও সে জানে। আর শুনতে হয়ও। অভয়পদকে চুপ করে থাকতে দেখে মহাশ্বেতা আরও ক্ষেপে যায়। গলাটা আর একটু চাপবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে সে বলে, 'বলি থ্যাটার তো ভাল, সে তো তবু বাজারের মেয়েমানুষ নিয়ে ঢলাঢলি। সে ঢলাঢলি তো ঘরে তোলে নি সে!'

কথাটা বলেই সেখান থেকে সরে যায় মহাশ্বেতা। অনেক দিনের পরে এই

সাহসটা যে হয়েছে তার তাতেই সে একটু অবাক হয় মনে মনে। নিজেই নিজেকে বাহবা দেয় এক এক সময়। তবু এই খোঁচাটা দেবার পরও স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহসে কুলোয় না—কোথাও হয়তো একটা সহজাত ভদ্রতাবোধেও বাধে। সে লেখাপড়া শেখে নি কিন্তু সে দিদিমাকে দেখেছে, মাসীমাদের দেখেছে—এমন কি মাও তার আজ পর্যন্ত কতকগুলো ভদ্র চালচলন ছাড়তে পারে নি—তাও সে দেখেছে। মোটামুটি একটা সংস্কার তার আপনিই থেকে গেছে ভেতরে। সামনে থাকে না তাই কোন দিন লক্ষ্যও করে না—তার স্বামীর সুগৌর বর্ণ এত বড় আঘাতেও রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে কি না।

লক্ষ্য করলে অবাক হয়ে যেত।

অভয়পদর মুখে লজ্জা কি উম্মার কোন রক্তিমাভাই ফোটে না। প্রশান্ত মুখে হাতের কাজ করে যায়।

বাড়িতে থাকলেই—যতটুকু জেগে থাকে—টুকটাক মেরামতির কাজ করে যায় সে। যা পায় হাতের কাছে। বাইরের দিকে একটা করোগেট টিনের চালা মতও খাড়া করেছে এই জন্যে। নানা যন্ত্রপাতি থাকে সেখানে। এমন কি একটা ছোটখাটো হাপরও করে নিয়েছে, কেমন চাকা ঘোরালেই আগুনটা ধরে ওঠে—মহাশ্বেতা প্রথম প্রথম অবাক হয়ে চেয়ে দেখত। স্বামীর সঙ্গে কথা কইতে গেলে এখানে এসেই কইতে হয়—সেই হয়েছে আরও ঘেন্নার ব্যাপার। 'মুখপোড়া মিন্‌সে' সাতজন্মে যদি ঘরে ঢোকে। হয় আপিস, নয় এই হাপরখানা। রাত্তিরে শোবে তো সেই দালানে—একখানা কাঠের বেঞ্চিতে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—সমান ব্যবস্থা। শীতে দয়া করে একখানা কাঁথা গায়ে দেয়, এই বোধ হয় মহার বাবার ভাগ্যি। যুদ্ধের বাজারে হাতে দু পয়সা আসতে মেজকর্তা বাড়িতে ধুনুরী ডেকে জনা-জাত লেপ তৈরী করিয়ে দিয়েছে—মায় ছেলেপুলের সুদ্ধ। তৈরী হয়েছে ওর জন্যেও—কিন্তু এক দিনও কি গায়ে দিলে সে লেপ। এক দিনও না! সেবার পৌষ মাসে বর্ষা হয়ে হাড়-কাঁপানো শীত পড়েছিল—এক দিন রাত্রে শুয়ে মহাশ্বেতার মায়া হল—সে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে নিজে নিজেই লেপখানা এনে গায়ে চাপা দিয়ে দিলে। সকাল বেলা দেখে—মাগো, মনে হলে এখনও গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে ওর—সেখানা পাট করে কখন শাশুড়ীর দোরের সামনে রেখে এসেছে, নিজে সেই কাঁথামুড়ি দিয়েই শুয়ে আছে। ভাগ্যিস ভোরে ওঠে

মহাশ্বেতা—ও-ই আগে দেখেছিল, নইলে শাশুড়ী ঠিক লেপখানা বাজেয়াপ্ত করতেন—আর প্রথম সুযোগেই বড় মেয়ের বাড়ি চালান করে দিতেন। সেই থেকে নাক-কান মলেছে মহাশ্বেতা, ওকে আর কোন স্বাচ্ছন্দ্য দেবার চেষ্টা সে করে না। নষ্ট হোক দুষ্টু হোক—মেজবৌ কথাগুলো বলে ঠিক ঠিক। বলে, 'ভোগ করারও বরাত থাকা চাই, বুঝলি দিদি! বট্‌ঠাকুর গত জন্মে কি প্রাণে ধরে কাউকে কিছু দিয়ে এসেছিল যে এ জন্মে ভোগ করবে! ওরা কষ্ট করতেই জন্মেছে। গেল জন্মের পাপের সাজা!'

ঘরের ঢলাঢলি নিয়ে অভয়পদকে ইঙ্গিত করার সাহসটাও এক দিনে হয় নি মহাশ্বেতার। মেজবৌয়ের অনেক বাড়াবাড়ি সহ্য করতে হয়েছে তাকে। অনেক সাহস। কতকগুলো জিনিস যে সম্ভব তা-ই জানা ছিল না মহাশ্বেতার। প্রথমটা চোখে দেখেও বিশ্বাস হত না। ভয় হত প্রমীলার জন্যই। এতটা সহ্য করবে না কেউ, এতটা ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহস। মাথার ওপর ধর্ম তো আছেন। ভগবান এর সাজা দেবেনই ওকে।

কিন্তু দিনের পর দিন যায়। মাসের পর মাস। ভগবানও যেমন প্রকাশ্যে কোন সাজা দেন না, তেমনি গুরুজনরাও না। কানাকানি গা-টেপাটেপি করেন অনেকেই—তবু মুখ ফুটে প্রমীলার মুখের ওপর কিছু বলতে পারেন না। এমনই দাপট তার যে সামনে এসে দাঁড়ালেই যেন সবাই কেঁচোটি হয়ে যান। আসলে ওর ক্ষুরধার রসনাকেই সবাই ভয় করে—মুখে তো আটকায় না কিছু!

বলতে যিনি পারতেন—যাঁর বলার অধিকার সর্বাগ্রে—তিনিই যে কিছু বলেন না। ক্ষীরোদা যেন বুড়ো হয়ে আরও ভীতু, আরও জবুথবু হয়ে গেছেন। বেশী ভয় তাঁর মেজছেলে আর মেজবৌকেই। আহা, দেখলেও দুঃখ হয় মহাশ্বেতার—ইদানীং কাউকে কিছু দেবার ইচ্ছে হলে কি খেতে ইচ্ছে হলে আড়ালে অভয়পদকে বলেন, এদিক ওদিক দেখে—কেউ কাছে না থাকলে। অথচ ভয় যে কাকে তা বোঝে না মহাশ্বেতা। বড় ছেলে আর বৌ যখন মান্য করে তোমাকে তখন এত ভয় কেন? তাও—এই তো সেবার, মুখ ফুটে বলেছিলেন মেজছেলেকে অনন্ত চতুর্দশীর ব্রতর কথা—তা কৈ অম্বিকাপদ তো দ্বিরুক্তি করে নি। ব্রত উদ্‌যাপনে বারোটি বামুন খাওয়াবার কথা—রীতিমত বাড়িতে ভিয়েন করে দেড় শ লোক খাইয়ে দিল। তবে?

এই তবেটাই বুঝতে পারে না। আড়ালে গজগজ করে শুধু।

তাও প্রমীলার যে খুব দোষ তাও তো দিতে পারে না মহাশ্বেতা। সেই যা ফুলশয্যার রাত্রে 'ধাষ্টামো' করেছিল—খুবই 'গর্হিত্ কাজ' সন্দেহ নেই (মহাশ্বেতার যা দু একটি সংস্কৃত সাধুশব্দ জানা আছে এই গর্হিত শব্দটি তার মধ্যে অন্যতম, যদিচ উচ্চারণ করার সময় সে অকারণে একটা হসন্ত দেয়)—তবু তার পরে সে আর ছোটকর্তাদের ধারে কাছে যায় নি ! বরং ছোট বৌকে নিজে ভাল করে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছোটকর্তার ঘরে পাঠিয়ে দিত। দোষ ষোল আনা দুর্গাপদরই—এটা মহাশ্বেতা স্বীকার করতে বাধ্য। বিয়ের আট দিন কোনমতে শুয়েছিল ছোট বৌয়ের সঙ্গে, তার পর বৌ বাপের বাড়ি যেতে গোনা দুটো কি তিনটে দিন শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল কিন্তু প্রথম দিন ছাড়া রাত্রে থাকে নি এক দিনও। তার পরে দ্বিরাগমনের পরই কী হল—ছেলে কিছুতে বৌয়ের কাছে শোবে না। আবার বলে কিনা 'অত কালো আমার ঘেন্না করে!' সেই যে ছেলেবেলায় দাদা পড়ত কথামালা না কিসের গল্পে আছে—মন্দ লোকের ছুতোর অভাব হয় না—এ-ও তাই! আসলে ওর মনে আছে অন্য কথা—মন পড়ে আছে অন্যখানে !

তা যাক। বেটাছেলে একটু এদিক-ওদিক চন্‌মন করেই—বয়সকালে নানারকমই করে থাকে কিন্তু তাই বলে ঘরের বৌকে কে এমন ত্যাগ করে? 'কত রকম কল্লাই জানে ছোটকর্তা!' মনে মনে গজরায় মহা, 'ওসব কল্লা! আমি বেশ বলতে পারি, ও মাগীর সঙ্গে ষড় আছে দস্তুরমত।'

বাস্তবিক অসৈরণ হবারই কথা।

রোজ রাত্রে শোওয়া নিয়ে এক কেলেঙ্কারি ' বাবু ঘরে শোবেন না বৌয়ের কাছে। বৌ শুতে যাবার আগেই ছেঁড়া মাদুর আর বালিশ নিয়ে ছাদে দৌড়বেন। মেঘ বৃষ্টি হল তো রান্নাঘরের দাওয়ায়। এক দিন মেজবৌ মাদুর লুকিয়ে রেখেছিল সবগুলো—সে বাবুর তেজ কত—বিছানা থেকে চাদর তুলে নিয়ে গিয়ে পেতে শুয়েছিলেন ছাদে।

তা তো নয়—আসলে ওটা মেজবৌকে সুযোগ দেওয়া।

মেজবৌ অমনি সেই রাত্তিরে ছুটবে ছাদে—কী সমাচার না, 'বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে পাঠাতে যাচ্ছি।'

তার পর দুপুর রাত পর্যন্ত ছাদে চলবে—মহাশ্বেতার ভাষায়—'দুপুরে মাতন।' কী যে ওদের এত কথা তা সে বোঝে না—শুধু হা-হা হি-হি হাসি আর ফিস্‌ফিস গল্প। যে শাসন করতে যাচ্ছে তার এত হাসি মস্করা

কিসের? আর রোজ রোজ এত বুঝোবারই বা আছে কি? এ কী কচি খোকা? একই তো কথা—রোজ নতুন করে সেটা আওড়ালেই কি নতুন কথা হয়? এক-আধ দিন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আড়িও পেতেছিল মহাশ্বেতা—তা শুনবে কি, নিজেরই এমন বুক ঢিপঢিপ করে যে তার আওয়াজে কিছু শোনাই যায় না। শুধু ফিস্‌ফিস আওয়াজ আর মধ্যে মধ্যে ঐ হাসি। তাই কি ছাই নিশ্চিন্দি হয়ে দাঁড়াবার উপায় আছে। হতভাগা ছেলে মেয়েরা ঠিক সময় বুঝে তখনই উঠবে, কাকে মোতাও, কাকে দাঁড়াতে চল বাগানে—এইসব।

রোজ এই ঘটনা। দুপুরে মাতন শেষ করে দু জনে নামবে। মেজগিন্নী চাপা হাসির লহর টেনে শুতে যাবে, ছোট কর্তা গিয়ে সুড় সুড় করে সেঁধোবে নিজের ঘরে। তবু কিন্তু আধিক্যেতার সেইখানেই শেষ নয়—কত ঢং যে জানে ছোঁড়া! ঘরে ঢুকবে, মোদ্দা বিছানায় শোবে না—ঢালা বিছানা করে দিয়েছে মেজকর্তা রীতিমত গদিবালিশ দিয়ে—সেখানে শোবে বৌ—উনি শোবেন মেঝেতে মাদুর পেতে কিংবা অমনি। প্রথম প্রথম ছোট বৌও শুতে আসত মাটিতে, সে বাবুর প্রচণ্ড ধমক—'যাও, ওপরে গিয়ে শোও বলছি! নইলে আমি আবার বেরিয়ে যাব।'

ছোট বৌ তরলার এইতেই বেশী আপত্তি।

আহা চোখের জল শুকোয় না বেচারার—একটি দিনের জন্যও।

হোক কালো রং, চেহারাটা ওর মহাশ্বেতার কোন দিনই পছন্দ হয় নি এটাও ঠিক—তবু মেয়েটা যে খুব ভাল তা যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছে সে। ভারি লাজুক আর শান্ত। গতরও তেমনি। ভোরে উঠে সেই যে গাধার মত খাটতে শুরু করে—রাত এগারোটার আগে এক দণ্ড বিশ্রাম নেয় না। সকলকার মুখে মুখে ছিষ্টি যোগান দিচ্ছে। ঐ ছোট কর্তারই কি কম ফৈজত! বাবুর আবার এদান্তে এক নোংরা নেশা হয়েছে নস্যি নেওয়া—নিত্যি এক রাশ ময়লা রুমাল কাচতে দিয়ে যাবে। মায় জুতোয় কালি দেওয়া পর্যন্ত শিখেছে ছোট বৌ। বলে ভাত দেবার ভাতার নয়—নাক কাটবার গোসাঁই! কেন রে বাবু, তাকে যদি তোর পছন্দ নয়, যদি নিবিই না ঘরে—তো অত ফরমাশ করিস কোন্ লজ্জায়? ঘেন্না করে না পরের মেয়েকে অমনি করে শুধু ঝিয়ের মত খাটাতে!

ছোট বৌও তেমনি, মুখ বুজে সব করবে। একটা কথাও শোনাতে পারে

না। হত মেজ বৌয়ের মত মেয়ে তো দেখিয়ে দিত মজা। এ মেয়ে খালি কাঁদতে জানে আর খাটতে জানে। দুপুর বেলা অবধি শোয় না একটু। সব চুকল তো শাশুড়ীর পা টিপতে বসল, নয়তো এসে মহাশ্বেতার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়ল। এমন কি কোলেরটার নোংরা ব্যাপারগুলো পর্যন্ত সে-ই উদ্ধার করে।

তরলার কাছে এ অবহেলাটা বড় প্রশ্ন নয়, তার কাছে সব চেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে অপমানটাই। চুপ করেই কাঁদে—কিন্তু এক-আধ দিন, বোধ হয় মুখ না খুলে পারে না বলেই ওর কাছে দুঃখ করে, 'দিদি, সে-ই মেঝেতে শোয়, আমি তো মেনেই নিয়েছি—তবে শুধু শুধু আদ্ধেক রাত পর্যন্ত এ কেলেঙ্কারি কেন। পাড়াসুদ্ধ লোক জানাজানি, ঢিঢিক্কার! কী লাভ হয় এতে বলতে পারেন? সবাই রোজ জানছে এক বার করে যে বৌটাকে ওর বর নেয় না। নিতে চায় না—ঘেন্না করে!'

আর একটা বড় ক্ষোভ ওর—মেজ বৌয়ের ঐ অভিনয়টা। প্রত্যহ সন্ধ্যের সময় সাজাতে আসাটা। সত্যি বড় ভাল মেয়ে তরলা তাই, নইলে মহাশ্বেতা হলেও বোধ হয় এক চড় কষিয়ে দিত কোন দিন। জানিস তো তুই এ সাজের দিকে দুর্গাপদ কোনদিন ফিরেও তাকাবে না, তবে শুধু শুধু এ মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন! জোর করে ধরে সাজানোও চাই অথচ অর্ধেক রাত পর্যন্ত নিত্যি তার বরকে আগলে রাখাও চাই।

ছি! ছি! ঘেন্নায় মহাশ্বেতার গলা পর্যন্ত তেতো হয়ে ওঠে যেন। তাই এক-এক দিন নিজের স্বামীকে অন্তত না শুনিয়ে পারে না। কিন্তু শোনালেই বা কি—এরা কি মানুষ! যেমন ইনি তেমনি মেজবাবু। 'এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার!'—অন্ধকারে ঘরে শুয়ে শুয়ে অথবা নির্জন পুকুরঘাটে বসে আপনমনেই হাত-পা নেড়ে বলে মহাশ্বেতা, 'এরা কি মানুষ! কেউ মানুষ নয়। মানুষের রক্ত গায়ে থাকলে—পুরুষ-বাচ্চা হলে এ কেলেঙ্কার কিছুতে সহ্য করত না।'

•

স্ত্রীকে যা-ই বলুক, সত্যিই কিছু হাল ছেড়ে বসে ছিল না অভয়পদ। ভেতরে ভেতরে খোঁজখবর নিচ্ছিল নানা দিকেই। অবশেষে একটা খবর নিয়েও এল এক দিন, কিন্তু ওর প্রস্তাব শুনে হেম অবাক হয়ে গেল। বক্তব্যটার মর্মোদ্ধার করতেই বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল তার।

সকালবেলা বড় ভাগ্নে এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল। হেম যেন বাড়ি থাকে, সন্ধ্যাবেলা অভয়পদ আসবে। অবশ্য খবর দেওয়ার খুব দরকার ছিল না, কারণ এবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসবার পর থেকে, বিশেষ কাজ না থাকলে হেম কোথাও যায় না। শুধু অনেক ফল জমলে কি কলার কাঁদিতে রং ধরলে শ্যামা জোর করে পাঠায় কলকাতাতে--তা না হলে সে বাড়িতেই বসে থাকে —বাগানের তদ্‌বির-তদারক করে।

দরকার না থাক, খবরটা পাওয়া অবধি হেম একটু আগ্রহের সঙ্গেই অপেক্ষা করছিল তখনও। এ খবরের সঙ্গে নিজের চাকরির কোন যোগাযোগ কল্পনা করে নি—তবে অকারণে লোক পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে বলবার লোক নয় অভয়পদ এটা সে জানে। তাই কৌতূহলের শেষ ছিল না তার—হয়তো একটু দুশ্চিন্তাও ছিল। কোন বিপদের খবর নয় তো? তরুর বিয়ের খবরও হতে পারে কিন্তু তার জন্যে তো মা রয়েছে—তার কাছে কেন?

অবশ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সেদিন কোন্ সাহেবের রিটায়ার-মেণ্ট উপলক্ষে একটু আগেই ছুটি হয়েছিল—সুতরাং চারটে বাজবার আগেই মল্লিকদের বাঁশঝাড়ের আড়ালে সেই বিবর্ণ হয়ে যাওয়া অদ্বিতীয় ছাতাটির উদয় হল।

ছাতাটি পেতে দাওয়াতে বসে বিনা ভূমিকাতেই একেবারে কাজের কথা পাড়ল অভয়পদ। হরিনাথের ভাই শিবু দাদার অফিসে ঢুকেছে—লিলুয়ার কারখানায় চাকরি করে। ওখানকার এক সেকশনের বড় বাবুর মেয়েকে বিয়ে করে ইতিমধ্যেই সে এস্টাব্লিশমেণ্টে চলে গেছে। তাকে ধরলে এখনই কাজ হতে পারে একটা।

কথাটা শুনে প্রথম কিছুক্ষণ মুখে কথা যোগাল না হেমের। শিবুর কাছে যাবে সে চাকরির জন্যে! শিবু!

অনেকক্ষণ পরে যখন কথা বলতে পারল তখন ঐ প্রশ্নটাই বেরোল, 'শিবুর কাছে যাব চাকরির জন্যে! এত কাণ্ডের পরে? কী বলছেন!'

'কেন, তাতে অসুবিধেটা কি?' স্থির অবিচলিত মুখেই পাল্‌টা প্রশ্ন করে অভয়, 'তোমরা তাদের তো ক্ষতি কর নি কিছু, বরং উপকারই করেছ। তোমরা নিয়ে না এলে ভাজ-ভাইঝিকে পুষতেই হত তাদের—যা হোক করে ভাইঝিটার বিয়েও দিতে হত। মুখে যত যাই বলুক—পাড়াঘরে মুখ দেখাতে পারত না নইলে। তা ছাড়া—ধর এখানে এনেও বোনকে দিয়ে তোমরা

নালিশ-মোকদ্দমা করাতে পারতে—অত বড় শক্ত অসুখের ভেতর সই করিয়ে নিয়েছে দলিলে—সেটা আদালতে কতখানি টিকত তা বলা কঠিন। তোমরা তো কিছুই কর নি—ঝগড়াঝাঁটি মামলা-মকদ্দমা। তবে আর তোমাদের লজ্জাটা কি বাপু?'

যুক্তি অকাট্য। কিন্তু এভাবে ভেবে দেখে নি কোন দিন হেম। ভাবতে অভ্যস্ত নয়। সে বিমূঢ়ের মত বসে রইল অভয়পদর মুখের দিকে চেয়ে।

তখন শ্যামাকে ডেকেও কথাটা বলল অভয়।

শ্যামাও প্রথমটা প্রবল আপত্তি করে উঠেছিল, 'না না। ঐ ছোটলোকদের কাছে যাবে মাথা হেঁট করে চাকরির জন্যে! ছিঃ! তার চেয়ে ও চিরকাল শাঁকে ফুঁ দিয়ে খায় সে-ও ভাল।'

'দেখুন, সে আপনাদের যা অভিরুচি। তবে চাকরির জন্যে, টাকার জন্যে মানুষ অনেকখানিই নিচু হয়। আপনারা একটু আশ্রয়ের জন্যে তো কম অপমান হন নি সরকারদের কাছে। অথচ এখন তো তাদের সঙ্গে দিব্যি সদ্ভাব। যাওয়া-আসা সবই আছে। তা ছাড়া দেখুন ছোটলোকমি তারাই করেছিল—আপনারা তো করেন নি।·· আর শাঁকে ফুঁ—সে ওখানে থাকলে যাও বা হত—এখানে আপনারা নতুন এসেছেন, এখানে আপনার ছেলেকে যজমানি দেবে কে? আপনাদের নামই হয়ে গেছে নতুন বামুন। পুরনো পুরুতও আছে। এই তো এত দিন ঘরে এসে বসে রয়েছে, ক পয়সা আনতে পারল?···যাই হোক, ভেবে দেখুন আপনারা!'

বলতে বলতে একেবারে উঠে দাঁড়াল অভয়পদ।

মা-ছেলে দু জনেই হাঁ-হাঁ করে উঠল। হেম হাত ধরে টেনে বসাল, শ্যামা ছুটে গেল ঘরে জলখাবার আনতে। জামাই অফিসের ফেরত আসবে খবর পেয়ে সে গুড় দিয়েই চন্দ্রপুলি করে রেখেছিল, আর ক্ষুদ-ভাজার নাড়ু। তার সঙ্গে দুটো পাকা কলা কেটে জামাইয়ের সামনে সাজিয়ে দিলে।

অগত্যা অভয়পদকে বসতে হল।

আবারও কথাটা উঠল।

প্রথম প্রথম যতটা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা—ক্রমশ আর ততটা অসম্ভব রইল না। প্রথম মাথা ঠাণ্ডা হল শ্যামারই। রেলের চাকরি পাকা চাকরি। না হয় শত্রু হাসবে একটু প্রথম প্রথম। ভাল চাকরি আজকাল অত সোজা নয়। চাকরি পাবার সময় একটু মাথা হেঁট করতেই

হয়। তার পর অত বড় অফিসে কে কোথায় থাকবে। কে-ই বা মনে রাখবে কথাটা!

'কিন্তু গেলেই কি করে দেবে? মিছিমিছি সেই মুখ পুড়িয়ে যাওয়া ছোটলোকদের কাছে!' তবু একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে শ্যামা।

'তা বোধ হয় দেবে। শিবু ঠিক ওর মায়ের মত নয়। পথে যখনই দেখা হয়—আসা-যাওয়ার সময়—ভাইঝির খবর নেয়, আপনাদের কথাও জিজ্ঞাসা করে। তা ছাড়া হাজার হোক ছেলেমানুষ—বাহাদুরি দেখাবার লোভও তো একটা আছে!···বরং এক কাজ করা যেতে পারে। শনিবার হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা হতে পারে। কোন্ ট্রেনে ফেরে তা আমি জানি। কথায় কথায় চাকরির কথাটা পেড়ে দেখা যেতে পারে। তেমন বুঝলে তখন বাড়ি যাওয়া যাবে।'

তার পর একেবারে ছাতা হাতে করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তা হলে শনিবার একটার সময় ইণ্টার ক্লাস ওয়েটিং রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থেকো।'

হয়তো আর একটু আলোচনা করতে পারলে খুশী হত এরা—এক বার ব্যাকুল ভাবে কী একটা বলতেও গেল শ্যামা, কিন্তু অনাবশ্যক বোধেই সে চেষ্টা আর করল না। জামাইকে এত দিনে ভাল করেই চিনেছে। অকারণ আলোচনা সে করে না। আর তার হিসেবে কথাও সে অনেক বলেছে, বৃথা এখন আর একটি কথাও কইতে রাজী হবে না।

॥ ৩ ॥

শিবুর ক্ষমতা বা সদিচ্ছা সম্বন্ধে অভয়পদ যতই যা বলুক না কেন—শ্যামার বেশ খানিকটা সন্দেহ ছিল। যারা নিজের বংশের বৌ আর মেয়ের সঙ্গে অমন শত্রুতা করতে পারে, মতলব এঁটে যথাসর্বস্বে বঞ্চিত করতে পারে—তাদের যে কোন রকম মনুষ্যত্ব আর অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না ওর। শুধু-শুধুই শত্রু হাসাতে যাওয়া হয়তো। শত্রু হাসানোও বড় কথা নয়—যাদের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না ইহজীবনে—তাদেরই দোরে গিয়ে 'কালামুখ নীলে করে' দাঁড়ানো—এর চেয়ে সত্যিই যেন গলায় দড়ি দেওয়াও ভাল। নিতান্ত নাকি ছেলের নামে একটা কালি থেকে গেছে, তাও পাস-করা ছেলে নয়—বয়সেরও গাছপাথর নেই—এই ভেবেই বিদ্রোহী মনকে শান্ত করে শ্যামা।

এখনও যদি চাকরিতে না ঢোকে তো কবে কি হবে? এমনিতেই তো সরকাররা যখন-তখন বলে—'ওর আর চাকরির বয়স নেই বামুনদি, মিথ্যে ও চেষ্টা করো না। বরং কোন দোকানে খাতা লেখার কাজ-টাজ দেখ গে, হাতের লেখাটা ভাল—হয়ে যেতে পারে। তবে তাও যে পাবে বলে মনে হয় না, যা চোর-বদ্‌নাম রটে গেছে।'

এই সব কথা মনে পড়েই চুপ করে যায় শ্যামা।

কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় অভয়পদর হিসাবে কিছুমাত্র ভুল হয় নি। শিবু সম্বন্ধে ওর অনুমান অভ্রান্ত। সত্যিই সে অসাধ্য সাধন করলে। মাস দেড়েকের চেষ্টাতেই অফিসে বসিয়ে দিলে সে। কেরানীরই চাকরি—কারখানা বলে লোহা-পেটানোর কাজ নয়, যদিও তখন যা হেমের মানসিক অবস্থা, লোহা-পেটানোতেও খুব আপত্তি ছিল না। মাইনেটা অবশ্য যৎসামান্য—মাসে আঠারো টাকার মত—তবে এ মাইনে বেশীদিন থাকবে না, শিবু বার বার বেশ জোর দিয়েই সে ভরসা দিয়েছে। কোনমতে খাতায় নামটা এক বার ওঠা নিয়ে কথা, তার পর একটু ভাল জায়গায় সরিয়ে দিতে কতক্ষণ!

সে যা হোক, মাইনে নিয়ে শ্যামা মাথা ঘামায় না—চাকরি একটা হয়েছে এইতেই সে খুশী। রেলের চাকরি—লোককে বলতে কইতে, বিয়ের বাজারে ছেলের দাম উঠে গেল।

কিন্তু ছেলের বিয়ের কথা এখন ভাবলে চলবে না তা শ্যামা জানে। ছেলের বয়স যতই হোক—বেটাছেলের বিয়ের বয়স পার হয় না কখনও—মেয়েকে নিয়েই এখন তার বড় সমস্যা। তরুকে আর কোনমতেই রাখা যায় না ঘরে। যা হোক করে এবার পার করতে হবে। পাড়াঘরের লোক এখানকার ভাল তাই—অন্য জায়গা হলে হয়তো একটা দুর্নাম তুলে দিয়েই বসে থাকত।

শ্যামা অবশ্য ঠিক ছেলের চাকরির জন্যে বসে ছিল না। টাকা, এই বলতে গেলে বিনা আয়ে সংসার চালিয়েও, কিছু জমেছে তার। উমার কাছে যে ফল পাঠায়—কিছুদিন ধরেই তার দাম নিচ্ছে না সে। বলে দিয়েছে, 'তোর কাছেই রেখে দে, যা হোক ভিক্ষে-দুঃখু করেও চালাব আমি ঠিক—এইটেই আমার ভরসা রইল। একেবারে শুধু হাতে কিছু মেয়ের বিয়ে হবে না আর সবটাই জামাইয়ের ওপর ভরসা করা ঠিক নয়।"

জামাই টাকা দেবে তা সে জানে। এবার নিতেও তার খুব সংকোচ নেই—কারণ সে এমনি নেবে না, ধারই নেবে। ধার শোধ-করতেও পারবে এ বিশ্বাস তার এখন হয়েছে। এর ভেতর সে রোজগারের আর একটা উপায় বার করে ফেলেছে। এখানে চার আনা আট আনা এক টাকা—ধার করবার লোক ঢের। থালা বাটি ঘটি বাঁধা রেখে ধার নেয়, টাকা মারা যাবার ভয় নেই, অথচ সুদ পাওয়া যায় ভাল। চার আনা আট আনায় এক পয়সা সুদ। এক টাকা হলেই দু পয়সা।

প্রথম প্রথম শ্যামা ফিরিয়েই দিত। সে এক যন্ত্রণা। নতুন বামুনদি এক রাশ নগদ টাকা দিয়ে বাড়ি কিনেছে অথচ তার হাতে চার আনা আট আনা পয়সা নেই—এ কেউ বিশ্বাস করে না। আর 'নেই' বলতে— এবং সেটা বিশ্বাস করাবার জন্যে যতখানি জোর দিয়ে বলতে হয়, ততটা জোর দিয়ে বলতে নিজেরও সংকোচে বাধে। মাথাটা বড় বেশী হেঁট হয়ে যায় যেন। তবু তাও করতে হয়েছে বাধ্য হয়েই, কিন্তু তার পরই বুদ্ধিটা খুলে গেল। জামাই এক গাদা টাকা ধার দিয়ে রেখেছে—অম্বিকাপদর নাম করে দিলেও টাকাটা যে ওরই তা জানে—সুতরাং তার কাছে চাওয়া যায় না আর। অথচ আয়ের এমন পথটাও ছেড়ে দিতে মন সরে না। ছেলের রোজগার নেই, সরকার-বাড়ির বাঁধা-বরাদ্দ বন্ধ—তার ওপর খরচ বেড়ে গেছে আগের চেয়ে। জামাইয়ের দেনা শোধ করতে হবে, সে তাগাদা না দিক, নিজের চক্ষুলজ্জা আছে। আগে আগে সে মনে করত যে চার আনা আট আনা পয়সা ধার করতে আসে অমনিই—চার আনার আবার সুদ কি? দৈবাৎ এক দিন সুদের হারটা শুনে আর স্থির থাকতে পারলে না। মহাশ্বেতাকে ডেকে পাঠিয়ে কাকুতি-মিনতি করে তার কাছ থেকে কুড়িটা টাকা চেয়ে নিলে—ধার হিসেবেই। যুদ্ধের বাজারে যখন অভয়পদর পকেট বোঝাই থাকত তখন মহাশ্বেতা টাকাটা সিকেটা সরিয়ে হাতে দু-চার টাকা করেছে তা শ্যামা জানে। ধার বলে চাইতে মহাশ্বেতাও ইতস্তত করে নি। তবে টাকাটা নিয়ে শ্যামা কি করবে তা মহাশ্বেতাও জানতে চায় নি—শ্যামাও বলে নি। ইচ্ছে করেই বলে নি। ওর এই অবস্থায় টাকা ধার নিয়ে তেজারতি কারবার করতে চায়—কথাটা অত্যন্ত হাস্যকর এবং অবিশ্বাস্য। তা ছাড়া এই টাকা খাটিয়ে রোজগার করবে সে—শুনলে মহাশ্বেতাও সে-রোজগারের ভাগ চাইবে অর্থাৎ সুদ চাইবে। এমনি কথাটা মহাশ্বেতার মাথাতে যাবে না, সেদিক

দিয়ে শ্যামা নিশ্চিন্ত। যার এক পয়সা আয় নেই—এতগুলি পেট খেতে—সে সুদে খাটাবার জন্যে টাকা চাইছে—এ মহাশ্বেতা কেন, কারুর মাথাতেই যাবে না।

সেই কুড়ি টাকা মূলধন খাটিয়ে ইতিমধ্যে অনেক ক-টা টাকাই করেছে শ্যামা। দুটো থলে বোঝাই হয়ে গেছে বন্ধকী বাসনে। চার আনা ধার দিলে মাসে এক পয়সা সুদ—অর্থাৎ টাকায় এক আনা। কিন্তু গোটা টাকা নিলে দু পয়সার বেশী পাওয়া যাবে না। শ্যামা তাই চেষ্টা করত চার আনা হিসেবে ধার দিতেই। আট আনা চাইতে এলে চার আনা দিত। আবার চার আনা দিত হয়তো পরের দিন—আলাদা একটা বাটি কি একটা হাতা রেখে। এ দুটো মিলিয়ে আট আনার হিসেব ধরা হত না—আলাদা আলাদা ঋণ হিসেবে পৃথক সুদ ধরে নিত। তাতে টাকা পিছু এক আনাই দাঁড়ায় মাসে।

এই সুদের প্রায় সবটাই জমে। খুব প্রয়োজন না হলে—অর্থাৎ একেবারে হাঁড়িচড়া বন্ধ না হলে এ থেকে খরচা করে না সে। তার ফলে এক দিন হিসেব করে দেখেছিল যে মোট এখন তার দেড় শর ওপর খাটছে এই কারবারে। বাসন বাঁধা রেখে কারবারের সুবিধা এই—বেশীদিন টাকা পড়ে থাকে না। পুরো মাস রাখে না প্রায় কেউই। দরকারের জিনিস, চার আনা আজ নিলে—কাল হয়তো জন-খেটে হোক কি কারুর বাগানে কাজ করে হোক মজুরি পেলেই সতেরোটি পয়সা শোধ দিয়ে গেল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের ধার করতে আসে মেয়েরা—তাদের হাতের জিনিসে টান বেশী—তারা পুরুষের অসুবিধা থাকলেও জোর করে আদায় করে আনে ধারের পয়সা। এক বার সীতার শাশুড়ী একটা পাইজোর রেখে পাঁচ টাকা নিয়ে গিয়েছিল টাকায় তিন পয়সা সুদ কবুল করে—আর এ মুখো হয় নি। সুদে আসলে জিনিসের দাম ছাপিয়ে গেছে কিন্তু ঠিক বেচে-কিনে নিতে সাহসে কুলোয় নি শ্যামার—কে জানে এর পর এসে যদি দাঙ্গাহাঙ্গামা করে! সেই থেকে নাকে কানে মলেছে সে—পুরো এক টাকার বেশী ধার কাউকে দেয় না, বেশী চাইতে এলে চোখ কপালে তুলে বলে, 'তিন টাকা! ওমা অত টাকা কোথা পাব বাছা! তোমরা তো বেশ লোক, দেখছ গামছা-কানি পরে থাকি, সারা দিন পাতা কুড়িয়ে নারকোলপাতা চেঁচে পেট চালাই—তার কাছে এসেছ তিন টাকা ধার চাইতে। মল্লিক-গিন্নীর কাছে যাও!' 'নয়তো বলে, 'চৌধুরীদের বড় বৌ থাকতে এখানে কেন এসেছ বাছা?'

চার আনা করে ধার দিলে সাত দিনে উসুল হয়; তাতে—হিসেব করে দেখেছে শ্যামা—গড়পড়তা এক টাকা খাটলে মাসে অন্তত পাঁচ পয়সা আয় হয়ই। তার মানে তিনটে টাকা খাটালে এক মাসে চার আনা—সে চার আনা আবার মাসে সওয়া পয়সা দিতে থাকে। বেশী লোভে কাজ নেই তার।

টাকার জন্য কৃচ্ছ্র তা বড় কম করছে না সে। আরও করতে পারত যদি ঐন্দ্রিলাটা একটু বুঝদার হত। ওর বড় লোকের হাত হয়ে গেছে। ছেলেবেলা দিদিমার সংসারে ছিল, তার পর গিয়ে পড়ল ঘোষালদের ঘরে। সেখানে ফেলাছড়ার মত অবস্থা না হোক—প্রাচুর্য ছিল। ফলে রান্না করতে দিলেই বিপদ—কিছুতে হাত-টেনে চলতে পারে না। পরিষ্কার মুখের ওপর বলে দেয়, 'ওসব ডেয়ো-ডোকলার রান্না কখনও শিখি নি, এখন আর শিখতে পারবও না। রাঁধতে হয় তুমি রাঁধ।

রাঁধতে পারে শ্যামা—তার জন্য কিছু নয়। এত দিনের দারিদ্র্যই তাকে হাতে ধরে শিখিয়েছে, আদৌ তেল না দিয়ে বা মশলা না দিয়ে কেমন করে রাঁধতে হয়। কিন্তু সে যদি ঐ নিয়ে থাকে তো এদিক করে কে? পাতা কুড়নো, পাতা চাঁচা, বাগানের তদ্‌বির করা, সুদ কষা, তেজারতি, পাইকেরদের সঙ্গে নারকোলসুপুরি নিয়ে দরকষাকষি, টাকা আদায়—এক কথায় পুরুষের কাজ। তা ছাড়া বিনা বাজারে রান্না তার, সকাল থেকে সুষুনি কলমি শাক তুলতে ডুমুর পাড়তে কি কাঁচকলা গুনে দেখে কাটতেই এক প্রহর বেলা কেটে যায়। সে ছাড়া এগুলো যে আর কেউ পারবে না। তরুকে আসতে দিতে চায় না, হয়তো রং ময়লা হয়ে যাবে রোদে পুড়ে মাটি ঘেঁটে। আইবুড়ো মেয়ে, চেহারা দেখিয়ে পার করতে হবে। হেম বাইরে থাকে, আর এক-আধ দিনের জন্যে এলেও এসব উঞ্ছবৃত্তি তার দ্বারা হয় না। বড় জোর বাগানের মাটিটা কুপিয়ে দিলে কি কলাঝাড়ের এঁটে মারলে। এই কাজগুলোই তার জন্য রেখে দেয় শ্যামা।

তা ছাড়া শ্যামা দেখেছে—কাজ নিয়ে থাকলে তবু ঐন্দ্রিলা এক রকম থাকে, বসে থাকলে অহরহ ঝগড়া। দিনরাত কাকচিল বসতে দেয় না একেবারে। তার সবচেয়ে বেশী রাগ যেন তরুর ওপর—কথায় কথায় শাপ-শাপান্ত করে। 'দেখব দেখব, তোর তেজই বা কদ্দিন থাকে। তেজ ভাঙবে, আমার মত হাত হবে, সর্বস্ব খুইয়ে তুইও পথে বসবি!' তরু শান্ত স্বভাবের

মেয়ে—সে এই অকারণ বিদ্বেষ ও অহেতুক আক্রমণের কোন জবাবই দিতে পারে না, শুধু চোখের জল ফেলে। শ্যামা দু-এক বার শাসন করতে যে যায় নি তা নয়, কিন্তু তাতে লাভের মধ্যে শুধু গালাগালিটা তরুর ওপর থেকে ওর ওপরই এসে পড়েছে। এমন অকথা-কুক[illegible]ল গালাগাল দেয় যে শুনলে কানে আঙুল না দিয়ে পারা যায় না। মে[illegible]নিয়ে হয়েছে ওর সাপের ছুঁচো ধরা, ফেলাও যায় না গেলাও যায় না।

সুতরাং রাঁধতেই দিতে হয়। আর তা নিয়ে অশান্তির শেষ নেই। এক পয়সা করে তেল কিনতে পারলে হয় বটে—কিন্তু কে নিত্য দোকানে যায়? কান্তি নেই, পরের ছেলেটা সাত বছরের হয়ে মারা গেছে—এমন কেউ নেই যে বাজার-হাট করে। শেষে অনেক খেচাখেচির পর ঐন্দ্রিলাই এক ফন্দি বার করেছে, বলেছে, 'তুমি বাবা তেলের শিশিতে দাগ কেটে দিও ওষুধের দোকানের মত। পাঁচ ছটাক তেল তো আসে—যদি আট দিন চালানোই মতলব হয় তো আটটা দাগ কেটে দিও—কি দশটা। যা পারি যেমন করে পারি আমি ঐ দাগেই চালাব!'

মেয়ের মেজাজ ভাল থাকলে শ্যামা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, 'তেল মোটে আগে দিবি নি। যেটুকু তেল দিবি তাতে আনাজ কষাও হবে না, মিছিমিছি তেলটা মাটি। আগে নুন বাটনা দিয়ে সেদ্ধ করে নিবি—পরে সুদ্ধ্ একটু ফোড়ন চোঁয়ানোর মত তেল ঢেলে সাঁতলাবি। তাতে গন্ধটা তো হবে—তাতেই ব্যান্নন উতরে যাবে দেখবি। বলি তেলের তো কোন স্বাদ নেই—শুধু গন্ধ। যত শেষে দিবি তত গ[illegible] ঠিক থাকবে। বুঝলি না? তবে লঙ্কাফোড়ন দিস্ নি কখনও—যেটুকু তেল তা হলে ঐ লঙ্কাতেই শুষে নেবে।'

মেয়ে হাত-পা নেড়ে বলে, 'মাইরি মা, তুমি একটা পয়সা বাঁচাবার ইস্কুল খোল। বিস্তর মেয়ে পাবে বলে দিচ্ছি। চার গণ্ডা করে মাইনে নিলেও তোমার পয়সা খায় কে! মেয়েরা না আসুক, পুরুষরা জোর করে ভর্তি করে দিয়ে যাবে।'

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে শ্যামা বলে, 'তা তো পারি খুলতে! অনেকেরই সুসার হয় তাতে, বুঝলি! বেশির ভাগই তো দেখি ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোচ্ছে না—অথচ বাইরের ঠাট বজায় দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত। কেন বাবা, যেমন আয় তেমনি ব্যয় কর না—তাতে অশান্তি হয় না কিছু।

তা তো নয়, ফোতো নবাবিটুকু চাই ষোল আনা। বিশেষ দেখি মাগীদেরই নবাবি বেশী। আমি কম তেলে রাঁধতে পারি না—আমি আতেলা তরকারি মুখে দিতে পারি না—স্থর টেনে টেনে আদিখ্যেতার কথা শুনলে বেম্ভাণ্ড জ্বলে যায় আমার। টাকা তো রোজগার করতে হয় না—কী কষ্টে আসে তা তোরা কি বুঝবি!'

॥ ৪ ॥

শেষ পর্যন্ত মঙ্গলার সেই সম্বন্ধই নিতে হয়। এদিকে ভাল ছেলে, কি এক বিলিতী সওদাগরী আপিসে কাজ করে, মাইনে চল্লিশ টাকা—উপরিতে দুনো পুষিয়ে যায়। একটা পাসের পড়া পর্যন্ত পড়েছিল, পাসটা দিতে পারে নি। মা-বাপ নেই, আছে বুড়ী ঠাকুমা। বুড়ী বাপের বাড়ির দরুন বিস্তর জমিজমা পেয়েছিল, সে সবই আছে। হয়তো তা ছাড়াও নগদ টাকা কিছু আছে। বুড়ীর আদরেই পাস দিতে পারে নি। ঘুড়ি উড়িয়ে ডাংগুলি খেলে কাটিয়েছে। তা হোক্—মাথা আছে। কথাবার্তা পরিষ্কার। পাত্র সব দিক দিয়েই ভাল। একমাত্র দোষ ঐ সতীনের। তা সে এমন কিছু নয়—বুড়ী লেখাপড়া করিয়ে সব দিক দিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছে। সে বৌ আর তার বাবা দু জনেই সে নাদাবি নামায় সই করে দিয়েছে—জমিটা পেয়ে তারা সব স্বত্ব ছেড়ে দিচ্ছে! তা ছাড়া এই তো মোটে তেইশ বছর বয়স—'তা এ বয়সে তো কত লোকের পেরথম পক্ষই হয় না, এই তো ধর না কেন তোরই ছেলে, দেখতে দেখতে ষেটের কম বয়সটি কী হল! এর পর ওর কনেই পাবি না। তখন মিছে করে বলতে হবে দোজবরে, নইলে লোকে ভাববে ছেলের কোন দোষ ছিল, তা না হলে অ্যাদ্দিন বে হয় নি কেন?'

বলেন আর অন্ধকার মুখগহ্বর বিস্তার করে হাসেন হা-হা করে।

শ্যামা এবার মন স্থির করে। কিন্তু তাও, এ সৌভাগ্যও যেন তার বিশ্বাস হয় না। বলে, 'এ কী আর আমার বরাতে হবে মা, কতটি হেঁকে বসবে তার ঠিক কি!'

'তুই রেখে বোস দিকি! সতীনের ওপর আবার খাঁই কি! খাঁই করলে চলবে কেন। হাজার হোক এক বার দাগ তো পড়ে গেছে। দোজবরে এমন ফুটফুটে মেয়ে পাচ্ছে এই কত না।; সে আমি বলে দিয়েছি বুড়ীকে

মুখের ওপর। ওলো বামনী কে জানিস, আমার পিসতুতো নন্দাই চুকড়ি দত্ত, সে হল বুড়ীর প্রেজা। ওদের বাড়িতে আসে পেরায়। সেইখানেই দেখা আমার সঙ্গে। কথায় কথায় কথা উঠল, বুড়ী বলে আমার হারানের জন্যে একটা ভাল মেয়ে দেখে দাও মা। আগে মনে পড়ে নি, বলেছিলুম কায়েতের ঘর হলে দু কুড়ি দশ গণ্ডা মেয়ে এনে দিতে পারতুম—এ যে বামুনের ঘরের মেয়ে চাইছ মা।...তার পরই মনে পড়ে গেল। সোন্দর মেয়ে শুনে বুড়ী বলেছে আমার এক পয়সা চাই নি। মেয়ে পছন্দ হলে দেনাপাওনার কথাই তুলব না। যা দেবে তাই নেব। তা তোর এখন থেকে অত ভাবনা কি, মেয়ে দেখা না আগে!'

শ্যামা একটু আশ্বস্ত হয়। মেয়ে ঐন্দ্রিলার মত রূপসী নয় ঠিকই—নাক-চোখ-মুখ খুব একটা সাকারাও নয়—তবে আর পাঁচটা মেয়ের তুলনায় ভালই দেখতে। তা ছাড়া গৌর বর্ণ টা আছে। সেখানেও হয়তো ঐন্দ্রিলার চেয়ে কিছু নিরেস—কিন্তু তবু ফরসাই যে তাতে সন্দেহ নেই। আর সবদোষ হরে গোরা।

'তাই তা হলে দেখাও মা। কবে কী হবে—আমি খবর পাব কী করে?'

'খবর তোকে নিতে হবে না। আমি বুড়ীকে বলে দিয়েছি—সামনের রবিবার খোদ নাতিকে সঙ্গে করে যাবে তোদের বাড়ি। নাতি ঢুকবে না, ওখানে ঐ চৌধুরীপাড়াতেই ওর কে ফেরেণ্ড আছে, তার বাড়ি গে বসে থাকবে। বুড়ী যাবে। কেমন ঠিক করি নি?'

নিজের বুদ্ধির তারিফে নিজেই হেসে ওঠেন আবার হা-হা করে।

তার পর বলেন, 'ভালয় ভালয় বে হয়ে গেলে ঘটকী-বিদেয় দিবি তো? দ্যাখ্—ভাল ঘটকী-বিদেয় কবুল না করলে ভাংচি দেব।'

'তোমার নাতনীর বিয়ে—ঘটকী-বিদেয় আবার কি! নুন-ভাত যা জোটে খেয়ে এসো এক পেট।'

'তবেই হয়েছে।' পিঁটকী খন খন করে ওঠে। ওর এই বয়সেই দাঁত পড়তে শুরু হয়েছে, কথা জড়িয়ে যায়। তাই গলায় জোর দিয়ে কথা বলা অভ্যাস হয়ে গেছে। বলে, 'মা কি কোথাও খায় নাকি? খাওয়া-দাওয়া তো ছেড়ে দিয়েছে। এখন তো মার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নোংরা। দেখছ না উঠোনের মাঝখানে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ কাপড় এখনও ভিজে, সদ্য গা ধুয়ে আসছে ঘাট্ থেকে। ঐ যে নতুন এক ঘর পিরিলী বামুন

এসেছে এখানে, ওদের বৌ সেদিন দশটা টাকা ধার নিয়েছিল একটা নাকছাবি রেখে, মা গা ধুয়ে আসছে, সেই টাকা শোধ দিয়ে গেল। তা গেল তো গেল—সে তো আর অত শত জানে না—টাকাটা দিয়ে গেল হাতে হাতে ঠেকিয়ে—ব্যস্, আর রক্ষে আছে—এখন আবার পুকুরে যাবে, গলা অবধি ওলাবে, নোটখানা ধোবে—তবে ঘরে ঢুকবে।'

'নোট ধোবে কি!' প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে শ্যামা। দশ-দশটা টাকা—যদি নষ্ট হয়ে যায়। টাকা—তা সে যারই হোক—নষ্ট হচ্ছে শুনলে বুকে বাজে বৈকি!

'তবে না তো কি! ধোবে তার পর উন্নুনপাড়ে রেখে শুকোবে, তবে বাক্সয় তুলবে।'

'তুই থাম দিকি! হাটিপাটি পেড়ে সব কথা সবাইকে না শোনালে চলে না—না? বলে আহাম্মুক নম্বর চার—ঘরের কথা করে বার!'

মঙ্গলা রেগে গজগজ করতে করতে ঘাটের দিকে চলে যান।

শ্যামা বলে, 'তা ভিজে কাপড়ে ছুঁয়েছে তাতেও দোষ?'

'নিশ্চয়ই, কাপড়ের জলটা তো ওর ছোঁওয়া হয়ে গেল! পুষ্করণীতে দোষ নেই—পিত্তিথ্রে করা বলে। কাপড়ে বয়ে আনলে দোষ জন্মায় বৈকি!'

পিঁটকী ম্লান হাসে। কারণ এটা তাদের পক্ষে—বিশেষ করে তার পক্ষে আর কৌতুকের কথা নয়। এর ধাক্কা বেশির ভাগ তাকেই পোয়াতে হয়।

পাত্রপক্ষ তরুবালাকে দেখে পছন্দ করে গেলেন। পাত্রের ঠাকুমা ভারি খুশী—তখনই আশীর্বাদ করে যেতে চান। অতি কষ্টে নিবৃত্ত করে শ্যামা, ভাল দিন দেখে পাকা-দেখাটা করা দরকার। সিদ্ধেশ্বরীতলায় পাঁজি দেখিয়ে না এলে সে আশীর্বাদ করতে দেবে না।

হারানের ঠাকুমা বললেন, 'সে যা হয় করো মা, কিন্তু সামনের তিন মাস বে নেই—যা করতে হবে এই মাসে। আমার এই ধর চার কুড়ি বছর বয়স হতে চলল, শরীরেরও এই অবস্থা—কবে বলতে কবে টেঁসে যাব, তখন ছেলেটা একটু ভাত-জলের পিত্যিশী হয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াবে—তা হতে দোব না। মেয়ে আরও দু-একটা দেখে রেখেছি—অবিশ্যি পছন্দের মেয়ে নয় সে সব—তবে নাপাথ্যিমানে তাদেরই কাউকে নিতে হবে, অগত্যে। এই সাফ্ সাফ্ বলে দিলুম!'

এ মাস অর্থাৎ আর কুড়ি দিন বাকী। শ্যামার মুখ শুকিয়ে যায়।

কিছু দিতে হবে না—বুড়ী গিন্নী বলে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলে দিয়েছেন যে 'দানসামিগ্‌গিরী নমস্কারী যেন খারাপ না হয়। আমাদেরও তো পাঁচটা কুটুম্বসাক্ষেৎ আসবে, তাদের সামনে ব্যাভ্রম না হই। নগদ টাকাটা কেউ সিন্দুক খুলে দেখতে আসবে না, কিন্তু এসব সামনে থাকবে! লোকে না ভাবে এর নাতির বে হচ্ছিল না বলে কোনমতে হাভাতের ঘরের মেয়ে এনেছে!'

শ্যামা তখনই ছোটে সিদ্ধেশ্বরীতলায় দিন দেখাতে। এ মাসের শেষ বিয়ের দিন পড়ছে আর ঠিক বারো দিনের মাথায়। মাথায় হাত দিয়ে বসবার কথা, কিন্তু মাথায় হাত কেন, মেঝেতে মাথা কুটলেও বিয়ে হবে না তা সে জানে। বুড়ী তিন মাস অপেক্ষা করবে না—তা তার গলার আওয়াজেই বুঝেছে সে, তা ছাড়া তিন মাস অনেক সময়, শ্যামাও সে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। যদি আরও ভাল মেয়ে পেয়ে যায় ওরা—অথবা মাঝারি মেয়ের সঙ্গে টাকার পাওনাটা ভাল হয়—তা হলে কি আর তখন ওর মেয়ে নেবে?

অথচ বারো দিন। কী করেই বা কি হয়।

সেই রাত্রে হেমকে পাঠায় শ্যামা বড় জামাইয়ের কাছে। এক দেনা শোধ হয় নি, আবার দেনার প্রস্তাব পাঠানো—কথাটা মুখে উচ্চারণ করতেই লজ্জায় মাথা কাটা যায়—অথচ ওরই বা কে আছে ঐ অধম-তারণ জামাইটি ছাড়া।

অভয়পদর কোমরে একটা ব্যথা ধরেছে সে আসতে পারলে না, কিন্তু হেমের মুখে সব শুনে বলে দিলে, 'মাকে ও সম্বন্ধ হাতছাড়া করতে বারণ কর। যা হোক করে হয়েই যাবে। ও ছেলেকে আমি জানি—প্রথম বয়সে বড় বকে গিয়েছিল, কিন্তু এখন মন দিয়ে চাকরি-বাকরি করে শুনেছি, থিয়েটারের শখ খুব—তা নিজের বাড়িতেই ক্লাব বসিয়েছে, বাইরে কোথাও যায় না। নানা ঝঞ্চাটে ওর কথাটা এত দিন মনে পড়ে নি। তা ছাড়া—শুনেছি কী সব ফাঁড়া-টাড়া ছিল। অবিশ্যি যদি সে সব কেটে গিয়ে থাকে তো আর আপত্তি কি!'

শ্যামা পরের দিন ভোরবেলাই ছুটল কলকাতাতে। উমা নতুন বাড়িতে চলে আসার পর এক বার মাত্র এসেছিল সে—গোবিন্দকে সঙ্গে করে। বাড়ি ঠিক মনে নেই—তবু আগে দিদির বাড়ি গেল না ইচ্ছে করেই। দিদির কাছে

কান্নাকাটি করে মোটা কিছু আদায় করতে হবে, উমার কাছে জমা টাকা আদায় করতে যাচ্ছে শুনলে দিদির হাত গুটিয়ে আসবে।

উমা শুনে আনন্দ প্রকাশ করলে। নিজে থেকেই বললে, থান দুই নমস্কারী সে দেবে। ওর ছাত্রীরা পূজোয় কাপড় দেয় কেউ কেউ—তা থেকে ভাল শাড়ি দুখানা তুলে রেখেছে সে তরুর বিয়ের কথা ভেবেই।

উমার তখন রান্না চড়েছে। এখানে এসে রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা করে না—বাড়ি ফিরতেই রাত আটটা-নটা হয়ে যায়, তখন উনুন ধরিয়ে রাঁধতে বসা পোষায় না। তা ছাড়া ঘুঁটে-কয়লা খরচের কথাও ভাবতে হয়। প্রথম প্রথম রুটি করে রাখত, কিন্তু সকাল দশটার রুটি রাত দশটায় এসে চিবোতে রীতিমত কষ্ট হয়। এখন অনেকখানি করে সাবু করে রাখে। রাত্রে এসে দুধসাবু খায়। দুধসাবু—তার সঙ্গে ঘরে নারকেল নাড়ু করা থাকলে তাই দুটো—নইলে বাজার থেকে সস্তার মিষ্টি নারকোল ছাপা বা তিলকুটো কিনে আনে—তাই। শীতকাল হলে একটু তরকারিও রেখে দেয়।

শ্যামা যখন এল তখন উমার সাবু আর একটা তরকারি নেমেছে—ভাত চড়াতে যাচ্ছে। ওকে দেখে একেবারে চালেডালে চড়িয়ে দিলে। ঘরে অন্য জল-খাবার ছিল না কিছু, অগত্যা দুধসাবুই এক বাটি ধরে দিলে ওকে—তার সঙ্গে দুটো তিলকুটো। তার পর নিজের তোরঙ্গ খুলে (মার দরুন তোরঙ্গ এটা—তার ভেতরই শ্যামা লক্ষ্য করে, এখনও কেমন মজবুত আছে, সেকালের জিনিস, ওর দাম কত! উমিটা কত-কীই পেলে!) কাপড়ের তলা থেকে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা টাকা-পয়সা বার করে ওর সামনে দিয়ে বললে, 'ত্যাখ দিকি গুনে কত আছে। আমার গোনা-গাঁথা নেই। যেদিন যা পাই এনে ঐতেই রেখে দিই। হিসেবনিকেশ গোনাগাঁথার সময়ই বা কৈ, করেই বা কে।'

পুঁটুলির আকৃতিটা দেখেই শ্যামা যেন অনেকখানি দমে যায়। ওর যে অনেক আশা এর ওপর। সে ব্যগ্র কম্পিত হাতে পুঁটুলিটা খুলে গুনতে বসে। টাকা নোট, খুচরো—এক গাদা। কিন্তু তবু অভ্যস্ত চোখ বুঝতে পারে এর মোট মূল্যের পরিমাণ ওর আন্দাজের চেয়ে অনেক কম।

বার বার তিন বার গোনে শ্যামা, ছিয়াশি টাকা সাত আনা।

'ঐ কী রে! আর?' ভগ্ন স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে। যেন আর্তনাদের মত শোনায় প্রশ্নটা।

'আর কোথা পাব। তোমার যা ফলবেচা টাকা সব ঐতেই আছে।'

'সে কি। এ কী সব্বনেশে কথা রে! আমার যে ঢের বেশী পাবার কথা, আমি যে এর ওপর ভরসা করে বসে আছি!'

'পাবার কথা!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে উমার কণ্ঠস্বর, 'পাবার কথা তার মানে কি! কত পাবার কথা তুমি জানলে কী করে? এর কি কোন লেখাপড়া হিসেবনিকেশ আছে!'

'ঠিক হিসেবনিকেশ নেই—তবু একটা আন্দাজ তো আছে। এত দিন নিই নি—এই কটি টাকা হবে কী করে। তুই অন্য কোথাও রাখিস নি তো? মনে করে ছাখ এক বার বরং। ভুলে—কি এমনি—হাত-আন্দাজের অভাবে?'

মিনতির মত শোনায় শ্যামার গলা। কিন্তু তবু তার ভেতরেই যেন একটা অন্য ধরনের সন্দেহও কোথায় উঁকি মারে।

আর সেইটে লক্ষ্য করেই নিমেষে জ্বলে ওঠে উমা, 'বলছি এই সব হিসেব-নিকেশের ভয়েই তোমার ফল-বেচা টাকা আমি কোথাও রাখি না—যত কাজই থাক, বাড়ি ফিরে আলাদা করে রেখে দিই, কাপড় কেচে এসে শত কাজ ফেলে, এমন কি ইষ্টমন্ত্র জপ করবারও আগে তোমার টাকা তুলে রেখে দিই। আর কোথাও থাকে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তা ছাড়া এই টাকাটাই কি সোজা—পনেরো-কুড়ি দিন অন্তর অন্তর তো হেম দিয়ে যায় চার-পাঁচটা পেঁপে সাত-আটটা নারকোল—তাতে এত হবেই বা কী করে। কী এমন ন শ পঞ্চাশ টাকা দামের জিনিস ওসব।'

'চার-পাঁচটা পেঁপে আট-দশটা নারকোল ঠিকই—কিন্তু সেই কী সাধারণ জিনিস। তা ছাড়া ছড়া কলাও তো পাঠিয়েছি, ভাল কালীবৌ কলা আমার। যেমন মোটা তেমনি বড়, মোলাম কলা। একোটা-কলা এক পয়সা আমার ওখানে বসে বিক্রি হয়!'

বলতে বলতে পেট-কাপড়ে বাঁধা তিন-চারখানা কাগজ বার করে শ্যামা। কান্তির ফেলে যাওয়া বাদামী কাগজের খাতা থেকে ছেঁড়া। তাইতে তারিখ দিয়ে দিয়ে সে লিখে রেখেছে কবেকার চালানে কী কী মাল এসেছে। কটা পেঁপে কটা নারকোল কটা কলা! মাল আর তার পাশে একটা আনুমানিক মূল্য। সেটা যোগ দিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় পৌনে দু শ টাকার মত।

কাগজগুলো উমার সামনে ফেলে দিয়ে প্রায় বিজয়গর্বে বলে ওঠে শ্যামা, 'এই তো। হিসেব তো সামনেই রয়েছে, আমি কি আর বিনা হিসেবে এত কথা বলছি। এক শ বাহাত্তর টাকা হবার কথা—নিদেন দেড় শও তো হবে। এত কম হয় কি করে!'

উমার মুখ লাল হয়ে ওঠে, সে তাড়াতাড়ি কাগজগুলো তুলে নিয়ে চোখ বুলিয়েই ফেলে দেয় শ্যামার সামনে, 'এ কী করেছ, সব পেঁপে গড়পড়তা তিন আনা হিসেবে দাম ধরে বসে আছ, সব নারকোল তিন আনা। তাই কেউ দেয়? ছোট বড় সব একদাম? বাজারে একটা মাঝারি পেঁপের দাম চার পয়সা—সেই জিনিস কত দাম নেওয়া যায় বল। তারাও তো বাজারে যায় রোজ—না কি? খুব বড় হলে—দেখাবার মত হলে সেটা তিন কেন চার আনাও আদায় করা যায়। তাই বলে গড়পড়তা সব তিন আনা! আর নারকোল তুমি তো বেচছ সাড়ে তিন টাকা শ—পঁয়ত্রিশ টাকা হাজার। সেই নারকোল এখানে কত দাম হবে মনে কর? বাজারে গিয়ে ত্যাখ বড় নারকোল এক-একটা এক আনায় বিক্রি হচ্ছে। তার দেইনি আমি তবু ছ পয়সার কম নিই না কোনটা, খুব মিষ্টি মোলাম নারকোল এমনি নানান বক্তৃতা দিয়ে গছাই। বড়গুলো দু আনা পর্যন্ত ধরি। তাও তোমার ফল তো ছোটই হয়ে আসছে ক্রমশ। দাতার নারকোল বকিলের বাঁশ—তোমার নারকোল ছোট হবে জানা-কথাই।'

হতাশ ক্ষুব্ধ মুখে বসে থাকে শ্যামা কিছুক্ষণ, তার পর রীতিমত বিরস কণ্ঠে বলে, 'কী করে জানব বল, এই ফলই আগে আগে তুমি যে দামে বিক্রি করেছ সেই হিসেবেই আমি দাম ধরে রেখেছি। মেয়ের বে দিতে হবে, আকণ্ঠ দেনায় ডুবে আছি—সেই জন্যেই আরও এত হিসেব রাখা। কোথায় দাঁড়াচ্ছি সেটা বুঝতে হবে তো। এমন জানলে সত্য সত্যই নিয়ে নিতুম। তাতে ভুলচুক হবার অত পথ থাকত না। আমারই বোকামি—টাকাটা ওখানে সুদে খাটালে দশগুণ বেড়ে যেত। উল্টে এ কমেই গেল আসল থেকে!'

'তার মানে কি বলতে চাইছ পষ্ট করে বল দিকি। আমি তোমার টাকা মেরে দিয়েছি—এই তো? চুরি করে খেয়েছি—না কি? বেশ তো, এতকাল ধরে ঘাড়ে করে করে ফিরিওলার মত বেচেছি তারও তো একটা দালালি-দস্তুরি আছে, মজুরি আছে। সেইটেই ধর না কেন।'

এবার শ্যামার হিংস্র চেহারাটা পুরোপুরি বেরিয়ে পড়ে। সে সমান তালেই জবাব দেয়, 'সে নিলেও তো বাঁচতুম—তাতে এত যেত না। এ যে মূলেই হাভাত!'

উমাও আর সামলাতে পারে না। বলে, 'ইতর ছোটলোকদের সঙ্গে ঘর করে করে তুমিও ইতর হয়ে গেছ, তাই এমন কথাটা বলতে পারলে। আমার কী গরজ পড়েছিল এতখানি নীচু হয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ফল বিক্রি করে বেড়াবার? এই সব ফলের যে এত দাম হতে পারে তা তুমি জানতে কখনও? তোমার ওধারের বাজারে কী দরে বিক্রি হয়? এ পথ দেখালে কে? সে প্রবৃত্তি যদি আমার থাকত তা হলে প্রথম থেকেই তো পয়সা সরাতে পারতুম। যে পেঁপে চার আনা পাঁচ আনায় বিক্রি করেছি এককালে, সে পেঁপের জন্যে তিন আনা দশ পয়সা দিলেও তুমি বর্তে যেতে। তোমার উপকার হবে বলেই তো করা। কারবার করছি জানলে নগদ কিনে নিয়ে কারবার করতুম—তাতে ঢের লাভ হত। বেশ হয়েছে—উচিত শিক্ষা হয়েছে। তুমি যাও, কত টাকা তোমার চুরি করেছি বলো হিসেব করে—একেবারে না পারি মাসে মাসে দিয়েও কড়াক্রান্তিতে শোধ করে দেব। আর কখনও কিন্তু এ-মুখো হয়ো না। ফলও পাঠিও না।'

এবার শ্যামা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। ভয়ও হয় তার। সত্যিই যদি ফল না এখানে পাঠাতে পারে তো সিকি দামও পাবে না। অর্ধেক ফল বিক্রিই হবে না, ওখানে খদ্দের কোথা এত? আর বাজারে গিয়ে বিক্রিই বা করতে যাচ্ছে কে?

অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বলে, 'না, না। তাই কি আমি বলছি—তা বলছি না। ভুলও তো হতে পারে—তাই বলা। আমার বড্ড ভরসা ছিল কিনা, এই টাকাটা হিসেবে ধরা ছিল তাই। চুরির কথা কে বলছে—তোর সব উল্টো-পাল্টা কথা—'

বলে আর আড়ে আড়ে উমার পানে তাকায়। উমার মুখ অঙ্গার-বর্ণ হয়ে উঠেছে, দৃষ্টি কঠিন। সেদিকে চেয়ে ভয় ভয়ই করে শ্যামার। উমা কিন্তু আর জবাব দেয় না, কথাও বলে না। অগত্যা সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টাকাগুলো আর এক বার গুনতে বসে। এ টাকাতে কিছুই হবে না ওর, অন্তত এক শ টাকা পুরো হলেও কথা ছিল। দান-সামগ্রী, বরযাত্রী খাওয়ানো—কন্যাযাত্রীও দু-চার জন বলতে হবে, নতুন পাড়ায় নতুন বাড়িতে

এসে এই ওর প্রথম কাজ—তা ছাড়া বরের আংটি আছে, মেয়েকেও কোন্ না দু গাছা রুলি আর কানের একটা কিছু দিতে হবে। বড় জামাইয়ের জামাই-বরণের ধুতি চাদর দেওয়া আছে··· এক জন তো এ দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে গেল, সে বেঁচে থাকলে এ বিয়ের দায়টা সম্পূর্ণ তার ওপরই চাপাতে পারত। বড় জামাইকে অবশ্য বরণের সময় একখানা গামছা দিলেও সে কিছু বলবে না—কিন্তু তা করতে চায় না শ্যামা। জামাইয়ের মত জামাই—সে যা করেছে ছেলেতেও তা করতে পারে না আজকাল। স্বামীপুত্র থেকে যে আশা করে নি, সেই আশা সে সফল করে দিয়েছে, নিজের বাড়ি করে দিয়েছে।

আবারও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে শ্যামা। উমা হেঁট হয়ে খিচুড়ি নাড়ছে। মুখটাও ভাল করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তার। রাগ করছে বটে—কিন্তু এত তফাত কখনও হতে পারে না। অন্তত আরও পঁচিশ-তিরিশ টাকা কি ওর ন্যায্য প্রাপ্য নয়? নিজেকে রীতিমত বঞ্চিত বোধ করে শ্যামা। যে হিসেবে দাম পেয়ে এসেছে এত কাল সেই হিসেবেই সে দাম ধরেছে মনে মনে—তবে এত তফাত কেন হবে?

নিজের মনকে শাসন করতে চায় শ্যামা, উমা ঠকাচ্ছে তাকে—এমন সন্দেহ যেন সে না করে, ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। হয়তো ভুল করে নিজে দু-চার আনা খরচ করে ফেলেছে মধ্যে মধ্যে. ম'ন নেই। হয়তো আঁচলে করে নিজের পয়সাও নিয়ে গিয়েছিল, ফলের দামও সেই আঁচলে বেঁধেছে, ফিরে এসে একসঙ্গেই নিজের বাক্সয় রেখে দিয়েছে। এমনও হতে পারে। সে দিক দিয়ে এক বারও ভাবছে না উমা, কেবলই রাগ করছে।

কিন্তু তাতেই কি এত তফাত হয়! অবশ্য শ্যামাও হয়তো বেশী বেশী ধরেছে হিসেব। তবে তার জন্যে না হয় পঁচিশটে টাকা কম হোক। তাই বলে এত?

একটা কুটিল সংশয় তার মনের মধ্যে একটু একটু করে মাথা তোলেই, কিছুতে তাকে দমন করতে পারে না শ্যামা।···

খিচুড়ি নামিয়ে ঠাঁই করে নিঃশব্দেই তাকে খেতে দেয় উমা। নিজেও খেতে বসে। কিন্তু দু জনের কেউ খেতে পারে না। উমা নিঃশব্দ দহনে দগ্ধ হচ্ছে—তার আহারে রুচি থাকা সম্ভব নয়; আর শ্যামার এই টাকার শোক। বহু ছেলেমেয়ে মারা গেছে তার, সে শোকের মত না হোক, কাছাকাছিই

এটা। তবু শ্যামা কোনমতে জোর করে পাতের আহার্য শেষ করে, কিন্তু উমার পক্ষে তা সম্ভব হয় না। খানিকটা খেয়েই উঠে পড়ে।

তার পর তাকে দ্রুত কাজ সেরে নিতে হয়। বাসন-কোসন মেজে, উনুন নিকিয়ে রান্নার জায়গা ধুয়ে, একেবারে কাপড় কেচে আসে সে। এবার বেরোবে ছেলে পড়াতে। বেলা দেড়টা বেজে গেছে, দুটোর মধ্যে বেরিয়ে পড়বে।

শ্যামা ইঙ্গিত বুঝে উঠে পড়ে। তাকেও দিদির ওখানে যেতে হবে। উমার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলবে না। কথা আছে কিছু কিছু বাজার সেরে হেমের সঙ্গে বাড়ি ফিরবে। হেম পাঁচটার মধ্যে দিদির ওখানে পৌঁছবে।

কিন্তু কাপড় দুখানার কথা উমা আর উচ্চবাচ্য করছে না যে! সে দুটো পেলেও তবু অনেকখানি হয়। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শ্যামা বলে, 'হেমকে পাঠাব বরং রবিবার, শাড়ি দুটো তার হাতে দিয়ে দিস।'

'না দাঁড়াও। তুমিই নিয়ে যাও। হেমকে পাঠাতে হবে না।'

'হেম তো আসবেই। তুই এবার যাবি তো, তরুর বিয়েতে?'

'যাব না যে তা তুমি ভাল করেই জান ছোড়দি। মিছিমিছি হেমকে তার জন্যে পাঠাতে হবে না।'

উমা মায়ের দরুন দেরাজটা খুলে শাড়ি দুখানা বার করে। তার পর মায়েরই ক্যাশবাক্সটা খুলে হাতড়ে হাতড়ে কতকগুলো টাকা পয়সা বার করে। সেগুলো একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে শ্যামার সামনে ধরে দিয়ে বলে, 'এগুলো নিয়ে গিয়ে বাড়িতে গুণে দেখো কত আছে। আর কত দিতে হবে চিঠি লিখে জানিও—আমি মাসে মাসে যেমন করে পারি না খেয়েও শোধ দেব। তবে আমার তো ন শ পঞ্চাশ টাকা আয় নয়—খেয়ে পরে সামান্যই বাঁচে, তার মধ্যে খাওয়াটা কমাতে পারি, তাই বাঁচিয়েই দেব।'

শ্যামা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'আমি কি তাই বলছি? তুই বা দিবি কেন, আর আমার হিসেবই যে বেদবাক্যি তাই বা কে বলেছে। আমি একটা আন্দাজ করে রেখেছিলুম এই পর্যন্ত। আমারও তো ভুল হতে পারে।'

উমা ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, 'ভুল দু জনেরই হতে পারে। সব চেয়ে বড় ভুল হয়েছে আমার এ কাজ ঘাড় পেতে নেওয়া, আর তোমার ভুল হয়েছে বিশ্বাস

করে টাকাগুলো আমার কাছে ফেলে রাখ। নাও, এখন ওঠ দিকি—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

শ্যামা এক বার ওর মুখের পানে চেয়ে শুধু শাড়ি দুখানা হাতে করে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। উমা আঙুল দিয়ে টাকাটা দেখিয়ে বললে, 'ওটাও নিয়ে যাও ছোড়দি—নইলে আপসোসের সীমা থাকবে না। চক্ষুলজ্জায় টাকাটা ছুঁইও না। তা ছাড়া বিয়েটা তো দেওয়া চাই। টাকা যখন হিসেবে কমই পড়ল, তখন ওটা দিয়ে ভোক্তন করে নাও। টাকা কুড়ির মত হবে বোধ হয়।'

শ্যামা রাগ করে বলে, 'তোর দিন দিন বড় চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্যি হচ্ছে উমা। আমি কি বললুম আর তুই কি বুঝলি। ও টাকায় আমার দরকার নেই। মেয়ের বে আমার অদৃষ্টে থাকে তো হবেই। তোর যদি দেবার মন থাকত তো এমনিই দিতে পারতিস্—এভাবে আমি নিতে পারব না।'

'সে তোমার ইচ্ছে! কিন্তু নিলেই ভাল করতে। মনে মনে চির দিনই আমাকে চোর ধরে রাখবে। তখন এটা না নেওয়ার জন্য হাত কামড়াবে শুধু শুধু।'

সে টাকাটা তুলে রাখে আবার। শ্যামা সেদিকে চেয়ে আর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে পড়ে।

টাকাটা পেলে এক শ টাকা পুরো হত এটা ঠিকই। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই এ টাকার লোভ সংবরণ করলে সে। যদি এর পর সত্যিই আর কিছু না বেচে উমা!

তা হলে একেবারে দাঁড়িয়ে লোকসান! হেম যা ছেলে, সে কিছুতেই বাজারে গিয়ে ওসব বেচতে পারবে না। আর বেচলেই কি এত দাম উঠবে? ওর অর্ধেকও হবে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

তরুর বিয়ে উপলক্ষে অনেকগুলো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। আর সে জন্যে, তরুর ভবিষ্যৎ ভেবে শ্যামা বেশ একটু কণ্টকিত হয়েই রইল। মহাশ্বেতা যখন ওর কোলে এসেছে তখন সবচেয়ে দুদিন, তবু তার বিয়েই সবচেয়ে নির্বিঘ্নে এবং এখন দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে ভাল হয়েছে। ঐন্দ্রিলাও বিয়ের সময় অন্তত কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় নি। ওর বরাত—নইলে ঘর বর সবই ভাল পেয়েছিল; কিন্তু তরুর বিয়েটা যেন কি রকম হয়ে গেল।

প্রথমত উমার সঙ্গে কাটান-ছিড়েন হয়ে যাওয়া।

সেদিন যখন নগদ কুড়ি-পঁচিশ টাকার মায়া কাটিয়ে চলে এসেছিল শ্যামা তখন ভবিষ্যতের কথাটাই বেশী করে ভেবেছিল। উমা যে এমন কাণ্ডটা করবে তা সে এক বারও ভাবে নি। এমন কি দু-তিন দিন পরে যখন কুড়ি টাকার একটা মনি-অর্ডার এল ওর নামে—তখনও ঠিক এতটা বুঝতে পারে নি। কুপনে লেখা ছিল—'তরুর আইবুড়ো ভাতের জন্য যৎসামান্য পাঠালাম।' তাতেও ভেবেছিল যে উমা একটু নরমই হয়েছে পরে—নইলে টাকাটা এ ভাবে পাঠাত না। তা ছাড়া আইবুড়ো ভাত তো তার দেওয়া উচিতই—না হয় কিছু বেশী দিয়েছে, সাহায্য হিসেবে।

তবু অস্বস্তি একটা ছিলই। তাই বিয়ের এক দিন আগে হেম যখন বাজার করতে কলকাতায় গেল তখন তার হাতে জোর করেই কয়েকটা নারকোল পাঠিয়ে দিলে সে। বাজারের জন্যে বস্তা ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছিল হেম—তার মধ্যে এগুলো নিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধা, আপত্তিও সে যথেষ্ট করেছিল—কিন্তু শ্যামা এক রকম অনুনয় বিনয় করেই গছিয়ে দিলে। বললে, 'আমি বিয়ের কথা হচ্ছে বলে এসেছি, ঠিক নেমন্তন্ন তো সেদিন করে আসতে পারি নি। এক বার সে ভাবে বলাও তো দরকার। দিদি যদি না-ও আসে গোবিন্দ বৌমা যেন আগের দিন থেকে এসে থাকে, জোর দিয়ে বলে আসবি। আর উমা অবিশ্যি আসবে না কিন্তু তবু আমাদের কর্তব্য আসতে

বলা। যাচ্ছিসই যখন, সেই ঝাড়নও নিয়ে যেতে হবে—এ কটা বয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধা কি? ওখানে ঢেলে দিয়ে চলে আসবি, বয়ে তো বেড়াতে হবে না!'

কিন্তু হেম রাত্রে ফিরল মুখ কালি করে। মাকে প্রায় যাচ্ছেতাই করলে সে, 'তুমি এই কাণ্ড করে বসে আছ! মাসী তোমার পয়সা চুরি করে! আর সেই কথা বলে এসে তিন দিন পরেই আবার তার কাছে মাল পাঠিয়েছ! কী রকম বেহায়া মেয়েমানুষ তুমি! ছি ছি! আমাকে ঘুণাক্ষরেও তো বল নি একথা—তা হলে কি এ গুথুরি করতুম! একেবারে অপদস্থের শেষ! তা-ও এটুকু বুদ্ধি হল না যে ব্যাপারটা একটু জুড়তে দাও! তা না সাত দিনের মাথাতেই আবার সেইখানে মাল পাঠাতে গেলে! তোমার ভীমরতি হয়েছে—বেশ বুঝতে পারছি।'

না, উমা নারকোল রাখে নি। পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে এ ভূতের ব্যাগার তার দ্বারা হবে না। বোন বোনপো খেতে পাচ্ছিল না বলেই সে এতটা নীচু হয়ে ফিরিউলীর কাজ করেছে। আর তো এখন দরকার নেই। আর কেন? তা ছাড়া ভাল ঘোড়ার এক চাবুক, তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে—আর নয়। প্যাঁজ-পয়জার-গুণগার—এর মধ্যে আর সে নেই। হেম যদি এমনি যায় তো স্বচ্ছন্দে যেতে পারে—তাদের ভালবাসে উমা, কল্যাণই চায়—কিন্তু এসব কেনাবেচার ব্যাপারে যেন আর না যায়, তা হলে ওর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, এটা যেন মনে রাখে।

অগত্যা হেম সেই আট-আটটা নারকোল কমলাদের বাড়ি ঢেলে দিয়ে এসেছে। ওদের খেতে দিয়ে এসেছে। কী করবে, এত মালের মধ্যে ঐ বোঝা টেনে বেড়াবে কে! বেশী লাভের আশা তো গেলই—আসলেও টান। এখানে শ দরে বেচলে তবু যে কটা পয়সা হত—তাও গেল। বোন-বোনপো থাক—তার জন্যে কিছু নয়, সে তো মধ্যে মধ্যে সে দেয়ও এক-আধটা—কিন্তু তারই বা এত খয়রাত করতে গেলে চলে কি করে, ঐ কটা নারকোল গাছই তো ভরসা! নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেরই গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে শ্যামার—বেছে বেছে আজকের দিনই বা এত তাড়াতাড়ি করতে গেল কেন। ঘি-ময়দা-পাঁপর এক গাদা কাঁচা বাজার, তার মধ্যে নারকোলগুলো বয়ে ফিরিয়ে আনা সত্যিই সম্ভব নয়। তাও হাঁদারাম ছেলে যদি 'এখন রইল পরে নিয়ে যাব' বলেও রেখে আসত। কী সমাচার—না, লজ্জা করে! এত

লজ্জা কি তোদের মানায়, যারা মোটা টাকা রোজগার করে তারা লজ্জার কথা তুললে তবু সাজে!

এদিকে তো এই—ওদিকে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল সরকারদের সঙ্গে। 'মাথার ওপর অভিভাবকের মত দাঁড়িয়ে থেকে উদ্ধার করিয়ে দেবেন' —একথা শ্যামাই বলে এসেছিল অক্ষয়বাবুকে। আর সত্যিই তার কে আছে, এক বড় জামাই, তা সে ওসব আদর-আপ্যায়ন-তত্ত্বাবধানের ধার ধারে না, নিজে ভূতের মত খাটতে পারে শুধু। তা ছাড়া সে তো ভিয়েনের কাছেই জোড়া থাকবে—বলেই দিয়েছে যে, 'এক জন শুধু বামুন ব্যবস্থা করো, যোগাড়ে দরকার নেই, আমিই যোগাড় দেব।' বড়জামাইয়ের বাড়ি, মেজ-জামাই-বাড়িও বলতে হয়েছে—সভ্য সত্য শিবু চাকরিটা করে দিয়েছে,—সরকার-বাড়ি, তা ছাড়া বাড়ির ঠিক আশেপাশে যারা আছে—বাড়ি পিছু এক জন করে বলতে বলতেই পঞ্চাশ-ষাট জন হয়ে গেছে। তা ছাড়া বরযাত্রীও আসবে কুড়ি-পঁচিশ জন মোট—অর্থাৎ প্রায় এক শর ধাক্কা। হালুইকর বামুন তাই এবার একটা ঠিক করতে হয়েছে। তার সঙ্গে যোগাড় দেওয়া সহজ কাজ নয়, বড় জামাইকে অন্য কোন দিকে পাওয়া যাবে না।

সুতরাং সরকারদের ওপরই ভরসা।

তা অক্ষয়বাবু এসেও ছিলেন, তদ্‌বির-তদারক করছিলেন যেমন করতে হয় তেমনিই। গোলমাল বাধল বরযাত্রী আসতে। বরের এক পিসেমশাই এসেছিলেন—গাঁজাখোরের মত চেহারা, তেমনিই গলার আওয়াজ। পরে শুনেছে শ্যামা যে লোকটা অতি হতভাগা, এদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কও নেই, নিহাত মাথার ওপর এক জনকে দাঁড়াতে হয় তাই আসতে বলেছিল বুড়ী শাশুড়ী,—তিনি এসেই তম্বি শুরু করে দিলেন, 'এই দান—? দানের বাসন তো মশাই আপনাদের মেয়েই ভোগ করবে—তা ঐ ফুঁয়ে-উড়ে-যাওয়া বাসন কখানা না দিলেই পারতেন। ও আর কদিন! ও কি, বরের জুতো দেন নি?···গরদের পাঞ্জাবি দিয়েছেন তো? আংটি কৈ? সেটা একটু ভারী-ভুরি দিয়েছেন, না কি সেও অমনি ফঙ্গবেনে? বন্ধু-বান্ধবের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না তা হলে আমাদের হারান।···ঘড়ি, ঘড়ি কৈ? ঘড়ির চেহারা তো দেখছি না। ও হরি, আপনারা তা হলে ডোমের চুপড়ি ধুয়ে ভোলাতে চান দেখছি · যা ছিরির ব্যবস্থা, মেয়েটাকেও শেষ অবধি ন্যাড়াবুঁচো

বার করবেন নাকি ? কী ব্যাপার কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ও মশাই, কন্যেকর্তা কে আছেন—এক বার আসুন তো দিকি এধারে, গয়না-গাঁটি মেয়েকে কী কী দিলেন বলুন তো।'

হেম চটে আগুন হয়ে উঠেছিল, শ্যামা অতিকষ্টে তাকে সরিয়ে দিলে। তারও বুক দুর-দুর করছিল—এ আবার কি কথাবার্তা। না জানি কি অঘটন ঘটে।

এগিয়ে গেলেন অক্ষয়বাবু, বললেন, 'আপনি কে তা তো জানি না—বরের অভিভাবিকা যিনি এসেছিলেন দয়া করে, যাঁর সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হয়েছে —তিনি জানেন আমরা কিছুই দিতে পারব না। তিনি বার বার বলেও গেছেন কিছু চাই না তাঁর। এদের বলতে গেলে ভিক্ষে-দুঃখু করে বে দেওয়া —কোথায় কি পাবে বলুন। যা দিয়েছে তাতেই খুশী হয়ে আপনারা দয়া করে মেয়েটি উদ্ধার করুন!'

পিসেমশাইয়ের চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল—হয়তো আগে থাকতেই ছিল একটু, তিনি বললেন, 'ও, আমি কে তা জানেন না। তা মশায় কে তা জানতে পারি কি ? মশায়ের সঙ্গে এদের সম্বন্ধটা ?'

একটু অপ্রস্তুত হলেন বৈকি অক্ষয়বাবু। একটু ঢোঁক গিলতে হল। বললেন, 'আমার নাম শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দে সরকার। এঁরা—'

'এঁরা আমাদের পুরোহিত'—এই বলতেই যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু তার আগেই বাড়ি-ফাটানো হাসি হেসে উঠলেন পিসেমশাই। 'বামুনের মেয়ের কায়েত অভিভাবক! বামুনের ঘরে কায়েত কন্যেকর্তা।···ওহে জগমোহন ব্যাপারটা তো ঘোরালো দেখছি। এখনও ভেবে ছাখ, এখানে বিয়ে দেবে কি না! শাশুড়ী ঠাকরুন খোঁজখবর করেছিলেন তো ভাল করে?··এই তো—কথায় বলে স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, মেয়ে-কর্তা কোন ব্যাপারেই ভাল না। এসব কি ওদের কাজ! দশহাত কাপড়ে কাছা দিতে পারে না ওরা। কী করতে কী করে বসে রইল ছাখ দিকি!'

এর পরে অক্ষয়বাবুর মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত। তিনি বললেন, 'কী বলছেন মশাই যা তা। একটু বুঝে-সুঝে বলুন। ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে এসব কী কথা।'

'কী, কী বললেন!···ভদ্রলোকের বাড়ি। তা যার বাড়ি—যাদের বাড়ি তারা কে? আমি বরের পিসেমশাই, ইনি জগমোহন ওর মামা—

আপনি কনের কে বলুন আগে, তবে এর পর কথার জবাব দেব। কথা হয় সমানে সমানে—কায়েতের সঙ্গে বামুন এ সব বের ব্যাপারে কথা কইবে কি ?'

জগমোহন—বরের মামা বটে, কিন্তু বরেরই প্রায় সমবয়সী—সে হাঁ হাঁ করে উঠল। ও পক্ষে আরও দু-চার জন তিরস্কার করলেন, বর নিজেও যেন ধমক দিল এক বার। এ পক্ষে বড়জামাই এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল (হেমকে ইচ্ছে করেই সামনে আসতে দিলে না শ্যামা)—পিসেমশাই শান্ত হয়ে এলেন। বোধ করি নেশাতেও আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিলেন, তিনি তার পর থেকে সমস্ত সময়টাই ঝিমিয়ে রইলেন, কনে যখন সভায় এল তখন তার গায়ে কী গয়না আছে না আছে ফিরেও দেখলেন না। তা ছাড়া জামাইয়ের ওপর বুড়ীর যে কী পর্যন্ত ভরসা—তা বোঝা গেল যখন সম্প্রদানের পর জগমোহন বুড়ীর পাঠানো চুড়ি আর হার বার করে কনেকে পরিয়ে দিতে বললে। ওঁদেরই মুখ-দেখানি গহনা এগুলো, শুধু-গায়ে বৌ এসে নামবে, সেই লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্য আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। বোঝা গেল নিজের জামাই বরকর্তা থাকতে ছেলের শালার ওপর তাঁর বিশ্বাস বেশী।

কিন্তু শান্ত হলেন না অক্ষয়বাবু। তিনি সম্প্রদান পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ঠিকই—তবে জলস্পর্শ করলেন না। ছেলেমেয়েদেরও খেতে দিচ্ছিলেন না—নিতান্ত শ্যামা এসে ঢিপঢিপ করে মাথা খুঁড়তে ওদের খেতে বললেন। নিজে শুধু এক গ্লাস জল খেয়ে বাড়ি চলে গেলেন। অথচ এদের কী দোষ তাও বোঝা গেল না। গাঁজাখোরই হোক আর নেশাখোরই হোক—একে বরযাত্রী তায় বরের পিসেমশাই, কুটুমের কুটুম—তাকে গলাধাক্কা দেওয়া যায় না। বিয়ের রাত্রে বরযাত্রীর বহু দাপট সহ্য করতে হয়, সেটা অক্ষয়বাবুর জানা উচিত। শ্যামা অনেক বোঝালেও কিন্তু তিনি অবুঝের মত রাগ করেই রইলেন। আশ্রয়দাতা উপকারী বন্ধু, এককালের মনিব বলতে গেলে—তিনি অভুক্ত চলে গেলেন বিয়েবাড়ি থেকে, মনটায় খচখচ করতে লাগল শ্যামার। এদের অকল্যাণ বাঁচাবার জন্যেই এক গ্লাস জল খেয়ে গেলেন বটে কিন্তু তাতে কোন সান্ত্বনা পেলে না শ্যামা।

॥ ২ ॥

তবে যতই যা হোক—এই বিয়ে উপলক্ষে কিন্তু সবচেয়ে অশান্তি বাধালে ঐন্দ্রিলা। সেদিন উমার বাড়ি থেকে ফিরেই শ্যামা দক্ষযজ্ঞের মধ্যে পড়ল বলতে গেলে। একে উমার সঙ্গে ঐ বিরোধ উপলক্ষে মনটা যৎপরোনাস্তি খারাপ হয়ে ছিল, তার ওপর দিদির কাছে গিয়েও খানিকটা আশাভঙ্গ হয়েছে। ইদানীং ঝি রাখতে হয়েছে, বৌমা পোয়াতি, তাকে এটা-ওটা খাওয়াতে হচ্ছে—আরও নানা কারণে সংসারের খরচ বেড়ে গেছে—অথচ গোবিন্দর অফিসের অবস্থাও নাকি টলোমলো, এক মাসের মাইনে তিন মাস ধরে আদায় হচ্ছে—ইত্যাদি টানাটানির নানা অজুহাত দেখিয়ে দিদি দিয়েছিল মাত্র দশটি টাকা। এবার গোবিন্দ চাকরি-বাকরি করছে, আরও অনেক বেশী পাবার আশা ছিল শ্যামার, সে জায়গায় আগের আগের বারের চেয়ে কমেই গেল টাকাটা। সেখানেও একটা বহু দিনের চাপা অসন্তোষ মাথা তুলেছে—ওর এখনও ধারণা থিয়েটারে কাজ করার সময় হেম মোটা মোটা টাকা দিয়েছে বড় মাসীকে। সেদিক দিয়ে একটু কৃতজ্ঞতাও থাকা উচিত ছিল না দিদির? 'তা তো নয়—তখন খুব হাত বাড়িয়ে ফেলেছেন, এখন আর তাল সামলাতে পারছেন না ঠাকরুন! মোটা আয় একটা বন্ধ হয়ে গেছে তো!' মনে মনে যতটা ঝাঁঝের সঙ্গে বলা সম্ভব ততটাই বলে সে।

একে তো এমনি নানা কারণে তিক্ত হয়ে ফিরছে, তার ওপর স্যাকরাদের বাঁশঝাড়টা ছাড়াতেই কানে এল এক বিকট চিৎকার। নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে সে চিৎকার ভয়াবহ শোনাচ্ছে—মনে হল যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।

শোনামাত্র দারুণ বিতৃষ্ণায় মন ভরে গিয়েছিল ঠিকই—তবু তার মধ্যেও কোথায় যেন একটা ক্ষীণ আশাও উঁকি মেরেছিল এক বার। নরেন নিশ্চয়। সে-ই এসে তার অভ্যস্ত চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে, বেধেছে বাপেতে আর বেটীতে। বহুকাল আসে নি সে, কিছু দিন ধরে সমস্ত কাজ-কর্মের মধ্যে বার বারই মনে হয় তার কথা। কে জানে কোথায় আছে, কী ভাবে আছে। কোথাও হয়তো রোগে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে, মুখে জল দেবার কেউ নেই—কিংবা মুখ থুবড়ে পড়ে কোথাও মরেই গেছে হয়তো, ওরা কেউ জানতেও পারলে না। হয়তো ভিক্ষে করেই খাচ্ছে—কে জানে। তার পক্ষে সবই সম্ভব।

সে আশার চমক লেগেছিল এক লহমা মাত্র। আরও দু কদম এগিয়ে যেতে যখন বোঝা গেল শুধুই নারীকণ্ঠের চিৎকার এবং একতরফা, তখন আর সে আশা রইল না। চুপ করে মেয়ের গলাবাজি সহ্য করবার লোক নরেন নয়। এটা শুধুই একতরফা চিৎকার—ঐন্দ্রিলারই।

দারুণ বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেল দু জনেরই। নিশীথরাত্রের নিস্তব্ধতায় বহু দূর পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌঁছচ্ছে, আশেপাশে ভদ্রলোকের বাড়ি। তারা না জানি কি মনে করছে! লোকে বলে হাড়াই-ডোমাই, কিন্তু তারাও মদ না খেলে চেঁচায় না। ভদ্রলোকের বাড়িতে রাতদুপুরে ডাকাতপড়া চেঁচানি—অলক্ষ্মীর দশা।

দু জনেই এগিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

দেখা গেল ব্যাপারটা আজ বহু দূর গড়িয়েছে। তরু শোবার ঘরে খিল দিয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। মেয়েটা পালিয়ে এসে অন্ধকারেই পুকুরঘাটে বসে আছে চুপ করে। মার কাছে তার অন্ধকার বাগানের ভয়ও তুচ্ছ হয়ে গেছে আজ। আর ঐন্দ্রিলা এক গাছা ঝাঁটা নিয়ে আস্ফালন করছে মধ্যে মধ্যে বন্ধ দোরে লাথি মারছে এবং অবিরাম অকথ্য গালিগালাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

'কী হচ্ছে কি? ছোটলোকপনা! চুপ করবি—না কি?'

আরও যেন জ্বলে উঠল ঐন্দ্রিলা, এ দিকে ফিরে যেন এক পাক নেচে নিলে সে, 'কেন, কেন চুপ করব? কিসের জন্যে মুখ বুজে থাকব চিরকাল তাই শুনি! ঝিয়ের মত খাটব আর অপমান হব! আমি আর আমার মেয়ে হয়েছি তোমাদের চক্ষুশূল—নয়? মেয়েটাকে মেরে ফেলতে পারলে বাঁচো তোমরা, একটা পেট বেঁচে যায়। সেই ফন্দিই এঁটেছ মায়েতে ঝিয়ে—আমি কি কিছু বুঝি না? কেন, আমরা থাকলে ছোট মেয়েকে রাজরাণীর মত বিয়ে দেওয়া যাবে না বুঝি—চক্ষুলজ্জায় বাধবে, না? ঘোচাচ্ছি তোমাদের বিয়ে, দাঁড়াও না। ফন্দি-আঁটা বার করছি আজ!'

হয়তো আরও বহুক্ষণ এইভাবে চলত, কারণ ওর সে রণচণ্ডী মূর্তির সামনে শ্যামাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে যাত্রা রক্ষা করলে হেমই—তার অকস্মাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। এ রকম অকারণ কলহ আজকের নয়, এক দিনের ঘটনা নয়, এ প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে তার। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই কমলাদের বাড়ি থেকে ফিরেছে সে—

হাসিতে, কৌতুকে, আদর-যত্নে অপরূপ নারীমূর্তি দেখে এসেছে। সে মধুর স্মৃতি যে মধুরতর স্বপ্নরসে মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা থেকে এই জাগরণ বড় বেশী রূঢ়, বড় বেশী দুঃসহ মনে হল। সে এগিয়ে এসে একেবারে ওর চুলের মুঠি ধরে ঠাসঠাস করে গোটাকতক চড় বসিয়ে দিলে, 'চুপ! একেবারে চুপ! নইলে আজ শেষ করে দেব একেবারে!'

সত্যিই কিন্তু এইতে কাজ হল। স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারে ঐন্দ্রিলা। জ্ঞান হবার পর থেকে তার গায়ে কেউ কোন দিন হাত তোলে নি! মা-বাবা নয়—দাদা নয় কেউ নয়। মানুষ হয়েছে সে মাসীর কাছে, দিদিমার কাছে। রাশভারী লোক ছিলেন দিদিমা তাঁর চোখের দৃষ্টিই ছিল যথেষ্ট, কারুর গায়ে হাত তোলবার তাঁর কোন দিন দরকার হত না। উমাও সেই স্বভাবই পেয়েছে কতকটা। সুতরাং এটা ওর একেবারে অভিজ্ঞতার বাইরে।

সে খানিকটা হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল দাদার মুখের দিকে। তার আয়ত চোখ দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল—পলকও পড়ছিল না। সেই ভাবে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর আস্তে আস্তে এক পা এক পা করে পিছিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় পৌঁছে বসে পড়ল।

তরুর মুখে তার পর ব্যাপারটা শোনা গেল।

হঠাৎ বিকেল থেকে শুরু করেছে ঐন্দ্রিলা, একেবারে যাকে বলে গায়ে-পাছকেটে ঝগড়া বাধানো। তরুকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু করেছে, 'ঘোষালদের জ্ঞাতি বলে ভাল বরও পছন্দ হল না। তা তার বদলে কী এমন তালেবর জুটল শুনি! ঐ তো ছিরির বর, দাদাবাবু বলেছে বিশ্বকাটে হয়ে গিয়েছিল—তাও সতীন সুদ্ধ—নিক্ না নিক্, সে কাঁটা বজায় আছে তো! কেন, ঘোষালদের ঘরে পড়লে কী মহাভারত অশুদ্ধটা হত—তোর মেজদাদাবাবু তো ঐ ঘরেরই ছেলে! তার পায়ের নখের যুগ্যি বর পেলেও তরে যেতিস। তোদের বড্ড তেজ হয়েছে—বুঝেছিস্! এত তেজ ভাল নয়। আমি হাজার হোক তোর দিদি, বয়সে বড়—আমাকে এত অপমান করা, এত হেনস্থা করা ধর্মে সইবে না—বুঝলি!'

তরু অনেকক্ষণ ধরে শুনেছে চুপ করে, তার পর আর থাকতে পারে নি—বলেছে, 'তা আমাকে এসব কথা বলছ কেন মেজদি, আমি কি আমার সম্বন্ধ ঠিক করেছি!'

'না—তা নয়, তবে তুইও জানিস। শলাপরামর্শ তো হচ্ছে দেখছি দিনরাত, মায়ে-ঝিয়ে গুজগুজ ফুসফুস। তবে একটা কথা মনে করিয়ে দিস—বেইমানি ভাল নয়। সেই ঘোষালরাই ছিল তাই তো ছেলে চাকরি পেয়েছে, কৈ আর তো কেউ পারে নি চোর ছেলেকে চাকরি করে দিতে!'

এই বার বোধ করি তরুর অবিচলিত ধৈর্যও টলেছে, সে জবাব দিয়েছে, 'তা মেজদি, এত যদি ভাল ঘোষালরা তো তাদের ঘরের মেয়ে তারা পুষছে না কেন, চোরেদের ঘরে এনে তুলেছ কেন! এই তো শুনেছিলুম, জুচ্চুরি করে তারা যথাসর্বস্ব তোমার নিয়ে নিয়েছে—আজ আবার এত ভাল হয়ে গেল!'

ব্যস, এইটুকুই যথেষ্ট। তার পরই একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরেছে ঐন্দ্রিলা, 'কী, কী বললি—তুই সুদ্ধ আমার মেয়েকে ভাতের খোঁটা দিবি! তোর খাচ্ছে সে, না তোর ভাতারের খাচ্ছে! এখনও তো ভাতার হয় নি, তবে কোথা থেকে রোজগার করে আনছিস তাই শুনি, খবরটা এক বার নিবড়েয় পৌঁছে দিয়ে আসি। বড় বেশী খাচ্ছে, না? তাই আমি আর আমার মেয়ে হয়েছি তোদের চক্ষুশূল! কেন আমার মেয়েকে ভাতের খোঁটা দিবি তুই? পয়সা বাঁচলে কি তুই পাবি ভেবেছিস! বাঁচলে ভাইয়েরই থাকবে। তোকে বেশী করে দেবে না—ভয় নেই। ভাইয়ের সংসারে এত টান—ওরে আমার ভাইসোহাগী রে!' ইত্যাদি ইত্যাদি—

তার পর থেকেই চলেছে। তরু একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে কিন্তু তাইতে ওর আরও রাগ। ক্রমশ সে আবিষ্কার করেছে যে তাকে আর তার মেয়েকে মেরে ফেলবারই ষড়যন্ত্র চালিয়েছে এরা! নিত্য নূতন অপমান তাকে করে শুধু সেই অপমানে ঘেন্না হয়ে গিয়ে পুকুরে ডুবে বলে।

গজরাতে গজরাতে বোধ করি রক্ত আরও চড়েছে মাথায়। শেষে খ্যাংরা হাতে তেড়ে এসেছে—'মরতে যদি হয় তো তোকে মেরে মরব!' সেই সময়ই ভয় পেয়ে কোলের ভাইটাকে নিয়ে ঘরে দোর দিয়েছে তরু। পাড়ার দু-চার জন এসেছিল কিন্তু ঐন্দ্রিলার ঐ সংহার-মূর্তি দেখে সকলেই আবার সরে পড়েছে। ইশারায় শুধু তরুকে বলে দিয়ে গেছে যে সে দোর না খোলে—কোন কারণেই।

সারারাত তেমনি স্তব্ধ হয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে রইল ঐন্দ্রিলা। শ্যামা ডাকলে না। রান্না হয় নি—বিকেল থেকেই এই কাণ্ড চলছে, রাঁধবে কে? তখন আর কারুর ইচ্ছেও হল না। ঘরে মুড়ি ভাজা ছিল—একটা নারকোল

কুরে নিয়ে তাই ক জনে ওরা খেলে এক গাল করে! মেয়েটাকে আগেই টেনে এনেছিল শ্যামা, তাকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে পাঠাল ঐন্দ্রিলাকে—সে কিছু খাবে কি না। ঐন্দ্রিলা জবাব দিলে না। মেয়েটাও কোনমতে এক বার জিজ্ঞাসা করেই দৌড়ে পালিয়ে এল, 'আমার ভয় করছে দিদিমা, মা কেমন করে চেয়ে আছে।'

ভয় শ্যামারও ছিল। ও যা মেয়ে, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারাও বিচিত্র নয় ওর পক্ষে। ওর মেয়েকে নিয়েই দোরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা, কিন্তু কারুরই সে রাত্রে ভাল করে ঘুম হল না।

তবে ভয়ানক কিছুই করলে না সে। তেমনি জেগে বসে রইল শুধু। পরের দিন ভোরে মেয়েটা ঘর থেকে বেরোতেই তার একটা হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলল!

প্রথমটা অত বুঝতে পারে নি শ্যামা। একেবারে যখন ওদের বাগান পেরিয়ে আগড়ের কাছে এসে পড়েছে তখন ছুটে এসে একটা হাত ধরলে সে, 'কোথা চললি, সাত সকালে! বাড়ি আয়, মেয়েটা খায় নি কাল থেকে—ওকেই বা টেনে নিয়ে যাচ্ছিস কেন!'

আবারও ভীষণ মূর্তি হয়ে উঠল ঐন্দ্রিলার, 'খবরদার, আমাকে ধরবে তো বেটাদের মাথা খাবে—এই বলে দিলুম, পেয়ারের ছোট মেয়ের আমার মত হাত-মাথা দেখবে। যদি মার খেয়ে অপমান হয়ে পড়ে থাকতে হয়তো শ্বশুর-বাড়িতেই পড়ে থাকব—সে আমার ঢের বেশী সম্মানের। ভায়ের সংসারে ঝিয়ের মত খেটে বকশিশ পাব মার—চড়চাপড় গায়ের কাপড়—সে আমার দরকার নেই। ঘোষালদের ঘেন্না কর তোমরা, তাদের বৌ মেয়ে রাখতে ঘেন্না করে—রাখতে হবে না তোমাদের—আমরা যেখানকার জিনিস সেখানেই যাচ্ছি।'

মেয়েটাকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে আরও জোরে হাঁটতে শুরু করল সে।

॥ ৩ ॥

ঐন্দ্রিলা চলে যাওয়ার ফলে শ্যামা রীতিমত অসুবিধায় পড়ল। তরুর বিয়ের পর এক দিন মাত্র জোড়ে এসেছিল মেয়ে-জামাই, তার পর আর তরুকে ওর দিদি-শাশুড়ী পাঠাল না। বললে, 'আমার সংসার চলছে না বলেই তো ধেড়ে

মেয়ে নিয়ে আসা। নাতির বে'র এত তাড়াও তো সেই জন্যে। আমি বুড়ো মানুষ বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকি আদ্ধেক দিন, ওকে ভাত জল দেয় কে। না, বৌ পাঠানো হবে না। আর ঢের দিন তো বাপের বাড়ি রইল আর কেন?'

ফলে সংসারের যাবতীয় কাজ—দু বেলা রান্না, বাসনমাজা, ঘর উঠোন নিকোনো ছড়া ঝাঁট—সবই শ্যামার ঘাড়ে এসে পড়ল। রান্না অবশ্য হাতিঘোড় কিছু নয়—তবু দু বেলাই হাঁড়ি চাপাতে হয়। লিলুয়ায় যাওয়া, এখানে সাড়ে ছটার ট্রেন, বাড়ি থেকে ছটার সময় না বেরোলে সে ট্রেন ধরা যায় না তার মধ্যে স্নান খাওয়া সারতে হবে। সুতরাং রাজগঞ্জের কলে চারটের ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়তে হয়, উনুনে পাতা জ্বেলে দিয়ে তবে মুখহাত ধুতে যাওয়া। সে ভাত-তরকারি দুপুরে নিজে খাওয়া যায়—কিন্তু আবার সন্ধ্যের পর কিংবা রাত আটটা-নটায় ফিরে যে খাবে তার সামনে আর ধরে দেওয়া যায় না।

ঐন্দ্রিলা থাকতেও ভোরের রান্না অবশ্য শ্যামাকেই রাঁধতে হত, কারণ অত ভোরে উঠে সে রাঁধতে পারবে না সাফ বলে দিয়েছিল—কিন্তু তার পর ছিল ছুটি, সারা দিন ধরে পুরুষ মানুষের কাজ—অর্থাৎ বাগান দেখা, ফল বিক্রি করা, পুকুরে ডিম ফোটানোর তদ্‌বির, পাতাকুড়োনো—করে বেড়াত নিশ্চিন্ত হয়ে। ঐন্দ্রিলা থাকত হেঁসেল আর রান্নাঘর নিয়ে, ক্ষার কাচাও তার ওপর ভার ছিল। এধারে বাসনমাজা ঘরদোর পরিষ্কার করা, বিছানা তোলা-পাড়া, ছড়া ঝাঁট—এগুলো ছিল তরুর। এখন সবগুলো ঘাড়ে এসে পড়ায় চোখে অন্ধকার দেখলে একেবারে।

ঐন্দ্রিলা যেদিন যায় সেদিনও শ্যামা এতটা বুঝতে পারে নি, ভেবেছিল সেখানে তারা আর কিছুতেই ঢুকতে দেবে না, দিলেও এক দিন কি দু দিন বড় জোর, তার পরই আবার ফিরে আসতে পথ পাবে না। কিন্তু হেম নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে এল। হরিনাথের মা মাস-দুয়েক ধরে পক্ষাঘাতে পড়ে আছে বিছানায়, শিবুর নতুন বৌ পোয়াতি—কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। এই সময় ঐন্দ্রিলা গিয়ে পড়াতে ওরা হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছে। শুধু পেট-ভাতায় খাটবে এমন লোক কোথায় পাওয়া যাবে? সুতরাং মৌখিক আপ্যায়নের ত্রুটি হয় নি, এখন নাকি শাশুড়ীও বৌমা বলতে অজ্ঞান। অর্থাৎ ঐন্দ্রিলা এখন সহজে ফিরছে না।

এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আর একটি পরের মেয়ে নিয়ে আসা—অর্থাৎ হেমের বিয়ে দেওয়া। চাই কি—তাতে দেনাও খানিকটা হাল্‌কা হয়ে যেতে পারে। দেখতে ভাল, রেলে কাজ করে, নিজের বাড়িঘর আছে,—হাজার না হোক সাত-আট শ টাকা নগদ খুব পাবে। তাতে বিয়ের খরচ করেও খানিকটা দেনা শোধ দেওয়া যাবে। চাই কি যদি একটু নিরেস মেয়ে নেয় তো দেড় হাজার দু হাজার পাওয়াও বিচিত্র নয়। তবে তা করবে না শ্যামা, সুন্দরের ঘর ওর, পণ খারাপ করবে না।

এক দিন রাত্রে ছেলেকে খেতে দিয়ে সেই কথাই তুলল শ্যামা, 'সামনের একটা মাস পরেই তো আবার বের মাস পড়বে—এই বার তা হলে খোঁজখবর করি—কী বলিস ? জামাই বলেছেন ওদের জানা-শোনা কোথায় একটি মেয়ে আছে—দেখতে ভাল, বড় বংশ—এক বার দেখে আসব ভাবছি !'

'আবার কার বিয়ে ?' অন্যমনস্ক ভাবে খাচ্ছিল হেম, হঠাৎ চমকে উঠল, 'আবার কী বিয়ে !'

'ওমা, তোর বিয়ে দিতে হবে না ?'

'রক্ষে করো মা। এই রোজগারে বিয়ে ! আগে দুটো দিন খেয়ে পরে বাঁচি।'

'রোজগার নিয়ে তোর কি হবে। সংসার কি তুই চালাস ? তা ছাড়া এই তো আড়াই খানা পেট কমে গেল তার জায়গায় একটা পেট চালাতে পারব না ? আর এমন কি নবাব-নন্দিনী আনব যে তার জন্যে নিত্যি কালিয়া পোলাও চাই, লালবাগানের শাড়ি ছাড়া তাঁকে পরতে দেওয়া যাবে না ! আমরা যা খাচ্ছি সুষুনি শাকের ঝোল ডুমুর ছেঁচকি, সে-ও তাই খাবে !'

'না না—ওসব এখন থাক।' অত্যন্ত বিরস কণ্ঠে বলে হেম, 'চির দিন দুঃখের পেছনে দড়ি দিয়ে কাটল, টানাটানি আর টানাটানি—দুটো দিন হাঁফ ছাড়তে দাও। মেয়েরা তো পার হয়েছে, ছেলেকে নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন !'

'ওমা মাথাব্যথা কি সাধ করে হয়, বয়স কত হল বল দিকি। ঐ যে এক জন দোজপক্ষে করলে তা-ও তো তোর চেয়ে ঢের কম বয়সে।'

'তা কি হবে ! আজকাল অমন অনেকে করছে। তেজবরেও তো করে ঢের লোক। একটু সামলে নাও দিকি, দেনাটা একটু কমুক। বৌ মানে তো একটা পেট নয়—এর পর যখন বাচ্ছা কাচ্চাতে শুরু করবে তখন ! কাস্তিটা

সামান্য একটু লেখাপড়ার জন্যে কোথায় পড়ে আছে! এই কি বিয়ে করার সময়।'

তা বটে। চুপ করে যায় শ্যামা।

কান্তি অবশ্য খুব খারাপ নেই। তরুর বিয়েতে এসেছিল। ঢ্যাঙা হয়েছে অনেকটা—তবু খুব রোগা হয় নি। বেশ দেখতে হয়েছে। জামা-কাপড়ও দিব্যি, হেম সেরকম জিনিস কখনও চোখে দেখে নি। গত বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠে প্রাইজ পেয়েছে। সব দিক দিয়েই ভাল। কুস্থান বটে—তা এমন কী আর, কুটুম্বের বাড়ি তো বটে।

খানিকটা পরে বলে, 'আমি যে আর এধারে পারছি না। একা একা।'

'বৌ এসেই কি একেবারে চার চালের ভার নেবে মাথায়। এখন দু দিন থাক—এত বিরক্ত করো না।'

হেম তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে নিয়ে বাইরের চালা-ঘরটার বারান্দায় এসে বসে। তাই কি একটু শান্তিতে বসবার জো আছে, এমন দক্ষিণ-খোলা বারান্দা তা গামড়া ছোবড়া আর নারকোল পাতায় বোঝাই হয়ে আছে। ওরই মধ্যে জায়গা করে নিয়ে বসে বটে কিন্তু কেমন ভয় ভয়ও করে। সাপ-বিছে থাকা বিচিত্র নয় তো।

বেশী রাত হয় নি—আটটা হবে বড় জোর। কিন্তু এরই মধ্যে পাড়া ঘর নিষুতি হয়ে এসেছে। মল্লিকদের কোন কোন ঘরে আলো জ্বলছে—বাগানের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে। স্যাকরাদের বাড়ির দিক থেকে অস্পষ্ট একটা কথা বলার শব্দও কানে আসছে। আর কোন চিহ্ন কোথাও নেই জনবসতির। বিপুল এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সব যেন লেপে মুছে এক হয়ে গেছে। এমন কি ওদের সামনের পুকুরটাও দেখা যাচ্ছে না আর ভাল করে। মধ্যে মধ্যে কাতলা মাছগুলো ঘাই না মারলে পুকুরের অস্তিত্বই টের পাওয়া যেত না।

তবে হ্যাঁ—মানুষের আলো নেই কিন্তু প্রকৃতির আলো আছে। জোনাকি আছে। হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ জোনাকি। দপদপ করে নিভছে আর জ্বলছে। ওর সামনে পুকুর পাড়ের যেখানটা আমড়া গাছে চালতা গাছে আর আমগাছে জড়াজড়ি, তার ওপাশে নতুন বাঁশঝাড়টা উঠছে—সেইখানের সেই জমাট অন্ধকারে যেন জীবন্ত নীহারিকার মত তাল পাকিয়ে ঘুরছে সংখ্যাহীন জোনাকির দল। তাদের সেই লক্ষ লক্ষ অগ্নিকণার ঘুরপাক খাওয়া দেখতে দেখতে দেখতে কেমন যেন ভয় ভয় করে হেমের। মনে হয় মানুষ সংখ্যায়

কত কম—এইসব পতঙ্গের তুলনায়। যদি তেমন কোন দিন আসে, ওরা আর সামান্য একটু শক্তি সঞ্চয় করে—তা হলে মানুষের কী দুর্গতিই না হবে।

এদিকে জোনাকি, ওদিকে ঝিঁঝিঁ পোকা। তার সঙ্গে গাং-ফড়িংগুলোর একঘেয়ে ডানা নাড়ার শব্দ। ঠিক ওর পিছনেই একটা ফড়িং—বোধ করি দেওয়াল আর টিপি করা গামড়ার মধ্যে আটকে গেছে। মনে হচ্ছে পাশে বসে কে বাতাস খাচ্ছে পাখা নেড়ে। জানে ফড়িং—তবু যেন গা ছমছম করে কেমন। মানুষের আশেপাশে কত অসংখ্য প্রাণী রয়েছে কত রকমের, তারা নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে—মানুষের দিকে। মানুষ লক্ষ্য করে না, অবজ্ঞা করে—কিন্তু তারা লক্ষ্য করে যাচ্ছে ঠিকই। হয়তো হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে সুযোগের—যেদিন সময় পাবে সেইদিনই মানুষের এতকালের অকারণ হিংসার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আর করেও তো—মাতাল রমা লাহিড়ীর বৌয়ের থেকেই বুঝেছে সে। বড় মাসীমার বাড়ির কখানা বাড়ি পরেই ওরা থাকত—রমা লাহিড়ী চাবি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, রুগ্না স্ত্রী—কে আবার উঠে দোর দেয় দোর খোলে—এই জন্যে। তার পর পাল্লায় পড়ে দু দিন মদ খেয়েছে বসে বসে কোন্ আড্ডায়, যখন খেয়াল হয়েছে এসে দেখেছে জ্যান্ত মেয়ে-ছেলেটাকে পিঁপড়েতে খাচ্ছে। খুব অসুস্থ, উঠে কোথাও যেতে পারে নি, রাজ্যের পিঁপড়ে এসে ছেঁকে ধরেছে। রমা লাহিড়ী যখন এসেছে তখনও প্রাণটা আছে, ধুক ধুক করছে—কিন্তু তখনই তার চোখ কুরে খেয়ে ফেলেছে পিঁপড়েতে।...

শ্যামার নিজের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। 'ল্যাম্পো' নিয়ে ঘাটে এসেছে বাসন মাজতে। বাসন মাজা শেষ হলে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চাল এনে ধুয়ে রাখবে। হাঁড়িতে জল চাল ঠিক করাই থাকে, উনুনে পাতাসাজানো—ভোরে উঠে আগে একটা দেশালাইয়ের কাঠি জ্বেলে দিয়ে তবে ঘাটে বেরোবে, প্রাকৃতিক কাজের জন্য। মোটা চালের ভাত—সেদ্ধ হতে ঠিক একটি ঘণ্টা সময় লাগে। ভাত আর একটা কিছু ভাতে নেমে গেলে যা হোক একটা তরকারি কি ডাল চাপিয়ে দেয়। পৌনে ছটায় খেতে বসবে হেম—তার মধ্যে অন্তত ভাতগুলো ঠেলবার মত উপকরণও একটু কিছু তৈরী করা চাই!

কষ্ট খুবই। রাত চারটেয় ওঠে—রাত নটার আগে কাজ চোকে না। কিন্তু এখন তাও ছুটি মেলে না। রান্না ঘরের দাওয়ায় বসে এই 'ল্যাম্পো'র

ক্ষীণ আলোতেই নারকোল পাতা চাঁচবে। এক আনা সের ঝাঁটার কাঠি বিক্রি হয়—পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা বন্ধ রাখলে তো চলবে না।

তাই বলে বিয়ে!

নিস্তব্ধ অন্ধকারে বসে বসে নিজের মনের মধ্যেটা দেখবার চেষ্টা করে। না, বিয়ের কথা ভাবতে ভাল লাগছে না আদৌ। নলিনীর স্মৃতি এখনও বড় স্পষ্ট, বড় উজ্জ্বল। ভালবেসেছিল কিনা তা এখনও বলতে পারে না—ভালবাসা কাকে বলে ঠিক জানেও না সে—তবে আজও সেই সব স্মৃতি মনে হলে মনটা উদ্বেল হয়ে ওঠে, মনের মধ্যে দেহের মধ্যে কেমন করতে থাকে, হাত-পাগুলোয় একটা কাঁপন অনুভব করে। এক-এক সময় ইচ্ছে করে ছুটে যেতে সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে। এমনও বোঝায় মনকে, এখন তো আর সে রমণীবাবুর কর্মচারী নয়—এখন আর ভয়টা কি!

আবার মনে পড়ে যায় শেষের দিনের স্মৃতিটা, তাকে পরিহার করে পালিয়ে যাওয়ার কথা—সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেলিত আবেগ শান্ত হয়ে আসে আপনা-আপনিই। ছিঃ! সে কি ভিখিরী, না এতই হেয়? না, দরকার নেই। ভালবাসা হয় সমানে সমানে—ভিক্ষা করে চুরি করে হয় না। তার যদি পয়সার জোর থাকত তা হলে কি আর সে এমন অবহেলা করতে—অবহেলারও বেশী, এড়িয়ে চলতে পারত। তা ছাড়া এ পথের এই দস্তুর। পয়সা দিয়ে কিনতে হয় যে জিনিস—বিনা পয়সায় তা চাওয়াই অন্যায়।

না, ওপথে আর যাবে না। তার চেয়ে তার যেমন অবস্থা সেই মত থাকবে। বিয়েই করবে। বৌ অন্তত তাকে অবজ্ঞা করতে এড়িয়ে যেতে সাহস করবে না, তার ভালবাসায় খাদ থাকবে না। স্বামী-স্ত্রীর ভাগ্য এক সঙ্গে জোড়া।

তবু ঠিক এখনই সে কথা যেন ভাবা যাচ্ছে না।

তার বৌ - তাকে যে মেয়ে দেবে—সে মেয়ে কেমন আর হবে। এই পাড়াগাঁয়েরই কালো কোলো একটা মেয়ে, যে না বুঝবে দুটো রসিকতা না বুঝবে তার সুখ-দুঃখ। যে শুধুই খাটবে খুটবে খাবে এবং সেবা করবে।

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায় রাণী বৌদির কথা।

যত দেখছে অবাক হয়ে যাচ্ছে। কী প্রাণ-প্রাচুর্য! চোখেমুখে কী প্রখর বুদ্ধির আভা! অথচ মনটা কি মিষ্টি। চোখের চাহনিতে মানুষের প্রয়োজন বুঝে নেয়, আর সে, প্রয়োজন মেটানোতেই যেন তার সবচেয়ে

আনন্দ। যতক্ষণ হেম থাকে ওদের বাড়িতে, যেন কী এক মধুর স্বপ্নে সময় কেটে যায় ওর—হাসিতে ঠাট্টাতে গল্পে মাতিয়ে রাখে সমস্তক্ষণ। তার কৌতুক প্রতি মুহূর্তে বিচ্ছুরিত হতে থাকে চারদিকে, হাসিতে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ ওঠে। এত কথাও জানে। মনে হয় দিনরাত বসে বসে শুধু ওর কথা শোনা যায়—অনন্তকালেও যেন শ্রান্তি আসবে না।

সকলের কী আর জোটে অমন বৌ! ও মেয়ে দুর্লভ! দাদার ভাগ্যটাই ভাল। সে বৌ-ও ভাল ছিল, অবহেলায় কোন দিন সেদিকে তাকাল না দাদা—আর এ তো অমূল্য রত্ন—কিন্তু তাই কি এর দামও পুরোটা বোঝে।...

শরতের অসহ্য গুমোট—তবু তার মধ্যেই সারা দিনের পর ভাত পেটে পড়ায় চোখ দুটো তন্দ্রায় ভারী হয়ে আসে। কেমন যেন ঘুমে জাগরণে চিন্তায় কল্পনায় স্বপ্নে একাকার হয়ে যায় মনের মধ্যে।...

মার বাসন মাজা শেষ হয়ে গেছে। ধুয়ে ধুয়ে তুলছে তালের গুঁড়ির পৈঠেতে। ধোওয়ার সময় জলে নাড়া পেয়ে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে পুকুরে! তাতে ল্যাম্পোর আলোটা পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ভাঙা ভাঙা অসংখ্য আলোর ঢেউ। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় হেমের মনে হল আসলে রাণী-বৌদিরই হাসি ওগুলো, আলোর তরঙ্গ তুলে শতখণ্ডে ভেঙে ভেঙে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে।

না, এখন তার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

অঘ্রানের গোড়াতেই কোথা থেকে নরেন এসে পড়ল। স্বামীকে দেখে এত আনন্দ বোধ হয় শ্যামার কখনও হয় নি। একা একা এই এত বড় বাড়িতে থাকা সারা দিন, আর ভূতের মতন পরিশ্রম করে যাওয়া—এ যেন আর ও পেরে উঠছে না কিছুতেই। তেমনি হেমেরও হয়েছে আজকাল—রোজই ফিরতে রাত হচ্ছে। তাও যদি ওপরটাইম করে রাত করত তো শ্যামার একটা সান্ত্বনা থাকত। দুটো পয়সা আসত তাতে। এ শুধুই আড্ডা. জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'এই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দুটো গল্পগুজব করছিলুম।' কিন্তু শ্যামা জানে বন্ধুবান্ধব কিছুই নয়, প্রত্যহ সে আজকাল বড় মাসীর কাছে যায়। টানটা কোথায় তাও ও বোঝে। ওর বয়েস হয়েছে ঢের, মানুষ দেখে দেখে কিছুই আর বুঝতে জানতে বাকি নেই। 'ডবকা হল ছোঁড়া তো ছুঁড়ীর হল গোঁড়া!' যে বয়সের যা। ঐদিকে টান না হলে আর প্রত্যহ হাওড়া থেকে সিমলে, সিমলে থেকে হাওড়া হাঁটতে পারত না। সবই জানে শ্যামা—তবে এ নিয়ে কেজিয়া করতে ইচ্ছে করে না। সম্পর্কটা বড্ড তেতো হয়ে যায়। তা ছাড়া ভয়েরও কিছু নেই। বৌমা ঠিক সে ধরনের মেয়ে নয়, অবসরও কম ও বাড়িতে। দিদি তো দিনরাতই বাড়িতে বসে। কথা গান কীর্তন এসব শুনতেও কখনও কোথাও যায় না। আর সবচেয়ে বড় কথা, পয়সা খরচ নেই। মাসের শেষে মাইনের পাই পয়সা এনে ধরে দেয় হেম। মাসকাবারী টিকিটের টাকা আর যখন যা দরকার হয় বলে চেয়ে নেয়! এ ছাড়া আট আনা চার আনা নেয় মধ্যে মধ্যে—বলে, 'বন্ধুবান্ধবরা পাঁচ দিন খাওয়ায়, তাদের না খাওয়ালে চলে না। তা আমি আর কি খাওয়াই—বেগুনি প্যাঁজের বড়া বড় জোর!' শ্যামা হাসে মনে মনে—বেগুনি প্যাঁজের বড়া ছাড়া ও পয়সাতে কিছু কেনা যায় না ঠিকই, বড় জোর দুখানা হিংয়ের কচুরি—কিন্তু সেটা যে কোথায় যায় তাও শ্যামা জানে। বৌমা ভরা পোয়াতি।

এই অবস্থায় নরেনকে পেয়ে যেন বেঁচে গেল ও।

কিন্তু এ কী অবস্থায় এল সে!

রোগা কাঠি হয়ে গেছে। পেটটা জয়ঢাক। হাত-পাগুলো ফোলা ফোলা, মাথার চুল একেবারে পাতলা হয়ে গেছে। চোখের কোল ফুলেছে। সন্থ শোথের লক্ষণ।

শঙ্কিত হয়ে উঠল শ্যামা, বুকের মধ্যেটা ঢিব্ করে উঠল সেদিকে চেয়ে— যতই হোক লোকটা আছে তাই হাতের লোহাগাছটা আছে, সিঁথিটাও সাদা নেই। সাত পাতের কুড়িয়ে যা-তা খেয়েও চলে যাচ্ছে। রোদে পুড়ে জলে ভিজে, সারা দিন বাগানে ঘুরে, গাছে ঠেকো দিয়ে আর পাতা কুড়িয়ে, যা ছিরির চেহারা হয়েছে—এর পর শুধু হাত আর সাদা সিঁথি হলে একেবারেই কাঠকুড়ুনী বলবে লোকে। তার চেয়েও বড় কথা হল, লোকটা পাজী হোক, বদমাইশ হোক—চিরজন্মের সাথ। অন্য কোন পুরুষের দিকে চাইবার কখনও অবসরও হয় নি, প্রবৃত্তিও হয় নি, আশা আকাঙ্ক্ষা না হোক, জীবনের কামনা বাসনার দিকে যদি কখনও ক্ষণকালের জন্যও কোন আনন্দ কোন তৃপ্তি পেয়ে থাকে তো—এই লোকটাকে উপলক্ষ করেই পেয়েছে। এখনও তাই কোথায় মনের গোপন কোণে একটু কোমলতা একটু মায়া আছে লোকটা সম্বন্ধে।

কিন্তু মনে যাই হোক, মুখে বেশ খানিকটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতেই বলে, 'বাঃ, চেহারা তো বেশ খুলিয়ে আসা হয়েছে দেখছি, এবার আর কি—খাটে তুললেই তো হয়!'

কে জানে কত দূর থেকে হেঁটে এসেছে, ক্লান্ত দেহে হেঁটে আসার ফলে হাপরের মত হাঁপাচ্ছিল নরেন, কোনমতে রান্নাঘরের দাওয়াটাতেই বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে 'হুঁ! তা তেমন অবস্থা না হলে আর এ যমপুরীতে আসবই বা কেন!'

'বলি স্বর্গপুরীতে থেকেই তো এমনি চেহারা খুলিয়ে আসা হয়েছে, তা সেখানে আর কটা দিন চেপে থাকলেই তো একেবারে খাঁটী স্বর্গে চলে যেতে পারতে। মিছিমিছি এ যমপুরীতে কষ্ট করতে আসবার দরকার কী ছিল!'

'নইলে তোর স্বর্গবাসের উপায় হয় না যে। দিনকতক সোয়ামীর গু-মুত ঘাঁট, নইলে পরলোকে গিয়ে কি জবাব দিবি?'

তার পর হাতের ময়লা পুঁটলিটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'নে, চুপ কর্ এখন— আসা-মাত্তর ফ্যাচফ্যাচানি শুরু করেছে। একটু তামাক সাজ দিকি! ঐতে সব আছে—'

'হ্যাঁ তা আর নয়। মেয়েরা কেউ নেই—এক হাতে জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ সব করছি, তার মধ্যে তোমার তামাক সেজে দিতে বসি। ওসব চলবে না, খেতে হয় সেজে খাও।…কত্তার মত রোজগার করব, বিষয়-সম্পত্তি দেখব, গিন্নীর মত রান্নাবান্না করব, ঝিয়ের মত ঘরবাড়ির পাট করব, বাসন মাজব, ক্ষার কাচব, আবার খানসামার মত তামাক সাজতে বসব—এমন নিকড়ে গতর আর নেই, আমারও বয়স হয়েছে!'

'মাইরি দে বামনী, এতটা হেঁটে এসে—তবু বসতে বসতে এসেছি, এই সিদ্ধেশ্বরীতলাতেই আধ ঘণ্টার ওপর বসতে হয়েছে—তাও হাঁপ ধরেছে দেখছিস, বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। এইবারটি অন্তত সেজে দে, এখন আর পাচ্ছি না, চোখে যেন ধোঁয়া দেখছি সব!'

অগত্যা শ্যামা পুঁটলিটা খুলে নেয়। নরেনের একটা হুঁকো বাড়িতেই থাকত, সেটা ওখান থেকে এখানে আনতে ভোলে নি শ্যামা, কিন্তু তামাক নেই ঘরে। কলকেটাও ভেঙে গেছে এক দিন পড়ে গিয়ে—নরেন আর আসে না, এনে রাখবার কথাও মনে হয় নি তাই। তা ছাড়া হুঁকো কলকে তামাক সর্বদা তার সঙ্গেই থাকে—বলতে গেলে ঐগুলোই যথার্থ তার জীবনের সাথীসঙ্গী—সুতরাং জানত যে সে এলে নতুন কলকেও আনবে।

'তা সে আঁটকুড়ীর বেটীরা গেল কোথায় সব?' একটু দম নিয়ে—এবং শ্যামা তামাক সাজতে বসায় কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে—প্রশ্ন করে নরেন।

'যাবে আবার কোথায়, যে যার শ্বশুরবাড়ি। তরুর বিয়ের আগে থেকি রাগ করে নিজের শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। এখন তাদের কন্না করার লোক চাই তো—বড় বোয়ের নাকি তাই খুব আদরও হয়েছে।'

'তরুটারও বে হয়ে গেছে! ইস্। জানতে পারলে আসতুম। কত কাল যে বিয়ে-বাড়ির খ্যাঁট জোটে নি অদেষ্টে!'

'মুখে আগুন! নিজের মেয়ের বে, তা কেমন পাত্তর হল, কোথায় পড়ল তা জিজ্ঞেস করা চুলোয় গেল—খ্যাঁটের চিন্তা। ঐ তো চেহারা, উদুরী ধরিয়ে বসে আছ যা বুঝতে পারছি—খ্যাঁট হজম হত?' মুখনাড়া দিয়ে বলে শ্যামা।

কিন্তু যে ধরনের উত্তর আশা করেছিল ওদিক থেকে সে ধরনের উত্তর এল না। খালি উঠোনের কাঁটাল চারাটার দিকে কেমন এক রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেই হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে নিতে বললে নরেন, 'কোন

ছেলেমেয়েরই কখনও খবর নিলুম না, আজ আর নিয়ে কি করব বল্। যা ভাল বুঝেছিস করেছিস—যেমন পাত্তর জুটেছে দিয়েছিস—অদেষ্টে থাকে ভোগ করবে, আর তোর মত পোড়া বরাত হয় তো জ্বলবে। আমার শাশুড়ী মাগীও তো খারাপ দেখে দেয় নি। তোর কী হাল হল তা তো দেখলিই। ও নিয়ে আর আমি ভাবি না।'

ওর কথা বলবার ধরনে একটা কী ছিল, শ্যামা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল, হঠাৎ কিছু জবাব দিতে পারলে না।

নরেন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তামাক টানবার পর একটু সুস্থ হয়ে চার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাড়িটা মন্দ করিস নি কিন্তু—মাইরি, তোর মাথা খুব। আমাদের যথাসর্বস্ব যখন গেল তখন যদি তুই একটু সেয়ানা হতিস, তা হলে হয়তো সব যেত না।'

তার পর আর গোটা দুই টান দিয়ে বললে, 'বরাত! বুঝলি, সবই বরাত। নইলে অমন বুদ্ধি হবে কেন! তুই এখানে এই ইন্দির ভবন করেছিস তা তো জানি না—শুনেছি বাড়ি করেছিস, কিন্তু সে যে এমন পাকা বাড়ি, বাগান পুকুর তা ভাবি নি। ওঃ, যা কষ্ট গেল ক মাস! অসুখে ভুগছি—এ সময় কোথাও কেউ আশ্রয় দিতে কি চায়? পথে পথেই কাটল বলতে গেলে। হঠাৎ খেয়াল হল তাই, লোককে জিজ্ঞেস করে করে চলে এলুম। ভাবলুম কে জানে শরীরের এই অবস্থা—হয়তো কোথায় কোন্ দিন মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকব—তোদের সঙ্গে দেখাও হবে না। আর বাড়ি একটা করেছিস যখন, এক বার দেখেও নিই!'

হঠাৎ যেন শ্যামার চোখে জল এসে যায়। বহু দিনের শুষ্ক রুক্ষ চোখে তপ্ত জল ভরে আসে। প্রাণপণে অন্য দিকে চেয়ে সে-জল সামলে নেয় সে। তার পর গলাটা সহজ করার চেষ্টা করতে করতে অর্ধ বিকৃত কণ্ঠে বলে, 'কেন, রাজ-অট্টালিকা না জানলে বুঝি আসতে নেই? যদি মাটির ঘরই হত—তাতে কি তুমি থাকতে পারতে না!'

'না, তা নয়।' একটু যেন অপ্রতিভই হয়ে পড়ে নরেন—যা এর আগে আর কখনও ওকে হতে দেখে নি—বলে, 'তা নয়। মনে হত কোন মতে একটু হয়তো মাথা গোঁজার কুঁড়ে ঘর করেছিস—ছেলেমেয়ে, ঐন্দ্রিলাটা আছে মেয়ে সুদ্ধ—তার মধ্যে কোথায় আর গিয়ে সেঁধুব! শুধু অশান্তি বৈ তো নয়!'

দুঃখের মধ্যেও কুট্ করে জবাব দেবার লোভ সামলাতে পারে না শ্যামা, 'থাকতে তো তুমি কখনই আসতে না। পরের বাড়িতে—তাই তো এসেছ চলে গেছ এমন কত বার। তা নিজের বাড়ি না হয় থেকেই চলে যেতে!'

'না রে—বুঝিস না। শরীর ভেঙে এসেছে, চিত্রগুপ্ত হুলিয়া বার করেছে এবার। কবে বলতে কবে এসে ক্যাঁক করে চেপে ধরবে। এখন একটু একটু সেবা খাবারও লোভ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে এসে পড়লে আর হয়তো নড়তে চাইতুম না!'

আবারও বুকের মধ্যেটা কেমন করে ওঠে শ্যামার। তাই, মনটাকে শক্ত করবার জন্যই বুঝি কর্কশ কথা টেনে আনে মুখে। বলে, 'সাত জন্মের পাপ তোমার—তাই! নিজের বৌ, নিজের ছেলে, নিজের নাতনী তার মধ্যে এসে থাকবে, একখানা ঘরই বা কি আধখানা ঘরই বা কি! আমরা যেমন ভাবে মাথা গুঁজে থাকতুম তুমিও তাই থাকতে, তোমাকে কি তাড়িয়ে দেওয়া হত! আপনার তো মনে করতে পারলে না কোন দিন তার কি হবে!'

নরেন আর জবাব দেয় না, অন্যমনস্ক ভাবে হুঁকোয় টান দিতে থাকে। কল্‌কের আগুন কখন নিভে এসেছে, ভেতরের তামাকও গিয়েছে পুড়ে ঠিক্‌রে হয়ে—তা বুঝতেও পারে না।

॥ ২ ॥

হেম যখন রাত্রে বাড়ি ফিরল তখন নরেন রান্নাঘরের দাওয়াতে খেতে বসেছে, শ্যামা সামনে বসে খাওয়াচ্ছে।

দৃশ্যটা এতই অভাবনীয়—বিশেষত দরজার কাছ থেকে একটা দিক মাত্র দেখা যাচ্ছিল নরেনের, ল্যাম্পোর ক্ষীণ আলোতে সেভাবে চেনা সহজ নয়, আর নরেন এত দিন বাড়ি আসে নি, তাকে দেখার সম্ভাবনাটাও ছিল সুদূর কল্পনার বাইরে—কাজেই হঠাৎ একটা লোককে মা এত যত্ন করে সামনে বসে খাওয়াচ্ছে, অথচ পরিচিত কেউ বলেও মনে হচ্ছে না—চমকে ওঠবারই কথা। হেমও চমকে উঠল। খানিকটা গলা-খাঁকারি দিয়ে দরজার কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

সেই আধা-আলোতে আধা-অন্ধকারে চিনতে পারলে না নরেনও। ও:

সেই কাশির শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই চমকে উঠল, হাতের গ্রাস হাতেই ধরে ফিরে বসে প্রশ্ন করলে, 'মশাই ? চিনতে পারলুম না তো !'

'পোড়া কপাল ! এমনি সম্বন্ধই দাঁড়িয়েছে বটে, বাপ ছেলেকে চিনতে পারে না, ছেলে বাপকে চেনে না। ও তো খোকা।'

'খোকা ? ও, আমাদের হেমচন্দর !...এসো এসো বাবাজী, এসো। বাবুই বলি—রোজগেরে বাবু যখন !'

সে আবার ফিরে বসে মুখের গ্রাস মুখে তুলল।

বাপকে দেখে পুলকিত হবার কথা নয়, তবে বাবার কথাবার্তায় এবং মার ধরন-ধারনে সে একটু বিস্মিত হল। এ যেন কেমন অন্যরকম স্বর দু জনেরই গলায়।

হেম আসবার সময় বড়বাজার থেকে খানিকটা ডালের ক্ষুদ কিনে এনেছে—শ্যামা এক-এক দিন ভিজিয়ে বড়া করে, চালের ক্ষুদের সঙ্গে মিশিয়ে সরুচাকলিও সেইগুলো নামিয়ে রেখে দাওয়ারই এক পাশে বসল একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে।

'উঃ—কত কাল পরে বাড়ি এলুম, তোমার জননীর হাতের রান্না খাব বলে—তা তোমার গর্ভধারিণী কোথা থেকে গাঁদালপাতার ঝোল বেঁধে বসে আছেন—কাঁচকলা আর ডুমুর দিয়ে। তবে মাগী রাঁধে ভাল, অনেক দিন পরে খাচ্ছি বলে আরও—অমর্ত লাগছে যেন !'

'তা কী করব—রোগটি তো বেশ ধরিয়ে এসেছ—শুধু কাঁচকলার মণ্ড খেয়েই তো থাকা উচিত।'

'তুই রেখে বোস্ দিকি। কাঁচকলার মণ্ড খেয়ে থাকাচ্ছি আমি ! একটা-দুটো দিন—এর বেশী আর এ পথ্যি চলছে না।'

খেয়ে উঠে শ্যামার হাত থেকে ঘটিটা নিয়ে আঁচাতে আঁচাতে বলে নরেন, 'এবার আর একটু তামাক দে বাপু, উনুনে তো আঙ্‌রা আছেই। বাস্তবিক, কীই বা বলি। একা এক হাতে। তা পুত্রের এবার বিবাহ দাও গিন্নী, আর কেন ?'

'ছেলে যে বিয়ে করতে চায় না !'

'ছেলে চায় না ! ছেলে আবার চাইবে কি ? আমরা হলুম ওর অভিভাবক, আমরা সম্বন্ধ ঠিক করব—সুড় সুড় করে গে পিঁড়িতে বসবে। ওর চাওয়া-চাওয়ির কি ধার ধারি !'

হেম বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

'মা গামছাটা দাও। ঘাটে যাই। আর ও আরও ভাত বাড়। বাজে কথা শোনবার সময় নেই ওসব।'

'ও,—মিলিটারী মেজাজ! রোজগেরে বাবু যে। আচ্ছা, হচ্ছে হচ্ছে। মেয়ে আগে একটা লাগসই খোঁজ করি, তার পর দেখছি। মেজাজ বুঝছি। দে, তামাক দে বামনী।'

হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে বাইরের ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসে। ঐখানেই ওর শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে শ্যামা।

হেম গামছা নিয়ে ঘাটে চলে গেল। তার বিস্ময়ের শেষ নেই। মার এত নরম হয়ে আসার কারণটা ঠিক বুঝতে পারছে না। নরেনের চেহারা খারাপ হয়ে গেছে এটা দেখেছে সে—কিন্তু সে খারাপ কতখানি তা বুঝতে পারে নি অন্ধকারে। আরও অবাক হচ্ছে সে বিধাতার যোগাযোগ দেখে। আজই রাণী বৌদি বলছিল, 'সত্যি, মেসোমশাইকে কখনও দেখলুম না, বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। যে সব গল্প শুনেছি মার মুখে আর তোমার দাদার মুখে—দেখবার মত মানুষ বটে। কোথায় থাকেন একটু খোঁজ করো না ভাই—'

'জানলে তো খোঁজ করব। কোথায় থাকেন এক ভগবান ছাড়া কেউ জানে না।'

'আচ্ছা—আসবেন তো এক দিন না এক দিন। খবর পেলেই আমি গিয়ে দেখে আসব, নয়তো ধরেই নিয়ে আসব এখানে। আমি গেলে ঠিক চলে আসবেন দেখো।'

'এনে কি করবে? পুষবে?' হেসে প্রশ্ন করেছিল গোবিন্দ।

'ওমা পুষব কি কথা! মেসোমশাই গুরুজন। মাথায় করে রাখব। তাতে দোষই বা কি?'

'দোষ কিছু নয়। তবে ঘটিবাটি সাবধান। পোষ মানবার মানুষ সে নয়।'

'ছি ছি। কী বল যা-তা কথা। মুখের রাখঢাক নেই! ঠাকুরপো বসে আছে, ওর বাবা তো বটে।…তা ছাড়া ত্যাখ বয়স হচ্ছে, শরীর ভেঙে আসছে, এবার ঘরমুখো মন হবে,—সেবার দরকার যে এখন!'

কথাগুলো যখন হচ্ছিল হেম তখন এক বারও ভাবে নি যে বাড়ি এসেই বাবাকে দেখতে পাবে আর এমন নরম মেজাজে দেখবে। শরীরের অবস্থা

খারাপ বলেই হয়তো। সত্যিই এবার হয়তো ঘরমুখো মন হয়েছে। ঐ লোক দিন-রাত বাড়ি বসে থাকবে আর অবিরত বাজে বকবে—মনে হলেই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। অথচ মার যে রকম ভাবগতিক—এবার তাড়াবার মত মনের ভাব নয়! বোধ হয় একা থাকে বলেই আরও। খবর পেয়ে যদি সত্যিই রাণী বৌদি এসে যায়? সব পারে ও মেয়ে। মুখে হয়তো খুব যত্ন-আত্তি করবে, ভক্তি-শ্রদ্ধাও দেখাবে কিন্তু মনে মনে··? ওরই ছেলে মনে করে হেম সম্বন্ধেও কি একটা খারাপ ধারণা হবে না?

কথাটা ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

অবশ্য রাণী বৌদির বুদ্ধি খুব। বয়স কম হলে কি হবে, অভিজ্ঞতা কারুর চেয়ে কম নয়। মানুষ চেনে খুব। সত্যি এই বয়সে এত জ্ঞান কি করে হল, ভাবতেও অবাক লাগে আর কী মায়া– সকলকেই যেন আপন করে টানতে চায়।···

'ল্যাম্পো'র শিখাটা হেমন্তের কুয়াশাঘন রাত্রে কেমন যেন আব্‌ছা আব্‌ছা দেখায়। হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাণী বৌদির কথাই ভাবে হেম, মুখহাত ধোওয়া আর হয়ে ওঠে না।

অন্ধকারে উঠানে দাঁড়িয়ে শ্যামা নরেনের সঙ্গে কথা বলছিল—সেইখান থেকেই হেঁকে বলে, 'কী রে হিমে কতক্ষণ খালি গায়ে থাকবি? এত কিসের মুখহাত ধোওয়া?'

'এই যে যাই।' হেম কোনমতে একটা কুলকুচো করেই জল থেকে উঠে আসে, মুখের ওপরটা কি হাত দুটো ভাল করে ধোওয়ার কথা মনেও পড়ে না।

॥ ৩ ॥

নরেন শ্যামাকে ভরসা দিয়েছিল যে তার সন্ধানে অনেকগুলি ভাল পাত্রী আছে, দুটো একটা দিন একটু সময়মত নেয়ে খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেই ও বেরোবে মেয়ে দেখতে। কিন্তু দুটো-একটা দিন কাটাবার পর—নিয়মমত শ্যামার গাঁদালঝোল ভাত সত্ত্বেও—বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ল। হাত-পা আরও ফুলে গেল, ঘর থেকে দাওয়াতে বেরোবার মত শক্তিও আর রইল না।

নরেন বলে, 'বুঝলি বামনী ভগা, ভগার খেলা এসব। আর দুটো দিন দেরি করলেও পথে মুখ থুবড়ে পড়তে হত। এতটা পথ হেঁটে খোঁজ করে করে আসবার আর শক্তি হত না। নিহাত মা বাপের পুণ্যের জোর আছে তাই পথের মধ্যে গুয়ে-মুতে পড়ে মরতে হল না। আর তোরও অদেষ্টে আছে ভোগান্তি।'

আবার কখনও বলে, 'তুই গাঁদালঝোল খাইয়েই আমাকে পেড়ে ফেললি। এ তোর আড়ি-আকোচ আমি স্পষ্ট বলতে পারি। আমাকে জব্দ করবি বলেই—। আমার হল গে অত্যাচারের দেহ, এ কখনও তোয়াজে ভাল থাকে? এত করে বললুম দুখানা বড়া ভেজে আমাকে একটু বড়ার ঝোল করে দে, নিদেন প্যাঁজ কুচিয়ে এখনকার একটা নতুন বেগুন পুড়িয়ে দে—তা দিলি নি। খাওয়া তো এবার ঘুচে এল।'

গজগজ করে আপনমনেই। ভাতের থালা দেখলেই ঝগড়া করে—গালাগাল দেয়।

'কী ও—গাঁদালঝোল? কোন্ গুয়োটা খায় দেখি। সরিয়ে নিয়ে যা, সরিয়ে নিয়ে যা! আমি খাব না। উপোস করে পড়ে থেকে গোহত্যে ব্রহ্মহত্যে হব বলে দিলুম।'

আবার খানিকটা হাউ হাউ করে কাঁদে, 'বামনী—অক্ষ্যাম হয়ে এসে তোর দোরে পড়েছি বলেই কি এমনি শোধ নিতে হয়? আমাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবি? ঐ কি কেউ খেতে পারে?'

'না তা পারবে কেন! শোথ ধরিয়ে এসে এখন কালিয়ে পোলাও খাবেন! নাও ওঠ খাও বলছি ভাল চাও তো নইলে হেম এসে টেনে ঐ পাঁদাড়ে ফেলে দিয়ে আসবে। শ্যাল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে জ্যান্তে, এত বড় বড় গো-হাড়গেল, খুবলে খুবলে খাবে, উঠে পালাবারও তো ক্ষমতা নেই। ওঠ, খেতে বসো।'

কখনও ধমক দিয়ে, কখনও ভুলিয়ে, কখনও বা ভবিষ্যতের আশা দিয়ে সেই গাঁদালঝোল আর গলাভাতই খাওয়ায় শ্যামা। রাত্রে মরি বাঁচি করে বালিরও ব্যবস্থা করেছে, পাড়ার লোকে বলেছে কাঁচা পেঁপে সেদ্ধ খাওয়াতে—অনেক পয়সার মায়া ত্যাগ করে তাও পেড়েছে সে গাছ থেকে, তবু যেন দিন দিন শয্যাগতই হয়ে পড়ছে নরেন।

শেষকালে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে ডাক্তার-বদ্যি একটা কিছু না দেখালেই

নয়। অথচ পয়সা খরচা করে ডাক্তার দেখাবার কথা এখন ভাবাও যায় না—মাথার ওপর 'অসুমর' দেনা। পাড়ায় মল্লিকদেরই এক জ্ঞাতি বই দেখে একটু আধটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেন—তিনিও নাকি আজকাল আট আনা ভিজিট করেছেন, এক আনা করে ওষুধের পুরিয়া। তাই যদি খরচ করবে তো পাল্কি ভাড়া করে সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাবে না কেন? মৌড়ীর হাসপাতাল যাওয়া-আসা এক টাকা রেট, তেমন দরদস্তুর করলে বারো আনাতেই রাজী হয়ে যায়। কিন্তু সে-ও ঢের। ওদের যা অবস্থা, মরণাপন্ন রোগীর ক্ষেত্রেও বিবেচনা করতে হয়। সদ্য তরুর বিয়েতে দেনা আরও বেড়েছে জামাইয়ের কাছে, শোধের উপায় একান্ত সীমাবদ্ধ।

কিন্তু হেম অবধি চিন্তিত হয়ে পড়ে। শেষে একটা রবিবার দেখে কোনমতে ধরে ধরে রাস্তার ধারে বসিয়ে বসিয়ে—বলতে গেলে সম্পূর্ণটা বয়ে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে হাজির করে। তারা একটা মিক্সচার দেয়, আর কি বড়ি। চিঁড়ের মণ্ড সিঙ্গি মাছের ঝোল পথ্য ব্যবস্থা।

ওখানে ওরা এসে বসে আছে কার মুখে খবর পেয়ে অভয়পদ ছুটে এল। তাদের বাড়িতে নিয়ে রাখবার প্রস্তাব করলে সে। কাছাকাছি থাকলে হাসপাতালে দেখাবার সুবিধা হবে—এই তার যুক্তি। কিন্তু হেম রাজী হল না। বাবাকে তার এখনও বিশ্বাস হয় না, শুধু বোন ভগ্নিপতি হলেও কথা ছিল, বাড়িতে আরও পাঁচ জন আছে, দুর্গাপদর নতুন বৌ, মেয়েরা এক জন না এক জন সপরিবারে থাকেই—মিছিমিছি তাদের কাছে কুটুমবাড়িতে থাকতাই।

নরেন নিজেও রাজী হল না অবশ্য, 'না বাবাজী, শরীরের যা অবস্থা হয়েছে—হয়তো মাঠে ঘাটে যাবার অবস্থাও থাকবে না বেশী দিন। সেখানে মাগী করতে বাধ্য কিন্তু এখানে কে ওসব করবে বল? ভরসার মধ্যে তো কন্যা—তা তারও তিন-চারটে নেণ্ডিগেণ্ডি, সেইসব সামলাবে না সংসারের কাজ করবে—না আমাকে দেখবে!··না, এখন থাক, একটু সেরে উঠি তার পর বরং এসে তোমাদের বাড়ি প্রসাদ পেয়ে যাব।'

ফেরার পথে কিন্তু ওভাবে আর ফিরতে দেয় না অভয়। একটা পাল্‌কি ডেকে তাতে তুলে জোর করে ভাড়ার পয়সাটা হেমের হাতে গুঁজে দেয়।

অনেক দিন অনেক কিছুই এই ভগ্নিপতির হাত থেকে হাত পেতে নিতে

হয়েছে, এখনও হচ্ছে। মিছিমিছি এই সামান্যর জন্য প্রতিবাদও বেশী করতে ইচ্ছা হল না। আট আনা পয়সা হাত পেতেই নিলে।

অভয়ের মুখে খবর পেয়ে মহাশ্বেতা এল বিকেলবেলা বাপকে দেখতে। তার অভ্যাসমত কোলে একটা ও হাতে একটা ছেলে নিয়ে।

নরেন তখন এক ছিলিম তামাক নিয়ে বাইরের রকে এসে বসেছে কিন্তু হুঁকোয় টান দিতে পারছে না—দুপুরের খাওয়ার পর সন্ধ্যে অবধি হাঁপানির ভাবটা থাকে বড় বেশী—বসে বসে হাঁপাচ্ছে। মহাশ্বেতা এসে প্রণাম করে ছেলেদের বললে, 'গড় কর সব—বেশ করে পায়ে হাত দিয়ে গড় কর!'

নরেন অবাকও হল, ব্যস্তও হয়ে উঠল।

'কে মা আপনি—কৈ আপনাকে তো—ও আপনি বুঝি এই চটখণ্ডীদের কেউ হন? না কি চৌধুরীদের? মানে আমি তো ঠিক থাকি না এখানে—'

মহাশ্বেতা এতখানি জিভ কাটে।

'পোড়াকপাল! ছেলেমেয়েদের পর করে দিতে হয় বলে কি এমনি করেই পর করতে হয়! নিজের মেয়েকেও চিনতে পারলে না! আমি যে মহা!'

'অ, মহা। বেশ বেশ, বড় খুশী হলুম। হ্যাঁ, জামাইয়ের সঙ্গেও দেখা হল যে। মহা ভক্তিমান ছোক্‌রা। সেই হাসপাতালেই প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলেন। এই যে আমার পুত্র, হেমচন্দ্র কৈ এক দিনও তো দেখি না একটা কাঠি করে একটু পায়ে হাত দিতে। কলি, কলি—ঘোর কলি। না-ই বা রইলুম বাড়িতে, জন্মদাতা পিতে তো বটে! না, জামাইয়ের ভাল হবে, খুব উন্নতি হবে মানুষের মত মানুষ। নিয়ে যেতে চাইছিলেন বাড়িতে—বলছিলেন, ওখানে থাকলে হাসপাতালে দেখাবার সুবিধে হবে। হেমচন্দ্রেরও তাই ইচ্ছে ছিল—বুঝলে না, যা শত্রু পরে পরে—কিন্তু আমি রাজী হই নি, বলি, আমার তো একটা বিবেচনা আছে। যেখানে সে মেয়েটা কতকগুলো এণ্ডা-বাচ্ছা নিয়ে নাটা-ঝাপ্‌টা খাচ্ছে, তার মধ্যে গিয়ে উৎপাত বাড়ানো আমি রাজী হই নি!'

তার পর নিবন্ত হুঁকোতেই গোটা-দুই টান দিয়ে একটা হাঁক দেয়, 'কৈ গো গিন্নী, কোথায় গেলে গো, একটা আসন-টাসন দাও—এঁরা সব দাঁড়িয়ে

রইলেন যে! দেখছেন তো, দেখছেন তো মাগীর বিবেচনা, চিরকাল এই করে আমার হাড়মাস জালিয়ে খেলে। বিবেচনা বলতে কিছু নেই! আপনারা এসে দাঁড়িয়ে রইলেন—একটা আসন দেবে কি কিছু—। তা বরং এখানে বসতে পারেন, বিলিতী মাটির মেঝে, দিব্যি পোষ্কার!'

'ও মা, আমাকে আবার আপনি-আজ্ঞে করছ কি গো! বললুম না আমি মহা—!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—তা কি আর আমি বুঝি নি। বলি আমার তো আর ভীমরতি হয় নি। করতে হয়, ছেলেমেয়েকেও আপনি-আজ্ঞে করতে হয়। ছোটটি থাকে যখন তখন তুই তোকারি চড়-চাপড়—বড় হলে একটা অন্য ব্যবস্থা—! বোস বোস, এই তোরা বোস না সব?'

ছেলে দুটো কোন মতে আড়ষ্ট হয়ে বসে সামনে। মহাশ্বেতা কিন্তু এক দৌড়ে ভেতরে চলে যায়। শ্যামা তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে নারকোল পাতা চাঁচছে—সেখানে গিয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'ও গো মাগো, বাবার যে পুরো ভীমরতি গো—আমাকে বলে আপনি, বলে বসুন—বাবা আর বাঁচবে না এ যাত্রা!'

বলেই ভ্যাঁক্ করে কেঁদে ফেলে মহাশ্বেতা।

নিজের মনের আশঙ্কাটা মেয়ের মনে প্রতিধ্বনিত হতে দেখে শ্যামার বুকটাও ধক্ করে ওঠে হয়তো—কিন্তু সে বিরক্ত মুখেই বলে, 'ও আবার কি, এখন থেকেই প্যান প্যান করছিস কেন! খেলে যা! এরকম অসুখ-বিসুখ করলে মাথার একটু গোলমাল হয়ই। আর যদিই বা তাই হয়, তাতেই বা এখন থেকে কান্নাকাটির কী হয়েছে। যা গুণের মানুষ! দুঃখে শ্যাল কুকুর কাঁদবে।'

'ও মা—তা বলে—বাপ তো! কী যে বল! মানুষের জীবনে—পিতা স্বগ্গ!'

'হয়েছে, হয়েছে—থাম। তোকে আর শাস্তর থগবগাতে হবে না!'

মহাশ্বেতাকে বেশী বলতে হয় না, সব বিষয়েই তার শিশুর মত কৌতূহল। সে আবার এক ছুটেই বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় নরেনের কাছে—

'এই যে, কোথায় গিছ্‌লি আবার। বোস বোস—এখানেই বোস। পোষ্কার জায়গা—সকালেই মুছে দিয়েছে, তোর গর্ভধারিণী। তাই বলছিলুম এই শালাদের, দাদামশাইকে দেখতে এসেছিস—কী নিয়ে এসেছিস বল।…

এবার যখন আসবি—মোড়ের দোকান থেকে খাস্তার গজা আর বাজার থেকে ঝাল ফুলুরি নিয়ে আসিস। বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাস নি, সাত শ রাক্ষুসীর খপ্পরে গিয়ে পড়লে আর আমি পাব না, গোরবেটার-জাতদের দুনতেল দিয়ে খাওয়াবে সব। আমাকে এইখানে চুপিচুপি দিয়ে যাস, আমি ঐ পাতার গাদার মধ্যে লুকিয়ে রাখব।'

মহাশ্বেতার চোখ কপালে ওঠে প্রায়, 'ও কি গো। তুমি তেলে-ভাজা ফুলুরি খাবে কি গো! আর ঐ বাজারের খাস্তার গজা। তোমার যে শোথ রোগ হয়েছে!'

'চুপ চুপ, গাঁক গাঁক করে চেঁচাচ্ছিস কেন! মাগী শুনতে পাবে যে। মিছে কথা, ওসব মিছে কথা। বুঝলি? ডাক্তারদের বাজে কথা যত সব। আমাকে না খেতে দিয়ে মারবার ফন্দি। মাগীর সঙ্গে ষড় করেছে গোরবেটারা। কিচ্ছু না, একটু হাঁপানির মত হয়েছে তাই, আর অনেক দিন তো পোষ্টাই কিছু খাই নি—হাত-পাগুলো একটু ফুলেছে। শুনেছি ভালমন্দ খেলে সেরে যায়। মাগীর গাঁদালঝোল খেয়ে খেয়ে পাইখানাটা একটু ধরেছে, বুঝলি না, এখন এই হাঁপানিটা সারলেই—তোর বাড়ি চলে যাব। জামাই তো বলেইছেন—।'

এই বলে খানিকটা আবার বসে বসে হাঁপায়। হুঁকোটায় টান দেয়—কিন্তু সেখানে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সেটা দরজার কোণে ঠেস দিয়ে রেখে বসে বসেই মেয়ের কাছে এগিয়ে আসে খানিকটা। চুপি চুপি বলে, 'ওঃ, কত কাল যে যজ্ঞিবাড়ির খ্যাঁট জোটে নি। ভেবেছিলুম হেমচন্দরের বিয়েতে পাঁচটা দিনের খ্যাঁট জুটবে—এই তো ধর না দু দিন পাকা দেখা—দু বাড়িতে দু দিন, তার পর এক দিন বে আর এক দিন বৌভাত—আর পরের দিন বাসি-যজ্ঞি। আজকাল ঠাণ্ডার দিন, কিচ্ছু খারাপ হয় না। গরম করে করে রাখলে তিন দিন থাকে।··আপনাদের তো অনেক জানাশুনো—দিন না একটা, ভাল বংশের মেয়ে দেখে। ও আমার রূপ চাই নি। রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাব! সোন্দর মেয়েদের বরাত ভাল হয় না। এই যে আমার ব্রাহ্মণী, বললে বিশ্বাস করবেন না—সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীর মত রূপ ছিল—কী বরাত কী বলব। আমার সাজানো সংসার—কুবেরের ঐশ্বর্য, মাগীর পয়ে সব যেন ফুস্‌মন্তরে উড়ে গেল। বংশ দেখে মেয়ে আনতে হয়, বংশ আর চালচলন দেখে। মানে একটু লক্ষ্মীছিরি থাকে এই আর কি! তা তেমন মহৎ-বংশের

মেয়ে হলে লক্ষ্মীছিরি একটু থাকবেই। তবে পাওনা-থোওনা তা অবিশ্যি কিছু দিতে হবে—হেমের গর্ভধারিণী যে শুধু হাত মুখে তুলবেন, তা মনে হয় না। দিন না একটু ভাল দেখে মেয়ে—আমি এই মাসেই দিয়ে দিই—'

'ও হরি! তুমি খ্যাট খাবে কি গো বাবা, তোমার যে পুরোদস্তুর ভীমরতি হয়েছে! তুমি আবারও আমাকে আপনি বলছ! এ তো মনে হচ্ছে তোমার আর বেশী দিন নয় বুঝতে পারছ না!'

'আ গেল যা। গোরবেটার জাত হারামজাদী মেয়ে আমার কল্যেণ আওড়াতে এলেন। আমার মরণ টাঁকছেন বসে বসে! যা দূর হ—আমার সামনে থেকে, এ শোরের পাল সরিয়ে নিয়ে যা! হবে না, কেমন বংশের বৌ আবাগী সব্বনাশী আমার ভীমরতি দেখছেন। তোর ভীমরতি হোক, তোর সোয়ামীর হোক, তোর গুষ্টির যে যেখানে আছে তাদের হোক। আমার কেন হতে যাবে!'

'ওমা—এ যে একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে যে! আমি ভাবছি ভীমরতি। চলে আয় চলে আয়। পালিয়ে আয়!'

ছেলে দুটোর হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরে চলে যায় মহাশ্বেতা।

মাকে গিয়ে বলে, 'কী সব কবিরাজী তেল পাওয়া যায় তাই বাবাকে লাগাও গে, এ যে একেবারে পাগলের অবস্থা!'

শ্যামা সদ্য-চাঁচা কাঠিগুলো গোছ করে নারকোল পাতারই একটা সরু ছোটা দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে গম্ভীর মুখে বলে, 'তোমার এত টান থাকে আর পয়সার জোর থাকে তুমি মাখাও গে মা—আমার এত ক্ষ্যামতা নেই। আর ইচ্ছেও নেই—সত্যি কথা বলতে কি। ঐ মুখে ভাত যে বেড়ে দিচ্ছি এই ঢের!'

মহাশ্বেতা অপ্রস্তুতভাবে বলে, 'না—ও একটা কথার কথা বললুম। বলছি যে পুরোদস্তুর ভীমরতি দেখছি বাবার।'

'তা হবে। কী আর করব বল। যতটুকু যা সাধ্যে কুলোচ্ছে করছি। করবার কথা নয়—তবু করছি।'

'তা বলছ কেন', হাত পা নেড়ে বলে মহাশ্বেতা, 'করা উচিতও তো। হাজার হোক তোমার সোয়ামী, আমাদের বাবা। বলি এ তো ফেলবার সম্পর্ক নয় গো!'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে। তোমার কাছ থেকে আর এই মরবার কালে উচিত অনুচিত শিখতে চাই না। আয় রে তোরা—দুটো নাড়ু খেয়ে যা!'

আগের দিন ক্ষুদভাজা গুঁড়িয়ে গুড় দিয়ে নাড়ু করে রেখেছিল, তাই বার করে দেয় শ্যামা নাতিদের।···

মায়ের তিরস্কার মহাশ্বেতা কোন দিনই গায়ে মাখে না, আজও মাখলে না। তা ছাড়া তার তখন কৌতূহলই প্রবল। সে আবারও বাইরে এসে দাঁড়াল। তবে খুব কাছে নয় এবার—একটু দূরে দাঁড়িয়েই বাপের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করতে লাগল। শিশুর মতই তার কৌতুক আর কৌতূহল।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও নরেনের দৃষ্টি এড়ায় নি।

সে একটু এগিয়ে রকের ধারে এসে বসল।

'ও কে? মা মহা, এদিকে এস মা, কাছে এস। ও কখন কি বলে ফেলি—শোকাতাপা মানুষ, অত ঠিক থাকে না। ওসব গায়ে মাখতে নেই। মরুক গে যাক্—বুঝছ না মা—পরের সঙ্গেই তো জীবনটা কাটল, আপনি বলে বলেই অব্যেস। পরদারেষু মাতৃবৎ—বুঝলে না, হাজার হোক আমরা গুরু-বংশের ছেলে, এসব শিক্ষা যে বলতে গেলে আমাদের মাতৃগর্ভ থেকে পাওয়া। আপনি শব্দটাই আগে বেরোয়। তা ও কিছু নয়—বলছিলুম কি, মেয়ে একটা দেখতে। তোমাদের তো রাবণের বংশ, আর ও কলমির দল, একটা ডগায় টান দিলেই দেখবে সেই কত দূর থেকে আসছে। সদ্‌বংশের একটি মেয়ে এনে দাও আমাকে, আমার জ্যেষ্ঠপুত্তুরের জন্যে।'

'ও মা তা মেয়ে মেয়ে করে তো হেদিয়ে গেলে, ছেলে তোমার যে পিঁড়েয় বসতে চায় না। ওর ভগ্নিপোত পঙ্কজ বলেছিল, মা তো কত করে বলে—ওর একেবারে ধনুকভাঙ্গা গোঁ—আর যা বল বল, বে করতে বলো নি।'

নরেন একটা অশ্রাব্য কটূক্তি করে ওঠে।

'রেখে দে দিকি তোর গোঁ। তুই মেয়ে দেখ—মেয়ে পছন্দ হলে ওর ঘাড়কে দিয়ে বে করাব—ও তো ছেলেমানুষ। ও কেন, ওর চোদ্দপুরুষ বে করবে। উঃ! ধনুকভাঙ্গা পণ। গোরবেটার জাতের ঘাড় ধরব—পিঁড়েয় নিয়ে গে বসাব। মিলিটিরী মেজাজ, ওসব মিলিটিরী মেজাজ আমি ঢের দেখেছি। আমার মেজাজও কম' নয়। ভাল আছি তো আছি—রাগলুম

তা বাপের কুপুত্তুর। আমাকে চেনে নি এখনও! আপনি
তার পর আমি আছি।'

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় নরেন, দু পা এগিয়েও আসে।
পরই পা দুটো অতিরিক্ত দুর্বল বোধ হওয়ায় রকের সিঁড়ির ওপরই বসে
ধপ করে।

॥ ৪ ॥

হাসপাতালের ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও নরেনের অসুখ ক্রমাগত বেড়েই যেতে লাগল। বার বার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ব্যয়সাধ্য—তবু পর পর দুটো রবিবার হেম পাল্‌কি করেই নিয়ে গেল, শ্যামার নিষেধ সত্ত্বেও। কিন্তু তাতেও সুস্থ হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আর বেশী পয়সা খরচ করা ওদের ক্ষমতার বাইরে। তা ছাড়া নরেনকে নিয়ে যাওয়ার বিপদও আছে সেখানে গিয়ে বসে থাকতে হলেই হাসপাতালের কর্মকর্তাদের কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দেয়—তখন যদি বা ধমক দিয়ে চুপ করায় হেম, ডাক্তাররা দেখার সময় তাদের মুখের উপরই গালাগাল দিতে শুরু করে। লজ্জার শেষ থাকে না। তা ছাড়া নরেনের ও ওষুধের ওপর খুব আস্থাও নেই। অগত্যা ওরা টোটকার ওপরই সমস্তটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। যে যা বলে—নরেনের নিজেরও অনেক রকম জানা ছিল—এটা ওটা ওষুধ এবং পথ্য পরীক্ষা চলে।

এর মধ্যে দু-এক বার বিয়ের কথা তুলেছিল নরেন- হেম বেশির ভাগ সময় জবাবই দেয় নি, দিলেও মৃদু ধমক দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। 'মিলিটারী মেজাজ', 'রোজগেরে বাবুর মেজাজ' ইত্যাদি বলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করলেও তার বেশী কিছু বলতে সাহস করে নি আর। কিন্তু সেই ঝালটা এবং তম্বিটা গিয়ে পড়তে শুরু হল শ্যামার ওপর। শ্যামা ছেলে মানুষ করতে পারে নি, সভ্যতা সহবৎ শেখাতে পারে নি গুরুজনদের কাছে কি রকম নম্র ও বিনত হয়ে থাকতে হয়—তা একটুও শিক্ষা পায় নি ছেলেমেয়েরা—বিয়ের কথায় ছেলেমেয়ের নিজস্ব মত থাকা এবং প্রকাশ করাটা নাকি সর্বপ্রকার শিক্ষা-সভ্যতার বাইরে। ইত্যাদি ইত্যাদি—

শ্যামা অনাবশ্যক বোধেই এ সবের জবাব দেয় না। তার অসংখ্য কাজ,

দিনেরাতে কাজ করার সময় আঠারো ঘণ্টার বেশী নয় - এটা সে হিসেব করে দেখেছে। সুতরাং এই সামান্য সময়ের মধ্যে পাগলের সঙ্গে বাজে বকে যদি দুটো মিনিটও নষ্ট হয় তো সেটা গায়ে লাগে। কিন্তু সে গায়ে না মাখলেও এক দিন এই ধরনের তম্বি হেমের কানে যেতে সে বিষম বিরক্ত হয়ে উঠল; রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বসে বকছিল নরেন, সেখান থেকে একটা কনুই ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে একেবারে বাইরের ঘরে এনে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'ফের যদি বাড়ির মধ্যে ঢুকে বাজে বকতে থাক কি ঐ সব কথা তোল তো একেবারে এমনি টেনে নিয়ে গিয়ে সরস্বতীর ধারে ফেলে দিয়ে আসব জ্যান্তে। এ বাড়িতে আর তোমার জায়গা হবে না—মনে রেখো!'

তার পর থেকেই—যেন নিজের শারীরিক দৈন্য এবং একান্ত পরনির্ভরতা উপলব্ধি করেই একেবারে চুপ করে গেল নরেন। হেমের আড়ালেও এ প্রসঙ্গ তুলতে সাহস করত না আর।

মাঘ মাস নাগাদ একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়ল সে। প্রাকৃতিক কাজগুলোর জন্যে অন্তত হামাগুড়ি দিয়ে দিয়েও বাইরে যাচ্ছিল—আর সেটুকু ক্ষমতাও রইল না। ফলে শ্যামার ঝঞ্ঝাট আরও বাড়ল। অসংখ্য কাজের মধ্যে দিনেরাতে বহু বার গিয়ে পুকুরে ডুবে আসতে হয়। মাথার সে একঢাল চুলের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই তার—সামনে তো প্রায় টাক পড়বার মতো হয়েছে—তবু যা আছে—দিনরাত ভিজে ভিজে দুর্গন্ধ ছাড়ে, শরীর খারাপ হয়।

এ সবই লক্ষ্য করে হেম—কিন্তু কী যে করবে তা ভেবে পায় না। ঐন্দ্রিলা এর মধ্যে কয়েক দিনই এসেছিল। দূর থেকে উঁকি মেরে দেখেই সরে এসেছে—বাপের কাছেও যায় নি। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে শ্যামা বলতে গিয়েছিল 'দু-চার দিন এসে থাক্ না—আমি যে আর পারছি না।' তার জবাবে সটান বলে দিয়েছে সে, 'হ্যাঁ, এখন আসি আর ঐ বুড়োর গুমুত ছিষ্টি সেবার ভার আমার ঘাড়ে ফেলে দাও। ওখানে আছি ঐ এক কড়ারে। রান্নাবান্না দাও করব—কিন্তু শাশুড়ীর সেবা আমার দ্বারা পোষাবে না। সেবা যা এক জনের করেছি সে-ই ঢের, আর করার সাধ নেই!'

হেমকে কিছু বলে না শ্যামা। তার ভয় হয়—বলতে গেলে হয়তো জবাব দেবে, 'তুমিকরছ কেন? ওর ওপর আমাদের কিসের এত কর্তব্য? যেথা ছিল এত কাল সেখানে যাক না!'

শ্যামা কিন্তু এখনও—এত কালের এত দুর্ব্যবহারের পরও—কেমন একটা মমতা অনুভব করে লোকটা সম্বন্ধে, এখন যদি সে না দেখে তা হলে সত্যিই হয়তো কোন্ পাঁদাড়ে গিয়ে পড়ে থাকবে, জ্যান্তেই শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে !···

এরই মধ্যে অকস্মাৎ এক দিন—রবিবার সেটা, সকালে বসে হেম দাড়ি কামাচ্ছে—নরেন ডাকলে 'বাবা হেম, হেমচন্দর ! একবারটি এখানে আসবে বাবা ?'

কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন। হেম একটু ভয় পেয়েই তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়াল।

'একটু কাছে এসো বাবা হ্যাঁ—এইখানটায়।'

একটু অনিচ্ছাসত্ত্বেও একেবারে বিছানার ধারে গিয়ে বসতে হয়। শ্যামা যত দূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে—ক্ষার কাচার তার বিরাম-বিশ্রাম নেই—তবুও রোগশয্যার কেমন একটা গন্ধ আছেই, একটা অস্বস্তি বোধ করে হেম।

নরেন কনুইতে ভর দিয়ে আধ-বসা করে উঠে সহসা ওর হাত দুটো দু হাতে চেপে ধরে, তার পর হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে—কতকটা ডাক ছেড়েই।

'কী হল কী হল !' ব্যস্ত হয়ে ওঠে হেম। শ্যামাও ছুটে আসে।

'বাবা হেম আমি তোমার অক্ষ্যাম পিতা, আমি পশু, পশুরও অধম। তবু আমি তোমার জন্মদাতা, গুরুজন। তোমার হাতে ধরে ভিক্ষা চাইছি বাবা, তুমি একটি বিবাহ কর। মরবার আগে বৌমার মুখখানি দেখে যাব—জল পিণ্ডের ব্যবস্থা হল জেনে নিশ্চিন্তি হয়ে যাব—এ আমার বড় সাধ। এ না হলে আমি নিশ্চিন্তি হয়ে মরতে পারছি না যে বাবা ! আমাকে এই ভিক্ষেটি তুমি দাও।'

আবারও হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে নরেন। দু হাতে চেপে ধরা হেমের হাতের ওপর নিজের কপালটা ঠোকে।

'আরে, আরে। এ কী বিপদ ! আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে, চুপ কর। চুপ কর। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি। চুপ-চুপ !'

বিব্রত হেম কী বলবে যেন ভেবে পায় না।

কোন্ মতে হাত দুটো টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে চলে আসে সে। হাত

দুটো কেমন একটা চিনচিন করছে যেন—বিশেষ করে বাপের চোখের জল লেগে আছে যেখানে—সেইখানটায়।

শ্যামা তাকিয়ে দেখে ছেলেরও চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, ছলছল করছে। ওর সঙ্গে চোখোচোখি হতে তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে নেয়, দাড়ি কামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্যামা লক্ষ্য করে, তখনও সে ভাল করে ক্ষুরটা ধরতে পারছে না—হাত দুটো কাঁপছে তখনও।…

সেই দিনই সে পাড়ার ফটিকের ভাইকে দিয়ে মহাকে ডেকে পাঠায়। ছেলের মত হয়েছে—এবার উঠে পড়ে পাত্রীর খোঁজ করুক।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ব্যাপারটা ঘটে গেল হঠাৎই। সে-ও একটা রবিবার, রবিবার হলেই হেম একটু সেজেগুজে কলকাতায় যেত—অফিস যাওয়ার কাপড়জামা সেদিন ক্ষারে কাচা হত—কাজেই ওর সেই দেশী কাপড়, আর পাম্পশু জুতো পরা ছাড়া উপায় থাকত না। শীতকাল হলে তার সঙ্গে সেই জার্মানির শাল। সেদিনও সেই বেশেই বেরিয়েছিল। বড় মাসীমার বাড়িতে এসে দেখলে এক গাদা লোক, ছোট দুখানা ঘরে থৈ থৈ করছে, রাণীবৌদির বাপের বাড়ি থেকে এসেছে সব। সুতরাং সেখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হল। ছোটমাসীর কাছেও ঠিক যেতে ইচ্ছা হল না—মার সেই কাণ্ডর পর থেকে একটু লজ্জাও করে বটে—তা ছাড়া সেখানে গেলে যেন বড় তাড়াতাড়ি কথা ফুরিয়ে যায়। একটু পরে বলবার মত আর কথা থাকে না। আর কোথায় যাওয়া যায়—ভাবতে ভাবতে মনে হল অনেক দিন থিয়েটারের পাড়ায় যাওয়া হয় নি—গেলে কেমন হয়? গেট-কীপাররা সব বন্ধু, ওকে গিয়ে পাস লেখাতেও হবে না; তা ছাড়া থিয়েটার না দেখলেও—অনেক রকম গল্পগুজব আছে—একটা ভাল রকম আড্ডা জমানো যেতে পারে।

মনে হল বটে—সেই ভেবেই বড়মাসীমার বাড়ির গলি থেকে বেরিয়ে ওদিকের রাস্তা ধরলে—তবু একটা সংকোচ থেকেই গেল মনে মনে। আবার ঐ সংসর্গ, ঐ মেয়েমানুষটার প্রসঙ্গও হয়তো উঠবে, হয়তো তাকে দেখতেও হবে—সবটা ঠিক রুচিকর হবে কিনা এই রকম একটা দ্বন্দ্ব চলতে লাগল মনে মনে। তাই গতিটা হয়ে গেল মন্থর, কতকটা বেড়াতে বেড়াতে যাবার মতই আস্তে আস্তে পথ চলতে লাগল। তবু, যত আস্তেই চলুক, এক সময় সেই বিশেষ রাস্তাটায় এসে পৌঁছল। এবার পা-টা যেন আরও ধীরে পড়তে লাগল, যা-হয় এখনই মন স্থির করতে হবে—যাবে না ফিরবে—আর সেই ভাবেই অন্যমনস্ক ভাবে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় বিয়েবাড়িটার সামনে এসে পড়ল।

প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি, ফুটপাথের ওপর পর্যন্ত লাল ভেলভেটের কানাত দিয়ে ঘেরা, ওপরে রসুনচৌকির ঘর, লোকজন সমারোহ—সবটা গমগম

করছে। ফুটপাথ ধরে চলছিল, কানাত-ঘেরা জায়গাটায় বাধা পেতে চেয়ে দেখতে হল—বিয়েবাড়ি তাও বুঝল—এবং রাস্তায় নেমে ঘুরেও আসতে হল। কিন্তু গতিটা বাড়ল না। সেই ভাবেই অতি ধীরে ধীরে—মানুষ উদ্দেশ্যহীন ভাবে বা অনিচ্ছায় যখন কোথাও যায় তখন যেভাবে চলে সেই ভাবেই বিয়েবাড়ির পর্দায় তৈরী ফটকটার সামনে এসে পড়ল। সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় কর্মচারী গোছের দু-চার জন, তাঁরাই হঠাৎ 'আসুন আসুন' বলে যেন কলরব করে উঠলেন, কোথা থেকে একটা একহালি বেল ফুলের মালা গলায় এসে পড়ল, একটি ছেলে গোলাপজলের পিচকিরি দিয়ে মাথাটা প্রায় ভিজিয়ে দিলে এবং তারই মধ্যে এক জন হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করলেন ভিতর দিকে। সবটা এমন অকস্মাৎ ঘটে গেল—এমন অতর্কিতে যে—ঘটনাটা কী ঘটছে ভাল করে বোঝবারও সময় হল না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দু-তিনটে বড় বড় গাড়ি এসে থামল, সম্ভবত তা থেকে নামলেন সম্মানিত বরযাত্রীর দল, 'আসুন আসুন' 'আস্তাজ্ঞে হোক' রব উঠল চারি দিকে, বাড়ির মধ্যে থেকে মোটা মোটা কর্মকর্তারা বেরিয়ে এলেন এবার অভ্যর্থনার জন্য, আর সেই গোলমাল গণ্ডগোল ভিড়ের মধ্যে কতকটা ঘটনার স্বাভাবিক স্রোতেই হেম গিয়ে পড়ল ভেতরের উঠানে—যেখানে চক-মেলানো করে চেয়ার পাতা—আরও বহু নিমন্ত্রিত অভ্যাগত যেখানে বসে আছেন—সেইখানে। কতকটা অভিভূতের মতই তারই একপাশাতে গিয়ে বসল সে।

যখন এই অনিবার্য গতি বন্ধ হল—অর্থাৎ থিতিয়ে বসতে পারল তখনই প্রথম ব্যাপারটা কী ঘটল একটু ভেবে দেখবার অবসর মিলল ওর।

প্রথম যে অনুভূতিটা হল ওর, সেটা কৌতুকের—মনে হল এ তো মজা মন্দ হল না—কোথায় যাচ্ছিল, কোথায় এসে পড়ল, এ যেন কোথা দিয়ে কী একটা হয়ে গেল। তার পর ভয় করতে লাগল। যদি কেউ চিনতে পারে, যদি কেউ এসে প্রশ্ন করে, 'আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন? কে আপনাকে নেমন্তন্ন করেছে?' যদি তাই নিয়ে কোন শোরগোল ওঠে, তখন সবাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইবে, সবাই দেবে ধিক্কার - সে বড় অপমান। অনেক সময় বিয়েবাড়িতে অনেক চুরিও হয়, তখন সবাইকে সনাক্ত করার চেষ্টা চলে —সেই সময়ই ধরা পড়ে যায়, কারা রবাহূত অথবা অনাহূত। যে অনিমন্ত্রিত এসেছে বলে ধরা পড়ে, তাকেই সবাই সেক্ষেত্রে চোর ভাবে—চোর না হলেও।

এই সেদিনই গোবিন্দ গল্প করছিল—ওর এক বন্ধুর বোনের বিয়েতে এক ছাদ লোক খেতে বসেছে, তার মধ্যে বন্ধুর মামা, দেখেই মনে হয় খুব ঘুঁদে লোক—এসে এক জনকে ধরলেন, 'আপনি কে মশাই, আপনাকে তো চিনলুম না! আপনি বরযাত্রী না কন্যাযাত্রী? ও বেয়াই মশাই এদিকে আসুন তো—ইনি কি আপনাদের নিমন্ত্রিত কেউ? দেখুন তো ভাল করে?' তার পর বরপক্ষের তিন-চার জনকে দিয়ে সনাক্ত করানো হয়ে গেলে তিনি কন্যাপক্ষকে ডাকলেন, ওহে ও ভবতারণ, এসো দিকি এদিকে—এঁকে কে নিমন্ত্রণ করেছে? চেনো নাকি এঁকে? অরুণ কোথায় গেল—অরুণ তোমরা এঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলে? দেখ তো ভাল করে—' ইত্যাদি। সে এক হুলস্থূল কাণ্ড। তবে নাকি যে খেতে এসেছিল সে খুব চতুর—সে আসবার আগে সেই রাস্তাতেই আর একটা বিয়েবাড়ি দেখে এসেছিল—সে এক ডাক্তারের বাড়ি, দোরের বাইরে মার্বেলে নাম লেখা আছে—সুতরাং নাম জানবার কোন অসুবিধা নেই—সে বললে, 'কেন, এটা ডাঃ সামন্তর বাড়ি নয়? ডাকুন না তাঁদের কাউকে—' এই বলে অব্যাহতি পেয়ে গেল। তাও সে চলে যাবার সময় তাকে শুনিয়েই মামা বললেন, 'ভাগ্যিস দোরের বাইরে নামটা দেখে এসেছিল—খুব পার পেয়ে গেল। তাও ভজাভজি করতে পারতুম, কে আবার অত কাণ্ড করে—তাই ছেড়ে দিলুম। তা ব্যাটা চালাক খুব, দেখেছ ভবতারণ, ফাঁদে পা দিলে না। ডাক্তারের নাম করলে না—তা হলেই চেপে ধরতুম, ডাক্তার তো মারা গিয়েছে—অনেকে আবার ঐ রকম ভুল করে বসে কিনা—ঠিক জানে না বলেই বললে তাদের কাউকে ডাকুন না! যা ব্যাটা যা—খুব বেঁচে গেলি!

কন্যার বাবা ভবতারণবাবু নাকি বলেছিলেন মৃদু কণ্ঠে, 'কেন দাদা এত কাণ্ড করলেন, বেচারী এক পেট খেতেই তো এসেছিল। আমি বুঝেছিলুম, কিছু বলি নি।'

তাতে মামা জবাব দিয়েছিলেন, 'না হে বোঝ না—এদের মধ্যেই এমনি করেই সব চোর আসে। এক বাড়ি লোক, চারদিকে জিনিস, যদি কিছু খোয়া যায়? তখন তো হায় হায় করবে!...না, না, ওসব মায়া করা কাজের কথা নয়। আর বুঝলেন প্রসাদবাবু, আমি যেন এই করতেই আছি। এই অপ্রিয় কাজটি আমাকেই করতে হয় চিরকাল। আর আমার চোখে কি ঠিক ধরাও পড়বে! মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারি যে— !'

কথাগুলো সব পর পর যেন বইয়ের পাতায় পড়বার মত করে মনে পড়ে যায় হেমের। নিমেষে এই মাঘমাসের শীতেও ঘেমে ওঠে সে। সব কর্ম-বাড়িতেই ঐ রকম চৌকশ দু-চার জন লোক থাকে, এ তো বড়লোকের বাড়ি, বৃহৎ আয়োজন, বহুলোক—তার মধ্যে এ ধরনের অভিজ্ঞ লোকও হয়তো অনেক।···শেষে কি দারোয়ানের হাতে গলাধাক্কা খেয়ে বেরোতে হবে এখান থেকে?···তার চেয়ে সরে পড়াই ভাল এই বেলা, মানে মানে। কী করবে, 'একটু ঘুরে আসছি' বলে বেরিয়ে যাবে?···'না, আমাদের আর সব কই?' বলে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াবে—না সোজাসুজি 'ভুল হয়েছে, অন্য বাড়ি মনে করে এসেছিলুম' বলে চলে যাবে সহমানে? তখন যদি আবার প্রশ্ন করে, কোন্ বাড়ি, মনে করেছিলে'—তখন? এ পাড়ায় আর কোন বাড়িতে বিয়ে আছে কিনা তাও তো জানে না, বহুকাল পরে এ রাস্তায় পা দিয়েছে—তখন কী উত্তর দেবে?

কী করবে ভাবছে এমন সময় কে যেন এসে বললে, 'আপনারা দয়া করে গা তুলুন, পাতা হয়েছে।' সবাই হৈ হৈ করে উঠে পড়ল। হেমও 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' ভাবে উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সে আর বাইরের দিকে যেতে পারল না, চারিদিকের লোক যেন অপ্রতিহত বলে তাকে ভেতর দিকে ঠেলতে লাগল।

সকলেরই আগ্রহ ঐ দিকে। কে এক জন যেন বললেন এরই মধ্যে, 'সে কি হে—বর এসে পৌঁছবার আগেই বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে চলে যাব?' তাঁকে সবাই মিলে থামিয়ে দিল, 'নিন, নিন—এদের তো ছুটি দিতে হবে, বর যখন আসবে তখন থই থই করবে লোক, কজনকে বসাবে? না না, ও কাজ সেরে ফেলাই ভাল।' কে এক জন বললে, 'ওহে এখনও যে ভাল করে ক্ষিদেই হয় নি, রবিবারের বাজার—বেলায় খাওয়া হয়েছে।' তাকেও আবার থামিয়ে দিলে, 'নে নে—দুই খাওয়াই এক সঙ্গে হজম হয়ে যাবে, শীতের বড় রাত!'

এরই মধ্যে, প্রায় অনিচ্ছায়, হেম এক সময় ছাদে গিয়ে পৌঁছয়। সিঁড়ির মুখে কে যেন বললে, 'ব্রাহ্মণরা দয়া করে ঐ দিকটায় যাবেন—।' সে কতকটা ভিড়ের চাপেই সেই দিকে ঘুরে গেল। ভিড় বেশ, তারই মধ্যে যত দূর সম্ভব আলসে ঘেঁষে অপেক্ষাকৃত অন্ধকারের দিকটায় গিয়ে বসল। লুচি বেগুন-ভাজা ছক্কা ডাল পাতে দেওয়াই ছিল, ওরা গিয়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গে হুড় হুড়

করে পরিবেশকের দল বেরিয়ে পড়ল। তখন আর ইতস্তত করার বা পিছিয়ে যাবার সময় রইল না। অগত্যা লুচির গ্রাস মুখে তুলতে হল। ঘাড় হেঁট করে একমনে খেয়েই যেতে লাগল, তখন কতকটা মরীয়াও হয়ে উঠেছে— যদি অপমান হতেই হয় তো খেয়ে নিয়ে হওয়া ভাল, ঘাড়ধাক্কা খাবার আগে আশ মিটিয়ে খেয়ে নেওয়া যাক!

খেলও প্রচুর। বহুদিনের মরা পেট, তবু প্রাণপণে আকণ্ঠ খেল। পেটের অসুখ হয় হবে, না হয় কাল আর কিছু খাবেই না সারা দিন, তবু এসব সে ছাড়তে পারবে না। বড়লোকের বাড়ি, আয়োজনও সেই মাপে হয়েছে। এত রকমের খাবার এর আগে সে চোখে দেখে নি, অর্ধেকের ওপর খাবারের নামও জানে না। কেউ কেউ বলছে, 'ওহে এটা দাও', 'ওটা নিয়ে এস'— তখন দেখে দেখে চিনছে কিন্তু মনে যে থাকবে না এসব নাম—সে বিষয়েও সে নিশ্চিত। মিষ্টিও হরেক রকমের, সন্দেশই তিন-চার রকম। কড়াপাক, আবার খাব, কাঁচাগোল্লা। দই ক্ষীর রাবড়ি। কিন্তু তখন আর একটি বোঁদের দানার স্থানও নেই পেটে—এ সব আছে জানলে কি আর আগে অতগুলো কুমড়ো কপি এঁচোড় আলু পটলের ডালনা মাছ মাংস খেত। নতুন এঁচোড় আর নতুন পটল—তাই মনে হয়েছে অমৃত। মায় খাস্তা কচুরি হালুয়া পর্যন্ত খেয়েছে একটু আগেই। এখন অনুশোচনায় ক্ষোভে চোখে জল আসতে লাগল। কে এক জন তদ্‌বিরকারক এলেন শেষের দিকে, বিরাট জামিয়ার গায়ে দিয়ে, আঙুলে হীরের আংটি এবং বুকে হীরের বোতাম —তাঁকে দেখেই হেমের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। মনে পড়তে লাগল গোবিন্দর গল্পের সেই মামার কথা—কিন্তু তিনি সেসব দিক দিয়ে গেলেন না, 'কৈ হে কী রকম খাওয়ালে সব—এঁরা যে কিছুই খেলেন না। কী রকম রেঁধেছে ঠাকুররা—সব যে পাতে পড়ে রইল।···কোন রকমে পেটটা ভরিয়ে নিন আপনারা···এ হে কিছুই যে খেলে না তুমি ভাই?'—শেষেরটা সোজা হেমকেই। কিন্তু ঘর্মাক্ত রুদ্ধনিঃশ্বাস হেম কোন জবাব দেবার আগেই কে এক জন বলে উঠল, 'আর কত খাব বলুন হেঁ-হেঁ—কত রকম করেছেন··· হেঁ হেঁ একটু একটু চাখতেই···হেঁ-হেঁ। না, ঠাকুররা আপনার রেঁধেছে খুব ভাল, কোন জিনিসটাই খারাপ হয় নি।'

'দই কেমন খেলে, দই? কাঁসারিপাড়ার সরের দই? বলেছি ব্যাটাকে খেয়ে সব ভাল বললে দাম দেব—'

'ফার্স্ট ক্লাস স্যার, ফার্স্ট ক্লাস দই! বহুকাল এমন দই খাই নি।'

'খাবে কোত্থেকে। এসব যে উঠেই গেল ক্রমশ। কে-ই বা এর কদর বোঝে, কে-ই বা এর দাম দেয়!' আর এক জন বলে উঠলেন কৃতার্থ ভাবে।

কর্মকর্তা যথারীতি আরও দু-এক বার হাত জোড় করে কোন মতে পেটটা ভরিয়ে নিতে অনুরোধ জানিয়ে চলে গেলেন সেদিক থেকে। হেম হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এক ছাদ লোক—বোধ হয় দু মহলের দুটো ছাদ বোঝাই লোক বসেছে—কে কাকে চেনে, কেই বা কার হিসেব রাখে! দাদার বন্ধুর বাড়ি আয়োজন সামান্য বলেই ধরতে পেরেছিলেন মামা।

এর পর এল সোনালী তবক দেওয়া পান। সবাই উঠে পড়ল হৈ হৈ করে। আঁচাবার জায়গায় ভিড় দেখে দু-এক জন রুমালে হাত মুছে বেরিয়ে এলেন! হেমও সেই পন্থা অনুসরণ করলে। রুমালখানায় বাড়ি গিয়ে সাবান দিলেই চলবে। তাড়াতাড়ি ভিড়ে গা ভাসিয়ে একেবারে বাইরে বেরোতে পারলে বাঁচে সে!

॥ ২ ॥

বুক ঢিপঢিপিনিটা বাড়ি এসেও ছিল। মাকে বলতে মা-ও প্রথমটা বললে, 'কাজটা ভাল করিস নি—কী দরকার বাপু, শেষে বে-ইজ্জত হওয়া একটা!' কিন্তু তার পরই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেরা করে বার বার শুনতে লাগল কী কী হয়েছিল এবং কোন্‌টা কেমন হয়েছিল। প্রতিটি সুখাদ্যে যেন তার রসনা মানস-স্বাদ গ্রহণ করতে লাগল সেই বার বার পুনরাবৃত্তিতে। শেষকালে অনেকক্ষণ ধরে শোনবার পর বললে, 'তা যা হোক্ বাপু, যা হয় করে বিপদটা কেটে তো গেল। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। বেশ হয়েছে। এমনি তো খাওয়া হত না। আর এ তো বলতে গেলে ভগবান হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। এতে আর কী হয়েছে।'

তবু—তখনও পর্যন্ত, এমন কি বিছানাতে শুয়ে শুয়েও বার বার প্রতিজ্ঞা করলে হেম যে—এই নাক-কান মলা, এ কাজ আর নয়। কিন্তু পরের দিন, তার পরের দিন মনে মনে কথাটা যতই সে ভাবে, নানা সুঘ্রাণ-আহার্যের রসনাসুখকর স্মৃতির রোমন্থন করতে থাকে, ততই আবার লুব্ধ হয়ে ওঠে।

শেষে দিনতিনেক যাবার পর মন স্থির করে ফেলে—এই শনি-রবিবারও এক বার বরাত ঠুকে দেখবে আর কোন এমনি বড়লোকের বাড়ি পাওয়া যায় কি না। বরং একটু দূর থেকে দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—যখন ভিড় বেশী হবে, বরযাত্রী কন্যাযাত্রীতে মাখামাখি—তখনই এক ফাঁকে ঢুকে পড়বে। বরযাত্রী মনে করবে কন্যাযাত্রী আর কন্যাযাত্রী মনে করবে বরযাত্রী। সেদিন বড় সকাল সকাল হয়ে গিয়েছিল।

মন স্থির করতে যা দেরি—তার পরই আগ্রহে অধীর হয়ে উঠল। আজকাল প্রায় প্রত্যহই অফিসের ফেরত বড় মাসীর বাড়ি ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা-দেড়েক কাটিয়ে যায়—সেখানে এত কাল থেকে গেছে—তাই সেটা কিছু অশোভন বা অস্বাভাবিকও দেখায় না। বড় মাসীর কাছ থেকে পাঁজিটা চেয়ে নিয়ে দেখলে রবিবার কোন বিয়ের দিন নেই। শুক্রবার আর শনিবার আছে। প্রথমটা একটু দমে গিয়েছিল কিন্তু তার পরই মনে পড়ে গেল—বিয়ে না থাক রবিবার বৌভাত পড়বে অনেকগুলো।

এই ভাবেই চলতে লাগল—সপ্তাহের পর সপ্তাহ। এক একটা রাস্তা ধরে চলে—যেটা বড়লোকের বাড়ি মনে হয়, দূর থেকে সামিয়ানা, বাড়ি ও অন্যান্য আয়োজন দেখে—ঢুকে পড়ে। ক্রমশঃ ভয় ভেঙে গেল, সাহস বাড়ল। দু চার দিন যাবার পর সবার অলক্ষ্যে এক-আধটা সন্দেশ বা দরবেশ পকেটেও ফেলতে শুরু করল। সেজন্য বাড়তি রুমাল বা কাচা ন্যাকড়াও বাঁদিকের পকেটে রাখত, পকেটটা যাতে নষ্ট না হয়। সেগুলো মাকে এনে দিত ছোট ভাইয়ের নাম করে। ভাল সন্দেশ বুঝলে শ্যাম তা থেকে একটু-আধটু নরেনকেও ভেঙে ভেঙে দিত।

এক দিন এমনি এক রবিবারে একটা বড় রাস্তা দিয়ে চলছিল বিয়েবাড়ির খোঁজে—হঠাৎ দেখা হয়ে গেল শরতের সঙ্গে। হেম আস্তে আস্তেই হাঁটছিল—বেড়াতে বেড়াতে দেখতে দেখতে যাবার মত করে—জোরে হেঁটে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে বিয়েবাড়িতে যাওয়া যায় না—কিন্তু শরৎ আগে আগে আরও আস্তে আস্তে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলছিল—তাই পিছন থেকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করতে করতে এক সময় তাকে ধরে ফেললে।

এগিয়ে ঘুরে গিয়ে প্রণাম করতেই শরৎ থতমত খেয়ে দু পা পিছিয়ে একটু যেন অবাক হয়েই চেয়ে রইল ওর দিকে। প্রায় মিনিট-খানেক

সময় লাগল ওকে চিনতে। তার পরই খুশী হয়ে বলল, 'এই যে, এসো, এসো। ভাল তো ?'

ওকে যে চিনতে দেরি লাগল তার কারণ ঠিক বিস্মৃতি নয়—হেম ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছে—অন্যমনস্কতা! কোথায় যেন কোন্ সুদূরে ওর মন নিবদ্ধ ছিল এতক্ষণ। এই পথ ধরে চললেও—এই পথ কেন, এর ধারে কাছে এমন কি এ জগতে ছিল কি না সন্দেহ। বহু দূর থেকে ছড়ানো মনকে যেন কুড়িয়ে গুটিয়ে টেনে আনল সে।

আবারও বলল এক বার—একটু থেমে, 'তার পর, সব ভাল তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ভাল আছেন ?'

'আমি ?' একটু ম্লান হাসল শরৎ। উদাস করুণ এক রকমের হাসি।

তার পর পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তোমার—তোমার ছোট মাসী আজকাল কোথায় থাকেন ? কেমন আছেন ? যাও মধ্যে মধ্যে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যাই বৈকি! এই তো কাছেই আছেন—এই রামহরি ঘোষের গলি। যাবেন নাকি ? চলুন না—।'

'ন্-না। থাক গে।'

একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই বলে শরৎ, অনিচ্ছার চেয়ে সংকোচই বেশী।

হেম চেপে ধরে, 'না কেন—এই তো। চলুন না একটু ঘুরে আসবেন। আমিও যাই নি অনেক দিন, আমারও খবর নেওয়া হবে।'

'কী আর হবে, খবর পেলাম—এই তো···অসুখ-বিসুখ করলে খবর দিও। তা ছাড়া হয়তো এখনও বাড়ি ফেরেন নি!'

'আজ তো রবিবার, ছোট মাসী আজ বাড়িতেই আছে।'

'কেন—কোথাও যান না ? তোমার বড় মাসীমা—হ্যাঁ তোমার বড় মাসীমা কেমন ? গোবিন্দর কি ছেলেপুলে ? সবাই এক সঙ্গেই আছেন তো ?'

'না—সে তো অনেকদিন ছাড়াছাড়ি।'

'কেন ? ছাড়াছাড়ি কেন ?'

'সে অনেক কাণ্ড। দাদার প্রথম পক্ষের বৌকে ছোটমাসীই এক রকম জোর করে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিল—সেখান থেকে ফেরার পথে ট্রেনেই কলেরা হয়।···তার পরই—মানে অল্পদিনের মধ্যেই দাদা আবার বিয়ে করে কি না—তাইতে ছোট মাসীর কী হল, মানে সে বৌয়ের জন্যে—মোট কথা

ঐ বিয়ে নিয়েই ছাড়াছাড়ি। দাদা যায়, বড় মাসীমাও যান—কিন্তু ছোট মাসী বিশেষ এ বাড়িতে আসে না। কখনও-সখনও, কারুর অসুখ-বিসুখ করলে—'

'ও। তোমার ছোট মাসী তা হলে একাই আছেন? তা চল না হয় যাই এক বার। আমার একা হয়তো কোন দিনই যাওয়া হবে না।'

'চলুন।'

নিমন্ত্রণের খোঁজ আর করা হয় না। কিন্তু হেমের কেমন যেন মনে হয়, এটা ঢের ভাল হল। যথার্থ একটা ভাল কাজ। ছোট মাসী বড় একা পড়ে গেছে আজকাল, বড় নিঃসঙ্গ—জীবনে বেচারীর কিছুই নেই আর, শুধু প্রাণধারণ আর প্রাণধারণের জন্য পরিশ্রম। যদি—আশা করতেও অবশ্য ভরসা হয় না আর—যদি এই উপলক্ষে এরা দু জনে একটু কাছাকাছি আসে, ঘনিষ্ঠ না হোক, মেসোমশাই যদি আসা-যাওয়াও করে মধ্যে মধ্যে—তবু দুটো কথা কইবার লোক পায় ছোট মাসী।

'তা কোথায়—মানে কার সঙ্গে আছেন তোমার ছোট মাসী?' যেতে যেতেই প্রশ্ন করে শরৎ।

'ওঁরই এক ছাত্রীর বাড়ি। তার অবশ্য বিয়ে-থা হয়ে গেছে—তবে সেই জানাশুনোতেই এঁদের এখানে ঘর পেয়েছেন। এঁরাও ব্রাহ্মণ—'

'ও। তা আমরা গেলে—মানে আমি গেলে কেউ কিছু বলবে না তো?'

অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে, কেমন এক রকম ছেলেমানুষের মতই প্রশ্ন করে শরৎ।

'সে কি! কে আবার কি বলবে? আপনারই তো—'

'আপনারই তো সবচেয়ে বেশী অধিকার সেখানে যাবার'—বোধ হয় এইটেই বলতে চাইল হেম—লজ্জায় কথাটা শেষ করতে পারল না।

সামান্য একটু হেঁটেই উমার বাড়ি পৌঁছল ওরা।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বহুক্ষণ, উমা আহ্নিক সেরে মারই পুরনো বড় মহাভারতখানা খুলে বসেছে সবে। বহুবারের পড়া—তবু আর কোন ভাল বইয়ের অভাবে তা-ই পড়ে মধ্যে মধ্যে। সপ্তাহের ছটা দিন মনে হয় বড় বেশী পরিশ্রম, আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না, একটু বিশ্রাম পেলে ভাল হয়—অথচ রবিবারটাও বড় বেশী মন্থর, বড় বেশী কর্মহীন—দুঃসহ ঠেকে।

হেমের গলা পেয়ে খুশী হয়েই উঠল উমা, ছোড়দির সম্বন্ধে যা-ই মনোভাব

থাক, বোন্‌পো বোনঝিদের সে পছন্দ করে। বিশেষ করে হেম—দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতায় বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছে।

শুধু হেম মনে করে সাগ্রহে হলেও সহজভাবেই দোর খুলে দিয়েছিল উমা—কিন্তু হেমের পিছনে নতমুখে যে লোকটি দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে চমকে উঠল সে। বরং বলা চলে ভূত দেখার মতই চমকে উঠল। কারণ বহুকাল—বহু দীর্ঘকাল আসে নি শরৎ, পথেঘাটেও দেখা হয় নি।

আরও চমকে উঠল ওরা ঘরে ঢুকতে।

হ্যারিকেনের আলো, তবু তাতেই যা চোখে পড়ল তা-ই ঢের।

এ কী চেহারা হয়েছে শরতের। এ কি তার সেই স্বামী—শুধু যার চেহারার কথা শুনেই অগ্রপশ্চাৎ কিছু ভাবতে দেয় নি দিদি, কিছু খোঁজ করতে দেয় নি মাকে! সেই রূপবান কান্তিমান স্বামী তার!

উমার বিস্মিত, স্তম্ভিত দৃষ্টি অনুসরণ করে হেমও ভাল করে—যেন নতুন করে চেয়ে দেখল মেসোমশাইয়ের দিকে। সত্যি, এ কী বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে ওর! চুলগুলো প্রায় সব পেকে গেছে, গায়ের বিশেষত গলার চামড়া শুধু কুঁচকে যায় নি, রীতিমত ঝুলে পড়েছে, চোখের দৃষ্টিটাও হয়ে উঠেছে কেমন যেন ঘোলাটে বিবর্ণ!

বোধ হয় ওদের দৃষ্টিতে নিরব প্রশ্নটা ফুটে উঠেছিল, শরৎ একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে, 'কেমন আছ?'

ওর সেই প্রশ্নেই বোধ করি সংবিৎ ফিরে এল উমার, একটা হাসির ভঙ্গী করে বলল, 'আমি আর খারাপ থাকব কেমন করে। যমের অরুচি তো! কিন্তু তুমি তো বেশ কাজ সেরে এনেছ বলেই মনে হচ্ছে—এখন পা-পা করে ঐ ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলেই তো হয়!'

'তা আর হচ্ছে কৈ? তা হলে তো বেঁচেই যাই। সরকারী আইন না থাকলে সত্যিই পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতুম। আর বাঁচার শখ নেই—দরকারও নেই কিছু!'

একটু ম্লান হাসল শরৎ। তার পর বলল, 'একটা আসন-টাসন দাও—আর দাঁড়াতে পারছি না। আজকাল একটু হাঁটলেই হাঁটু দুটো কেমন ভেঙে আসে।'

'এই যে দিই—। তা তুমি ঐ বিছানাতেই বসো না।'

'না না। পথের কাপড়! মিছিমিছি তোমার পরিষ্কার বিছানাটা—।'

'তা বটে।' হেম ছিল বলে বাকী কথাটা মুখে এসেও আটকে গেল। 'কোন দিনই তো আমার বিছানাটা ছুঁলে না। পরিষ্কার শুদ্ধই রইল চিরকাল! ঐটের সম্বন্ধেই তোমার যত বিবেচনা!' এমনি অনেক কথাই গলার কাছ পর্যন্ত এসেছিল, বলা হল না। সে তাড়াতাড়ি নিজে যে মাদুরটায় বসেছিল, সেইটেই এগিয়ে দিয়ে বললে, 'বসো না, দু জনেই বসতে পারবে।'

শরৎ বসল। মনে হল যেন পা দুটো ভেঙে বসে পড়ল, যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। কে জানে কেন, ওর অবস্থা দেখে উমার আজ এই মুহূর্তে একটা অপরিসীম মমতা বোধ হল। বড় বেচারা—বড় হতভাগা লোকটা। সে বিছানা থেকে নিজের বালিশটা নামিয়ে দিয়ে বলল, 'এইটেয় ঠেস দিয়ে ভাল করে বসো।' তার পর গলার কাছে ঠেলে-ওঠা একটা কি অবাধ্য বস্তুকে দমন করতে করতেই হেমের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'তার পর? তোদের খবর কি? তরুরা কেমন আছে? পাঠিয়েছিল ওরা এর মধ্যে এক বারও? খেঁদি কোথায়?'

'খেঁদি তরু সব শ্বশুরবাড়ি। সেই তো মুস্কিল হয়েছে। বাবা যে ফিরে এসেছেন!'

'ফিরে এসেছেন—তার মানে? তিনি তো আসেনই মধ্যে মধ্যে।'

'না। তা নয়। একেবারে পাকাপাকি। এখানেই আছেন। শরীর একেবারে গেছে তো। বোধ হয় এবার—। মার খুবই কষ্ট হচ্ছে, সংসারের সব কাজ—মার আবার আরও কতক বাড়তি কাজ আছে—সে তো তুমি জানই —তার ওপর বাবার সেবা। দিনের মধ্যে চোদ্দ বার পুকুরে ডুব দিতে হচ্ছে!'

'বাবা, এমন! একেবারে অশক্ত হয়ে পড়ে তবে বুঝি স্ত্রীপুত্রের কথা, বাড়ির কথা মনে পড়েছে! তা হলে ছোড়দির তো খুব চলছে। তা তুই এবার একটা বিয়ে-থা কর—বয়স তো পেরিয়ে গেল!'

উমা কথাটা শেষ করার আগেই—এর খোঁচাটা যে অন্যত্রও লাগতে পারে মনে পড়ায়—শরতের মুখের দিকে চাইল। সে তখন বালিশটা টেনে একটা হাঁটু উঁচু করে আর একটা পা সেই উরুর ওপর তুলে আধশোয়া করে বসেছে, দুটি চোখই তার বোজা—মুখেও কোন বেদনা বা আঘাতের চিহ্ন নেই, যেমন ভাবহীন থাকে সাধারণত প্রায় তেমনিই, শুধু লক্ষ্য করে দেখে উমা—কপালে ওর বড় বেশী রেখা পড়েছে, যা পড়া উচিত তার চেয়ে যেন ঢের বেশী।

হেম ওদের দিকে অত লক্ষ্য করে নি—তার মনে নিজের ভবিষ্যতের প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড়—সে হ্যারিকেনের দিকে চেয়ে ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে বললে, 'হুঁ! মা তো দিনরাত খ্যাচ্-খ্যাচ্ করছে, কিন্তু মাইনে তো ঐ, তার ওপর আবার খরচা বাড়ানো—। বড় ভয় করে। মাথার ওপর অম্বুমর দেনা, মা যে কোথা থেকে কবে কি শোধ করবে তা জানি না!'

'মা তো তোর ঐ করেই করছে সব, যখন তোর মাইনে বলতে কিছু ছিল না, তখনও তো চালিয়েছে। তিনটে মেয়ের বিয়েও দিলে। তা ছাড়া দুটো পেট তো কমেও গেছে। তরু নেই, খেঁদি নেই—'

'তেমনি বাবা আছেন। তা নয়—। ভাবছি তাই।'

শরৎ কি তন্দ্রাচ্ছন্ন হল নাকি?

উমা গলাটা অকারণেই ঈষৎ একটু উঁচু করে বলে, 'কতক্ষণ বেরিয়েছিস বাড়ি থেকে? খাবি কিছু? ঘরে অবশ্য নারকোল নাড়ু আছে, কিন্তু—। খাবার আনাব?'

প্রশ্নটা যথাস্থানেই পৌঁছয়। শরৎ এবার নড়েচড়ে বসে। বলে, 'আমার জন্যে কিছু আনিও না।'

'কিছুই খাবে না? একটু মিষ্টি?'

'না। মিষ্টি সহ্য হয় না। বড় অম্বল হয়। চা নেই তো ঘরে - না?'

'ঘরে নেই—তবে বাড়িওলাদের কাছে আছে। ওদের একটা উনুন জ্বলছেই দিনরাত, শুধু চায়ের জন্যে। করে দিচ্ছি আমি।'

'না, না। থাক গে—আবার অত হাঙ্গামা করতে হবে না। পরের কাছে চেয়ে চিন্তে—'

'তাতে কোন হাঙ্গামা নেই। ওরা চোদ্দ বার চিনি চেয়ে নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে। ওরাই করে দেবে এখন—।'

উমা ভেতরে যায়। দু কাপ চা চাই, আর ওদের কোন লোক যদি কখানা হিংয়ের কচুরি এনে দিতে পারে।

কিন্তু ইতিমধ্যে হেমের মাথা খুলে যায়। সে হঠাৎ উঠে পড়ে বলে, 'আমি চট করে একটু ঘুরে আসছি মেসোমশাই—যাব আর আসব। এই পাড়াতেই একটু কাজ আছে। এলুম যখন—'

শরৎ যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। একলা উমার সঙ্গে মুখোমুখী এই নির্জন ঘরে বসতে বোধ করি ভয়ই করে ওর। বলে, 'আরে ও কি, কোথায় যাবে?

বসো না। আমিও তো উঠব—। তোমার মাসী হয়তো তোমার জন্যে খাবার আনতে গেল—'

'যাব আর আসব মেসোমশাই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

শরৎ আর কিছু বলবার আগেই বেরিয়ে যায় সে।

উমা যখন খাবার আর চা নিয়ে ফিরে আসে, তখন হেম নেই। শরৎ একা তেমনি চোখ বুজে বসে আছে।

'ও কি—হেম কোথা গেল?'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি বলে কোথায় গেল। এই পাড়াতেই নাকি ওর কী কাজ আছে!'

'ত্যাখ দিকি, দুষ্টু ছেলে। চা-টা নষ্ট হবে।' উমা এই বয়সেও রাঙা হয়ে ওঠে কি?

'দুষ্টু—? ও!' শরৎও মুখ টিপে হাসে। লজ্জিত হাসি। তার পর বলে, 'নষ্ট হবে কেন, তুমি খাও না!'

'না। ও আমার সহ্য হয় না। খাই না যে একেবারে তা নয়, এদের পাল্লায় পড়ে সর্দি-কাশি হলে খেয়েছি—কিন্তু রাত্রে ঘুম হতে চায় না!'

'তা হোক। খাও একটু। একা খাব!'

শরৎ বাকী কাপটা ওর দিকে ঠেলে দেয়, হাতে তুলে দিতে বুঝি সংকোচে বাধে।

উমা অগত্যা কাপটা টেনে নেয়। হেমের জলখাবারের রেকাবিটা তক্তপোশের নীচে সরিয়ে রেখে শরতেরটা সামনে একটু ঠেলে দেয়। বলে, 'খাও। মিষ্টি নয়, হিঙের কচুরি। নারকোল নাড়ু একটা দিয়েছি, না খেতে চাও খেও না। ঘরে তৈরী ছিল, তাই—'

শরৎ নিরবে কচুরির থালা টেনে নেয়; চিবোতেও থাকে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে।

উমা চায়ে একটা চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করে, 'তোমার কী হয়েছে? শরীর খারাপ? অসুখ ধরিয়েছ নাকি?'

'অসুখ? না—তেমন কিছু নয়, মোটামুটি ভালই আছে শরীর। তবে খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হচ্ছে তো। হোটেলের খাওয়া কোনকালে সয় না আমার, অথচ তাই খেতে হচ্ছে—দু বেলাই।'

'কেন ?—তার—তার মানে ? হোটেলে কেন ?'

কণ্ঠটা বড় বেশী যেন তীক্ষ্ণ শোনায় উমার। সে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ে। যে প্রদেশে সে গিয়ে পড়ছে সেখানে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

শরৎ চায়ের পেয়ালায় একটু চুমুক দিয়ে, বেশ সহজ কণ্ঠেই বলে, 'গোলাপী মরে গেছে। ছেলেমেয়ে দুটো সুদ্ধ। এক রাত্তিরে তিন জনই গেল কলেরায়, শুধু আমারই কিছু হল না। তার পর আর কি—এই!'

উমা উত্তর দিলে না। ওর বুকে যে তুমুল আলোড়ন উঠেছে, তাতে সহজ ভাবে কথা বলা আর সম্ভব নয়। রক্তের সে উত্তাল গতির শব্দ বাইরে থেকেও যেন কান পেতে শোনা যায়। সহস্র প্রশ্ন ঠেলাঠেলি করে মনের মধ্যে, সহস্র অভিমান, সহস্র অনুযোগ। কিন্তু কিছুই বলে না সে, বলতে পারে না। শুধু—হাত দুটো বড় বেশী কাঁপতে শুরু হয় বলে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখে।

চা-টা শেষ করে শরৎও কাপটা নামিয়ে রাখে। দুখানা কচুরি খেয়েছে আর নারকোল নাড়ুটা। আরও দুখানা কচুরি পড়ে রইল, কিন্তু এখন আর ওর পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয় বুঝেই উমা অনুরোধ করল না। তা ছাড়া সেদিকেঁ ওর দৃষ্টিও ঠিক পুরোটা ছিল না, মনও নয়। মন বহুদিনের ফেলে আসা দীর্ঘ মরু-দিনগুলিতে বিচরণ করছিল, বহু নালিশ, বহু হাহাকার, বহু ব্যর্থতা সেখানে।

অনেকক্ষণ পরে কথা কইতে পারল উমা। একটা ডেয়ো পিঁপড়ে ক্রমাগত চক্রাকারে আলোটার পাশে ঘুরছে, সেইদিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'তা আর কোথাও—মানে আর কোন আত্মীয়—'

'নাঃ! তেমন আর কে আছে। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে তো বহুকালই ছাড়াছাড়ি, কে কোথায় আছে তাও জানি না। তেমন পয়সা থাকলে তারাই হয়তো খবর পেয়ে এসে জুটত, তাও তো নেই। এখন আমার বোঝা বইবার মজুরি পোষাবে না!'

একটু হাসল সে। তার পর বলল, 'আরও কত দিন বাঁচতে হবে তাও তো বুঝতে পারছি না—নইলে সব বেচে কিনে দিয়ে কোন তীর্থে চলে যেতুম।...ছোট প্রেস, বেচতে গেলে তিন-চার হাজারের বেশি উঠবে না—সে টাকা সম্বল করে কোথাও যাওয়া যায় না, ভরসা হয় না!'

আবারও কিছুক্ষণ দু জনেই চুপচাপ।

যে কথাটা গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছে সেই থেকে—সেটা কিছুতেই বলতে পারে না, সে অনুরোধ করতে পারে না। অথচ লোকটার জন্য এ কী প্রবল অনুকম্পা বোধ করছে ও, এ কী অকারণ মমতা। এমন কি—সেই স্ত্রীলোকটার মৃত্যুসংবাদও, এর দিকে চেয়ে যেন দুঃসংবাদ বলেই মনে হচ্ছে।

শরৎ আবারও যেন চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ উঠে বসে বলে, 'হেম তো এল না, আমি তা হলে উঠি আজ—কী বল!'

আর না বললেই নয়। এ সুযোগ এবং সুবিধা কবে আসবে আবার কে জানে, আবার কত কাল পরে দেখা হবে!

মরীয়া হয়েই বলে ওঠে উমা, 'তা তোমার প্রেস তো এমন খুব বেশী দূরে নয়, এখান থেকে খেয়ে গেলেই তো হয়!'

'তোমার এখান থেকে?'

'হ্যাঁ? তাতে দোষ কি?'

'না, দোষ কিছু নেই। তবে তুমি একার মত যা হয় দুটি রাঁধ চুড়ুর-বুড়ুর—তার মধ্যে আমি আবার—।...মিছিমিছি তোমার ঝঞ্ঝাট বাড়ানো। থাক, আর কটা দিন দেখি। তার পর একেবারে শরীর ভেঙে গেলে তাই হয়তো এসে উঠতে হবে তোমার ছোড়দির বরের মত। বোনে বোনে তোমাদের বরাত কিন্তু বেশ!' হেসে বলল শেষের কথাগুলো, একটু ঠাট্টার সুরেই।

'না। তার বরাত আমার চেয়ে ঢের ভাল। সে ছেলেমেয়ে পেয়েছে, সংসার পেয়েছে, নিজের বাড়িঘর করতে পেরেছে। তার স্বামী পশু হোক, সে পশুকেও সে পেয়েছে, অন্তত কিছুদিনের জন্য। আমি কি পেলুম?'

এতক্ষণের সমস্ত সংযমের ও সংকোচের বাঁধ বুঝি ভাঙে। চেষ্টা করেও কথাগুলোকে বুঝি আটকাতে পারে না উমা।

শরতের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে যায়, লজ্জায় অপমানে এবং হয়তো বা বেদনাতেও মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'মাপ কর। সত্যিই আমার অপরাধের সীমা নেই। কথাগুলো আমার আরও ভেবে বলা উচিত ছিল।'

সে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে গিয়ে পায়ে জুতোটা গলিয়ে এক সময় বাড়িরও বাইরে বেরিয়ে যায়।

উমা আর কিছুই বলতে পারে না। আটকাতেও পারে না ওকে। ব্যাকুল ভাবে এক বার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু বাড়িতে আরও

বহু লোক। ওদের কাছে অপরিচিত একটা পুরুষের পিছু পিছু গিয়ে হাত ধরে বা মিনতি করে টেনে আনা সম্ভব নয়।

এ কী করল ও, এ কী বলল! যা বলতে গিয়েছিল তার উল্টোটাই বলে বসল! এই সময় একটু সেবা, একটু সান্ত্বনা, একটু সাহচর্য দেবার জন্যই বুঝি মনটা উন্মুখ হয়ে ছিল, সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল মন—কিন্তু সে বার্তা তো ওর কথায় প্রকাশ পেল না, কঠোর নির্ঘাত আঘাতে সে তো সরিয়েই দিল আরও দূরে—

এ সময় যদি হেমটাও থাকত।

সব লজ্জা ত্যাগ করে সে হেমকে দিয়ে ডেকে পাঠাত।

কিন্তু হেম আর এল না। তখনও নয়—তার পরেও নয়। সে রাত্রেই আর ফিরল না সে।

ওদের দীর্ঘ নিভৃত অবসর দিয়েই চলে গিয়েছিল—কিন্তু উমা সে অবসরকে কোন কাজেই লাগাতে পারল না। এত দিন ছিল আত্ম-অনুকম্পা আর দুর্জয় অভিমানের মধ্যে একটা আশ্রয়—অদৃষ্টের পরিহাসে সেটুকুও ঘুচে গিয়ে সে জায়গায় দেখা দিল অনুশোচনা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

হেম বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, কথাটা মহাশ্বেতা ও বাড়ি থেকে ফেরবার পর আর কারুরই জানতে বাকী রইল না। বাকী থাকবার কথাও নয়—আনন্দের কথা, উল্লাসের কথা। গোপন করবারও কোন কারণ মনে পড়ে নি মহাশ্বেতার।

কিন্তু সে-রাত পোহাবার আগেই, কথাটা এত 'গাব্ জাবার' জন্যে—তার অনুতাপের শেষ থাকে না। কে জানত যে মেজবৌয়ের একটি বোন হাতের কাছে যোগানো ছিল!

প্রমীলা সোজাসুজি বলে নি মহাকে, সাহসে কুলোয় নি বোধ হয়। কারণ মহাশ্বেতার মুখ আজকাল একটু একটু খুলছে, ইদানীং সে ওকে শুনিয়েই নানা কথা বলে, ওর প্রতি মনোভাব যে মহাশ্বেতার ভাল নয় সেটা কারুর কাছেই আর গোপন নেই। বিশেষত বড় আর ছোট হয়েছে এক জোট। প্রমীলার প্রতি এত দিনের সমস্ত বিদ্বেষ তরলার প্রতি সহানুভূতি-রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। ওকে উপলক্ষ করে সে বিষ উদ্গার করার সুবিধা হয়েছে খুব—আর তরলাও যেন একমাত্র আশ্রয় হিসেবেই, তার বড় জাকে অবলম্বন করেছে।

সুতরাং সন্ধ্যাবেলা পুরুষরা অফিস থেকে ফিরতেই প্রমীলা কথাটা বলেছে অম্বিকাকে, অম্বিকা বলেছে দাদাকে।

অভয়পদ অবশ্য শুনে বলেছিল, 'তাই নাকি? তা তুমিই বলো না তোমার বৌদিকে!'

'না দাদা—তুমিই বলো। মেজ বৌ অতি-অবশ্য করে বলে দিয়েছে।'

'বলছ, তা বলব ওকে। কিন্তু এ তো তোমার বা মেজবৌমারই বলবার কথা।'

আর কিছু বলে নি সে। শুধু ঈষৎ একটু ভ্রূ কুঁচকে—অভয়পদর পক্ষে সেইটাই অবশ্য যথেষ্টর বেশী—ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়েছিল। অম্বিকা সে দৃষ্টির সামনে সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকেছে।

রাত্রে শুতে যাবার আগে অভয়পদ স্ত্রীর ঘরে এসে দাঁড়াল। স্ত্রীর ঘরই বলতে হয়—কারণ অভয় কোন দিনই সে ঘরে শোয় না। চলনে তার সেই অদ্বিতীয় কাঠের বেঞ্চিটিই এ জগতে বোধ হয় তার একমাত্র বাসা।

'কী গো, কি সমাচার। আজ যে এ ঘরে?' চিমটি কেটে বললে মহা।

অভয়পদ সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, 'হেম নাকি বিয়ে করতে রাজী হয়েছে? মা নাকি তোমায় মেয়ে দেখতে বলেছেন!'

'বাব্‌বা, এরই মধ্যে তোমার কাছে পর্যন্ত খবর পৌঁছে গেছে! আমিই তো বলব ভাবছিলুম। তা বেশ তো, ত্যাখ না—একটা ভাল-দেখে মেয়ে। বাবা বলে দিয়েছেন বেশ সদ্‌বংশের একটি মেয়ে দেখতে—'

অভয়পদ মুহূর্তকাল মৌন থেকে বললে, 'অম্বিকে বলছিল মেজ বৌমার নাকি একটি বোন আছে, আপন খুড়তুতো না জাঠতুতো বোন—তাকে এক বার দেখাবার কথা!'

'কে! কার কথা!' চাপা গলায় যত দূর ফেটে পড়া সম্ভব তাই পড়ে মহাশ্বেতা, 'মেজ বৌয়ের বোন! এই কথা পেড়েছে ওরা? সাহস বটে, বলিহারি যাই! আস্পদ্দা!'

অভয়পদর মুখে কোন বিস্ময় ফোটে না, বরং বেশ যেন প্রশান্ত মুখেই প্রশ্ন করে, 'কেন এতে আর সাহসের কী আছে! তোমরা মেয়ে খুঁজছ—তাদের ঘরে আছে, এই তো!'

'হ্যাঁ—জেনেশুনে ঐ ঝাড়ের বাঁশ আমি বাপের বাড়িতে ঢোকাই! আমার কি হায়া-পিত্তি সব ঘুচে গেছে? ও বেউড় বাঁশের ঝাড়, ও রক্ত যেখানে আছে সেখানে কোন কাজ করব না আমি, করতে দেব না। এই আমার স্পষ্ট কথা। তা তুমি রাগই কর আর গোসাই কর!'

অভয়পদ মুচ্‌কি হাসে একটু, বলে, 'তুমি যেখান থেকে মেয়ে আনবে সে কোন্ ঝাড়ের হবে তা কী করে জানছ? বাইরে থেকে কার কতটুকু বোঝ?'

'সে বরাতে যা আছে তা হবে। তাই বলে জেনেশুনে ঐ ডাকাতে মেয়ের বোনকে—না সে আমি পারব না!'

'তা হলে এই কথাই আমি বলে দেব তো?' একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করে অভয়পদ।

'দাও না। তাতে কি হয়েছে? আমি কি ভয় করি নাকি? অত ভয়

কিসের ? তোমার কাছে তোমার মেজ ভাই গুরু গোবিন্দ আর মেজ ভাজ
।। গোসাঁই হতে পারে, আমার কাছে নয় !'

কথাটা সম্ভবত যথাযথই জানিয়েছিল অভয়পদ। ফলে মেজবৌ যাকে বলে নিজমূর্তি-ধরা' তাই ধরলে। ঠিক মুখের ওপর বা স্পষ্ট করে না বললেও, কারুরই আর বুঝতে বাকী রইল না যে এ সব শব্দভেদী বাণ কার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হচ্ছে।

ভোরবেলা হয়তো উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে দুর্গাপদকে উপলক্ষ করে বলে, 'লোকে কথায় কথায় বলে বংশ। ভাল বংশ দেখে কাজ করতে হয়। ওসব আমি মানি না। এই যে আমার বড় জা, লোকে বলে বোকা–তা বোকাই বলুক আর যা-ই বলুক অমন নিপাট ভালমানুষ তো কই বড় একটা দেখা যায় না। মনে যা এল মুখে বলে ফেললে, কখনও রেখে-ঢেকে কথা কইতে জানে না। মন গঙ্গাজল। আর ছ্যাখ কাজে কর্মে আহারে ব্যাভারে বাড়ির বড় বৌয়ের যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনি—নয় কি ? কিন্তু বংশ দেখতে গেলে কি ও মেয়ে আনা চলত ? তুমিই বল না ছোট্ ঠাকুরপো, গুরুজন—বলা অবিশ্যি উচিত নয়, পেন্নাম করি এইখান থেকেই—কী মানুষ বল তো ওর বাবা ? ঐ বাপের এই মেয়ে—ভাবাই যায় না। না, ওসব কিছু নয়, যাকে যেমন তৈরী করেছেন ভগবান !'

সে কথা কানে যাওয়ার কোন অসুবিধে নেই। কারণ বড় বৌ হয়তো তখন রান্নাঘরে ডাল সাঁতলাচ্ছে। সে তেলেবেগুনে জলে ওঠে, 'আমার বংশ ! আমার বংশের কথা কেউ যেন না মুখে আনে। বাবা যা-ই হোক, কত বড় গুরুবংশ আমাদের, দু শ আড়াই শ ঘর শিষ্যি-যজমান ছিল ঠাকুরদার। কত লোক নিত্যি তাঁর পাদোকজল খেত। এক জনকে দেখে বংশ বিচার করা যায় না !'

'আমিও তো তাই বলি ছোট্ ঠাকুরপো—এক জনকে দেখে বংশ-বিচার করা ঠিক নয়। কে কেমন তাও কেউ ঠিক করে বলতে পারে না। ন্যাবা হলে মানুষ সব হলদে দেখে শুনেছি, কারুর ওপর কারুর রীষ থাকলে তার সব খারাপ দেখে। কিন্তু যথাধর্ম কার মনে কী আছে কেউ কি বলতে পারে ? ওপরটা দেখে বিচার করা চলে না।'

মহাশ্বেতা নিজের ফাঁদে নিজে আটকে পড়ে গজরায় শুধু—লাগসই জবাব একটাও খুঁজে পায় না।

কোন দিন হয়তো আঘাতটা একেবারে সোজা এসে লাগে—বল্লমের আঘাতের মত।

'বলি আমি কার ঘরে কী আগুন লাগিয়েছি—কার ভাতারপুতকে ছিনিয়ে নিয়েছি যে আমার ঝাড়ে বংশে সব খারাপ হয়ে গেল? আমি কি কাউকে ভাঙিয়ে নিয়েছি কলিয়ে সলিয়ে? আমি কারুর পেছনে ঘুরি? আর কারুর পেছনে না ঘুরে যদি আমার পেছনেই কেউ ঘুরে মরে—সে কি আমার দোষ? …তোরা ভোলাতে পারিস না কেন? আমি কি চেষ্টা করে কাউকে ভোলাই? …এটি মনে রেখো পুরুষ রূপেও ভোলে না বয়সেও ভোলে না—ভোলে গুণে। নিজেদের দোষ কেউ দেখতে পায় না—শুধু শুধু নিজের খামতি পরের দোষ বলে চালাতে চেষ্টা করে।'

এ আঘাত অবশ্য বড় বৌয়ের চেয়ে ছোট বৌকেই লাগে বেশী। সে এসে কান্নাকাটি করে বড় জায়ের কাছে, 'দিদি আপনারা তো দেখে শুনেই কালো বৌ আনলেন অমন সুন্দর পুরুষের জন্য—এখন আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন? এ তো ইচ্ছে করে আমাকে জব্দ করা!'

আঘাত আসে তরলার ওপর অন্যদিক দিয়েও।

এর পর যেন আরও বাড়ায় প্রমীলা। ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে দুর্গাপদর সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্প গুজব বাড়িয়ে দেয়। আজকাল সন্ধ্যে থেকেই দু জনে ছাদে বসে থাকে,—রাত্রের রান্না মেজবৌ ছেড়েই দিয়েছে দীর্ঘকাল—এক বার শুধু খেতে নামে, আবার উঠে যায়, রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত বসে বসে গল্প করে।

'কিসের এত কথা ওদের, কিসের এত গল্প বলতে পারিস না ছোট বৌ? ফুস্‌মন্তর ঝাড়ে বসে বসে—না কি? না কি গুণজ্ঞান করে পাথর করে বসিয়ে রাখে। আর তুক-গুণের কথা বলবই বা কি, বাড়িসুদ্ধ লোককেই তো গুণ করে রেখে দিয়েছে। নইলে ভাসুর সোয়ামী শাশুড়ী সব বিদ্যমান থাকতে এমন বেলেল্লাগিরি করে পার পেয়ে যায়—এ কখনও শুনি নি বাপু! তা ছাড়া শরীরেও তো কুলোয়! মেজবৌ না হয় সারা দুপুর ঠেসে ঘুমোয়—ওর এক রকম পুষিয়ে যায়—কিন্তু ছোট-কর্তাকে তো সাতটায় ভাত খেতে বসতে হয়, ওর চলে কী করে?'…

ইদানীং—মহাশ্বেতা শিখিয়ে দেওয়াতেই—কিছু দিন ধরে দুর্গাপদ গিয়ে শোবার পর তরলা নেমে এসে ওর বিছানাতে বসে পা টিপে দিচ্ছিল। প্রথম প্রথম দু-চার দিন নিষেধ করলেও শেষ পর্যন্ত প্রবল বাধা কিছু দেয় নি। দু-

চার দিন পরে নিষেধও করত না। ব্যাপারটা বেশ সহজেই মেনে নিয়েছিল। প্রত্যহই তরলা এসে নিঃশব্দে পা টিপতে বসত, পা টেপার মধ্যেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ত দুর্গাপদ—ওর নিঃশ্বাসের শব্দে ঘুম গাঢ় হয়েছে বুঝতে পেরে তরলা ফিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুত—এবং আরও বহুরাত্রি পর্যন্ত জেগে কাটাত।

কিন্তু মহাশ্বেতার সঙ্গে মেজবৌয়ের এই প্রত্যক্ষ বিরোধের পর দুর্গাপদ বহুরাত্রে ফেরে, তখন—সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে—তরলার চোখের পাতা ভেরে আসে ঘুমে, এক-এক দিন টেরও পায় না কখন এসে শোয়। যদি বা ঘুম ভেঙে উঠে যায় অথবা জোর করে চোখে জল দিয়ে জেগে থাকে—দুর্গা আর ওকে ছুঁতে দেয় না পা। বলে, 'ঢের হয়েছে, জুতো মেরে গরু দানে আর কাজ নেই! হেন কুকথা নেই যা আমার নামে তোমরা রটাচ্ছ না—আবার এ লোক-দেখানো পতিভক্তি কেন? যাও, শুয়ে পড় গে।'

তাতে তরলা হয়তো জবাব দেয়, 'আমি কি বলেছি কিছু, আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, কে বলছে আর কে কার পেছনে কলকাঠি নাড়ছে সব আমি জানি, থাক্। খবরদার আমার পায়ে হাত দিতে এলে এবার এমন কটু দিব্যি দেব যে টের পাবে মজা! দূর করে দেব ঘর থেকে!'

লজ্জায় অপমানে ভয়ে কাঠ হয়ে যায় তরলা।

পরের দিন বড় জায়ের কাছে বলে, 'গত জন্মে কত পাপ করেছিলুম, কোন্ সতীলক্ষ্মীকে কী বঞ্চিত করে এসেছিলুম তাই এ জন্মে সব পেয়েও বঞ্চিত হলুম। এমন ঘর বর গয়না কাপড়—এমন আপনার মত জা, নির্বিরোধী শাশুড়ী—কটা মেয়ে পায়? সব পেয়েও আমি আজ কাঙ্গাল। শুধু এই ভেবেই নিজের হাতে প্রাণটা বার করতে পারি না দিদি, নইলে উপায় সব জানি। বলে আত্মহত্যা মহাপাপ, সে জন্মের পাপের ফলে এই ভুগছি আবার মহাপাপ বাড়াব! শুধু সেই জন্যে পিছিয়ে আসি—ভাবি থাক, সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত যেন এই জন্মেই হয়ে যায়। কিন্তু আর সহ্য হচ্ছে না। আর পারছি না মাথার ঠিক রাখতে।'

'তা দিন কতক বাপের বাড়ি ঘুরে আয় না ছোট বৌ!'

'ছিঃ! তারা তো সবই জানে—আমি না বললে কী হবে, জানতে কিছু কি বাকী আছে? সে বাড়িতে পা দেব কোন্ মুখে। সবাই আহা-উহু করবে,

দয়ার চোখে দেখবে—সে আরও বেশী অসহ্য। তা ছাড়া তারা তো কিছু কম করে নি—যথাসাধ্য খরচ করেই বিয়ে দিয়েছে—তার ওপর তাদের ঘাড়ে চাপব! বাপ-মার জ্বালার ওপর জ্বালা! আর বিয়ের পর বাপের বাড়ি পড়ে থাকা মানেই ঝি হয়ে থাকা। শ্বশুরবাড়িতে সব সহ্য করা যায়—এত কাল আদরের পর বাপের বাড়িতে হেনস্তা হলে বড় অসহ্য লাগে দিদি। না, যদি বেরোতে হয় তো মরাই বেরোব।'

'বাপ রে! অমন কথা বলিস নি। আমি বলছি,—তুই সতীলক্ষ্মী মেয়ে, তোর হক্ তুই এক দিন ফিরে পাবিই! দুটো দিন সবুর কর!'

॥ ২ ॥

কথাগুলো যখন বলেছিল মহাশ্বেতা তখন তা যে এত শিগ্‌গির ফলে যাবে, তা বোধ হয় সে নিজেও আশা করে নি।

আর এমন মর্মান্তিক ভাবেই ফলল!

মর্মান্তিক বৈ কি! মেজ বৌ অন্য সব ব্যাপারে যতই মহার ওপরে টেক্কা দিক, একটা ব্যাপারে মহাই তাকে টেক্কা দিয়েছে। সন্তান বলতে এ বাড়িতে যা কিছু মহাশ্বেতারই। প্রমীলার একটি মেয়ে হয়ে বহু দিন আগে মরে গিয়েছিল—আর কিছুই হয় নি। হবেও না আর—তাই সকলে জানে। মহাশ্বেতা সগর্বে বুক ফুলিয়ে বলত সবাইকে, 'মদ্দর মত গাছে চড়া কী জলে ঝাঁপাই-ঝুড়লে মদ্দই হয়ে যায়—বুঝলি! সব তাইতে হামবড়া, কত্তামি। তাই ভগবান বললে 'কত্তামি নিয়েই থাক, তোকে আর গিন্নেমো করতে হবে না।' ওর তো আগাগোড়া বাঁজা মেয়েমানুষের লক্ষণ, একটা হয়েছিল কি করে তাই ভাবি।···সে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে—আর নয়, এটি জেনে রেখো!'

কিন্তু নজর পড়ল মহাশ্বেতারই।

কিছু দিন ধরেই খেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে চলে যায় মেজবৌ। কেন যায় অত কেউই মাথা ঘামায় নি, হঠাৎ এক দিন মহার বড় ছেলেটা বললে, 'মা জান—মেজকাকী রোজ খেয়ে উঠেই বমি করে!'

'তাই নাকি, কে বললে রে!'

'আমি দেখেছি, যা খায় বমি করে আসে। সকালে আজকাল কিছু খেতে চায় না দেখ না? খেয়েই বমি করতে হয় যে।···মেজকাকী বাঁচবে—হ্যাঁ মা?'

মহাশ্বেতা এখন আর এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ নেই।

সেদিন দুপুরে রান্নাঘরে তিন জায়ে খেতে বসেছে, ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছে মেজবৌ—হঠাৎ মহার মনে পড়ে যায় কথাটা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে মেজবৌয়ের মুখের দিকে। চোখের কোলে কালি পড়েছে, মুখের চেহারাটাও যেন কেমন কেমন।

'হ্যাঁলা মেজবৌ—তোর রকম-সকম তো ভাল বোধ হচ্ছে না!'

'সে তো তোমার কোন দিনই ভাল বোধ হয় না দিদি!'

'নে রঙ্গ রাখ।...দেখি জামাটা খোল তো—'

এবার মেজবৌও লজ্জিত হয়, 'কী যে বল দিদি তার ঠিক নেই।'

'ওমা তা এখানে আবার লজ্জা কি, পুরুষ তো কেউ নেই। আর তোর কি এখনও লজ্জার বয়স আছে?'

'যাও। দেখবেই বা কি! তোমার বুঝি এখন জ্ঞানবুদ্ধি খুব হয়েছে? নিজে তো এক কালে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছিলে মরে যাচ্ছি বলে—'

'ও। তাই বল! তা হলে মেজকত্তার অ্যাদ্দিন পরে জলপিণ্ডির ব্যবস্থা হচ্ছে! আজ আসুক মেজকর্তা বাড়িতে—সন্দেশ আদায় না করে ছাড়ছি না। ভোঁদা গয়লার দোকানে অর্ডার দেওয়া রাজভোগ খাওয়াতে হবে।'

'নাও। নাও। ওসব বলো না খবরদার। বুড়ো বয়সে—লজ্জা করে।'

'লজ্জা আবার কি লা! তোর যেমন কথা। এ তো আনন্দের খবর।'

কথাটা বলতে বলতেই কিন্তু যেন মহাশ্বেতা গম্ভীর হয়ে ওঠে। পরাজয় তো বটেই—সেই সঙ্গে যেন কতকটা আশাভঙ্গও। স্বামী যে যথাসর্বস্ব মেজ ভাইয়ের হাতে তুলে দিচ্ছে তার তবু একটা সান্ত্বনা এত দিন ছিল যে—হয়তো এ যা-কিছু এক দিন তার ছেলেরাই পাবে।

তবু—মনে মনে যতই পরাজয়ের গ্লানি এবং আশাভঙ্গের বেদনা বোধ করুক, শিশু-সুলভ কৌতুকবোধ ওকে বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে দেয় না। কথাটা বিকেলের মধ্যেই শাশুড়ীর কানে ওঠে, তিনি বলেন, 'ওমা তাই নাকি? ষাট ষাট। আজ বাপু তা হলে বড় বৌমা পাঁচ পয়সার বাতাসা আনিও, সন্ধ্যেবেলা হরির নোট দিতে হবে। খবরটা যখন আজই কানে পৌছল—'

'কী যে বলেন মা। পাঁচ পয়সার বাতাসা কি! এমন একটা শুভ খবর! অন্তত সওয়া পাঁচ আনা বলুন। উচিত তো পাঁচ সিকের দেওয়া।

'তা না হয় সওয়া পাঁচ আনাই আনিও। কে জানে বাপু, পাঁচ পয়সার বাতাসাই তো জানি ঢের। বরাবর আমাদের হরির নোট হলে—'

'বরাবর ক জন লোক ছিল মা! এখন ঘেটের বাড়িতেই কত জন লোক।

'তা ছাখ বাপু যা ভাল বোঝ!'

মেজকর্তা আসতেও আর এক চোট চেঁচামেচি হয়। বড়বৌ দু হাতে পথ আগলে দাঁড়ায়, 'উঁহু—তা হবে না! আজ সটে-পটে ধরেছি—সন্দেশ আর রাজভোগ নিয়ে এলে তবে বাড়ি ঢুকতে পারবে। ডুবে ডুবে জল খাওয়া—ভাবো যে শিবের বাবাও টের পাবে না—না?'

'নাও, আজ আবার এ কী মূর্তি! বলি—হল কি এত সন্দেশ খাওয়াবার মত?'

'কী আবার হবে—জলগণ্ডুষের স্থল! উঃ, কী চাপতেই পার মাইরি! সত্যি সত্যি আমি ছাড়ব না বলে দিলুম, আমাকে চেনো নি!'

অম্বিকাপদর মুখেও সলজ্জ হাসি ফোটে।

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। আজ এখনই কি করে হয়। মাস-কাবার হোক।' কোথায় কি তার ঠিক নেই—'

'তা শুনছি না বাপু। নিদেন এখন যা আছে পকেটে বার কর তো।'

সত্যি-সত্যিই পকেট ঘেঁটে সাড়ে তেরো আনা পয়সা বার করে নেয় মহাশ্বেতা। বড় ছেলেকে খটির বাজারে পাঠায় গরম রসগোল্লা কিনে আনতে।

এত চেঁচামেচি দুর্গাপদর কানে না পৌঁছানোর কথা নয়।

সে যেন একটু অবাকই হয়ে যায়।

বার বার তাকায় মেজ বৌয়ের দিকে। কথাটার সত্যাসত্য যাচাই করতে চায়। কিন্তু এক বারও চোখে চোখ পড়ে না দু জনের। মেজবৌ যেন সযত্নেই এড়িয়ে চলে দুর্গাপদর চোখ।

অন্য দিন সন্ধ্যার পরই ছাদে যায় দু জন। আজ প্রমীলা গিয়ে দেখে তখনও দুর্গাপদর দেখা নেই। তার ওপর নীচে থেকে বড় বৌ হেঁকে বলে, 'ওলো ও মেজ বৌ, খোঁপায় খড়কে কাঠি গুঁজেছিস তো? তোদের তো ভয়ডর নেই—আমরা মরি যে বুক কেঁপে। তা ছাড়া, এখনই তো তোর ভাসুর হরির নোট দেবে—সেরে একেবারে টং-এ উঠলে হত না!'

প্রমীলা তরতর করে নেমে আসে।

'ও কী হচ্ছে দিদি! বট্‌ঠাকুর বাড়ি এসেছেন, ও কী চেঁচামেচি হচ্ছে! কী মনে করছেন বল তো!'

'কী আবার মনে করবেন। ভাইয়ের বংশরক্ষে হচ্ছে এই মনে করছেন!'

গলা কিছুমাত্র চাপবার চেষ্টা না করেই হাসতে হাসতে জবাব দেয় সে। বেগতিক দেখে প্রমীলা আর বেশী ঘাঁটায় না, তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে।

দু জনে দেখা হয় একেবারে রাত্রে খাওয়ার পর।

দুর্গাপদ একটু দেরি করেই দাঁত খুঁটতে খুঁটতে ছাদে ওঠে।

'কি ব্যাপার গো, ছোটবাবুর আজ যে দেখাই নেই!'

দুর্গাপদ তখনই কোন জবাব দেয় না। ধীরে সুস্থে, দাঁতে খড়কে দেওয়া শেষ হলে খড়কেটা ফেলে দিয়ে একেবারে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, 'কৈ এসব কথা আমাকে বল নি তো এক দিনও—'

'কী কথা? ও, নাও! এ আবার কি একটা বলবার মত কথা! বুড়ো বয়সে—'

'বুড়ো বয়সে হতে পারে—বলতেই যত লজ্জা!'

'আর কীই বা বলব! বা রে, এসব কথা বুঝি মুখ ফুটে বলে কেউ নিজে নিজে! জানি—জানতে তো পারবেই—

'হুঁ!' দুর্গাপদ ট্যাঁক থেকে নস্যির কৌটোটা বার করে।

'কী হল—আজ যে মনটা ভার ভার? এই খবরেই নাকি?'

'হওয়া তো উচিত।'

'কেন? বা রে। এর সঙ্গে তোমার কি?

'না—তাই ভাবছি!'

'কী ভাবছ তাই তো শুনতে চাইছি।'

'শুনে লাভ কি!'

'তবু—'

'ভাবছি সবাই তো দিন কিনে নিলে। আমিই বোকা—চিরদিন যাত্রার বাইরেই রইলুম, আসরে ঢোকা আর হল না।'

'থাকছ কেন! আসরে ঢুকতে কে বারণ করেছে? দিন কিনে নিতেই বা কে আটকে রেখেছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে প্রমীলা।

দুর্গাপদ নীরবে বসে নস্যি নেয়।

'কী, উত্তর দিলে না যে ?'

'উঠি। ঘুম পাচ্ছে।' দুর্গাপদ সত্যিই উঠে দাঁড়ায়।

'ও আবার কী। সে কি কথা ? এরই মধ্যে ?' প্রমীলা ওর কোঁচাটা চেপে ধরে।

কোঁচাটা এক রকম জোর করেই ছাড়িয়ে নেয় দুর্গাপদ। ধীর ও নিস্পৃহকণ্ঠে বলে, 'বড় বৌদি ঠিকই বলছিল—এ অবস্থায় এত রাত্রে ছাদে ওঠা তোমার ঠিক নয়। পেটে যেটা এসেছে—নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তুমি আর এসো না রাত্তির বেলা—'

'আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি ছোট বৌয়ের আঁচলের তলায় ঢোক গে যাও!' রাগ করে বলে ওঠে প্রমীলা।

দুর্গাপদ এ আক্রমণেও বিচলিত হয় না। বরং ধীরে সুস্থে ছাদ থেকে নামবারই উদ্যোগ করে।

এবার প্রমীলা এসে দু হাত দু দিকের কাঠে দিয়ে দরজা আটকে দাঁড়ায়।

'ও কী হচ্ছে ছেলেমানুষি! বসবে চল। এরই মধ্যে নামতে হবে না!'

অন্ধকার—তবু উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোতে মোটামুটি নজর চলে একটা। বড় সাংঘাতিক কটাক্ষ মেজবৌয়ের চোখে। অগত্যা দুর্গাপদকে ফিরে গিয়ে বসতে হয়।

কিন্তু প্রমীলা বুঝতে পারে যে তার এ বিজয় ক্ষণস্থায়ী। ওদের আড্ডা আর জমবে না আজ। একথা সেকথার পর—এবং সে কথাও বড় শুষ্ক, বড় প্রাণহীন, বড়ই জোর করে বলা—গোটাকতক হাই তুলে দুর্গাপদ আবারও উঠে পড়ে হঠাৎ এক সময়।

'শরীরটা ভাল নেই, বড় ঘুম পাচ্ছে আজ!' কৈফিয়ত স্বরূপ বলে সে।

কিন্তু প্রমীলা সে কৈফিয়তের জবাব দেয় না। বাধাও দেয় না আর। কাঠ হয়ে বসে থাকে শুধু।

•

দুর্গাপদ যখন নিজের ঘরে এল তখন তরলা বসে হ্যারিকেনের আলোতে —ওদের বাড়ির অদ্বিতীয় বই—পুরনো রামায়ণটা পড়ছে। অসময়ে এত সকাল সকাল স্বামীকে ফিরতে দেখে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয় সে। স্থানকালপাত্র সব ভুলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে।

সে দৃষ্টির সামনে কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ে দুর্গাপদ। আপন মনেই 'শরীরটা ভাল নেই' বলে মাদুরের দিকে হাত বাড়ায়। তরলা তাড়াতাড়ি উঠে এসে নির্দিষ্ট স্থানে মাদুরটা পেতে দেয়, বালিশ এনে সাজিয়ে দেয়—তার পর তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে নিজের বিছানায় এসে শোয়।

বার বার 'ঘুম পেয়েছে' বলে নেমে আসা সত্ত্বেও দুর্গাপদর চোখে কিন্তু ঘুম নামে না। বার বারই এপাশ ওপাশ করে। 'উঁ-আঁ'ও করে মধ্যে মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত তরলার আর স্থির থাকা সম্ভব হয় না। নেমে এসে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে, 'পা টিপে দেব ?'

এত কাল পরে 'দাও' বলতে সংকোচে বাধে। কিন্তু নিষেধও করে না। সেইটেই সম্মতি বলে ধরে নিয়ে তরলা পা টিপতে বসে।

অনেকক্ষণ পরে স্থির হয়ে আসে দুর্গাপদ, সেই নিথর ভাবটাকেই ঘুম বলে ধরে নিয়ে তরলা আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় শোয়। বহু দিন পরে এইটুকু সাহচর্য লাভ করেই তার তৃপ্তি হয় বুঝি খানিকটা। আজ তারও তন্দ্রা আসে তাড়াতাড়ি।

কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ কার একটা হাত গায়ে লাগতেই ভয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করে চমকে উঠে বসে।

'ভয় নেই, ভয় নেই, আমি!' চাপা গলায় বলে দুর্গাপদ। সে বিছানার এক পাশে এসে বসেই বোধ করি ওকে ঠেলেছে।

শুধু চাপা নয়, অস্বাভাবিক কোমলও শোনায় ওর কণ্ঠস্বর।

'শরীরটা বড্ড ভার ভার লাগছে, গা-হাত-পা কামড়াচ্ছেও খুব। মেঝেয় শুতে সাহস হচ্ছে না ঠিক। ভাবছি এখানেই—'

'না, না। আপনি এখানেই শুয়ে পড়ুন। আমি বালিশ এনে দিচ্ছি।'

সে উঠে তাড়াতাড়ি দুর্গাপদর বালিশ দুটো এনে দেয়। তার পর নিজের বালিশটা টেনে নিয়ে মেঝেয় শোবার উপক্রম করতেই দুর্গাপদ খপ্‌ করে ওর একটা হাত ধরে ফেলে।

'না, না। তুমি মেঝেয় শুচ্ছ কেন ? এখানেই তো ঢের জায়গা রয়েছে, শোও না।'

থর থর করে কেঁপে ওঠে তরলা। সেই হাতটা যেন অবশ হয়ে আসে।

'না না। আপনার অসুবিধা হবে হয়তো—' অতি কষ্টে বলে শেষ পর্যন্ত।

'কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। এ তো দু জনের মতই বিছানা। তা ছাড়া

তোমার অভ্যেস নেই, মেঝেয় শুলে তোমার শরীর খারাপ হবে। এখানেই শোও।'

শেষের দুটি শব্দ আদেশের মতই শোনায়।

অগত্যা বালিশটা যথাস্থানে রেখে কোনমতে গুটিসুটি মেরে একেবারে দেওয়াল ঘেঁষে শোয় তরলা— মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে।

শোয়—কিন্তু আর তন্দ্রা আসে না চোখে। এইটুকু অধিকার লাভকেই অচিন্তিত-পূর্ব সৌভাগ্য বলে মনে হয়। বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে। জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে থাকার জন্যেই বোধ হয়—ঘেমে নেয়ে ওঠে।

মনে হয় দুর্গাপদও জেগে আছে। বিঘতখানেক মাত্র ব্যবধান সুতরাং নিশ্বাসের শব্দ তো বোঝা যায়ই—সামান্য মাত্র নড়াচড়াও অনুভব করা যায়।

খানিক পরে—বোধ হয় মিনিট পনেরো পরে হঠাৎ দুর্গাপদর একটা হাত ওর গায়ে এসে পড়ে।

'এত জায়গা থাকতে অমন গুটি সুটি মেরে শুয়েছ কেন?···অমন করে শুয়ে কেউ ঘুমোতে পারে? ভাল হয়ে শোও, নইলে আমার মনে হবে যে আমি তোমার অসুবিধে করলুম—আমার জন্যই তোমার ঘুম হচ্ছে না।'

আজ কি তরলার মাথা খারাপ হয়ে গেল? না সে অসুস্থ হয়ে প্রলাপের ঘোরে এসব শুনছে?

অদ্ভুত বিচিত্র ওর মনের গতি। সে এখন প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করে আজ সকালে উঠে কার মুখ দেখেছিল। দিদির—না তার ছোট ছেলেটার? না বোধ হয় স্বামীরই—কিন্তু সে তো ঘুমন্ত মুখ।···

দুর্গাপদর হাত ওকে সামান্য আকর্ষণ করে নিজের দিকে।

সে হাত ক্রমে যেন ওর দেহের অত্যন্ত নিভৃত, অত্যন্ত কোমল প্রদেশে পৌঁছয়।

'ইস, কী ঘেমেছ! ছাখ দিকি—এই গরমে এমন করে গায়ে কাপড় জড়িয়ে এতটুকু হয়ে শুলে ঘামবে না! এদিকে এসো এদিকে এসো—ভাল করে শোও!'

এবার আর তরলা স্থির থাকতে পারে না।

তার এত কালের সমস্ত বেদনা ক্ষোভ অভিমান অশ্রুর বন্যায় বেরিয়ে আসতে চায়। দুর্গাপদর সবল আকর্ষণে তার বুকের মধ্যে এসে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'নাও। এ আবার কী কাণ্ড! কান্নাটান্না থামাও বাপু। আমি আবার এসব ছিঁচ-কাঁদুনেপনা দেখতে পারি না। কান্নার হয়েছে কি?'

তার পর একটু বিব্রত, একটু অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'বাতাস করব? খুব গরম হচ্ছে?'

ততক্ষণে ওর হাত তরলার সুপুষ্ট, সুগঠিত, যৌবন-প্রস্ফুটিত দেহ যেন লেহন করতে থাকে। সে স্পর্শে ও আকর্ষণে তরলা অর্ধমূর্ছিতের মত পড়ে থাকে। এইটুকুর জন্যই হয়তো সে সেই বিবাহের দিন থেকে বা সে-সম্ভাবনা থেকেই বুভুক্ষু ছিল—কিন্তু বিধাতা সে সাধনার বস্তু যখন অপ্রত্যাশিত ভাবেই দিলেন, তখন তা উপলব্ধি করারও যেন অবস্থা রইল না। বহু পরস্পর-বিরোধী আবেগের সংঘাতে শুধু দেহ নয়, মনটাও যেন অনড় অবশ হয়ে রইল।

দুর্গাপদ তাকে আরও কাছে টেনে নেয়। আরও নিবিড় হয়ে ওঠে তার বাহুবন্ধন—

পরের দিন ভোর বেলা দোর খুলে বেরোতেই প্রথম যার সঙ্গে তরলার চোখাচোখি হল—সে প্রমীলা।

দোতালায় দালানের কোণে নীচের সিঁড়িতে নামবার মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এই দিকেই চেয়ে। তরলা আর একটু কাছে আসতে যেন সাপের মত হিস্ হিস্ করে ওঠে, 'তোকে এমন খোঁড়ো কাকের মত দেখাচ্ছে কেন লা ছুট্‌কী—রাত্তিরে ঘুম হয় নি বুঝি?'

তরলাও মেয়েরই জাত। সাধারণত এদের কাছে মাথা হেঁট করেই থাকে সে, কথার ঘা দেওয়া অভ্যাস নেই তার; কিন্তু আজ বোধ করি বহু দিনের বহু বেদনাই তার কণ্ঠে বিষ যোগায়। সে শান্তভাবেই জবাব দেয়, 'না মেজদি, আমার ঘুম যেমন হওয়া উচিত তেমনিই হয়েছে, কিন্তু আপনি এত সকালে উঠেছেন যে? আপনার রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল তো? না কি সারারাত আমার ভাবনা ভেবে ভেবেই কাটিয়ে দিলেন?'

এবার আর প্রমীলা কণ্ঠের বিষ ঢাকবারও চেষ্টা করে না। বলে, 'বাঃ, কথা ফুটেছে যে। তাই তো বলি পাখি কিসের টানে দাঁড়ে ফিরল! ভাল মানুষ ছোটবোয়েরও বাড়ির হাওয়া গায়ে লেগেছে তা হলে!'

তরলা কিন্তু আর কথা বাড়ায় না। তার মন তখন—পরিপূর্ণ না হোক

অনেকখানি তৃপ্তিতে ভরে আছে। পাওনার মাধুর্যটা যে পুরোপুরি মধুর হতে পারে নি তার কারণ এই স্ত্রীলোকটারই বিষস্মৃতি তার সঙ্গে মিশিয়ে ছিল বলে। তবু—যেটুকু পেয়েছে সেইটুকুই সে আপন মনে রোমন্থন করে ভোগ করতে চায় আজ—যে প্রসন্নতার আমেজ থাকলে তা সম্ভব, সেটা এখন এর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করলে থাকবে না, বিষ উঠবে আকণ্ঠ ফেনিয়ে।

সে প্রমীলার পাশ কাটিয়ে নীচে নেমে যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

অবশেষে মহাশ্বেতাই একটি পাত্রী খুঁজে বার করে। ওর শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কেই—জাঠতুতো ভাসুরের মেয়ের ননদ। জানাশুনো ঘর, মেয়েটিও নাকি ভাল। ভাসুরঝি লীলা তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ একেবারে—কাজে কর্মে বিবেচনায় ব্যবহারে—সব দিক দিয়েই নাকি ঘরে আনবার মত। খুব নাকি বড় বংশও ওদের ; উলুবেড়ের কাছে যে গ্রামে ওদের বাড়ি—ওরা এক কালে সেই গ্রামেরই জমিদার ছিল। এখন বহু সরিকে ভাগ হয়ে গিয়ে পড়ন্ত অবস্থা। লীলার শ্বশুর কোন্ এক বাঙালীর বাড়ি চাকরি করেন—সামান্য কিছু জমিজমাও আছে, যোগেযাগে চলে যায়। লীলার বর অবশ্য রেলে কাজ করে—তেমনি তার নিজেরও বেশ একটি সংসার হয়ে গেছে বলতে গেলে। পাঁচটি ননদ ওর—এইটি মেজ। বড়র বিয়ের দেনাই নাকি এখনও শোধ হয় নি, সুতরাং পাওনা থোওনা বিশেষ হবে না, সে আভাসও দিয়েছে লীলা।

সব খবর নিয়ে মহা ছুটল মায়ের কাছে। মেয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়ে হাত-পা নেড়ে বলল, 'মেয়ে দেখতেও কুচ্ছিত নয়, রংটা নাকি শুনছি খুবই ওজ্জ্বল! একেবারে যাকে বলে ফিট্ গৌরবন্ন। মোদ্দা ঐ কথা—টাকার কামড় কর তো হবে না। তবে তাও বলি—গেণ্ডার টাকা দিয়ে যে সোন্দর মেয়ের বে দেবে—সে তোমার ঘরে দেবে না। কী আছে তোমার বল ? ছেলে একটা পাশ করে নি—চাকরিও বেশী দিনের নয়। সম্পত্তি বলতে তো এইটুকু এক বাড়ি—বাঁশের কেল্লা। কেন দেবে বলতে পার ? টাকা চাইলে কুচ্ছিত মেয়ে নিতে হবে—এই পষ্ট কথা বলে দিলুম। কী করবে ভেবে ছ্যাখ।'

শ্যামার জবাব আসতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। সে বলে, 'তবে মা শুধু গরাসও মুখে তুলতে পারব না—আমারও এই সাফ কথা। মেয়ের বের দেনা শোধ করতে না পারি সে আলাদা কথা কিন্তু তাই বলে দেনা করে ছেলের বিয়ে দেব সে বান্দা আমি নই। কথা পেড়ে ছ্যাখ—একেবারে যদি ডোমের চুপড়ি ধুয়ে ঘরে তোলাতে চায় তো মেয়ে দেখে কাজ নেই।'

মহাশ্বেতা যতটা উৎসাহ নিয়ে ছুটে এসেছিল ঠিক ততটাই নিরুৎসাহ হয়ে ফিরল। কিন্তু দেখা গেল লীলার সাংসারিক জ্ঞান ওর চেয়ে অনেক বেশী। সে বললে, 'এখন থেকে ওসব কথা বলে তেতো করে দরকার নেই কাকীমা, মেয়েটা আগে দেখিয়ে দাও, যদি মেয়ে পছন্দ হয় তো দিদ্‌মাও অনেক নরম হয়ে আসবে—আর ওরাও—সামান্যর জন্যে তখন তৈরী সম্বন্ধ ভাঙতে চাইবে না। দু পক্ষই তখন অন্য সুর ধরবে দেখো!'

যুক্তিটা সকলেরই মনে ধরে। সবাই সায় দেয় ওর কথায়।

মেয়ে-দেখানোর ব্যবস্থাও লীলাই ঠিক করে একটা। শ্যামা হবু কুটুম-বাড়িতে মেয়ে দেখতে যাবে না, অথচ সে ছাড়া কে-ই বা মেয়ে দেখবে! রায় দেবার মালিক যখন সে-ই, তারই দেখা দরকার। আবার মেয়ে এনে দেখানোও বড় অপমানের কথা—পাত্রীপক্ষ যত গরীবই হোক, এক কালের জমিদারী রক্ত এখনও গায়ে আছে, তারা রাজী হবে না। অগত্যা ঠিক হল যে শ্যামাদেরই পাড়ায় মেয়ের এক কাকীর বাপের বাড়ি—মেয়ের কাকীর সঙ্গে সেখানে বেড়াতে আসবে, শ্যামা সেইখানে গিয়েই দেখবে।

মেয়ে এক কথাতেই পছন্দ হল শ্যামার।

রংটা—রাণী বৌয়ের মত অত গোলাপী নয়, হলুদের ওপর উজ্জ্বল, কতকটা দুর্গাপ্রতিমার মত। প্রতিমার মতই একটু ওপর-দিকে-টানা চোখ, ভুরু তো যেন কে বসে বসে এঁকেছে মনে হয়। থাই-মুখটিও চমৎকার। দোষের মধ্যে কপালটা একটু উঁচু—আর গড়নটাও খুব পুরন্ত গোছের নয়, একটু যেন রোগাটে। তা হোক—এতটাও আশা করে নি শ্যামা। আশা বেশী থাকলে মানুষের মন খুঁতখুঁত করে—প্রত্যাশাই যেখানে অনেক কম সেখানে একটু বেশী পেলেই খুশী হয়ে ওঠে সে। শ্যামাও দুটো একটা কথা কয়ে, হাত-পাগুলো একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বেশ প্রসন্ন মুখেই বললে, 'তা এধারে তো মন্দ নয়—তা মেয়ে, মেয়েই বলি, লীলার সম্পর্কে তুমি তো আমার মেয়ের বেয়ান হলে গো—চুলটা বেঁধে রেখেছ বাছা, ওটা তো দেখবার উপায় রাখ নি!'

'ওমা তার আর কি হয়েছে—দেখুন না।'

মেয়ের কাকী খোঁপা এলিয়ে বিনুনি খুলে চুল ছড়িয়ে দেন। ঘন কালো চুলে সারা পিঠ ঢেকে যায়। চুলের রাশ। শ্যামা আরও খুশী হয়—খুব লম্বা নয় চুল। শাস্ত্রে নাকি লেখে পায়ের গোছ পর্যন্ত চুলের কথা—কিন্তু শ্যামা দেখেছে যে খুব লম্বা চুল হলে মেয়ের ভাগ্য ভাল হয় না।

'না—তা চুলও তো দিব্যি। তা হ্যাগা বাছা—কী যেন নাম বললে, কনকরেণু? বড্ড গালভরা নাম বাপু, কনকই বলি শুধু, তা স্থাখ আমার ঘর করতে পারবে তো? গরীবের সংসার, পাতার জ্বালে রান্না, ঝি-চাকর নেই—ঘরের পাট, বাসন মাজা সবই নিজেদের করতে হয়—গিয়ে নাক তুলবে না তো?'

মেয়ের হয়ে কাকীই জবাব দেয়, 'কী যে বলেন আঁবুই মা! আমাদের সংসারেই কি ঝি-চাকর আছে? সে ক্ষ্যামতা কৈ? তবু তো আপনাদের বাড়ি ধান সেদ্ধ করতে হয় না, গোরুর পাট নেই। আমাদের তো পরিপুন্ন ষোল আনাই সব বজায় রাখতে হয়। এর ওপর আউতি-যাউতি নোক-নৌকতা কুটুম্বিতে—সে সবও তো আছে গো!'

'তা বটে। সে সব আমার কিছু নেই। মহাদের মত ঠাকুরও নেই একটা। সে সব পাট অনেক দিন চুকে গেছে। যা কিছু নিজেদেরই পেট পুজোর ধান্দা। তা স্থাখ। লীলাকে বল অভয়ের সঙ্গেই কথা-বার্তা কইতে। যা করবেন জামাই-ই করবেন। মেয়ে আমার অপচন্দ নয়—এইটুকু বলতে পারি।'

লীলার খুড়শাশুড়ী তখনই পাঁচ পয়সার বাতাসা কিনতে পাঠান—খাড়াখাড়া হরির লুট দিতে হবে।

দিন তিনেক পরে একটা শনিবার দেখে অভয়পদ এল। এ তিন দিন সে বৃথা ব্যয় করে নি—ও-পক্ষের সঙ্গে কথা কয়েই এসেছে তা শ্যামা জানে। তাই সে পরনের খাটো কাপড়খানাকে টানাটানি করে ঘোমটা দেবার একটা বৃথা চেষ্টা করতে করতে বেরিয়ে এল একটু উৎসুক হয়েই। সহজ ভাবে এখন কথা কয় বটে—কিন্তু জামাইয়ের সামনে ঘোমটা না দিয়ে বসে না সে আজও।

বিনা আমন্ত্রণে বসা এবং বিনা ভূমিকায় কথা বলা চিরদিনের অভ্যাস অভয়পদর। সে শাশুড়ীর পেতে-দেওয়া পিঁড়িটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজের অদ্বিতীয় ছাতিটি পেতেই রান্নাঘরের রকের ধারে বসল। তার পর একেবারেই আসল কথাটা পাড়ল। কাঁটাল গাছটার দিকে চেয়ে বলল, 'আমাকে আর এর মধ্যে জড়ালেন কেন—হাজার হোক আমাদের কুটুমের মেয়ে।'

'তুমি ছাড়া আর আমার কোন্ কাজটা হচ্ছে বাবা, চিরদিন তো সবই তুমি করে এলে। তুমিই আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান। এখন এর বেলা আর কার

কাছে যাব বল ? তা ছাড়া তুমি কি আর জ্ঞাতি ভাইয়ের মেয়ের শ্বশুরবাড়ির দিক টেনে আমার লোকসান করাবে !'

মিনিটখানেক মৌন থেকে অভয়পদ জবাব দিলে, 'লোকসান যাতে হয় তার ব্যবস্থা আপনিই খানিকটা করে এসেছেন ! একেবারে এক কথায় কন্যাপক্ষকে জানিয়ে দিয়ে এলেন যে তাদের মেয়ে আপনার পছন্দ হয়েছে—তারা খানিকটা জো পেয়ে তো যাবেই। এসব ক্ষেত্রে একটু রেখে ঢেকে মনের কথাটা জানাতে হয় !'

শ্যামা ঘোমটার মধ্যেই এতখানি জিভ কাটে। কথাটা তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। সত্যিই মেয়ে দেখে অমন করে গলে যাওয়া তার উচিত হয় নি।

অভয়পদ আবারও একটু চুপ করে থেকে বলে, 'দু শ এক টাকা নগদ, চুড়ি হার কানের মাকড়ি—আর যেমন দানসামিগ্‌গিরি দিতে হয় তা দেবে—বরের আংটি জোড়। নমস্কারী থান-আষ্টেক পর্যন্ত। এর বেশী বাড়ানো গেল না।'

'মোটে দু শ এক ! কী হবে বাবা তাতে ? তা ছাড়া বরের ঘড়ি-বোতাম—কিছু দেবে না ? না না—অত কমে আমি পারব না !'

অভয়পদর প্রশান্ত মুখ কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। সে শুধু বলে, 'তা হলে ওদের না বলে দিই ?'

শ্যামা এবার বিষম বিব্রত বোধ করে। এই এক মানুষ, দুটো পরামর্শ করার উপায় নেই ! মাঝামাঝি কোন কথা বোঝে না—একেবারে হ্যাঁ—কি না—বলে দাও !

সে বেশ খানিকটা বিপন্ন কণ্ঠেই বলে, 'একেবারে না-ই বা বলবে কেন ? মানে একটু বেগ দিয়ে দেখলে হয় না। ওদের কি একেবারে ধনুর্ভঙ্গ-পণ ? বিয়ে ভেঙে যাবার মত দেখলে আবার খানিকটা বাড়বে হয় তো !'

অভয়পদ ঘাড় নেড়ে বললে, 'যতটা টানবার তা আমি টেনেছি—ওরা আর বাড়তে রাজী নয়। অবশ্য অবস্থাও ওদের খারাপ। এর ওপর যে খুব বাড়তে পারত তাও মনে হয় না। এক উপায় আছে—তত্ত্ব, গায়ে-হলুদ, ফুলশয্যে যদি গায়ে গায়ে কাটান দেন। তাতে আপনার খরচটা কমে একটু !'

'তেমনি ঘরে আসবে না তো কিছু ! প্রথম ছেলের বিয়ে—ফুলশয্যের তত্ত্ব আসবে না—সেটাই বা কেমন কথা ! তা ছাড়া একটা ভাল কাপড়, হলুদ-মাখার একখানা আটপৌরে কাপড়, একটু দইমাছ—এগুলো তো পাঠাতেই

হবে। লক্ষণ-অলক্ষণের কথা তো আছে! তার ওপর আর কটা টাকা খরচ করলেই আমার তত্ত্ব সাজানো হবে। ওদেরও ধর—ক্ষীর-মুড়কির বাটি, ফুলের রেকাব, মেয়ে-জামাইয়ের কাপড় এগুলো তো বাদ দিতে পারবে না।'

এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় শ্যামা। বেশ একটু সাগ্রহেই জামাইয়ের মুখের দিকে চায়—অর্থাৎ এক্ষেত্রে আর কী করা যেতে পারে—কিছু একটা সদ্‌যুক্তি চায় সে।

কিন্তু অভয়পদ সেদিক দিয়ে যায় না। শুধু নিস্পৃহভাবে বলে, 'বেশ, তা হলে আপনার যা শেষ কথা বলে দিন। আর কতটা পর্যন্ত আপনি তা থেকে নামবেন তাও বলে দিন—আমি সেই মত বুঝে না করে দেব!'

শ্যামা অসহায় ভাবে চারদিকে চায়। এসব সে করে নি কখনও। ভেবেও রাখে নি। কিন্তু এই এক মনিষ্যি-এর সঙ্গে কথা বলাও যা দেওয়ালকে বলাও তাই।

সে খানিকটা চুপ করে থেকে কতকটা প্রশ্ন করার ভঙ্গীতেই বলে, 'যদি নগদটা চার শ এক করতে বলি—আর বোতাম ঘড়ি, রাজী করাতে পারবে না?'

'মনে তো হয় না। আমি খানিকটা চেষ্টা করেছিলুম বৈকি! যা বলেছে তার ওপর আর সামান্য কিছু বাড়ানো যায়! অত বেশী বাড়বে না।'

শ্যামা চুপ করে থাকে। কী বলবে ভেবে পায় না কিছুতেই।

অভয়পদও উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে খানিকটা। তার পর বলে, 'তা হলে ঐ কথাই বলি—আপনি যা বললেন। রাজী না হয়, আবার অন্য মেয়ে খুঁজতে হবে।'

টাকাটা বড়ই কম। যা আশা করেছিল তার থেকে বেশ খানিকটা কম। দেনা শোধ তো হবেই না, বিয়ের খরচটা চালানোও মুশকিল। কিন্তু মেয়েটাও বড় ভাল। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, লাজুক ধরনের মেয়ে। আজকাল যেমন ঘরে ঘরে হয়েছে বেহায়া-বাচাল পুরুষের-ঘাড়ে-পড়া মেয়ে—তেমন নয়। ঠিক হাতছাড়া করতেও মন চায় না।'

অবশেষে প্রায় মরীয়া হয়েই মনস্থির করে ফেলে সে।

বলে, 'অন্তত যদি বোতামটাও দেয় আর একশটা টাকা নগদ বেশী—তা হলেও হয়। সেইটাই বলে ছাখ না!'

'যে আজ্ঞে। তাই বলব।'

কার বিবাহোপলক্ষে কুণ্ডুদের বাড়ি থেকে পাওয়া বাসি লুচি আর মোণ্ডা ছিল—জামাইকে জল খেতে দিল শ্যামা। কিন্তু আজ আর অভয়পদ কিছু খেলে না। বললে, 'আজকাল প্রায়ই বিকেলের দিকে একটু করে অম্বল হচ্ছে। বাসি লুচিটা আর খাব না। আচ্ছা, তা হলে আসি।'

ছাতাটি বগলে করে বেরিয়ে গেল সে।

॥ ২ ॥

পরের দিন অভয়পদ এল একেবারে মেয়ের বাপ পূর্ণ মুখুজ্জে মশাইকে সঙ্গে করে। নইলে নাকি উপায় ছিল না - উনি কাল থেকে এসে তাঁর বেয়াই-বাড়ি অর্থাৎ অভয়পদর জ্ঞাতিদাদার বাড়ি বসে আছেন—একটা হেস্তনেস্ত না করে যাবেন না। তা ছাড়া যাকে মেয়ে দেবেন তাকে এবং তার বাড়ি-ঘর দেখারও একটা কৌতূহল আছে বৈকি! একেবারেই সব পাট চুকিয়ে দিতে চায় অভয়পদ।

শ্যামা একটু বিব্রত বোধ করে। প্রথমত এসব কথা কওয়া তার অভ্যাস নেই। এত কাল কন্যাপক্ষের হয়ে দয়া ভিক্ষাই করে এসেছে—পাত্রপক্ষের হয়ে সে ভিক্ষা কী করে ফিরিয়ে দিতে হয় শেখে নি। তা ছাড়া ছেলের বাবা যখন রয়েছে তখন উচিত তার কাছেই নিয়ে যাওয়া—নইলে ওরাই বা কি ভাববে? অথচ যা ছিরির মানুষ—

কিন্তু অভয়পদ দেখা গেল আট-ঘাট বেঁধেই এসেছে।

তার শ্বশুরমশাইয়ের শয্যাশায়ী অবস্থা, দীর্ঘকাল গ্রহণীতে ভুগে মাথাটারও একটু গোলমাল হয়েছে—এ সব কথাই পূর্ণবাবু জানেন। তাঁকে বাইরের ঘরের দিকেও নিয়ে যায় নি অভয়—রান্নাঘরের দাওয়াতেই এনে বসিয়েছে। সুতরাং সেদিক দিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।

অগত্যা শ্যামাকে খাটো কাপড়টা পাল্টে একমাত্র পোশাকী শাড়ি পড়ে বেরোতে হয় হবু বেয়াইয়ের সামনে। অভয়পদকে মধ্যস্থ রেখে ঘোমটার মধ্য দিয়েই কথা বলে সে। কিন্তু তবু দেখা গেল দরদস্তুর টানাটানিতে সে সত্যিই অনেক বেশী পটু অভয়পদর চেয়ে। কন্যাপক্ষের যথারীতি অনুনয়-বিনয়, হাত জোড় করা, এমন কি কান্নাকাটির মধ্যেও কথার পিঠে কথার প্যাঁচ লাগিয়ে তিন শ এক টাকায় রাজী করাল সে। তার সঙ্গে সোনার বোতামটাও।

তবে একটা কথা নিয়ে যান পূর্ণ মুখুজ্জে মশাই—গায়ে-হলুদের তত্ত্বে বাহুল্য কিছু করবে না শ্যামা, কারণ ও পক্ষ থেকে তার যোগ্য ফুলশয্যা পাঠাবার ক্ষমতা নেই।

'এমনিতেই—এত দিন যা করি নি তাই করতে হবে—খানিকটা ধানজমি ছাড়তে হবে। সম্বচ্ছরের চালটা আসত—তা আর আসবে না। কিন্তু উপায়ও তো আর নেই। ধার করবার যত জায়গা ছিল তা বড় মেয়ের বিয়েতে শেষ করেছি—আর কেউ ধার দেবে না।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন পূর্ণ মুখুজ্জে মশাই।

অবশ্য এ প্রতিশ্রুতি প্রসন্ন মনেই দেয় শ্যামা। বাহুল্য করবার ক্ষমতা কই তার? তারও তো ঐ তিন শ এক টাকা পুঁজি! দেনা এমনিতেই যথেষ্ট আছে—ছেলের বিয়েতে দেনা করতে রাজী নয় সে। আর করবেই বা কোথা থেকে? ধার দিতে তো ঐ এক জামাই—তাকে কত দোহন করবে?

অতঃপর ছেলে দেখে জলখাবার খেয়ে প্রসন্নমনেই বিদায় নেন পূর্ণবাবু। ছেলে দেখে ভারি খুশী—প্রকাশ্যেই স্বীকার করে গেলেন যে এমন রূপবান জামাই তাঁর বংশে জাঠতুতো খুড়তুতো জ্ঞাতি জড়িয়ে আর একটিও হয় নি।

শ্যামারও মনটা অনেকদিন পরে বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। নতুন কুটুমকে জলখাবার খাওয়াতে নগদ আট আনা পয়সা বেরিয়ে গেল—কারণ তাঁর সামনেই জামাইকেও দিতে হল, সেখানে কিছু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা যায় না—তবু তাতেও দুঃখিত নয় শ্যামা। তার হেমের বিয়ে হবে, বৌ আসবে—এ স্বপ্ন সেই যেদিন হেম ভূমিষ্ঠ হয়েছে সেই দিন থেকেই মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে! শুধু ইদানীং চারিদিক থেকে যখন দুর্ভাগ্য ঘিরে ধরেছিল তখন যেন আর কল্পনা করতেও সাহসে কুলোত না। একান্ত দুরাশা বলে মনে হত। কিন্তু আজ আর তা দুরাশা নেই, আজ তা বাস্তব—আজ তা হাতের মধ্যে এসে গেছে। এত দিনে তার সত্যিকারের সংসার হতে চলেছে—এই মুহূর্তে আরও কিছু বেশী খরচ হলেও বোধ করি দুঃখিত হত না সে।

•

ওরা চলে গেলে শ্যামা নরেনের কাছে এসে বসল। মনটা বড়ই খুশী আছে, আজ আর এটাকে সময় নষ্ট বলে মনে হল না।

নরেন বিস্মিত হল। স্ত্রীর দর্শন প্রয়োজনের সময় ছাড়া দুর্লভ। বললে, 'আজ যে এমন অকালে-সকালে বামনী—ব্যাপার কি?'

'খোকার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল যে। সামনের মাসের দোসরাই দিন ঠিক হল।' শ্যামা হাসি হাসি মুখে বলে।

'কী হল? বে ঠিক হয়ে গেল? কার বে? খোকা—মানে আমাদের হেমচন্দরের?'

বলতে বলতেই বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না —আবার এলিয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকে।

'হ্যাঁ—তা নইলে খোকা আবার কে!'

'কী রকম? আমার ছেলের বে আমি জানলুম না—আমার সঙ্গে কথা হল না—বে ঠিক হয়ে গেল! বলি ঠিকটা করলে কে? কার এত বড় হেকমত! আমি গার্জেন থাকতে আমাকে না জিজ্ঞেস করে আমার ছেলের বে ঠিক করে! বলি কে—কে ঠিক করলে তাই শুনি? সেই গোরবেটার জাত হারামজাদা জামাই নাকি? অ্যাঁ?'

'দ্যাখ—খবরদার জামাইকে গাল দিও না বলে দিলুম। সাতজন্ম অমন জামাইয়ের পাদোক জল খেলে তবে যদি মানুষ হতে পার। অমন জামাই পেয়েছিলে তাই সাতগুষ্টি তরে গেল। তাও কি তুমি করেছ—নিহাত আমার বাপ-মার পুণ্যের জোর ছিল তাই ঐ পাত্তরে মেয়ে দিতে পেরেছি!'

'থাম্ থাম্—অত আর লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়তে হবে না। মোদ্দা ও বিয়ে হবে না। নেই মাংতা বিয়ে—নেই মাংতা বৌ!···ঠিক করেছেন! ঠিক অমনি করলেই হল। তুই কি জানিস—এর সব নেম কানুন! বংশ দেখতে হবে, গাঁই-গোত্তর মিলোতে হবে—দেনা পাওনা আছে—তবে তো বে ঠিক হবে। কথায় বলে লাখ কথা না হলে বে হয় না। উনি অমনি এক কথায় বে ঠিক করে ফেললেন। নে যা—এখনই খবর পাঠা, ওসব চলবে না, বে দিতে হয় মেয়ের বাপ এসে আমার কাছে হাত জোড় করে বসুক!'

'হুঁ! কত বড় গার্জেন আমার এলেন রে, ওঁর কাছে হাত জোড় করে বসবে! তুমি কে যে তোমার কাছে মেয়ের বাপ আসবে? সে সম্পর্ক রেখেছ? না বাপের কোন কাজ করেছ?··· আমিই তার মা বাপ দু জনের কর্তব্য করে এসেছি চিরকাল—আমিই কথা দিয়েছি। আমারই ঝকমারি হয়েছিল তোমাকে খবর দিতে আসা। তুমি কি মানুষ—যে মানুষের মত কথা বুঝবে!'

'কী কী বললি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! এত বড় কথা বললি

আমাকে! কী বলব ভগবান মেরে রেখেছেন তাই—এত অঙ্গ থাকতে পা দুটোই নিয়ে নিয়েছেন—নইলে নোড়া দিয়ে তোর ঐ বত্রিশ পাটি দাঁত ভেঙে চোপ্‌রা করা বার করে দিতুম।...আচ্ছা কুছ পরোয়া নেহি, এয়সা দিন নেহি রহেগা—এক বার কি উঠব না! তখন এর সুদসুদ্ধ যদি আদায় না করি তো—'

বলতে বলতে—বোধ করি নিঃশ্বাসের অভাবেই চুপ করতে হয়। আবার যখন বলতে শুরু করে তখন কণ্ঠস্বর অনেকটা কোমল শোনায়, 'হাতি যখন দঁকে পড়ে ব্যাঙেও তাকে চাট্ মারে। কী বলব নিহাত নাতোয়ান হয়ে পড়েছি তাই। এমন করিস নি বামনী, ভাল হবে না। ধর্মে সইবে না। একটা অনাথ পঙ্গু লোককে এমন করে দু পায়ে থ্যাঁৎলাতে নেই—'

বলতে বলতেই বোধ হয় একটা অসীম আত্মকরুণা বোধ করে সে। হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে আপন মনেই। কিন্তু সে কান্না শ্যামার কানে যায় না। তার অনেক আগেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। দামী কাপড়টা ছেড়ে আবার গুছিয়ে তুলে রাখা দরকার। পাতার আণ্ডিল পড়ে আছে। সামনে এত বড় কাজ—তার আগে বাড়ি পরিষ্কার করতে হবে, দুটো পয়সাও দরকার।

পাকা দেখা চুকে গেলে ফর্দ করতে বসতে হয়। বাজারের ফর্দ নিমন্ত্রণের ফর্দ সবই করতে হবে। লোক বলতে তো মা আর বেটা ঐ দুটি প্রাণী। কারুর সঙ্গে একটা পরামর্শ করবে এমন কেউ নেই। অভয়পদ এ সবে আসতে চায় না, মহার তো মাথারই ঠিক নেই। লোক-খাওয়ানোর ফর্দ—ঘি ময়দা আনাজ মাছ দই—এ ফর্দ কত লোক হবে বললে অম্বিকাপদ করে দেবে। নিখুঁত হিসেব তার, কম-বেশি কখনও হয় না। কিন্তু তার আগে কাকে কাকে এবং মোট কজনকে বলা হবে তার ফর্দটা করা দরকার।

মোটামুটি হেমের ভাষায় 'লিষ্টি'টা সহজেই হয়ে যায়। তিন ঘর কুটুমবাড়ি, পাড়াঘরে একটি একটি, সরকার-বাড়ি সব! কলকাতায় গোবিন্দ, গোবিন্দর বৌ—ওদের বাড়িওলাদের এক জন। এত কাল ঐ বাড়িতে ছিল হেম, খুবই জানাশুনা দহরম মহরম। না বললে খারাপ দেখায়। সবাইকে বলাই উচিত, অন্তত এক জনকে বলতেই হবে।

'এ ছাড়া', ছেলের মুখের দিকে চেয়ে, শ্যামা বলে, 'তোমার বন্ধুবান্ধব

কাকে কাকে বলবে, কে আছে ভেবে ছাখ। তার পর বরযাত্তর কাকে বলা হবে—সেটাও লিখে নাও। ওদের বলেছি জনকুড়ি-পঁচিশের বেশী হবে না। আর বরযাত্তর নিয়ে যাওয়া তো নয়—ফুলশয্যেয় অতটি লোকই নিয়ে আসবে ওরা।'

শেষের কথাগুলো হেমের কানে যায় না। তার বন্ধু-বান্ধব কে আছে—যাকে বিয়েতে বলা যায়. তাই ভাবতে থাকে সে। বন্ধুই বা কৈ তার? পুরনো রং-কলে দু-এক জনের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গতা হয়েছিল বটে, কিন্তু তার পর বহুকাল তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই, বাদ দিলেও চলবে। এ অফিসে এখনও পর্যন্ত এমন কেউ হয় নি, যাকে বন্ধু বলা যায়। বললে পুরো সেকশনটাকেই বলতে হয়। তার দরকার নেই। সে ক্ষমতাও নেই ওর। এক আছে থিয়েটারের কজন। কানাই নন্দ ওদের কাউকে না বললেও দক্ষিণাদাকে বলা দরকার। সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী তার।···থিয়েটারে না হয় যাবেই না, বাড়ির ঠিকানা জানে, সেখানে গিয়ে বৌয়ের কাছে বলে আসবে। তা হলেই খবর পৌছবে তার কাছে।

দক্ষিণাদার নামটা লেখে হেম।

'তার পর? আর—?' শ্যামা প্রশ্ন করে।

'কান্তিকে তো আনতে হবে। কেন তাও জানাতে হবে। রতনদিকে বলা উচিত নয়?' জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে হেম চায় মায়ের দিকে।

'ওমা, তাকে তো বলতেই হবে। ভাল করে বলে আসবি তাকে। সে তো আসবেই না, মিছিমিছি পাওনাটা ছাড়ি কেন!'

'যদি আসে? কান্তিকে অত ভালবাসে—আসতেও পারে হয়তো!'

একটু যেন উৎসুক, সতৃষ্ণ নয়নে মার দিকে চায় সে।

'আসে তো আসুক না। ভয়টাই বা কিসের! আজকালকার দিনে কে আর অত খবর রাখে! আর রাখলেও—এখন আর সেদিন নেই যে লোকে মুখের ওপর কিছু বলবে কিংবা না খেয়ে চলে যাবে সবাই!'

এইটেই শুনতে চাইছিল হেম। কারণ তার মনের মধ্যে একটা বাসনা জেগেছে কদিনই—বিয়ের কথাটা পাকা হয়ে যাবার সময় থেকেই—নলিনীকে নিমন্ত্রণ করলে কী হয়?

ভালবাসা? না, ভালবাসা আর নেই। বিদ্বেষ তো নেই-ই। সে সব ছেলেমানুষি অনেকদিন চলে গেছে। এখন নলিনীর স্মৃতির সঙ্গে একটা স্নিগ্ধ

মাধুর্যই জড়িয়ে আছে মনের মধ্যে। আর কৃতজ্ঞতা। অনেক দিয়েছে সে। কাঙালকে নিয়ে গিয়ে—সত্যি সত্যিই হাত ধরে নিয়ে গিয়ে—রাজসিংহাসনে বসিয়েছে। যা পেয়েছে তার জন্যই যথেষ্ট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, আরও কী পায় নি, কী পেতে পারত সে হিসেব করার কোন অধিকার তার নেই।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ল্যাম্পোর আলোতে ফর্দ তৈরি হচ্ছিল। ল্যাম্পোর সেই কম্পিত ধূমমলিন শিখাটার দিকে চেয়ে কত কি ভাবতে লাগল হেম। কত ছোট ছোট টুকরো টুকরো কথা—কত অকিঞ্চিৎকর ঘটনার স্মৃতি। নলিনীকে ঘিরে ওর প্রথম যৌবন-স্বপ্নের সহস্র ইতিহাস।···

প্রচণ্ড হাই তুলে শ্যামা এক সময় প্রশ্ন করে, 'কী হল, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? কাজটা শেষ করে ফেল্ না বাপু।'

সত্যিই যেন চমকে জেগে ওঠে হেম, একটু অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'দেখি, এখন আর মাথায় কিছু ঢুকছে না, বড্ড ঘুম পেয়েছে—কাল সকালে তখন আর এক বার ভেবে দেখব কারুর নাম বাদ পড়ল কিনা!'

সে আর শ্যামার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই একেবারে উঠে দাঁড়ায়। যদিও—বিছানাতে শুয়ে বহুক্ষণ বহুরাত্রি পর্যন্ত তার চোখের পাতায় তন্দ্রার আভাস পর্যন্ত নামে না।

॥ ৩ ॥

আর সব নিমন্ত্রণই সন্ধ্যার পর করা সম্ভব কিন্তু নলিনীকে বলতে গেলে দুপুরে যেতে হবে। সুতরাং যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—হেম পুরোপুরি অফিস থেকে ডুব মারল। কামাই তার বড় একটা হয় না, এক দিন 'সিক্-রিপোর্টে' কোন ক্ষতি হবে না।

অবশ্য মাকে সে কথা জানানো চলবে না। তা হলেই হাজার গণ্ডা কৈফিয়ত। নলিনীর কথাটা এখন বলতে চায় না সে। সেদিন গোলেমালে চলে যাবে—কে আর তখন খুঁটিয়ে কৈফিয়ত নিচ্ছে! সুতরাং যথারীতি ভোরবেলা খেয়েই বেরিয়ে পড়ল এবং সোজা গোবিন্দর বাড়ি উঠে—সারা সকাল আড্ডা দিয়ে, গোবিন্দর অফিসের বেলা করিয়ে আর এক বার বড় মাসী আর রাণী বৌদির সঙ্গে ভাত খেতে বসল। ওদের কাছেও

ভাঙলে না কথাটা, শুধু বললে, 'এমনিই শরীরটা ভাল লাগল না, তাই ডুব মারলুম। বারো মাসই তো ঠিক ঠিক হাজরে দিচ্ছি—এক দিন না গেলে আর কী হবে?'

তবু কমলা সন্দিগ্ধস্বরে বলে, 'দেখিস, চাকরি-বাকরি নিয়ে টানাটানি হবে না তো?'

'পাগল হয়েছ তুমি! এ কি মার্চেণ্ট অফিস? রেল আপিসে অত সহজে চাকরি যায় না।'

গোবিন্দ ও গোবিন্দর বৌ বিয়েতে যাবে। রাণী বৌদির ইচ্ছা দু দিন আগেই যায়—মেসোমশাইকে দেখবার আর তাঁর সঙ্গে গল্প করার জন্য প্রাণটা ছটফট করছে ওর—কিন্তু 'এই এক পোড়া মেয়ে, পেটে এসে ইস্তক শত্রুতা করছে!' তখন কমলা যেতে দেয় নি—ভরা পোয়াতি বলে। এখনও আগে যেতে দিতে তার আপত্তি—কোলে কচি মেয়ে, সেখানে গেলে সবাইকে বিব্রত করবে, নিজেও বিব্রত হবে। ঠিক হল যে বিয়ের দিন ভোরবেলা ওরা চলে যাবে—গায়ে হলুদের পালা চুকিয়ে ওখানেই দুটি মাছভাত খেয়ে ফিরে আসবে—গোবিন্দ ওকে এখানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আবার বরযাত্রী বেরোবে। ওরা যে ট্রেনে রওনা হবে সেই ট্রেনেই গোবিন্দ কলকাতা থেকে উঠবে—ঠিক রইল। বৌভাতের দিন ওরা যাবে একেবারে বিকেলে—সেদিনটা কোনমতে রাত কাটিয়ে ভোরবেলা ফিরবে। সেদিন কমলাও যাবে কথা আছে। উমা কোনমতেই যাবে না—তা হেমও জানে, তবু সে বলেছিল এক বার, উমা তারই হাতে তার আইবুড়ো ভাতের কাপড় একখানা আর মিষ্টি বাবদ একটা টাকা দিয়ে দিয়েছে।

গোবিন্দদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দক্ষিণাদার বাড়ি হয়ে যখন কম্বুলেটোলার সেই বিশেষ পরিচিত বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়াল তখন বেলা দুটো বাজে। সময়টা হিসেব করাই ছিল, কিন্তু তবু একেবারে বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে। কড়াটা নাড়তে গিয়েও হাতটা সরিয়ে নিলে। এতক্ষণ একটা আবেগের বশে ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছে—সব কথা থিতিয়ে ভাবতে পারে নি। যদি নলিনী কথা না কয়? যদি এড়িয়ে চলে সেদিনের মত? অনেক দিন পরে এসেছে সে সত্যি কথা—কিন্তু তাতেই যে নলিনীর মত-পরিবর্তন হবে তার ঠিক কি? কিংবা যদি কড়া নাড়তেই কিরণের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? 'তুমি আবার কী মনে করে এদিকে এসেছ বাছা, তোমার

লজ্জা নেই? আভি নিকালো হিঁয়াসে!' বলে চেঁচিয়ে ওঠে সে? না, থাক বরং। এক বারের অপমানই যথেষ্ট। সেধে গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাবার দরকার কি! যে জীবন থেকে চলে গেছে চিরকালের মত—তাকে আর টানাটানি করতে গিয়ে লাভ নেই।

হেম ফিরে দাঁড়াল। ফিরেই যাবে সে। ডাকবে না। তবু আর এক বার পিছন ফিরে বাড়িটার দিকে না চেয়ে পারল না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই খুট করে দরজাটা খুলে গিয়ে গিরিধারী বেরিয়ে এল।

'আসুন আসুন দাদাবাবু। ভেতরে আসুন। ফিরে যাচ্ছেন কেন? দিদিবাবু বোলাচ্ছেন আপনাকে।'

'দিদিবাবু কেমন করে জানলেন?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে হেম।

'জানলা দিয়ে দেখল যে।'

অগত্যা ফিরতে হয়।

সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল নলিনী, আগের মত। কাছে আসতে একটু এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে ঢিপ করে এক প্রণাম করে সে।

'ওকি, ওকি—ও আবার কি?' বিব্রত হেম দু পা পিছিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। হাতটা ধরে ফেলে আটকানো উচিত ছিল কি না ভাবতে ভাবতে আর কিছু করা হয় না।

'তা হোক, ব্রাহ্মণ মানুষ। একে তো কত অন্যায় করেছি। সেদিন থেকে কী জ্বালায় জ্বলছি মনে মনে তা কি বলব। এই দিনটির জন্যেই অপেক্ষা করে ছিলুম। বলি আর কোন দিন কি একটু নিরিবিলি দেখা হবে না। মা কালীর কাছে কত মানত করেছি।...যেদিন শুনলুম চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছ—সেদিন থেকে কেঁদে বাঁচি না। বলি আমার জন্যেই বামুনের ছেলের ভাত-ভিক্ষে নষ্ট হল—এ মহাপাপ রাখব কোথায়?'

দুপুরবেলা ভাড়াটেরা দোর বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে। তবু গলা নামিয়ে ফিসফিস করেই বলছিল নলিনী। তার সেই প্রায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের অস্ফুট কথায় হেমের সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল।

'চল চল—ওপরে চল। আমার কপাল—এইখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে বকছি।'

হাত ধরে নিয়ে যায় ওপরে, আগের মতই। সেই ঘর, সেই শয্যা। যেন বহুদিন আগে স্বপ্নে দেখা কোন্ এক রাজ্যে ফিরে এল সে। নেশা

লাগে হেমের। কত দিন কত রাত কী ঐকান্তিক কামনাতেই এই ঘরে আবার ফিরতে চেয়েছে সে, অন্তত একটি বারের জন্যও।

একেবারে নীচের ঢালা বিছানাটাতে বসিয়ে অভ্যাস মত জামাটা খুলে নেয় নলিনী, গেঞ্জিটাও। তার পর ঠিক গা ঘেঁষে না হলেও কাছে এসে হাওয়া করতে বসে।

'তার পর? এখন কি করছ?'

'রেলে কাজ করছি।' গলায় একটু জোর দিয়েই বলে সে।

'ওমা, তবে তো ভালই হয়েছে। শাপে বর। রেলের কাজে শুনেছি বেশ পয়সা।'

'সে সব কাজে নয়। আমাদের আপিসের চাকরি। এখানে পয়সা নেই।'

'তা হোক, বাঁধা কাজ তো। মাসকাবারে মাইনেটা হাতে পাবে। এ যা ছিরির কাজ ছিল। ঝাঁটা মারো!'

'তা তুমি সেদিন অমন করে আমাকে এড়িয়ে গেলে কেন?' ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করে বসে হেম। বহুদিনের নিরুদ্ধ অভিমানে গলাটা কেঁপে যায় ওর।

'সেদিন'টা যে কোন দিন তা আর বুঝিয়ে দিতে হয় না। সেদিনের জ্বালা না হোক, ব্যথা বুঝি নলিনীরও কম ছিল না। উত্তর দিতে গিয়ে চোখে জল এসে যায় তারও। মুখ নামিয়ে ধরা গলায় বলে, যদি তোমার চোখ থাকত তো দেখতে পেতে—আমার মত অবস্থায় পড়লে বুঝতে। সেদিন তোমাকে এড়িয়ে গিয়ে বুঝি আমার খুব সুখ হয়েছিল? কী শাসনে যে ছিলুম তা তো জান না। বুড়ো বয়সে সেদিন মা আমাকে ধরে মেরেছে পর্যন্ত। তার ওপর ভয় দেখিয়েছিল থিয়েটারে এসে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকবে। বিষম ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম তাই।…সারা রাত সেদিন শুধু কেঁদেছি তোমার জন্যে। তাই কি ছাই—প্রাণ খুলে কাঁদবার জো আছে। সে মিন্‌সে তো পাশে শুয়ে—টের পেলেই হাজারো জবাবদিহি!'

চোখে বুঝি জল এসে যায় হেমেরও। নলিনীর মুখখানা তুলে ধরে কোঁচার খুঁটে মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার চোখ দুটো। নলিনী আর সামলাতে পারে নি নিজেকে। টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে তার গাল বেয়ে। কিন্তু সাহস হল না হেমের, নিজেরও ভেঙে পড়বার ভয়ে।

সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রসঙ্গটা পাল্‌টে দিলে।

'তা আজ তোমার মা কোথায় ?'

আঁচলে চোখের জল মুছে নিয়ে—ধরা গলাতেই হাসির আভাস এনে বললে, 'ওমা তা জান না বুঝি ? আমি বলি খবর নিয়েই এসে[illegible] যে আজ তিন মাস আমার সঙ্গে ঝগড়া করে কাশী গিয়ে আছে !'

'কেন—ঝগড়া কেন ?'

'সে অনেক কথা !'

'কি শুনি শুনি—' সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে হেম।

একটু একটু করে নলিনী খুলে বলে ইতিহাসটা। দীর্ঘ কাহিনী—তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে—যে, রমণীবাবু আর নলিনীর ঘরে আসেন না। কালো বলে যে নতুন মেয়েটা এসেছিল সখীর ব্যাচে—ঢ্যাঙা ফরসা মত—হেম যখন ছিল সে তখন সবে এসেছে—দর্জিপাড়ায় বাড়ি, ওর মা খুব নামকরা বাড়িউলী, সেই মেয়েটাকে নিয়েই আছেন। অনেকদিন ধরেই ঝুঁকেছিলেন, নলিনী লক্ষ্য করেছিল ঠিকই—কিন্তু বকাবকি করলে কান্নাকাটি করলে দিব্যি গালতেন, মিছে কথা বলতেন—দু দিন হয়তো আসতেনও ঠিক—আবার ডুব মারতেন। শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে নলিনীই হাল ছেড়ে দিলে। এক দিন স্পষ্ট বলে দিলে রমণীবাবুকে যে তাঁর আর আসবার দরকার নেই।

এই নিয়েই ঝগড়া কিরণের সঙ্গে। কিরণ হাল ছাড়তে রাজী নয়। সে অনেক কিছু মতলব এঁটেছিল—মাদুলি কবচও মেয়েকে পরিয়েছিল গোচ্চার। শেষে প্রস্তাব করেছিল তারকেশ্বরে নিয়ে যাবার, সেখানে নাকি ধন্না দিতে হবে। প্রসন্ন মাসী নাকি ঐখানে ধন্না দিয়ে সত্যেনবাবুকে চিরকালের মত বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু নলিনী কিছুতেই রাজী হয় নি। সে বড় অপমান। তা ছাড়া তারকনাথের কাছে ধন্না দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে এমন কিছু তালেবর নয় রমণীবাবু। এদানিং বড্ড কঞ্জুষ হয়ে গেছে যেন আরও, হাত দিয়ে জল গলে না। আর দরকারই বা কি, নলিনীরও তো মুখ বদল করতে ইচ্ছে হয়। না হয় থিয়েটারের চাকরি আর করতে পারবে না—চোখের সামনে সতীন রাণীগিরি করবে, সে দেখা বড় কঠিন—কিন্তু বাড়িটা তো আছে, যা ভাড়া পায় তাতে টেক্স-খাজনা দিয়ে নুনভাতও তো জুটবে! সেটা তো আর রমণীবাবু কেড়ে নিতে পারবে না। কিরণের সে কথা পছন্দ হয় নি, আসলে এমন ভাবে হাল ছেড়ে দেওয়াটাই পছন্দ নয় তার—এক কথা দু কথায় ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গিয়েছিল, নলিনীও আর রাগ সামলাতে পারে নি—বলেছিল,

'বেশ করব, আমার যা খুশি তাই করব, তোমার কি? আমি তোমার খাই, না তুমি আমার খাও?' তাইতেই অভিমান হয়েছে, কাশী চলে গেছে। বলে গেছে 'ভিক্ষে করে খাব, ছত্তরে খাব—অন্নপূর্ণার গলিতে আঁচল পেতে বসব—তবু তোর অন্ন আর খাব না!'

'তা'—একটু হেসে বলে নলিনী, 'সেখানে আমাদের জানাশোনা অনেকে তো আছে, দশ টাকা করে পাঠাচ্ছি—নিচ্ছে তো শুনছি। না নিয়ে আর কি করবে? ফিরেও আসবে তা জানি, রাগ করে কত দিন থাকবে!'

'এখন তা হলে কার কাছে আছ?' প্রশ্ন করে হেম, 'থিয়েটারে আর যাও না বুঝি?

'না, সেই দিন থেকে আর যাই নি। বাবু মাসকাবারে মাইনেটা পাঠিয়ে দিয়েছিল—ফিরিয়ে দিয়েছি'।...এখন আসেন আমাদের মুখুজ্জে মশাই—ওরই, মানে রমণীবাবুরই বন্ধু, ওঁর সঙ্গেই আসতেন-টাসতেন। অনেকদিন ধরেই ছোক ছোক করছিলেন—নিহাত বন্ধুর ব্যাপার বলেই কথাটা পাড়েন নি। বাবুকে ছেড়েছি শুনেই ছুটে এসেছেন। মাইনে ও-ই আছে, এধারেও দেয় থোয় মন্দ না। কামায় তো ভাল। খুব নাকি বড় চাকরি, বছর-খানেকের মধ্যেই নাকি আরও উঁচুতে উঠবে, তখন এক খাস বড়সাহেব ছাড়া ওর মাথার ওপর কেউ থাকবে না।...এ আমি ভালই আছি ভাই, থিয়েটারের মেহনতটা তো বেঁচে গেছে!'

তার পরই কেমন এক রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে হেমের দিকে চেয়ে বলে, 'তা তুমি এসব জান না—তো আজ হঠাৎ কী মনে করে এসে পড়লে?'

হেম রাঙা হয়ে ওঠে একেবারে। সলজ্জ হেসে বলে 'আমার যে বিয়ে। তোমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি!'

'বিয়ে? তোমার? ওমা কী হবে!' প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে নলিনী, 'তা এতক্ষণ একটা কথাও বল নি! কী চাপা লোক রে বাবা!...তা বেশ, ভালই হয়েছে। সত্যি, বয়স তো হয়েছে—এবার ঘরবাসী হওয়া দরকার। না, বড় আনন্দ হল শুনে।...কোথায় বিয়ে? কত পাচ্ছ? মেয়েটি কেমন? কত বয়স তার—মানাবে তো?' একসঙ্গে একশটা প্রশ্ন করে সে।

'রোস রোস—এক এক করে বল। তুমি যে তুবড়ি ছুটিয়ে দিলে!'

সংক্ষেপে পাত্রী, তার বয়স, বাড়ি ঘর, এবং সম্ভাব্য রূপের একটা বিবরণ দেয় হেম।

নলিনী সত্যিই খুশী হয়েছে মনে হল ওর বিয়ের কথা শুনে। ছুটে চলে গেল বাইরে—গিরিধারীকে পাঁচ রাস্তার মোড় থেকে রাজভোগ আনতে পাঠালে। ছেলেমানুষের মত ছুটোছুটি করতে লাগল যেন।

'চা খাবে? খাও আজকাল? এখন মুখুজ্জে সাহেবের জন্যে চায়ের পাট হয়েছে বাড়িতে। ওঁর মুহুর্মুহু চা চাই।'

তার পর আতিথেয়তা সারা হলে বলে, 'তা সত্যিই নেমন্তন্ন করছ তো? যাব? কোন কথা উঠবে না? মানে কোন আবার ফ্যাসাদে পড়বে না তো আমার জন্যে? কি বলবে?'

'কিছুই বলব না। বলব আলাপী লোক। বলব আমার আগের মনিবের বৌ। গায়ে কি তোমার কিছু লেবেল মারা আছে?'

'না থাকলে ভালই। আমি কিন্তু বাপু সত্যিই যাব। গিরিধারীকে সঙ্গে করে বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ঠিক চলে যাব।'

'নিশ্চয়ই যেও। ইষ্টিশানে নেমে একটা পাল্‌কি নিয়ো—বলো যে নতুন বামুনদের বাড়ি ঠিক নিয়ে যাবে।...তুমি কী বলবে বাবুকে?' হেম মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা করে।

নলিনীও হেসে জবাব দেয়, 'বলব তোমার সতীনের বে।...এ তো সুবিধে গো। বিয়ের নেমন্তন্নে যাচ্ছি আমোদ করতে—অন্য রকম সম্পর্ক হলে কি কেউ যায়—না যেতে পারে? কিছু খারাপ ভাববে না। বলব থিয়েটারের চেনাশুনো নেমন্তন্ন করেছে—অনেক করে যেতে বলেছে! আর কিছু বলবে না। সে রকম লোক নয়—সন্দ-বাই নেই।'

'এবার উঠি তা হলে, আরও দু-এক জায়গায় যেতে হবে।'

মুখে বলে হেম, কিন্তু তখনই ওঠে না। কী যেন একটা অপূর্ণ রয়ে যায়, কিসের জন্য যেন মনটা সতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। যে মোহ তার আর নেই বলে কিছু দিন আগেই মনকে আশ্বাস দিয়েছে, সেই পুরাতন মোহই আচ্ছন্ন করেছে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে। পরিচিত পরিবেশ প্রাক্তন অভিজ্ঞতার মধুস্মৃতি জাগিয়ে তুলছে। সেই স্মৃতির রসে মন আবিষ্ট হয়ে উঠছে। কেমন যেন একটা অস্থিরতা অনুভব করছে ভেতরে ভেতরে। বুকের মধ্যেটা কাঁপছে একটু একটু।

নলিনী কিন্তু ওর কথাটাকে সহজভাবেই নিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে আলনা থেকে ওর জামা আর গেঞ্জিটা নিয়ে এসে দাঁড়াল।

'কি হল—উঠবে বললে যে? না কি একটু বসবে?'

হেম সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ওর একটা হাত ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলে। মৃদু আকর্ষণ—সুতরাং প্রস্তুত না থাকলেও হুমড়ি খেয়ে পড়বার মত কিছু নয়, নলিনী অল্প চেষ্টাতেই সামলে নিলে নিজেকে। এ আকর্ষণের অর্থ তার অজানা নয়। সে এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেমের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। ও বিহ্বল দৃষ্টিও সে চেনে। পুরুষের এ আকর্ষণ আর ঐ বিহ্বল দৃষ্টির অর্থ তার কাছে পরিষ্কার।

সে প্রবলবেগে ঘাড় নাড়লে, 'না না, ছি! বিয়ে করতে যাচ্ছ, একটা ভদ্দরলোকের মেয়েকে হাত ধরে ঘরে আনছ—কত শিবপুজো করে কত আশা নিয়ে সে আসছে বলদিকি!...আর এসব করো না, যা করেছ করেছ—তখন কোন দোষ ছিল না। কিন্তু এখন আর নয়। আমারও বহু জন্মের পাপ এ জন্মে ভোগ করছি—আবার সতীলক্ষ্মী বামুনের মেয়ের কাছে জেনেশুনে পাপের ভাগী হতে পারব না। কিছু মনে করো না—লক্ষ্মীটি, তুমি আজ বাড়ি যাও!'

ওর হাত থেকে জামা দুটো নিয়ে কোনমতে গলাতে গলাতে বেরিয়ে আসে হেম। আজও সেইদিনকার মত নিষ্ফল আবেগে সমস্ত শরীর কাঁপছে তার—আজও অপমানে না হোক—লজ্জায় পা দুটো তেমনি টল্‌ছে, প্রায় সেদিনের মতই স্খলিত পদে বেরোতে হল এ বাড়ি থেকে—তেমনি বলতে গেলে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে। তবে সেদিন অপমানটা বাইরে, সহস্র চক্ষুর সামনে—আজ সবটাই ভেতরে। আজ আত্মগ্লানি ও আত্মধিক্কারই প্রবল।...

ছি ছি, নলিনী কী ভাবলে তাকে। কী ছোটই হয়ে গেল ওর কাছে। আর কি কোন দিন ওর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবে?

নলিনী সদর দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল, সে পেছন থেকে চুপি চুপি বললে, 'আমার ওপর রাগ করে যাচ্ছ না তো লক্ষ্মীটি, আমার অপরাধ নিও না। কথাগুলো ভেবে দেখো।'

হেম সে কথার জবাব দিলে না। ফিরে তাকালেও না আর। তবে সে রাগে নয়, লজ্জায়।

॥ ৪ ॥

হেমের বৌভাত উপলক্ষে আমাকে আর একটি যা কাজ করতে হল, তা তার চিরকাল মনে থাকবে। এত নীচে যে সে নামতে পারে, তা এত দিনের এত জীবনযুদ্ধের পরেও ধারণা ছিল না তার। আর বুদ্ধি বটে বড় জামাইয়ের—এ বুদ্ধি সাত বছর এক পায়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেও তার মাথাতে আসত না।

কম করতে করতেও প্রায় সওয়া শ লোক হয়ে গেল বৌভাতে। তিন মেয়ের বাড়ি, সরকারদের বাড়ি—তার ওপর কুটুম বাড়ি, এই তো পুরো একশ-র ধাক্কা। তা ছাড়া পাড়াঘরে একটি একটি বলতে হয়েছে। প্রথম ছেলের বিয়ে—ভিন্ন পাড়ার লোকও দু-এক জন সে বলেছে, একটু মাতব্বর দেখে দেখে।

এসেছিল অনেকেই। নলিনীও সত্যি-সত্যিই এসেছিল। তবে তাকে চেনবার জো ছিল না, ভোল পাল্টে এসেছিল একেবারে। সাদা গরদের শাড়ি পরে ঘোমটা দিয়ে যখন পাল্কি থেকে এসে নামল, তখন হেমও প্রথমটা চিনতে পারে নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাল্কির পেছনে গিরিধারীর দিকে নজর গিয়েছিল তাই রক্ষা—নইলে হয়তো বোকার মত প্রশ্ন করে বসত, 'কোথা থেকে আসছ গা পাল্কিওলারা?'

অবশ্য নলিনীর আসল পরিচয় কেউ সন্দেহ না করলেও ওর ঐ অতিরিক্ত সম্ভ্রান্ত বেশভূষা ও ধরনধারনের জন্যেই বিস্ময় ও কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়েছিল কিছু কিছু—অনেকের কাছেই জবাবদিহি করতে হয়েছিল হেমকে। বিশেষ করে সোনার মাকড়ি দিয়ে বৌয়ের মুখ দেখার ফলে আরও চাঞ্চল্য।

'ইটি কে গা হেম—ঠিক চিনতে পারলুম না তো—'

'হ্যাঁ হে হেমচন্দ্র,—উনি, মানে—তোমার কুটুমবাড়ির কেউ নাকি?'

এক-এক জন এক-এক বার ডেকে ডেকে প্রশ্ন করেন।

সকলকেই এক উত্তর দিয়েছিল হেম, 'আমার পুরনো মনিবের স্ত্রী। তিনি আসতে পারেন নি, উনি একাই চলে এসেছেন। আমাকে খুব স্নেহ করেন কিনা—'

কিন্তু প্রত্যেক বারই কান মাথা গরম হয়ে উঠেছে তার, লজ্জায় ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথার মধ্যে।

সবচেয়ে বিপদে পড়েছিল প্রমীলাকে নিয়ে। তার চোখ যেন অন্তর্ভেদী—

মুচ্‌কি হেসে প্রশ্ন করেছিল, 'তা হ্যাঁ দাদা, তোমার মনিবগিন্নির তো নোয়া একগাছা আছে দেখছি সোনা বাঁধানো—কিন্তু সিঁথির সিঁদুর কী হল!'

এক মুহূর্তে ঘেমে উঠেছিল হেম। ঠিক কোন উত্তর যোগায় নি। ভাগ্যে সেখানে মহা দাঁড়িয়ে ছিল—সে বোকার মত জবাব দিলে, 'পরতে নেই হয়তো ক দিন—মাথা ময়লা হয়েছে!'

বেঁচে গেল হেম। বললে, 'সত্যি, এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন মেজদি? মেয়েলী ব্যাপারের আমি কি জানি?'

কিন্তু প্রমীলাও ছাড়বার পাত্রী নয়। সোজা হেমের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'ওঁকে জিজ্ঞাসা করব নাকি?'

'কর না।'

'কিছু দোষের হবে না?'

'তা জানি না। বুঝে দেখ।' সেখান থেকে সরে পড়েছিল হেম। কে জানে যা মেয়ে—হয়তো কী অপমানই বা করে বসবে। হয়তো জানাজানি হয়ে যাবে।

কিন্তু প্রমীলা আর একটু বাঁকা হেসেছিল শুধু।

এক ফাঁকে একটু নিভৃতে দেখা হতে হেমই বলেছিল, 'এক জন জিজ্ঞেসা করছে সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন?'

নলিনী প্রস্তুত হয়েই এসেছে। বললে, 'ওমা, সিঁদুর বাঁধা রেখেছি যে—ওঁর অসুখের মানসিক।' বলে হাসল সে। একটু অপ্রতিভ হাসি।

'সে তো শুনেছি লোহা-সিঁদুর দুই-ই বাঁধা রাখতে হয়!'

'তা কেন—যার যা মানসিক।' প্রশান্তকণ্ঠে বলে নলিনী।

রতন আসে নি। নিমন্ত্রণ করতে যাবার সময়ই বলে দিয়েছিল, 'না ভাই, আমি কোথাও যাই না—জানেনই তো। থিয়েটারে বায়স্কোপেই যাই না। একেবারে মরে এবাড়ি থেকে বেরুব—এই ইচ্ছে। কান্তি যাবে বৈকি। তবে বেশী দিন আগে পাঠাব না, এক জন মাস্টার রেখেছি ওর জন্যে, মিছিমিছি পড়ার কামাই হবে। এবার ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে উঠল দেখে মাস্টারমশাই এক জন ব্যবস্থা করেছি। সামনের বারেই তো ম্যাট্রিক দেবে—যদি একটা জলপানি পায় তো আর কারুর দ্বারস্থ হতে হবে না—নিজেই নিজের পড়ার খরচ যোগাতে পারবে!'

মাস্টার রাখার খবরটা এরা কেউ জানত না। শুনে শ্যামার মন খারাপও হয়ে গেল যেমনি—তেমনি নতুন একটা আশাও মনের সঙ্গোপনে উঁকি মারতে লাগল। ছেলে যেন বড্ড পর হয়ে যাচ্ছে। বড়লোক-ঘেঁষাও হয়ে যাচ্ছে হয়তো। এর পর কি আর ওদের ঘরে বাস করতে পারবে? শাক ডাঁটা ডুমুর-সস্‌সড়ি ভাত কি মুখে রুচবে! তা ছাড়া জলপানি পেয়ে যদি আরও পড়ে তো—চাকরি-বাকরিই বা কবে কি করবে। শ্যামা কি চিরকাল এই দুঃখের পেছনে দড়ি দিয়ে বেড়াবে? অথচ সেই সঙ্গে একটা অত্যন্ত গোপন দুরাশা, একটা সুদূর কল্পনাও মনে জাগছে, এত যখন করছে তখন নিশ্চয়ই ভালবাসে কান্তিকে, ওর তো ছেলেপুলে নেই, অগাধ ঐশ্বর্য শুনেছি। কে জানে, মা সিদ্ধেশ্বরী যদি মুখ তুলে চান, ওকেও দিয়ে যেতে পারে হয়তো!

বিয়ের দিন সকালে দারোয়ান এসে কান্তিকে পৌঁছে দিয়ে গেল। তার সঙ্গে একখানা দামী দেশী ধুতি, একথালা গোলাপছাপ সন্দেশ আর একটা সোনাবাঁধানো চিরুনি বৌয়ের জন্য। কিন্তু সেটাও তত বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারল না—যতটা করল কান্তি নিজে। ছেলেকে দেখে সবাই অবাক। কেউ যেন চিনতেই পারে না। যেমন ঢ্যাঙা হয়েছে, তেমনি সুন্দর। শুভ্র গৌর বর্ণ, আয়ত চোখ, দীর্ঘ পক্ষ্ম—গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁটের ওপরে সামান্য একটু গোঁফের আভাস—কচি কিশলয়ের মত। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। আর বেশভূষাই বা কি। চুনট্ করা দেশী কাপড়, সিল্কের পাঞ্জাবি, পাম্পশু জুতো, আঙুলে একটা শীল আংটি। ফুলবাবু একেবারে।

সকলের সপ্রশ্ন ও সবিস্ময় মিলিত দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে ঘেমে ওঠে কান্তি। তার যেন কেমন লজ্জা করতে থাকে। হেম পর্যন্ত একটা স্-স্ শব্দ করে উঠে মাকে বলে, 'কী সুন্দর চেহারা হয়েছে মা কান্তিটার—যেন রাজপুত্তুর, না?'

এই উপমাটাই বার বার মনে হচ্ছিল শ্যামার। রাজপুত্র ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে না কান্তিকে দেখলে। রূপকথার রাজপুত্র একেবারে। আনন্দে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তার গর্ভের কোন সন্তানই তো ফেল্‌না নয়—সবাই সুন্দর। ঐন্দ্রিলা আর কান্তির তো কথাই নেই। ওদের বাপও ঐ বয়সে—। রংটাই যা খুব উজ্জ্বল ছিল না, কিন্তু মুখচোখ ঐ কান্তির মতই ছিল. ঠিক। আজও সেই প্রথম চার চোখে চাওয়ার কথা মনে হলে কী রকম করতে থাকে বুকের মধ্যে। সেই মানুষ বদস্বভাবের গুণে ঘুরে ঘুরে

আর অত্যাচার করে করে কী পোড়া কাঠই হয়ে গেল। আর সে নিজেও, তার রূপটাই কি সোজা ছিল! সেই রূপ, সেই রংই তো পেয়েছে ওরা। আজ আর কিছুই নেই তার—একেবারে ঘুঁটেকুড়ুনী কাকতাড়ানী হয়ে গেছে। আজ কান্তির মা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয় তার। কে জানে, ওদেরও লজ্জা হয় কি না।

কান্তি ওদের চোখ এড়াতেই বাবার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নরেনও ওকে চিনতে পারে নি। অনেকটা ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কে বাবাজী তুমি, চিনতে পারলুম না তো? তুমি বুঝি আমার হেমচন্দরের শালা?'

লজ্জার ওপর লজ্জা। পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাম মুছতে মুছতে বলে, 'বা রে! আমি তো কান্তি। এক বার উঠে বসতে পারবেন? পায়ের ধুলো নেব!'

'কে? কা—। ও আমাদের কান্তি। আরে, এ যে নবকার্তিক একেবারে। ময়ূরে গিয়ে চড়ে বসলেই তো হয়। বাঃ, এমন সাজালে কে? সেই কসবী মাগী বুঝি? আর কি—নজরে পড়ে গিয়েছিস দেখছি। চেপেচুপে থাক্—দিন কিনে নিতে পারবি। উঃ—আবার রুমালে খোসবো। বাবুয়ানার কিছু বাকী নেই। হবে হবে—ও বয়সে ঐ—এ বয়সে এই। আমিও বাবু ছিলুম বৈকি এক কালে! তবে এমন মাল-দার কারুর নজরে পড়তে পারি নি এই যা—আমার কপালে জুটেছিল যত খোলার ঘরের মাগী-

কান্তির প্রণাম করা হয় না, সেখান থেকেও ছুটে পালায়। লজ্জায় আঙার হয়ে উঠেছে তার কানের ডগাগুলো, মুখে কে যেন মুঠোমুঠো আবীর ঢেলে দিয়েছে।

ঝকমারি হয়েছিল তার বাবাকে ঘাঁটাতে আসা। জেনে-শুনেও আসাটা তার উচিত হয় নি।

অবশেষে রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াতে শ্যামা একটু অবসর পায় প্রশ্নটা করবার।

'হ্যাঁ রে, তোর রতনদি তোকে খুব ভালবাসে, না? এসব কবে কিনে দিলে রে?'

'কী সব—এই কাপড়জামা? দাদা যেদিন বলে এসেছিল সেই দিনই দর্জিকে ডেকে পাঠিয়ে জামার মাপ দিয়েছে।'

'ভাল হয়ে থাকিস বাপু, মন দিয়ে লেখাপড়া করিস। কত খরচ করছে বল দিকি। আবার তো শুনছি মাস্টার রেখে দিয়েছে এক জন—?'

'হ্যাঁ। বারণ করলুম অত করে, শুনলে না। এত লজ্জা করে—তাই কি কম, পনেরো টাকা মাইনে নেন মাস্টার মশাই। অন্য কোন্ ইস্কুলের মাস্টার এক জন। কী জেদ চাপল—খরচার ভূতে পেয়েছে যেন।'

'ভালই তো। এর আর ভূতে পাওয়া-পাওয়ি কি। ভগবানের ইচ্ছেয় আছে ঢের—তোকে ভালবাসে—খরচ করছে। মানুষ হয়ে যদি উঠিস কোন দিন—ওকে দেখিস। এই কথাটা ভুলিস নি।'

তার পরই আর এক বার ছেলের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে শ্যামা বলে, 'তা তুই তো সেজেছিসও খুব ভাল। একেবারে বাবুদের মতই। এমন কাপড় পরতে শিখলি কোথায়?'

'এ তো রতনদি নিজে হাতে পরিয়ে দিলেন আসবার সময়।'

বলতে বলতেই কান্তির সুগৌর মুখ আবারও আবীর-রাঙা হয়ে ওঠে।

শ্যামা বলে, 'তাই নাকি—তা হলে তোর মায়ায় খুব জড়িয়ে পড়েছে বল্—আহা নিজের একটা নেই তো—ছেলের মতই দেখে আর কি!'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে, সেটা তৃপ্তির কি ঈর্ষার—তা বোধ হয় নিজেও বোঝে না।

কিন্তু সে সব কথা কান্তির কানে যায় না। তার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায়। কাপড় পরিয়ে দেওয়াটা আজ নতুন নয় অবশ্য—আজকাল প্রায়ই ইস্কুলে যাবার সময় রতন ওকে কাপড় জামা পরিয়ে চুল আঁচড়ে বইখাতা গুছিয়ে দেয়—মোক্ষদাদির আবার তাতে একটু রাগ হয় তা এমন কি কান্তিও বোঝে—মুখে যদিও বলে, 'ভাল তোমাকে বরাবরই বাসে দিদি—কিন্তু এদান্তে যেন বড্ড মায়ায় জড়িয়ে পড়েছে। তা তুমিও বাবু যে বড্ড নিপাট ভালমানুষ—ভালবাসা আদায় করবার ঐ তো কৈশল কিনা। এমনিধারা ছেলের ওপরই মায়া পড়ে যে!'

তার জন্যে নয়—আজ আসবার সময় যা কাণ্ড করলে রতনদি—কাপড় জামা পরিয়ে মাথা আঁচড়ে নিজের আঁচল দিয়ে মুখের তেল-তেল ভাবটা মুছিয়ে দিয়ে দুটো কাঁধ ধরে যেন খানিকটা দূরে দাঁড় করিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওর দিকে, তার পর আবার একটু কাছে টেনে দাড়ির কাছে দুটো আঙুল দিয়ে মুখটা তুলে ধরে বললে, 'সত্যিই তোকে যেন মনে হচ্ছে কোন্

রাজপুত্তুর, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে কোন্ রাজকন্যেকে আনতে যাচ্ছিস্। আমার কিন্তু ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।'

তার পর—যা কোন দিন করে না রতনদি—সুগভীর স্নেহে ওকে একটি চুমো খেয়েই যেন শিউরে উঠে ঠেলে সরিয়ে দেয় খানিকটা—কতকটা আপন মনেই বলে ওঠে, 'না না—গরীব বামুনের ছেলে তুই, তোকে যে মানুষ হতে হবে। রাজকন্যের ফাঁদ ভাল নয়। আর এমন সাজিস নি তুই। এসব ভাল নয়, ভাল নয়!'

বা রে। যেন কান্তিই সাজবার কথা বলেছে, ভাল জামার আবদার ধরেছে! আর কোন দিন সাজবে না সে, রতনদি বললেও সাজবে না।

ঐন্দ্রিলা বিয়ের খবর পেয়েই চলে এসেছিল। ওখানে যে সে আর টিকতে পারছে না তা অন্য লোকের মুখে আগেই শুনেছে শ্যামা। সে জানত যে এবার এক দিন মান খুইয়ে নিজেকেই ফিরতে হবে। ওখানে হরিনাথের মা একটু সেরে উঠেছেন, বাইরে বেরোতেও পারছেন দেওয়াল ধরে ধরে, বসে বসে যা কাজ তা তো অনেকটাই করে দিচ্ছেন—সুতরাং তাঁরও প্রয়োজন কমেছে, এরও স্বভাব নিজের উগ্রমূর্তি ধারণ করেছে। আগে সকলে গরজে সহ্য করত ওর মেজাজ—এখন করে না। ফলে খিটিমিটি বাধতে বাধতে এখন একেবারে ডাকাত-পড়া ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। দু দিন পরে অপমান হয়েই বেরোতে হত হয়তো—হেম গিয়ে পড়তে বেঁচে গেল দু পক্ষই। ঐন্দ্রিলা পরের দিনই চলে এল। ওরাও আর ধরে রাখবার চেষ্টা করলে না। কিংবা কবে ফিরবে তাও প্রশ্ন করলে না।

যাই হোক—এখানে এসে, বোধ হয় অনেক দিন পরে, কতকটা নতুনের মত বলেই সে খাটছিল খুব। বলতে গেলে বেঁচে গিয়েছিল শ্যামা ওকে পেয়ে। ঘরদোর সাফ্ করা, কাচাকুচি—এতগুলি লোকের রান্না—চার চালের ভার তুলে নিয়েছিল মাথায়। বৌ আসবার পর থেকেই আবার কোথায় কি মাথার মধ্যে গোলমাল বেধেছে। 'রাগ-রাগ ভাব। বৌভাতের দিন সকালে সেটাই চরমে উঠল—একেবারে অসহযোগ। শ্যামা চোখে অন্ধকার দেখলে। হালুইকর বামুন এসেছে মোটে এক জন, অভয়পদ যথারীতি তাকে যোগাড় দিচ্ছে, তার দ্বারা বাড়ির রান্নার কোন সুসার হবে না। অথচ এদিকেও তো লোক কম নয়। এসব করে কে'? 'পাঁচ-ব্যান্নন' ভাত বোয়ের

হাতেও তুলে দিতে হবে। তার একটু নেমরক্ষে পায়েস চাই, কলার বড়া চাই। তরুকে সে কখনও করতে দেয় নি এসব কাজ—অভ্যস্ত নয়। মহার রান্না অভ্যাস আছে খুব—কিন্তু তার কোলের ছেলেটা ক দিন ধরে ভুগছে—তাকেই বা কে দেখে! ছেলেটাকে কেউ নিলে সে করতে পারত। নেয় কে?

অগত্যা শ্যামা যুদ্ধের দিকে না গিয়ে সন্ধির দিকে গেল। হাতে পায়ে ধরে, অজ্ঞাত এবং সম্ভবত অকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে কোন মতে কাজে লাগাল তাকে আবার। কিন্তু সে আগুন একেবারে নেভে নি—ছাই-চাপা পড়েছিল মাত্র। হঠাৎ আবার সন্ধ্যার দিকে ধূমায়িত হয়ে উঠল। কিন্তু তখন কুটুম-সাক্ষাৎ এসে পড়েছে, ঐটুকু বাড়িতে লোক গিসগিস করছে—তখন আর ওর মান ভাঙাবার সময় নেই। সে চেষ্টাও করলে না শ্যামা, শুধু সবাইকে টিপে দিলে, ওকে কেউ না ঘাঁটায়। কর্মবাড়িতে কেলেঙ্কারি হওয়া ঠিক নয়।

সেই মেজাজেই ছিল সে—কিন্তু এক সময় বোধ হয় আবিষ্কার করলে যে সবাই তাকে এড়িয়ে চলছে। আর যাই হোক—বোকা নয় ঐন্দ্রিলা। এমন একঘরে হয়ে থাকার অর্থটা সকলের চোখে পড়বে—হয়তো নতুন কুটুমদেরও। কী মনে করবে তারা—ঝগড়াটী বদনাম তো আছেই, সেটা এবার হয়তো সেখান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে আর সে বড় অপমানের কথা হবে—তাই বুঝেই হঠাৎ যেন আবার সক্রিয় হয়ে উঠল সে, এবং নিজে যেচে সেধে কাজকর্ম হাতে তুলে নিতে লাগল। কন্যাপক্ষের মেয়েদের আদর-আপ্যায়ন রসিকতা কোনটাই বাদ গেল না। শুধু তাই নয়, মেয়েদের খাওয়ানোর সময় পরিবেশন করার ভার একার ওপরই তুলে নিলে। আর সেই অতি-সক্রিয়তার সময়ই ছুটোছুটি করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল দাওয়ার নীচেটায়—যেখানে মাটির গেলাসগুলো ধুয়ে উপুড় করে রাখা হয়েছিল—একেবারে তার ওপর। ফলে অবশিষ্ট সমস্ত গেলাসগুলোই ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। ভাগ্যে তখন পরিবেশন করে খালি একটা গামলা হাতে ফিরছিল, নইলে তরকারিও কম পড়ে যেত। কারণ সবটাই মাপা ওদের। কিন্তু লোকসান যা হল তাও কম নয়। তখন রাত দশটা বেজে গেছে, এখানে আর এ বস্তু পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ তখনও কমপক্ষে পঞ্চাশ জন লোক বাকী। যার-পর-নাই কুটুমবাড়ির পুরুষরাই বাকি। স্থান সংকীর্ণতার জন্যে অল্প অল্প করে লোক বসানো হচ্ছিল!

শব্দ পেয়ে ছুটে এল অনেকেই। হেমই এসে হাত ধরে তুললে। হেমের ইঙ্গিতেই লোকসানটার কথা কেউ উচ্চবাচ্য করলে না। ঐন্দ্রিলা এমনিতেই যথেষ্ট অপ্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিটা নিয়ে বেশী আলোচনা করলে হয়তো এখনই ভিন্ন মূর্তি ধারণ করবে। কুটুমরা থাকতে থাকতে অন্তত চেঁচামেচি হওয়া ঠিক নয়। তা ছাড়া লেগেছেও খুব। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না সে, হয়তো কেটেকুটেও গেছে। এখন কিছু বলা আর কাটার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া সমান।

রাণী এসে ঐন্দ্রিলাকে ধরে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় শুইয়ে জল দিয়ে চুঁচে দিতে লাগল। শ্যামা তখন বসে পড়েছে। এত পেতল কাঁসার গেলাস নেই যে মান রক্ষা হয়।

শব্দ পেয়ে অভয়পদও ছুটে এসেছিল। শ্যামা আজ মাথায় কাপড় দিতেও ভুলে গেল তার সামনে। প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, 'এখন উপায় ?'

'উপায় আছে বৈকি। গেলাস আনিয়ে দিচ্ছি। ব্যস্ত হবেন না।'

হেম বিস্মিত দৃষ্টিতে ভগ্নিপতির দিকে চেয়ে বললে, 'এখন কোথা থেকে আনাবেন ? সব তো বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছে !'

'সে যা হয় হয়েই যাবে।'

অভয়পদ সরে যায় সেখান থেকে। একটু পরেই শ্যামা ঘাটের দিকে যেতে—পাশ থেকে ডেকে বলে, 'শুনুন একটু।'

অভয় তাকে নিভৃতে কথা কইবার জন্য ডাকবে—এ একেবারে অভাবনীয়। শ্যামা বুঝল গুরুতর কোন কথা আছে।

'কী বাবা ?' বলে এগিয়ে গেল সে।

'আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। পাতা গেলাসগুলো ঐ ওধারে বাঁশঝাড়ের গোড়ায় ফেলা হচ্ছে তো—ওদিকটা অন্ধকার, কেউ দেখতে পাবে না। আগের গেলাসগুলো সব ভাঙে নি নিশ্চয়, বেছে নিয়ে গোটাকতক ঐ ধারের ঘাট থেকেই ধুয়ে নিন ভাল করে।'

কথাটা বোধগম্য হতে সময় লাগল শ্যামার।

তার পর অস্ফুট-কণ্ঠে দুটি শব্দ শুধু উচ্চারণ করলে, 'ঐ এঁটো গেলাস ?'

'অত ভাবতে গেলে আর চলবে না। কাঁসার গেলাস তো মেজে নেন—তাই নিন। বেশ করে মাটি দিয়ে রগড়ে মেজে নিন। তেলটাও উঠে যাবে

তাতে, গন্ধও থাকবে না। মাটি তো শুদ্ধ,—হাতে মাটি করে শুচি হন—মাটি দিয়ে মেজে এঁটো বাসন শুদ্ধ করেন। মাটির গেলাসে দোষ কি?…নইলে কি বে-ইজ্জত হবেন?'

তা বটে। আগের যুক্তিগুলো তেমন নয়। শেষের যুক্তিটাই প্রবল। শ্যামাকে বেশী বলতে হয় না। সে 'আচ্ছা' বলে সরে পড়ে। তার পর একটা গামছা নিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ঐ দিকের ঘাটে যায়। পাড়ে কাপড়টা ছেড়ে রেখে হাতড়ে হাতড়েই আবার যায় বাঁশঝাড়ের দিকে। সেখান থেকে হাত দিয়ে দিয়ে দেখে আস্ত গেলাস তুলে নেয় ত্রিশ-চল্লিশটা—তার পর সেগুলো বয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ধুয়ে নেয় মাটি বুলিয়ে। সেগুলো আবার পাড়ে তুলে রেখে একটা ডুব দিয়ে উঠে আসে একেবারে।

ওদিকে কারবাইডের উজ্জ্বল আলো, লোকের ভিড়, কোলাহল। এদিকের অন্ধকার পুকুরপাড়ে কারুর নজর চলবার কথা নয়—চললও না। শুধু সতর্ক ও সজাগ ছিল অভয়পদই, তাকে ইঙ্গিতও করতে হল না, শাশুড়ীকে আবার ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে দেখেই সে-ও অন্ধকারে চলে গেল।

একটু পরে গেলাসগুলো এনে দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে সহজভাবেই হেমকে বললে, 'এই নাও গেলাস। এতেই হবে বোধ হয়, না হয় বাড়ির লোক যা হয় করে চালিয়ে নেবে। একেবারে ধুয়েই এনেছি—বসিয়ে দাও গে পাতে পাতে।'

এই ভগ্নিপতিটিকে বহুবার অসাধ্য-সাধন করতে দেখেছে সে—সুতরাং হেম আর খুব একটা বিস্ময়বোধ করল না। কোন প্রশ্নও করল না। পাতা পড়ে গিয়েছিল—তাড়াতাড়ি গিয়ে গেলাসগুলো সাজিয়ে দিলে।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ভাল করে আলাপ পরিচয় হবার আগেই নতুন বৌ কনক ও হেমের মনের মাঝখানে কোথায় একটা প্রায়-অদৃশ্য পাঁচিল উঠল।

কনক হেমকে ঠিক বুঝতে পারল না। হেমও তাই। অথচ সে ভুল বোঝাবুঝিটা এতই সামান্য, এতই অকিঞ্চিৎকর যে ব্যাপারটা অপরেরও অনুমান করা সম্ভব নয়।

ফুলশয্যাটা হয়েছিল ওদের রান্নাঘরে। তক্তপোশ একটা আগেই কোথা থেকে আধ-পুরনো কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিল অভয়পদ, সেটা স্থানাভাবে তখনকার মত রান্নাঘরেই রাখা হয়। এখন এক বাড়ি লোক থৈ থৈ করছে—বড় ঘর ওদের ছেড়ে দিলে এরা শোয় কোথায়? তাই শেষ পযন্ত রান্নাঘরেই ফুলশয্যার ব্যবস্থা করতে হল। আর ফুলশয্যা নামেই। রাত তো কাবার হয়েই এসেছে। কতটুকুই বা শোওয়া—নিয়মরক্ষা বই তো নয়।

কিন্তু তার পরের দিনও হেম যখন হুকুম করলে রান্নাঘরে ওদের বিছানা করতে, তখন সকলেই অবাক হয়ে গেল। রান্নাঘর অবশ্য বড়ই—তবে মেটে ঘর, গোলপাতার চাল। জানলাগুলো নিতান্ত খুপরি খুপরি। শ্যামা আপত্তি করলে, এমনও তার মনে হল এক বার যে, গতকাল ওখানে ফুলশয্যার ব্যবস্থা হওয়াতে একটু অভিমানই হয়েছে ছেলের। মহা ছিল সেদিনও—সে বললে, 'ওমা, কী খিটকেল! লোকে বলবে যে আমাদের জন্যেই। সে ভারি মন্দ কথা হবে বাপু।' তরু, ঐন্দ্রিলা সকলেই কুণ্ঠিত বোধ করতে লাগল। শ্যামা বুঝিয়ে বলতে গেল, 'কাল সব গোবিন্দর বৌ-টৌ ছিল, সে একরকম কথা। আজ আর দরকার কি বাপু। আমাকে তো বাইরের ঘরে শুতেই হবে, ঐ রুগী একা তো আর ফেলে রাখা যায় না। নিয়ে দিয়ে থাকবে তো খোকা, খেঁদি আর তার মেয়ে। তরু আর মহা একটা রাত থাকবে—কালই চলে যাবে ওরা। একটা দিন কোনমতে দালানেই বেশ থাকবে 'খন। নয়তো মহাই না হয় ছেলে নিয়ে রান্নাঘরে শুক। কি বাইরের ঘরেও থাকতে পারে—'

হেম একটু অসহিষ্ণুভাবেই তাকে থামিয়ে দিলে, 'আমি ওখানেই শোব। যদি কোন রাজনন্দিনীর মেটে ঘরে শুতে অসুবিধে হয়—সে যেন বড় ঘরে শোয়।'

এবার শ্যামা একটু আশ্বস্ত হল। হাসলও মনে মনে। জানলার বাইরেই বোন-ভাগ্নী থাকলে ছেলে-বোয়ের সারারাত বকর বকর করার অসুবিধা হবে।

হেসেছিল কনকও। একে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সে—তায়, তার বাবা যা-ই বলুন না কেন, আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে তার। সে অনেক কিছুই বোঝে। তার অবশ্য মেটে ঘরে শুতে আপত্তি নেই—অভ্যাসও আছে, তার বাপের বাড়িও পাকাঘর মেটেঘর মিলিয়েই—কিন্তু রান্নাঘর আলাদা। ধোঁয়া ঝুল কালি—মনে করলেই কেমন হয়। অবশ্য পাতার জ্বালে রান্না বলে শ্যামা আজকাল প্রায় দাওয়াতে বাইরের উনুনেই রান্না করে, নিতান্ত বর্ষাবাদল না হলে আর ঘরের উনুন জ্বালে না, তবু ধোঁয়া ঢোকে বৈকি! তবু—এসব অসুবিধা সত্ত্বেও—খুশীও হয়েছিল কনক বরের বিবেচনা দেখে। ফুলশয্যা হতে হতে কাল রাত তিনটে বেজে গিয়েছিল ক্লান্তিতে ঘুমেতে দু জনের অবস্থাই শোচনীয়, তা ছাড়া ওরা দু জনেই জানত যে এই শেষ রাত্রেও অনেক জোড়া কান পুকুরের দিক থেকে ঘুরে এসে জানলার গোড়ায় আড়ি পেতেছে—রাণীদির মিষ্টি হাসির শব্দ তো স্পষ্ট শুনেছে কনক—সুতরাং কথাবার্তা কইবার কেউ চেষ্টাও করে নি ওরা। ওদের আসল ফুলশয্যাটা বলতে গেলে আজকেই হবে—প্রথম আলাপ ও পরিচয়টা। সেদিক থেকে একটু নিভৃত অবসর মন্দ নয়।

কিন্তু সেইখানেই কোথায় একটা মস্ত গণ্ডগোল হয়ে গেল।

বৌ বলতে দুটি বৌকেই হেম ভাল করে কাছ থেকে দেখেছিল। গোবিন্দরই দুই বৌ, তারা ও রাণী। দু জনেই সপ্রতিভ। তারার বয়স হয়েছিল, তা ছাড়া সে বাইরের মেয়ে, লজ্জা করতে শেখার অবসর পায় নি। আর রাণী বয়সের তুলনায় একটু বেশী সপ্রতিভ, বরং প্রগল্‌ভও বলা যায়। কিন্তু সে প্রগল্‌ভতা মুগ্ধই করে মানুষকে। এ দু জন ছাড়া দেখেছিল সে মহাদের বাড়ির প্রমীলাকেও, কাছ থেকে না হলেও যাতায়াতে অনেক বারই দেখেছে। অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে, কথা কইবার সময় সে বুদ্ধির দ্যুতি তার চোখে মুখে বিচ্ছুরিত হয়। কথাতে তার ক্ষুরের ধার। বেঁধে, তবু ভাল লাগে।

আর দেখেছে নলিনীকে—প্রগল্‌ভও নয় বুদ্ধিমতীও নয়—তবু বেশ কথা বলে। সহজ ভাবেই বলে।

এদের দেখেই অভ্যস্ত সে—তাই মেয়েদের যে কথা বলাতে হয়, লজ্জা ভাঙাতে হয়—তা জানে না। জোর করবার কথা তো কল্পনারই বাইরে, তাই সে সাধারণ ভাবে সহজ ভাবেই কথা কইতে গেল কনকের সঙ্গে। কিন্তু কনক এটা আশা করে নি। একে সে একটু বেশী লাজুক, তায় জ্ঞান হওয়া থেকে অর্থাৎ কৈশোরে পা দেওয়া থেকে অপর বিবাহিত মেয়েদের কাছ থেকে শুনে আসছে যে বরেরা অনেক সাধ্য-সাধনা করে কনে বৌদের কথা বলায়। আর সে সাধ্য-সাধনার আগে ওদের কাছে ধরা দিতে নেই, তাতে খেলো হয়ে যেতে হয়।

সুতরাং কনক থতমত খেয়ে গেল। অবাকও হয়ে গেল বেশ খানিকটা। আদৌ কথার উত্তর দিতে পারলে না অনেকক্ষণ। তার পর যখন হেম প্রায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে তখন দু-একটা উত্তর দিলে বটে—সে উত্তর বা সে কথার ধরন হেমের ভাল লাগল না। সে সংক্ষিপ্ত উত্তরের মধ্যে কনকের বিস্ময়-বিহ্বলতা, এত দিনের স্বপ্নে রূঢ় আঘাত লাগার বিমূঢ়তা এবং কিছুটা আশা-ভঙ্গের বেদনা অনুভব করার মত শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা হেমের ছিল না। অপর কোন নববিবাহিত বন্ধুর সঙ্গে এই ধরনের সরস আলোচনা করা তার ভাগ্যে কোন দিনই হয়ে ওঠে নি। সুতরাং কনকের সহজভাবে কথা বলার সাময়িক অক্ষমতাকে স্থায়ী অক্ষমতা মনে করলে সে। তার মন বিগড়ে গেল।

ওদের সে প্রথম পরিচয়ের ধরনটা একটু নমুনা থেকেই বোঝা যাবে :

হঠাৎ এক সময় হেম জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার বয়স কত ?'

কনক নির্বাক।

'কী হল—বয়সটাও জান না নাকি ?'

অনেকগুলো উত্তর মনের মধ্যে গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছিল।

বলতে পারত যে, 'জানব না কেন, কী বললে তুমি খুশী হবে সেইটেই যে জানি না।'

অথবা পাল্টা প্রশ্ন করতে পারত যে, 'কেন বল দিকি, বয়স জেনে তবে ভালবাসবে ?' বলতে পারত যে, 'কোন্ বয়সটা তোমার পছন্দ বলে দাও—আমি সেই বয়সেরই।'

কিন্তু হেমের ঐ কাঠ-কাঠ প্রশ্নের ধরনে কিছুই বলা হল না। বলা হল না কনকের রসের অভাবে নয়—সে রসের উৎসে পৌছতে পারার অক্ষমতার জন্য। ভাল পার্‌সির হাতের আঘাত না খেলে খেজুরগাছ রস দেয় না—বাছুরে না ঢুঁ মারলে গোরুরও দুধ বেরোয় না। সুতরাং অসহিষ্ণু ধমকে কনকের কথা কণ্ঠেই রয়ে গেল। কোন মতে শুধু ঢোঁক গিলে বললে, 'সতেরো পূর্ণ হয়েছে।'

'তবে তোমার বাবা কমিয়ে বললেন কেন? তিনি কি মনে করলেন কনের বয়স কম জানলে আমি আহ্লাদে আটখানা হব?'

একথার জবাব নেই। কিন্তু হেম আরও খোঁচায়।

'কী, বাক্যি হরে গেল যে! আমি কি কচি খোকা—যে কম বয়স না হলে বিয়ে হত না? আমার ঢের বয়স হয়ে গেছে। আরও বুড়ো মেয়ে হলেও আমার চলত!'

কনক শুনেই যায়। এর উত্তর কি দেবে?

কিন্তু হেমই আবার খুঁচিয়ে তোলে কথাটা, 'কী, বাপের নিন্দে শুনেই রাগ হয়ে গেল বুঝি? যার মেয়ের এত আত্মসম্মান জ্ঞান তার অমন জলজ্যান্ত মিছে কথা বলাটা ঠিক হয় নি!'

অগত্যা মুখ খুলতে হয় কনককে। সে জড়িয়ে জড়িয়ে থতিয়ে থতিয়ে বলে, 'বাবা কেন কিসের জন্যে কি বলেছেন—কি কী করেছেন তা আমি কেমন করে জানব!'

'অ। জান না। তবু ভাল।'

তার পর হয়তো কিছুক্ষণ দু জনেই চুপ করে থাকে।

খানিক পরে আবার হয়তো হেম বলে, 'তা আমার কত বয়স তা তো তুমি জানতে চাইলে না।'

উত্তরটা ঠোঁটের ডগাতেই এসেছিল কনকের, 'জেনেই বা লাভ কি, বুড়ো বর জানলেও তো আর বিয়ে ফেরত নিতে পারব না। শুধু শুধু মন খারাপ করে লাভ নেই।' এও মনে হয়েছিল বলে যে, 'শিব যত বুড়োই হোন গৌরীর কাছে তিনি চিরযুবো।'

কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না। এর কাছে এসব কথা বলতে যেন ইচ্ছা করল না। তার ওপর সংকোচও একটা ছিল বৈকি। ছেলেবেলা থেকে মা কাকী জেঠী মাসীর দল কেবল ভয় দেখিয়েছেন—'দেখিস জিভ সামলে

থাকিস, শ্বশুরবাড়িতে যেন বেহায়া নাম কিনিস নি। বরের সঙ্গে কথা কইবিও বুঝে সমঝে, বর বাচাল ভাবলে মনে মনে ঘেন্না করবে।'

শুধু বললে, 'কী দরকার ?'

'জানতে ইচ্ছে করে না ?'

'না।'

এরই মধ্যে এক বার হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল হেম, 'রাণী বৌ—মানে আমাদের বড় বৌদিকে কেমন দেখলে বল তো ?'

তার পর উত্তরের অপেক্ষা না করেই, একটু যেন বেশী আগ্রহেই বলে ওঠে, 'কেমন কথাবার্তা বলেন শুনেছ ? লেখাপড়া-জানা মেয়েরা ওঁর কাছে দাঁড়াতে পারে না !'

হঠাৎ যেন কনকের মুখের ওপর এক ঘা চাবুক মারলে কে !

এতক্ষণের সমস্ত প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্নের যে তফাত আছে—এতক্ষণকার প্রশ্নের ধরনে যে নিস্পৃহতা ঔদাসীন্য এমন কি বিতৃষ্ণার ভাব ছিল—এই প্রশ্নে যে তার কিছুই নেই, বরং আগ্রহে আকুলতায় এই কিছুক্ষণ আগেকার কঠিন কণ্ঠস্বরও যেন কী এক জাদুমন্ত্রে মধুর হয়ে উঠেছে—সেটা তার মনের নজর এড়াল না। কতকগুলো আত্মরক্ষার বর্ম মেয়েরা নিয়ে জন্মায়, কর্ণের সহজাত কবচের মত—সেগুলো ওদের স্বাভাবিক বৃত্তিও বটে। বিশেষ করে যে মেয়ে পল্লীগ্রামে বহু পরিজনের সংসারে মানুষ হয়েছে তার এ বৃত্তিগুলো শাণিত হয়ে থাকে। কনকও সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করে নিল— ঐ সূর্য চোখের সামনে থেকে চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছে বলেই প্রদীপের আলো চোখে ধরছে না। দামী বিলিতী চন্দ্রমল্লিকার কাছে কুন্দ হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে।

সে শুষ্ক কণ্ঠে একটা 'বেশ' বলে পাশ ফিরে শুল—তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম স্মরণীয় প্রণয়-রজনীর বিশ্রম্ভালাপে যবনিকা টেনে দিয়ে।

হেমও আর কথা বাড়াল না। বোধ করি রাণী বৌদির কথা মনে হতেই তার মনও সেই মাধুর্য-রসে নিষিক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই রসেই ডুবে থাকতে চাইল সে।

কিন্তু তবু, একটু বিরক্তও হল। মনে হল বিধাতা বেছে বেছে তার অদৃষ্টেই এক বোদা মেয়ে রেখে দিয়েছিলেন। প্রাণহীন কাঠের পুতুল। সংসারে হয়তো কাজে লাগতে পারে, তার কাজে লাগবে না।

সে বুঝতে পারল না যে, যে মেয়েই আসুক, তার আশাভঙ্গ হতই। আসলে তার আশাটা যে কত দূর গড়ে উঠেছে—সেই সন্ধানটাই জানত না সে। চোখের সামনে রাণী বৌদি নিত্য নূতন রূপে উদ্ভাসিত, বিলাতী হীরের অসংখ্য পলে বিদ্যুতের আলো পড়লে যেমন চারিদিক থেকে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কতকটা তেমনি। আর তাইতে চোখ ধেঁধেই গেছে তার, অন্ন কোন আলো আর চোখে লাগবার কথা নয়।

সুতরাং মনের অগোচরেই যে আশা, যে ইচ্ছা গড়ে উঠেছিল, সেইখানে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল। আশাটার খবর জানত না, আঘাতটা জানল। মনটা বিরূপ হয়ে উঠল তার ফলে। সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়েও নিল নিজেকে। পরের দিন থেকে আর আলাপের চেষ্টাও করল না। তা ছাড়া তার এমন দরকারও নেই, বিয়ে তো করেছে সে মা আর বাবার পীড়াপীড়িতে—তারাই ঘর করুক বৌ নিয়ে। তাদের কাজে লাগলেই হল।

তার প্রয়োজন?

না। তার কোন প্রয়োজন নেই। মনের প্রয়োজন এ মেয়ে মেটাতে পারবে না। সে আর এক জন মেটাচ্ছে—প্রয়োজনের বেশী। পাত্র উপ্‌চে উঠেছে সে মাধুর্যের সুরায়। দৈহিক?—না, যত দূর নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়—সে তাগিদও খুব নেই। ও জিনিসটাতেই তেমন যেন প্রবল আসক্তি আর নেই। নলিনী একটা অভ্যাসের সৃষ্টি করেছিল। সেদিন তার কাছে গিয়ে সেই অভ্যাসটাই তাকে টেনেছিল—নইলে মেয়েদের সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই ঐটে আগে মনে হবে, সে রকম মানসিক গঠন ওর নয়। রাণী বৌদিকে দেখে তার মন ভরে আছে সত্য কথা—কিন্তু ঐ পর্যন্তই, দেহের দিক দিয়ে কখনই ভাবে না সে। তার দীপ্তিতে সে মুগ্ধ। তার বেশী কিছু নয়। শুধু দেখতে চায় তাকে। কাছে বসতে চায়। তার নিত্য নূতন রূপ দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে, নিত্য নব-নব বিস্ময়কর কথা শুনে মন ভরে যাবে। আর কিছু চায় না।

॥ ২ ॥

কনক এত কথা জানে না। জানা সম্ভবও নয় কোন সাধারণ মেয়ের পক্ষে। হেমের ঔদাসীন্যে সে যেন কাঠ হয়ে উঠল। একটা চাপা অভিমানও বোধ করল বটে—কিন্তু সে অভিমান ত্যাগ করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল

না, যদি কোন্ পথে কী ভাবে ত্যাগ করলে তাদের সম্পর্কটা সহজ হয়ে উঠবে বুঝতে পারত। কিন্তু এখন কী করা উচিত, তার দিক থেকে কী করবার আছে, তাও যে ভেবে পেল না।

এই ভাবতে ভাবতেই সপ্তাহ কেটে গেল। বাপের বাড়ি যাবার ছুটি মিলল মাত্র পনেরো দিন। শ্যামা বললে, 'আমি একা আর পেরে উঠি না—বড্ড নাটাঝামটা খেতে হয়। আরও আমার সেই জন্যে সাত-তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দেওয়া। বৌমাকে কিন্তু বেশী দিন ফেলে রাখতে পারব না বেই মশাই!'

পূর্ণবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন একেবারে, 'সে কি কথা, ও তো এখন আপনারই মেয়ে, আপনাদের সম্পত্তি। তা ছাড়া আমরাই বা রাখতে চাইব কেন? ঢের দিন তো পুষলুম, আবারও?'

সুতরাং পনেরো দিন পরেই ফিরে আসতে হল।

অবশ্য পনেরো দিন কম নয়—যদি সেটুকু সময়েরও সদ্ব্যবহার করতে পারত। পরামর্শ দেবার লোক কম ছিল না, নিজের ও জেঠতুতো খুড়তুতো মিলিয়ে বোনই ওরা অনেক, ওপরে নীচে কাছাকাছি বয়সেরই পাঁচ-ছ জন—তা ছাড়া পাড়ার সমবয়সী বন্ধুরা তো ছিলই। কিন্তু কনক কারুর কাছেই মন খুলতে পারল না—পরামর্শ চাওয়াও হল না। কোথায় একটা আত্মসম্মান-বোধে বাধল। কেমন করে যেন আপনা থেকেই অনুভব করলে যে এ বড় অপমানের কথা। আর সকলের জন্যেই তাদের বর পাগল, তবু তা তারা কেউই তার মত সুন্দর নয়—অথচ তার বরই তার সম্বন্ধে উদাসীন—একথা কি ওদের বলা যায়? বললে তারা আহা উহু করবে, সহানুভূতি জানাবে, কিন্তু সে তো করুণা। এই বয়সে সকলের, বিশেষত সমবয়সীদের কৃপার পাত্রী হয়ে লাভ নেই। সকলে যখন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল তাকে—তার দাম্পত্যপ্রণয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতার ইতিহাস শোনবার জন্য, তখন সে যতটা পারল পূর্বশ্রুত বহু কাহিনীর ভাণ্ডার থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে সাজিয়ে একটা কাল্পনিক চমৎকার প্রথম প্রণয়ের ইতিহাস খাড়া করল। শ্রোত্রীরা যে তখনকার মত একটু ঈর্ষিত হয়েই বিদায় নিল—সেইটেই বড় লাভ।

তার পর এখানে ফিরে আবার যথাপূর্বং।

বরং আগের চেয়েও খারাপ।

হেম যেন আরও সুদূর—আরও কঠিন হয়ে গেছে।

কথা যে একেবারে কয় না তা নয়। হুকুম ফরমাশ 'এটা দাও, ওটা তুলে রাখ, জামাটায় সাবান দিও'—সহজেই করে। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। আসেও সে প্রত্যহই বহু রাত করে। এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকে সে—সংকোচে কথাটা শাশুড়ীকেও জিজ্ঞাসা করতে পারে না—ভাববেন হয়তো যে এরই মধ্যে বৌ ছেলের ওপর খবরদারি করছে। হেমকে তো জিজ্ঞাসা করা সম্ভবই নয়। তবে অনুমান করতে পারে সে। খেতে বসে এক-এক দিন মা-ছেলে বা দাদা-বোনে যে টুকরো টুকরো কথা হয়—তা থেকে বোঝে যে সে অনুমান ওর মিথ্যাও নয়। প্রায় প্রত্যহই বড় মাসীমার বাড়ি যায় হেম। এ ছাড়া থিয়েটারেও যায় শনি-রবিবার করে। বিয়ের নেমন্তন্নেও যায় হামেশা, প্রায় প্রত্যেক বিয়ের দিনেই যায়। ওকে এত লোক কী সূত্রে নেমন্তন্ন করে তা ভেবে পায় না কনক। শুধু খেয়েই আসে না, মধ্যে মধ্যে ছাঁদাও নিয়ে আসে।

বহু কথাই বলতে ইচ্ছা করে তার স্বামীকে। বহু অনুযোগ, বহু প্রশ্ন। কিন্তু কাকে বলবে ভেবে পায় না। রাত দশটায় এসে খেয়েই শুয়ে পড়ে—ওঠে ভোর পাঁচটায়। ছটার মধ্যে স্নান করে খেয়ে বেরিয়ে যায়। এ মানুষ যদি নিজে থেকে কথা না বলে তো বলা কঠিন। তা ছাড়া সংকোচ করতে করতে বাধার একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে—নিজে থেকে যেচে মান ভাঙাতে যাওয়া—ভারি লজ্জা করে ওর। তা ছাড়া মান ভাঙাবেই বা কী করে? যে অপরাধ ও করে নি সেই অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে?

অবশ্য কথা কয় না—মানে গল্প করে না বলে যে সেবাও নেয় না—তা নয়। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ সেবা ছাড়া অসাধারণও কিছু নেয় বৈকি! এবার আসবার সময় মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, 'খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে বসবি, তিনি শুতে যাও বললে তবে যাবি। আর রোজ জামাইয়ের পা টিপে দিবি—পুরুষ মানুষ, খেটে খুটে ঘুরে ঘারে আসে—ওটুকু ওদের দরকার। দেখিস—যেন শ্বশুরবাড়িতে আমাদের মুখ নষ্ট করিস নি—কেউ না বলতে পারে যে মা মাগী কোন সহবৎ শেখায় নি মেয়েকে!'

মার প্রথম উপদেশ মানা কঠিন নয়। কারণ শাশুড়ীই ওর জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করেন। হেমের খাওয়া হলে সেই পাতে ওকে খেতে দিয়ে শাশুড়ী ননদও খেতে বসে যায়—খাওয়া একসঙ্গেই চোকে—ঐন্দ্রিলা রাত্রে মুড়ি খায় বেশির ভাগই, কোন দিন জুটলে এক-আধখানা রুটি—সে তো

আগেই উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ে—শাশুড়ী জেগে বসে থাকেন, কখন তার সকড়ি মুক্ত করা, বাসন মাজা শেষ হবে সেই জন্য। সে যখন ঘাটে যায়—শ্যামাও আলো হাতে করে গিয়ে দাঁড়ায়। সোমত্থ বউ, এত রাত্রে বাইরের ঘাটে যাওয়া ঠিক নয়। সে ফিরে এসে বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতে সদর বন্ধ করে শ্যামা চলে যায় বাইরের ঘরে, সুতরাং কনকেরও আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন থাকে না।

দ্বিতীয় উপদেশটা নিয়েই একটু বিপদে পড়েছিল সে। প্রথম দিন অযাচিত অনিমন্ত্রিত ভাবে স্বামীর পায়ে হাত দিতে বেধেছিল তার। সব চেয়ে ভয়, এটাকে না সে প্রণয়-ভিক্ষা বলে মনে করে। অবশ্য মনে করে যদি সদয় হয় তো বেঁচে যায় কনক—কিন্তু তবু পায়ে ধরে ভালবাসানো—ছিঃ! মনে হলেই কেমন হয়। আরও ভয় যদি পা সরিয়ে নেয়, যদি রূঢ় ভাবে সেবা প্রত্যাখ্যান করে? যদি পা দিয়ে হাত সরিয়ে দেয়?

কিন্তু কোন আশা বা কোন আশঙ্কাই তার ফলল না। হেম নির্বিবাদে চুপ করে শুয়ে রইল। বাধাও দিলে না নিষেধও করলে না—কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একটা মিষ্টি কথাও বললে না। সব চেয়ে বিপদ থামতেও বললে না—সে কি সারারাত্তির টিপে যাবে নাকি—এমনি? কী মনে করে হেম—তার রাজপ্রাপ্য? অবশেষে অনেকক্ষণ পরে—ক্লান্ত হয়ে আপনিই থামল কনক। তাতেও কোন সাড়া এল না ও তরফ থেকে। একটু পরে পাশে শুয়ে বুঝল সাড়া দেবার অবস্থাও নেই—হেম গাঢ় ঘুমে অচেতন। হয়তো অনেকক্ষণই এই ভাবে ঘুমোচ্ছে সে। ক্ষোভে অপমানে কনকের চোখে জল এসে যায়। কান্নাটা আরও লজ্জার বুঝেই কোনমতে আত্মসংবরণ করে।

কিন্তু তার চেয়েও লজ্জাকর আর একটি ঘটনা ঘটল দিনকতক পরে। যেটার জন্য এত আকিঞ্চন, এত সাধনা—সব মেয়েরই যা কাম্য—তা যখন এল তখন সেটা পাওয়ার লজ্জাতেই যেন মরে যেতে ইচ্ছা করল কনকের।

রোজই পা টেপে সে। নিরবে নিঃশব্দে সেবা করে যায়, আর অম্লানবদনে সে সেবা গ্রহণ করে হেম। থামতে বলে না কোন দিনই, প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ে সে সেবা নিতে নিতেই। কনক আজকাল সেয়ানা হয়ে গেছে, সে দশ-বারো মিনিট পা টিপেই শুয়ে পড়ে, ওঁর রাজনিদ্রার জন্য অপেক্ষা করে না।

এরই মধ্যে এক দিন—এই পা টেপার সময়ই হেম ওর একটা হাত ধরে আকর্ষণ করল নিজের দিকে।

পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই সত্য কথা—তবু নারীর সেই স্বাভাবিক অনুভূতি, সহজাত বৃত্তিই তাকে যেন সতর্ক করে দিলে। সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর—একটা অজ্ঞাত আশা ও আশঙ্কায়। তবু ঠিক কি ব্যাপারটা তা তখনও বুঝতে পারে নি বলে বাধা দিতেও পারলে না—একটু কঠিন হবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হেমের সবলতর আকর্ষণে একেবারে তার পাশে এসে পড়ল।

সে আকর্ষণের পূর্ণ অর্থ বুঝতে দেরি হল না অবশ্য।

সেদিন আর ঘরে শুয়ে থাকতে পারে নি কনক, হাতড়ে হাতড়ে অন্ধকারেই বেরিয়ে এসে বাইরের দাওয়ায় পড়েছিল। সারারাত ধরে কেঁদেছিল সে—প্রণয়হীন সম্ভাষণহীন চুম্বনহীন দাম্পত্য মিলনের এই অপমানে। এক বার পুকুরে গিয়ে গা ঢেলে দেবার কথাও যে মনে জাগে নি তা নয়—কিন্তু নিহাত প্রথম বয়স, বহু আশা আকাঙ্ক্ষা বহু স্বপ্ন তার মানস-ভবিষ্যতে, সেই আশা ও স্বপ্নই তাকে এই ভাবে সর্বনাশের দিকে যেতে বাধা দিল। ভোর বেলা শাশুড়ীর দোরখোলার শব্দে আবার ধীরে ধীরে সে ঘরেই ফিরে এল—সেই অভিশপ্ত শয্যার দিকে।

হেম তখন অগাধে ঘুমোচ্ছে।

কাজটা করে ফেলে হয়তো সে একটু অনুতপ্ত হয়েছিল কিন্তু একটা মনগড়া সান্ত্বনা ঠিক করে নিতেও বেশী বিলম্ব হয় নি তার। নিজের একটা অকারণ অহঙ্কার, মিথ্যা আত্মমূল্যবোধই তাকে সে সান্ত্বনা যোগাল। যেন রাণী বৌদির মত মেয়ে, প্রমীলার মত মেয়েই তার প্রাপ্য ছিল। কনকের মত জড় প্রাণহীন মেয়ে দিয়ে তাকে ঠকানো হয়েছে। সে মেয়েকে যা দিয়েছে এই ঢের—তাকে অনুগ্রহই করা হয়েছে।

আর একটা সূক্ষ্ম অহঙ্কার তার চূর্ণ হয়েছে। জৈবিক প্রয়োজন তার নেই বলে সে ভেবেছিল মনে মনে—সে ভাবনা মিথ্যা হয়ে গেছে। এখন একটা মিথ্যা অহঙ্কারকে আর একটা মিথ্যা অহঙ্কার দিয়ে ঢাকা ছাড়া উপায় কি?

॥ ৩ ॥

চুরি করে নেমন্তন্ন খাওয়াটা যেন হেমের এক নেশায় পেয়ে বসেছে। এটা ঠিক খাওয়ার লোভ নয়, হয়তো সেটা প্রথম প্রথম একটু ছিল কিন্তু এখন আর নেই, তা সে হলপ করে বলতে পারে। খাওয়ার সময় যেটা ছিল সে সময়ই খেতে পায় নি—ফলে খাওয়ার শক্তিটাও গেছে কমে। জলখাবার খাওয়া ওর কোন কালে অভ্যাস নেই, ছুটির দিনেও সেই একেবারে বেলা বারোটা-একটা নাগাদ ভাতে-জলে বসে। কমলার বাড়িতে যখন থাকত ছুটির দিন সকালে সেখানে হাজির থাকলে গোবিন্দ জোর করে কিছু খাওয়াত —এখানে সে বালাই নেই। শ্যামার মনেও পড়ে না সে কথা। এখন বৌ আসার পর ছেলের ভাতের সঙ্গে এক মুঠো চাল বেশী নেয়—সেই ভাতই একগাল করে কনক ও সীতা খায় সকালবেলা। সেই তাদের জলখাবার। ছুটির দিনে ওদের জন্যে দুটি মুড়ি ব্যবস্থা। তাও অনেক দিন ভুলে যায় শ্যামা। নিহাত সীতা কান্নাকাটি করে তাই ঐন্দ্রিলা বার করে দেয়, চক্ষুলজ্জার খাতিরে বৌদিকেও দিতে হয়। নইলে কনক কিছুতেই মুখ ফুটে চাইতে পারত না। হেম তার দু বেলা দু মুঠো ভাত—যে কোনও উপকরণ দিয়ে হোক—এই পেলেই খুশী। তাও উপকরণের দিকে ভাল করে চেয়েও দেখে না কোন দিন। প্রথম বয়সে লোভ সংবরণ করতে বাধ্য হয়েছিল বলেই —এখন পেটে ক্ষিদে এবং খাবারের দোকানে থরে থরে ... মিষ্টান্ন সাজানো থাকলেও, সে খাবার খাওয়ার কথা মনে পড়ে না ওর। এমন কি পকেটে পয়সা থাকলেও না।

না, লোভটা বড় কথা নয়। এর মধ্যে একটা অন্য আনন্দ আছে। ঠকাবার আনন্দ। নিজের চতুরতার সাফল্যের আনন্দ, কৃতিত্বের আনন্দ। ভয় আছে, এখনও মাঝে মাঝে খুবই ভয় করে—যখন কোন কোন কর্মবাড়িতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দু-এক জন লোকের সামনে পড়ে যায়, ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে দেখে তারা, ফিস-ফিসও করে তাকে নিয়ে—তখন বুকের মধ্যে দুর-দুর করে বৈকি! এক বার একটা জায়গায় অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে পালাতে হল শেষ পর্যন্ত। না খেয়েই বাড়ি ফিরতে হত—যদি না আর একটা বাড়িতে ঠিক সেই সময় বরযাত্রী নামবার সময় হত। সে বরকর্তা কেমন এক রকম অন্যমনস্ক ধরনের মানুষ—পাশ দিয়ে যাচ্ছিল,

হঠাৎ ওর কনুইটা ধরে ফেলে, 'ওকি বাবা, তুমি যাচ্ছ কোথায়? এসো এসো। এই ত্যাখ ছেলেমানুষ, পালাবার ফিকিরে ছিলে বুঝি?' বলে ঠেলে দিলেন ভেতর দিকে। সে বাড়িটাও ছোট, বসবার জায়গা কম, কন্যা-কর্তা সেইখানে থেকেই কতক বরযাত্রীকে একেবারে পাচার করলেন ছাদে। নির্বিঘ্নে খেয়ে নেমে এল।

অবশ্য এ বিপদে খুব কমই পড়তে হয়েছে তাকে। কারণ বড় বিয়েবাড়ি ছাড়া সে ঢোকে না, ছোট মাপের কাজে ধরা পড়বার ভয় বেশী। তবে খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টি লোক দু-এক জন থাকে সব জায়গাতেই, যাদের নজর এড়ানো শক্ত, যারা অতিথির মুখ দেখলেই রবাহূত বা অনাহূত বুঝতে পারে।

তবু বিপদ আছে বলেই উত্তেজনাও আছে। আর সেই উত্তেজনাটাই হল আসল নেশা। সেই নেশাতেই পেয়ে বসেছে তাকে।

আগে ছিল হেম সম্পূর্ণ একা, তাতে বেশী ভয় ভয় করত—এখন ওর এই কারবারে এক জন অংশীদার জুটে গেছে। সে হল দুর্গাপদ—মহার দেওর।

এক দিন, কী একটা ছুটির দিনে লগনসা পড়েছে। হেম সেজেগুজে এসে শ্যামবাজারের দিকের একটা রাস্তা ধরে চলতে চলতে বিয়েবাড়িগুলোর আয়তন এবং সমারোহ দেখে অভ্যাগতের একটা আনুমানিক সংখ্যা হিসাব করছে মনে মনে—এমন সময় প্রায় সামনাসামনি ধাক্কা লেগে গেল দুর্গাপদর সঙ্গে।

'আরে, তুমি এখানে কী করছ! এত সাজগোজ? বিয়ের নেমন্তন্ন নাকি?'

'হ্যাঁ। তা তুমিই বা এখানে কোথায়?'

'গিছলুম একটু এক বন্ধুর বাড়ি। অনেক দিন ধরেই বলছে আসতে—সময় আর হয় না। আজ মরীয়া হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। তা ত্যাখ না—ভাবলুম এত পয়সা খরচা করে এলুম, রাত্তিরের থ্যাটটা সেরে যাব—ব্যাস, আজই বাবু উধাও, তিনি আবার কোন্ তালে গেছেন কে জানে! অবিশ্যি আমি আসব বলে রাখি নি—খুব দোষ দেওয়াও যায় না। যাক্—তুমি যাও, আমিও চলি—'

তার পর ঈষৎ ঈর্ষাতুর দৃষ্টিতে আর একবার তার সাজ-পোশাকের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি তো দিব্যি চললে এখন কালিয়া পোলাও খেতে, আমি এখন দেখি যাই কী জোটে—যদি জল দেওয়া ভাত চাট্টি থাকে তো

রক্ষে, নইলে আবার চাপাতে বলতে হবে। এক কেলেঙ্কারি আর কি।... তা বলে তো সারা রাত পেটে কিল মেরে শুয়ে থাকা যায় না—কী বল? আমি আবার মরতে কেন যে আমার ভাত রাখতে বারণ করে এলুম তাও জানি না।'

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের দিকে এগোয়।

হেম ওর একটা হাত ধরে ফেলে, 'তা তুমিও চল না।'

'আমি? আমি কোথায় যাব?

'কালিয়া পোলাও খেতে?'

'হ্যাঁ, তোমার নেমন্তন্ন তুমি সেজেগুজে এসেছ—আমি সেখানে যাব কি?'

'কেন—তোমারও তো দিব্যি ধোপদস্ত কাপড় জামা দেখছি।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য আছে। আজই তো ভাঙবার দিন। তা ছাড়া কলকাতায় বন্ধুর বাড়ি আসছি—তোমাদের ওখানে যে বেশে যাওয়া চলে তা তো আর এখানে চলবে না।'

'তবে আর কি—চল চল। রাত হয়ে যাচ্ছে।' সে দুর্গাপদর হাত ধরে টানে সত্যিই।

'আরে—আরে—টানছ কোথায়। এমন ভাবে বিনা নেমন্তন্নে—'

'আমাকেই বা কে গলায় কাপড় দিয়ে হাত-জোড় করে নেমন্তন্ন করেছে!'

'তার মানে?' দুর্গাপদর দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, 'তবে তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'সেখানে ভাল ব্যবস্থা পাব সেখানেই।'

ওর বিস্ময় লক্ষ্য করে হেম হাসে। তার পর সংক্ষেপে ব্যাপারটা খুলে বলে। প্রথমদিনকার আকস্মিক ব্যাপারটা থেকে কী করে এটা পেশায় দাঁড়িয়ে গেল।

'তাই নাকি। ওঃ, চালাক বলে আমাদের খুব অহঙ্কার ছিল। যা হোক দেখালে বটে। খুব দুর্জয় সাহস তো তোমার!'

'নাও—যাবে তো চল! এখনও না কোথাও ঢুকে পড়তে পারলে ভিড় কমে যাবে, মওকা পাব না।'

'যাব? অনেকদিন ভাল মন্দ কিছু খাই নি বটে। সেই যা তোমার বিয়েতে—তা সে আবার আমার দাদার ম্যানেজমেন্ট তো, জুত হয় নি!'

উৎকৃষ্ট ভোজ্যের কল্পনাতেই তার দু চোখ লুব্ধ হয়ে ওঠে। দুর্গাপদ চিরদিনই খেতে ভালবাসে।

হেম আর কথা না বাড়িয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় তাকে।...

সেই সূত্রপাত। এখন দুর্গাপদ ওর এই অভিযানে নিত্যসঙ্গী। আগে থেকে পাঁজিপুঁথি দেখে ঠিক করে রাখে—কোন্ দিন কোন্ ট্রেনে আসবে, কারুর সে ট্রেন হঠাৎ ফেল হয়ে গেলে অপর জন কোথায় অপেক্ষা করবে, ইত্যাদি। দুর্গাপদ অবশ্য আর একটা ভাল ব্যবস্থা করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। হাওড়া স্টেশনের চায়ের স্টলে একটি ছেলে কাজ করে—তার দাদা দুর্গাপদর অফিসের বেয়ারা। সেই হিসেবেই জানাশুনো। অফিসের দিনেও ভারী লগন্সা পেলে ছাড়ে না ওরা, সকালবেলাই ধোয়া জামাকাপড় এনে তার কাছে জিম্মা করে দিয়ে যায়, অফিসের ফেরত স্টেশনে এসে ওয়েটিংরুমে মুখহাত ধুয়ে কাপড় পাল্টে 'নিমন্ত্রণ রক্ষা' করতে বেরোয়। রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে আবার সেই ছোকরার কাছ থেকেই ময়লা কাপড় জামা নিয়ে নেয়।

এক দিন এই বিয়েবাড়ির সন্ধানেই গিয়ে পড়েছিল ও অঞ্চলে। সকাল সকাল লগ্ন সেদিন—ওদেরও সেটা শনিবার, কোন অসুবিধাই হয় নি—তাড়াতাড়ি খাওয়া চুকে গিয়েছিল বরং, সেইটেই সুবিধা। অনেকটা সময় হাতে আছে বলে আস্তে আস্তে গল্প করতে করতে ফিরছিল। অন্যমনস্ক হয়েই হাঁটছিল, তবু এক সময় কেমন যেন মনে হল জায়গাটা ওর খুব অচেনা নয়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল—সামনেই শরতের ছাপাখানা।

দুর্গাপদকে একটু দাঁড়াতে বলে হেম এগিয়ে গেল ওদিকে। ঘরে আলো জ্বলছে যখন—প্রেস খোলা আছে নিশ্চয়। আর মালিকও তা হলে আছেন। অনেক দিন শরতের সঙ্গে দেখা হয় নি। বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল তখনও দেখা পায় নি—জমাদারের কাছে লিখে রেখে গিয়েছিল। শরৎ যেতে পারে নি। আইবুড়ো ভাতের কাপড় ও মিষ্টি বলে চারটে টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়েছিল। সেই কুপনেই লিখে দিয়েছিল, 'শরীর খুব খারাপ যাইতেছে, আবার হাঁপানির মত হইয়াছে—যাইতে পারিলাম না সেজন্য খুব দুঃখিত, আর এক দিন গিয়া বধূমাতাকে দেখিয়া আসিব' ইত্যাদি।

শরীর খারাপ জেনেও এত কালের মধ্যে খবর নেওয়ার কথা মনে পড়ে নি, সেজন্য বড়ই লজ্জিত বোধ করতে লাগল হেম। অনেক আগেই এক দিন আসা উচিত ছিল।

কিন্তু ভেতরে উঁকি মেরে দেখলে শরৎ নেই।

সে জায়গায়—ওরই চেয়ারে বসে আছে আর এক জন লোক। শরতের কর্মচারীদের চেনে হেম, তারা কেউ নয়। কর্মচারী শ্রেণীর বলে মনেও হল না।

একটু ইতস্ততঃ করে হেম ওপরে উঠে গেল, 'শরৎবাবু নেই?'

যে বসে ছিল, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী একটি লোক, সে একটু অবাক হয়েই তাকাল ওর দিকে, 'তিনি তো আর বসেন না এখানে—বহু দিন হল বসছেন না।'

'বসছেন না? আর এখানে আসেনই না?'

'না। তিনি প্রেস ছেড়ে দিয়েছেন।'

'ছেড়ে দিয়েছেন? মানে বেচে দিয়েছেন?'

'না বেচে ঠিক দেন নি। লীজ দিয়েছেন, আমিই লীজ নিয়েছি। মাসিক ভাড়া বন্দোবস্ত। মালপত্র টাইপ মেশিন সব তাঁর অবশ্য, তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে কিছু হস্তান্তর করতে পারব না। আমার শুধু নেড়ে চেড়ে চালানো। তাঁর তো আর নিজে দেখা সম্ভব নয়!'

'কেন—তাঁর কি খুব অসুখ?'

'দেখুন', ছেলেটি বিজ্ঞভাবে বলে, 'খুব যে একটা অসুখ তা বলতে পারি না। হাঁপানির মত হয়েছে, হজমের গোলমাল—আছে এটা ওটা—তবে আসলে মনটাই গেছে ভেঙে আর কি। এসব আর পেরে ওঠেন না। যোঝবার শক্তিটা চলে গেছে!'

তার পরই কী মনে করে যেন সচেতন হয়ে উঠল নতুন মালিক।

'কাজ কর্ম কিছু আছে নাকি? থাকলে স্বচ্ছন্দে দিয়ে যেতে পারেন।… সেই সবই—কম্পোজিটার জমাদার সব ঠিকই আছে, আমি কাউকে ছাড়াই নি। শরৎবাবু নেই বলে কাজের কোয়ালিটি কিছু খারাপ হবে না!'

'না, আমি কাজ দিতে আসি নি—আমি তাঁর আত্মীয়।'

'আত্মীয়—অথচ কোন খবর রাখেন না।' লোকটির কণ্ঠে ঈষৎ বিদ্রূপের সুর। বোধ হয় আশাভঙ্গ-জনিত ক্ষোভের ফল সেটা।

'না দূরে থাকি কি না। তা সেই বাসাতেই আছেন কি না জানেন?'

'না না, থাকেন এই কাছেই। নতুনবাজারের পাশে একটা মেসেতে। খুব কষ্টেই আছেন ভদ্রলোক। যান না, দেখেই যান এক বার। আমি ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।'

সে একটা চিরকুটে বাড়ির নম্বর ও গলির নাম লিখে দেয়।

শরৎ আবার রাস্তায় ফিরে এসে দুর্গাপদকে বলে, 'তুমি যাও ভাই দুর্গা, আমার একটু ফিরতে দেরি হবে।'

'কেন বল দেখি—কী ব্যাপার এখানে?'

'এ আমার মেসোমশাইয়ের প্রেস। খবর নিতে গিয়েছিলুম, শুনলুম খুব অসুখ। মনে করছি এক বার দেখেই যাই—। আবার অন্য এক দিন এত দূর উজোন ঠেলে আসা—।'

দুর্গাপদকে বিদায় দিয়ে খুঁজে খুঁজে অতিকষ্টে মেস-বাড়িটা বার করলে হেম। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের গলি থেকে একটা কানাগলি বেরিয়েছে, তার মধ্যে একটা অতি পুরাতন জরাজীর্ণ বাড়ি। সদরের কাছ থেকেই ভিজে-ভিজে ভ্যাপ্‌সা গন্ধ পাওয়া যায়। কেরানীর মেস নয়, নতুন বাজারের যত দোকানদারদের কর্মচারীর মেস। দোকানদাররা অনেকে বাসায় বা বাজারের ওপর ঘর ভাড়া করে থাকে। কর্মচারীদের আরও সস্তায় থাকা দরকার। আঠারো, কুড়ি, বাইশ, এই সব মাইনে বেচারীদের। বাড়িটাও সেই মাপেরই। তবু খরচ কমাবার জন্য একটা ঘরে ছটা পর্যন্ত বিছানা ফেলতে হয়েছে। ওপর তলায় সম্ভবত চৌকির বালাই নেই, নীচের ঘরে তবু একটা করে আমকাঠের চৌকি ফেলা আছে।

সদরের পাশে গলির দিকে যে ঘর—সেই ঘরেই শরৎ থাকে, একতলাতে। স্যাঁত্‌স্যাঁত করছে ভিজে ঘর—সেইখানেই চৌকির ওপর বসে হাঁপাচ্ছে সে। অন্ধকারেই বসেছিল, এখানে এত আলোর সুবিধে নেই—'গেস্ট্ এসেছে' ঠাকুর হেঁকে বলায় চাকর এসে একটা হ্যারিকেন বসিয়ে দিয়ে গেল মেঝের ওপর। তাতে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বেশী, দেখতে দেখতে কেরোসিনের গন্ধে ঘরটা ভরে উঠল।

হোক্ ক্ষীণ আলো—তবু কঙ্কালসার দেহটা দেখতে কষ্ট হয় না। সেই রূপের এই পরিণতি! হেমের চোখে জল এসে যায় যেন।

'এসো এসো বাবা, বসো। এখানে এলে কী করে? ঠিকানা—? ও,

প্রেসে গিছলে বুঝি? তার পর, খবর সব ভাল তো? বিয়ে চুকে গেল নির্বিঘ্নে—? বৌমা কেমন হলেন? তোমার মার সঙ্গে বনছে তো?'

কষ্ট করে করে হলেও অনেকগুলো কথাই বলে শরৎ। একা একা মুখ বুজে থাকা সারা দিনরাত। দোকানীর মেস, সবাই ভোরে উঠে চলে যায়—মাঝে এক বার খেতে আসে—তা তখনও কথা কইবার মত যথেষ্ট ফুরসত থাকে না তাদের—রাত্রে ফেরে এগারোটা বারোটায়, ক্লান্তিতে মড়ার মতই এলিয়ে পড়ে। অনেক দিন পরে পরিচিত লোকের সঙ্গে কথা কইতে পেয়ে যেন বেঁচে যায় সে।

হেম কতকটা স্তম্ভিত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল, সে এবার বললে, 'কিন্তু এ কী হাল হয়েছে আপনার? আপনি ডাক্তার-টাক্তারও দেখান না বুঝি?'

'ডাক্তার আর কি করবে? বয়স হলে এসব অমন হয়। আর ডাক্তার দেখিয়ে বেঁচেই বা লাভ কি বেশী দিন, তাড়াতাড়ি সরে পড়তেই তো চাই!'

'তাই বলে এই ঘরে—এমনি ভাবে। একে আপনার হাঁপানির মত হয়েছে, তার ওপর এই ভিজে ঘরে বাস করছেন? সে বাসা ছাড়লেন কেন? মেসে আসবার কী দরকার পড়ল?'

'না বাবা, সে যেন টিকতে পারলুম না কিছুতেই। একা একা—! তা ছাড়া এক জায়গায় থাকা এক জায়গায় খাওয়া—এ আর পোষাল না।'

'তা এই মেস ছাড়া কি আর মেসও জোটে নি আপনার? কলকাতায় কী আর এর চেয়ে ভাল মেস ছিল না?'

একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসল শরৎ।

'তা ঢের ছিল বৈকি। তবে কি জান—আমার যেন আর কিছুতেই কোন হাঙ্গাম করতে ইচ্ছে করে না। আমারই এক কম্পোজিটার এই মেসে থাকত—সে সন্ধান দিলে, চলে এলুম। কে আবার ঘোরে, খোঁজ করে—অত মেহনত পোষায় না। তা ছাড়া এর কতকগুলো সুবিধেও আছে—ছাপাখানাটা কাছে, ওদের কোন দরকার হলেই ছুটে আসে, জেনে যায়। গঙ্গাটাও বেশী দূর নয়—টানটা একটু কমলেই মনে করছি রোজ গঙ্গাস্নান করব—তোমার মাসীর মত। আর কী জান, সস্তাও খুব—সাত টাকায় খাওয়া থাকা!'

'কিন্তু এত সস্তার আপনার দরকারই বা কি? এত কি টাকার অভাব

আপনার পড়ল যে দশ-বারো টাকার একটা মেসেও থাকতে পারেন না। কত দেয় আপনাকে ওরা প্রেসের ভাড়া?'

'ও, তাও জেনে এসেছ! আচ্ছা বটে অনাদি ছোকরা, সকলের সঙ্গে হাটিপাটি পেড়ে ঘরের কথা বলা চাই। তা ভাড়া মন্দ দেয় না। চল্লিশ টাকাই দেয় মাসে। তেমনি খরচও তো দেদার—কাপড় আছে জামা আছে—ডাক্তার বদ্যি আছে—কী নেই বল? তবু দশ-বারো টাকা কি আর খরচ করতে পারি না—তা পারি। অন্য একটা মতলব আছে। কখনও তো টাকা জমাতে পারলুম না, রোজগার কম করি নি—কিন্তু থাকল না একটা পয়সাও। কত কর্তব্যেই তো ত্রুটি রয়ে গেল—মধ্যে মধ্যে বড্ড গ্লানি বোধ হয় বাবা মনটার মধ্যে। তাই বাসার পাট উঠিয়ে মালপত্তরগুলো বেচে যখন থোক্ টাকা খানিকটা হাতে পাওয়া গেল, তখনই এই মতলবটা মাথায় এল। মরবার আগে যদি আর কিছু জমাতে পারি, দুটো টাকা মিলিয়ে—। যাক্ সে কথা, তোমার আর শুনে কাজ নেই।...ও হরি তুমি এখনই উঠে দাঁড়ালে যে—বসো বসো। কিছু একটু আনাই খেয়ে যাও।'

'না না—এক জায়গায় নেমন্তন্ন ছিল আপনার ওই ছাপাখানার পাড়াতেই—এক পেট খেয়ে আসছি। ওসব দরকার নেই। আর এক দিন তখন—। আজকের মত উঠি।'

'উঠবে? তা ওঠ।' একটু যেন ক্ষুণ্ণ কণ্ঠেই বলে শরৎ, 'তোমার তো আবার সেই হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরা। রাতও হয়ে যাচ্ছে বটে। আচ্ছা এসো তা হলে। মোদ্দা মধ্যে মধ্যে—যদি এদিকে কাজকর্ম কিছু থাকে একটু খবর নিয়ে যেয়ো বাবা।'

তার পর আরও খানিকটা ইতস্তত করে—প্রথম থেকে যে প্রশ্নটা ঠোঁটের কাছে ঠেলাঠেলি করছিল, হেম ঘরের বাইরে পা দিতেই যেন হঠাৎ সেটা করে ফেলে, 'তোমার—তোমার ছোট মাসী ভাল আছেন? গিয়েছিলেন নাকি তোমার বিয়েতে?'

'না, উনি তো কোথাও যান না। তবে ভালই আছেন—যত দূর জানি। ক দিন আগেও বড়দার সঙ্গে নাকি দেখা হয়েছিল।'

'বড়দা—? মানে গোবিন্দ?...ভাল থাকলেই ভাল। আচ্ছা এসো।'

॥ ৪ ॥

হেম কিন্তু তখনই বাড়ির দিকে গেল না বরং উল্‌টো দিকেই হাঁটতে শুরু করল। এখনই উমার বাড়িতে যাবে সে। আজই এর একটা বিহিত করে ফিরবে—তা সে যত রাতই হোক।

উমা তখন সবে পড়িয়ে ফিরে কাপড় কেচে পূজোয় বসতে যাচ্ছে। হেমের গলার আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে দোর খুলে দিলে।

'কী রে, এত রাত্রে হঠাৎ? খবর সব ভাল তো?' উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করে উমা।

'আমাদের খবর সব ভাল। আজ এদিকে এসে পড়েছিলুম—খবর নিতে মেসোমশাইয়ের ছাপাখানায় গিয়েছিলুম—তাই।'

বুকের মধ্যেটা কেমন যেন ঢিব্ করে ওঠে উমার। সে কোন প্রশ্নও করতে পারে না। অসহায়ভাবে হেমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু। হঠাৎ যেন পায়ের জোরটাও কমে যায় অনেকখানি। একটু কাঁপুনির ভাব টের পায় নীচের দিকটায়। তাড়াতাড়ি কপাটটা ধরে ফেলে সে।

'না - না। সে রকম কিছু নয়। বলছি, ব্যস্ত হয়ো না।' উমার অবস্থাটা হ্যারিকেনের আলোতেও লক্ষ্য করে হেম।

উমা আশ্বস্ত হয়ে ভেতরে এসে ওকে পথ ছেড়ে দেয়। মাদুরটা বিছিয়ে বসতেও দেয়।

একটু হাসিও পায় নিজের অবস্থা লক্ষ্য করে। স্বামী বলে যাকে একবার কোন অধিকারই নেই—এক বিয়ের রাতের কটা মন্ত্র ছাড়া—তার জন্যই তার এ কী উৎকণ্ঠা! এ কী শুধু নিজের এই এয়োস্ত্রী অবস্থার সুবিধার জন্যই? মাছ খাওয়া তো সে ছেড়েই দিয়েছে বহুকাল। শুধু এই লালপাড় শাড়ি, এই লোহাগাছটা আর শাঁখা দু গাছা! ব্রত-পার্বণে ছাত্রীদের বাড়ি থেকে কিছু পাওনা হয়—এই তো!

হেম মাদুরে বসে বলে, 'মেসোমশাই প্রেস লীজ দিয়ে দিয়েছে—মানে ভাড়া আর কি। প্রেসে আসেও না বসেও না, দেখাশুনোও করে না। শরীরে আর কিচ্ছু নেই—দেখলে চিনতে পারবে না তুমি—কঙ্কালসার হয়ে গেছে একেবারে—বাহারে চোখদুটো তেমনি না থাকলে চিনতে পারতুম না সত্যিই। হাঁপানির মত হয়েছে নাকি—বসে বসে হাঁপাচ্ছে। তার ওপর

সে বাসা-টাসা সব উঠিয়ে দিয়ে—বললে বিশ্বাস করবে না—নতুন বাজারের পেছনে এক এঁদো গলির ভাঙা পুরনো ড্যাম্প বাড়ির এক মেসে একতলার ঘরে আছে। এ আত্মহত্যা ছাড়া আর কি? কলকাতায় যে অমন বাড়ি আছে তা না দেখলে বিশ্বাস হত না আমার!'

'কেন? আর মেস পায় নি? বাড়িই বা ছাড়লে কেন? না কি পয়সা নেই?'

কণ্ঠস্বরটা যেন অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ শোনায়। উমা নিজেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ে নিজের গলার আওয়াজে। আসলে কঠিন করবার প্রাণপণ চেষ্টাটাকেই অন্তরের ব্যাকুলতা যে বিদ্রূপ করে গেল—এ তীক্ষ্ণতা যে ব্যগ্রতারই নামান্তর তা কি হেমের বুঝতে বাকী থাকবে!

হেম অবশ্য কী বোঝে তা সে-ই জানে। সে একটু বোধ হয় ভয় পেয়েই যায়। সামান্য একটু হাসবার মত ভঙ্গী করে বলে, 'সে বাড়িতে একা একা নাকি থাকতে পারছিল না তাই মালপত্র সব বেচে কিনে সে বাড়ি একেবারে ছেড়ে দিয়ে ঐ মেসে এসে উঠেছে। ছাপাখানার দরুন ভাড়াই পায় মাসে চল্লিশ টাকা তবু বেছে বেছে ঐ সাত টাকার মেসে এসে না উঠলে চলছিল না।...আসলে ওঁর কথার ভাবে যা বুঝলুম—এখন টাকা জমিয়ে যাচ্ছে—বোধ হয় তোমাকে দিয়ে যাবে বলে!'

শেষের কথাগুলো একটু ভয়ে ভয়েই বলে হেম।

আর ভয়ের কারণও যে ছিল—তা বোঝা গেল বলা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই।

উমার সে তপ্তকাঞ্চন বর্ণের কিছুই আর নেই সত্য কথা—রোদে পুড়ে জলে ভিজে বাইরে ঘুরে ঘুরে মুখটা তামাটে হয়ে গেছে একেবারে—তবু অপমানের এবং উষ্মার গাঢ় লাল রংটা হেমের চোখে পড়ে। আগুনের মতই জ্বলে ওঠে উমা। বলে, 'হ্যাঁ অনেক তো দিয়েছে—ঐ উপকারটাই বাকী আছে শুধু। মরবার সময় টাকা দিয়ে স্বামীর কর্তব্য করে যাবে—না! আস্পর্দ্ধা!'

হেম চুপ করে বসে থাকে। সে যা বলতে এসেছিল—এ যেন উল্‌টোটা হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরে উমাই শান্ত হয়ে আসে। হেমের কথাগুলো—আগের কথাগুলো যেন মনে মনে এক বার উচ্চারণ করে। 'কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে।' 'দেখলে চেনা যায় না।' 'একা সেই ভিজে ঘরে বসে বসে হাঁপাচ্ছে।' 'এ আত্মহত্যা ছাড়া আর কি!'

ওর মনে পড়ে যায় সেদিনের কথাগুলো। শরতের সেই বিবর্ণমুখে বেরিয়ে যাওয়া। সেই অসহায় দীন ভঙ্গীটা। সে চলে যাবার পর অনুতাপের শেষ ছিল না উমার। কে জানে সেদিনের সেই আঘাতের ফলেই লোকটা এমন ভাবে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে কি না।

হঠাৎ যেন ছটফট করে ওঠে সে ভেতরে ভেতরে। কিন্তু প্রাণপণে সে আকুলতা দমন করে মুখে শুধু বলে, 'তা এ কথা এত রাতে আমাকে বলতে এলি কেন?'

হেম তবুও চুপ করে থাকে। কেন এসেছে সেটা যেন বলতে আর ভরসা পায় না। তার উত্তরে আবার জ্বলে উঠবে কিনা কে জানে!

'এখানে--মানে আমার কাছে এনে রাখতে চাস?' যত দূর সম্ভব শান্ত কণ্ঠে সহজভাবে প্রশ্ন করে উমা। হঠাৎ এ আশ্চর্য শক্তি কোথা থেকে পেল ও আত্মদমন করবার, নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যায়।

'নইলে মেসোমশাই আর বাঁচবে না।'

এতক্ষণে কথাটা বলে ফেলে যেন বাঁচল হেম।

এবার উমার চুপ করে থাকার পালা।

কত কী মনে হচ্ছে তার। কত বিস্মৃত স্মৃতি ভিড় করে আসছে চিন্তার দরজায়। কত ভুলে যাওয়া আবেগ উদ্বেল হয়ে উঠছে। যে সব চিত্তবৃত্তি মরে গেছে ভেবেছিল—সেইগুলোই জেগে উঠছে আবার—একসঙ্গে।

মনের ঝড় কান পেতে কি বাইরে থেকে শোনা যায়?

কার বুকে উঠেছে ও ঝড়? কার মনে বেধেছে লড়াই?

উমা যেন বহু দূর থেকে নিরাসক্ত ভাবে চেয়ে থাকবার চেষ্টা করে। যেন অনেকখানি ব্যবধান থেকে শোনার চেষ্টা করে সে ভয়ঙ্কর কোলাহল।

তার পর—তেমনি যেন অনেক দূর থেকেই ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করে সে, 'সে কি আসবে মনে করিস?'

'তুমি—তুমি বললেই আসবে। তুমি এক বার যেতে পার না?'

'আমি যাব—সেই মেসে? লোকে বলবে কি?'

'তুমি বাইরে গাড়িতে বসে থেকো। সে গলিতে তো গাড়ি যাবে না। দূরেই থাকতে হবে। তুমি চল লক্ষ্মীটি!'

'আমার এত করার গরজ?'

আবারও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে উমা। কিন্তু এবার হেমও বুঝতে পারে—এ প্রশ্ন হেমকে নয় তার—নিজেকে।

সুতরাং সে চুপ করেই থাকে। উমাই এক বার অসহায় ভাবে চারিদিকে চায়। এই ঘরে মারই আসবাব বোঝাই। সে দিকে চেয়ে মাকে মনে করবার চেষ্টা করে সে। বোধ হয় মার এই স্মৃতির মধ্যে থেকে তাঁর একটা নির্দেশ পাবারও আশা করে।

সেদিকে চেয়েই মনে হয়—কে যেন মনের মধ্যে বলছে, 'তুমি বড় ছোট হয়ে যাচ্ছ উমা। এখনও এই অভিমানের ঊর্ধ্বে উঠতে পার নি?'

সত্যি—অভিমান কি কখনও মরে না?

তার পর কতকটা ছেলেমানুষের মতই বলে—'এই তো ঘর। বাড়িওলাই কি রাজী হবে? আর সে যে বড় লজ্জার কথা—এখন এ কথা বলতে যাওয়া?'

'আমি—আমি এক বার বলে দেখব?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে হেম।

'না না—সে আরও লজ্জার কথা। তুই একটা কাজ করতে পারবি বাবা? কাল তো রবিবার, সকাল করে খেয়ে দেয়ে চলে আসবি এক বার?'

'নিশ্চয় আসব। আমি আটটার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারি।'

'না না—খেয়ে দেয়ে দশটা-এগারোটায় আসিস, তা হলেই হবে।'

হেম খুশী হয়ে চলে যায়।

উমা আর এক বার অসহায় ভাবে তাকায় ঘরটার দিকে। যেন মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যেকার বাতাস কমে গেছে একেবারেই। শ্বাস নেওয়া যাবে না একটু পরে। যেন অদৃশ্য এক শক্তি তার গলা টিপে ধরছে।

সে ছুটে গিয়ে ঘরের বাইরে ভেতরের খোলা উঠোনটায় দাঁড়াল।

পরের দিন হেম যখন এল—তখনও উমার চোখ লাল, হয়তো রাত্রি-জাগরণের ফলেই। সম্ভবত সারারাতই ঘুমোতে পারে নি বেচারী। তার দিকে তাকিয়ে হেমের কষ্টই হতে লাগল। কেনই বা এর মধ্যে জড়াতে গেল ওকে। সত্যিই যার কাছ থেকে এতটুকু কিছু পেলে না—তার প্রতিই বা কর্তব্যপালনের কী এত গরজ!

উমা কিন্তু কথা কইল খুব সহজ ভাবেই।

'বাড়িওলাদের বলে মত করিয়েছি। বুড়োমানুষ থাকবেন, বাইরের পাইখানা আর কলতলা ব্যবহার করবেন—ওঁদের আপত্তি হবে না। শুধু

তাই নয় ওঁরা এই সিন্দুক আর দেরাজটাও আপাতত ওঁদের ঘরে রাখতে রাজী হয়েছেন। যদি ওঁরা পাশের ছোট ঘরটা খালি করে সারিয়ে দিতে পারেন তো চার-পাঁচ টাকা ভাড়া বেশী দেব তাও বলেছি।···সে থাক গে, তোকে একটা কাজ করতে হবে—কোথায় তক্তপোশ পাওয়া যায় আমি তো জানি না —খোঁজ করে একটা কিনে আনতে হবে।··টাকা নিয়ে যা—এক জনের মত ছোট তক্তপোশ, নইলে ধরবে না। আর ছাখ একটা পাশ বালিশ চাই। ভাল বড় তৈরী পাশবালিশ ওয়ার সুদ্ধ কিনে আনিস। যে মুটেতে তক্তপোশ আনবে তাদের দিয়েই এই দেরাজ সিন্দুক ওপরে ওদের ঘরে বই করতে হবে।'

হেম এতটা আশা করে নি। সে মহা উৎসাহে টাকা নিয়ে বাজারে চলে গেল।

মুটে দিয়ে মাল সরিয়ে চৌকি পেতে যখন ঘর ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে স্নান করে এল উমা—তখন বেলা তিনটে।

এতক্ষণে খেয়াল হল হেমের।

'তুমি কিছু খেলে না তো মাসী?'

'সকালে পুজো সেরে একটু জল খেয়ে নিয়েছিলুম। আর কিছু লাগবে না। চল, বেরিয়ে পড়ি। সন্ধ্যের সময় একেবারে রাঁধব।'

'দাঁড়াও। তোমার না হোক আমার খিদে পেয়ে গেছে ছুটোছুটি করে। আগে একটু খাবার আনি।'

হেম ছুটে গিয়ে খানকতক কচুরি আর দুটো কি মিষ্টি নিয়ে আসে।

উমা ম্লান হাসে। এ ক্ষিদে যে ছেলের কিসের তা বুঝতে তিলমাত্র বিলম্ব হয় না তার। সে প্রতিবাদও করে না, অনাবশ্যক বুঝেই। মিছিমিছি কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই—সেই ধরপাকড়, পীড়াপীড়ি। কোন তর্ক-বিতর্কেই তার রুচি নেই আর। যা করতেই হবে বুঝছে তার জন্য দেরি করতেও ইচ্ছে করে না। আসলে সে ক্লান্ত। করছে, সবই করছে ও—কিন্তু ভেতরে ভেতরে এ যে কী প্রচণ্ড অবসাদ আর সীমাহীন ক্লান্তি—তা শুধু সেই বুঝছে।

হেম ছুটেই ফিরল খাবার নিয়ে—নিজেই পাতা খুলে দু ভাগ করে সাজাল। এক ভাগ এগিয়ে দিল মাসীর দিকে। হয়তো প্রচণ্ডঃএকটা প্রতিবাদ আসবে ভেবেছিল কিন্তু কিছুই করল না উমা। শুধু বলল, 'দাঁড়া, জল গড়াই একটু।'

তার পর নিঃশব্দেই খেতে শুরু করল।

ছোট মাসীর বড়ই খিদে পেয়েছিল—মনে মনে ভাবে হেম।

শরতের দিক থেকেও যতটা প্রবল আপত্তি উঠবে—যতটা বেগ পেতে র রাজী করাতে—বলে আশঙ্কা করেছিল হেম, ততটা কিছুই হল না। শুধু খন সে গিয়ে বললে, 'ছোট মাসী বাইরে গাড়িতে বসে আছে, আপনাকে কিছে', তখন প্রথমটা শরতের একটু দেরি হয়েছিল কথাটা বুঝতে। মুহূর্ত-য়েক তাকিয়ে ছিল হাঁ করে হেমের মুখের দিকে। তার পরই বিষম ব্যস্ত য়ে উঠেছিল, 'কে, কে ডাকছে বললে—তোমার ছোট মাসী? কেন বল তো? কান বিপদ-আপদ নাকি?·· চল চল আমি যাচ্ছি!'

ব্যস্ত হয়েই উঠে দাঁড়িয়েছিল। রোগা মানুষ, দুর্বল শরীর—পাছে আবার টে যাবার চেষ্টা করে বলে হেমই তাড়াতাড়ি ওর হাতটা ধরে ফেলে, 'না া, তেমন কিছু নয়, ব্যস্ত হবেন না আপনি আস্তে আস্তে চলুন।'

সে-ই হাত ধরে নিয়ে চলল গাড়ি পর্যন্ত।

'কী ব্যাপার—তুমি এমন হঠাৎ।'

গাড়ির সামনে গিয়ে প্রশ্ন করে শরৎ।

সত্যিই তার দিকে চেয়ে প্রথমটা যেন চিনতে পারে না উমা। এই কি সেই মানুষ! তার চোখে যেন অকারণেই জল এসে যায়। সে তাড়াতাড়ি মুখটা নীচু করে বলে, 'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। উঠে এসো।'

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। শরতের আবারও খানিকটা সময় লাগে বুঝতে।

'নিয়ে যেতে মানে—? তোমার কাছে? বাস করব?'

'আমার কাছে না হলে আর নিয়ে যাবার কথা তুলব কেন?'

'ও, হেম সেদিন দেখে গিয়ে বলেছে বুঝি? তা এই ঘাটের মড়াকে আবার সেধে কেন ঘাড়ে চাপাচ্ছ মিছিমিছি?'

'ঘাটের মড়া বলেই তো ঘাড়ে চাপাচ্ছি। এই সময়ই তো আমার দরকার।'

আরও একটা কথা মুখে এসেছিল। মনে হয়েছিল বলে, স্ত্রীর প্রয়োজন দুর্দিনে—রক্ষিতা সুখের দিনের সঙ্গিনী। কিন্তু দুর্বার বলে মনকে শাসন করে ও। কটু কথা আর বলবে না। তা ছাড়া সে স্ত্রীলোকটা মৃত। সেও ভালবাসত নিশ্চয়। থাক।

শরৎ একটু হাসে। বলে, 'তা বটে। মলেও—খবর পেলে তোমাকেই যা কিছু শ্রাদ্ধ-শান্তি করতে হবে। এমনিই শাস্তরের আইন। তা আজই যাব? এখনই? জিনিসপত্রগুলোর কিছু করা হল না যে—!'

'তুমি উঠে এসে বসো, তোমার পা কাঁপছে। জিনিস—হেমকে বলে দাও, মোটামুটি যা আছে নিয়ে আসুক। বাকী যা আর একটা রবিবার এসে হেমই নিয়ে যাবে। টাকাকড়ি যদি ওদের পাওনা থাকে তো তাও চুকিয়ে দাও।'

'না টাকা আগাম দেওয়া আছে। আর সে কীই বা টাকা।···আচ্ছা, হেম তুমি চাকরটাকে ডাক তো, রঘু ওর নাম। ওকে বলে দিই—বিছানা-বাক্সগুলো তোমাকে দিয়ে দেবে।'

সে ক্লান্তভাবেই গাড়িতে উঠে সামনের দিকটায় বসে পড়ে।

বাড়িতে এসে মুখ-হাত ধোবার জল দিয়ে প্রশ্ন করে উমা 'রাত্রে কী খাও?'

'রাত্রে? কী খাই?' আবারও হাসে শরৎ, 'ভাল থাকলে দু-একখানা রুটি খাই, ভাতও খাই এক-আধ দিন—নইলে দুধসাবু। মানে খেতুম। তবে এখানে মেসে তো ঢালা ব্যবস্থা। অত তোয়াজ করে কে! ভাল থাকলে যা পারি খাই—নইলে একটা মিষ্টি আনিয়ে খেয়ে শুয়ে থাকি। দুধসাবু খেলেই ভাল থাকি!'

'তবে তো আমারও সুবিধে। আমারও তো ঐ খাদ্য।'

সে ছোট উনুনটায় গুল ধরিয়ে সাগু চাপিয়ে দেয়।

তার পর নতুন চৌকিটাতে পরিপাটি করে বিছানা করতে থাকে।

বিছানা করে সদ্য কেনা পাশবালিশটা যখন সাজিয়ে রাখছে—শরতের মনে পড়ে গেল কথাটা।

ভোলে নি উমা। কথাটা ভোলে নি। এ বোধ হয় কোন মেয়েই ভুলতে পারে না।

নিজের অন্যায়ের বিপুল আয়তনটা এই প্রথম যেন উপলব্ধি করে শরৎ।

ওদের ফুলশয্যার রাত্রে শরৎই পাশবালিশটা আড়াল দিয়েছিল—সদ্য-বিবাহিত স্বামী আর স্ত্রীর মাঝখানে, পাছে ছোঁয়া লাগে। রক্ষিতার প্রতি একনিষ্ঠা বজায় রাখতে স্ত্রীর স্পর্শদোষ বাঁচিয়েছিল।

সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটু করুণ হাসি ফুটে উঠল শরতের মুখে। প্রায় চুপি চুপি বললে, 'পাশবালিশটা ভোল নি দেখছি।'

'না। কিছুই ভুলি নি। ও কি ভোলবার!' প্রায় সহজ কণ্ঠেই বললে উমা, তবু তখনই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর সামনে না চোখের জল পড়ে, গলা না কেঁপে যায়। বড় বেশী দৈন্য প্রকাশ পাবে তা হলে।...

নতুন শয্যা, নতুন মানুষ।

এই প্রথম স্বামী তার ঘরে শয্যা গ্রহণ করছেন। তবু কত দূর! কত ব্যবধান!

আলোটা নিভিয়ে নিজের বিছানায় এসে শুতে শুতে সেই কথাটাই মনে হল উমার।

এ কি এই কয়েক হাতের ব্যবধান মাত্র? দুটো বিছানার মাঝখানে এই সামান্য দূরত্ব? এ যেন ওদের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের যুগযুগান্তরের সুবিপুল ব্যবধান। সে ব্যবধান আর ঘুচবে না। ঘুচবে না বলেই সে নিজে এই ছোট্ট ব্যবধানটির ব্যবস্থা করেছে। বিরাট অন্তরালের প্রতীক স্বরূপ, সেদিনের সেই অন্তরালের স্মৃতি স্বরূপ—পাশবালিশটা কিনে আনিয়েছে।

যত দিন স্বামীকে সে কাছে পায় নি—যখন কাছে পাওয়ার কোন আশাও ছিল না—তত দিন তখনও কোথায় যেন একটা অতি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষীণ আশা বেঁচে ছিল। আজ স্বামী তার কাছে ফিরে এসেছেন, হয়তো অবশিষ্ট চিরদিনের জন্যই ফিরে এসেছেন—তবু আজ সে নিজে হাতেই সে আশার সমাধি রচনা করল—ঐ পৃথক শয্যাটি পরিপাটী করে পেতে দিয়ে।

আজ আর সম্ভব নয়। আর কিছুতেই সম্ভব নয়। আজ এক শয্যায় শুতে গেলে বিপুল পরিহাস হয়ে দাঁড়াত। ভাগ্যের বহু পদাঘাত সহ্য করেছে সে—আর নয়।

অন্ধকার ঘরে, অন্ধকার শয্যায় হাতড়ে হাতড়ে এসে শুয়ে পড়ল সে। অনেক—অনেক দিন পরে প্রায় মরুভূমি-হয়ে-যাওয়া শুষ্ক চোখে কোথা থেকে অশ্রুর উৎস জেগেছে। দুই চোখ জ্বালা করে জল এসে ঝাপ্সা হয়ে গেছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। আলোর একটা ক্ষীণ আভাস পর্যন্ত না।

কত দিন পরে মাকে মনে পড়ছে তার।

'মাগো এবার আমাকে নাও। আমাকে নাও। কত দিন ভুলে থাকবে আর?'

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

এ বাড়িতে কনকের পক্ষে একমাত্র বৈচিত্র্য—এবং বোধ হয় কিছুটা আনন্দ ও সান্ত্বনার স্থলও হল নরেন। বস্তুত নরেন যদি না থাকত তো সে টিকতে পারত না। হয়তো পাগল হয়ে যেত এত দিনে। স্বামী উদাসীন, প্রায় গৃহত্যাগী—ছুটির দিন সকালে মাত্র ক ঘণ্টা সময় সে জেগে এ বাড়িতে থাকে—কিন্তু সেও ভোর থেকে স্নানাহারের সময় পর্যন্ত তার বাগানেই কাটে। ননদ বিদ্বিষ্ট—দিনরাতই কলহের সহস্র ফাঁদ পাতছে—অতি কৌশলে সে ফাঁদ এড়াতে হয়। কনকের অপরিসীম ধৈর্য তাই, নইলে প্রতি মুহূর্তেই দারুণ ঝগড়া বাধত। তার বিবাদের ফাঁদ এড়াতে হয় মানে তাকেও এড়াতে হয়। সামনে পড়লেই বাক্যবাণ ছুটতে থাকে—কাঁহাতক সহ্য হয় মানুষের! তার ভয়ে ভাগ্নী সীতাটার সঙ্গেও কথা কইতে পারে না। আড়ালে আবডালে কথা কয়ে দেখেছে—সে মেয়ে আবার এমন, কার সঙ্গে কী কথা হল প্রত্যেকটি মার কাছে গিয়ে গল্প করে। তা থেকে বহু দিন ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছে—কনক প্রাণপণে মুখ বুজে (এবং কানও সম্ভবত, নইলে সে কথা হজম করা শক্ত) থেকে তা এড়িয়েছে। শাশুড়ীই সাবধান করে দিয়েছেন, 'কেন মা ওদের সঙ্গে কথা কইতে যাও, খুব দরকার না থাকলে কয়ো না। ও ঝাড়-বংশই পাজী, বুঝছ না?'

এ তিন জনকে আর শিশু-দেওরকে বাদ দিলে আর যে সুস্থ লোক এ বাড়িতে আছে—শ্যামা, সেও তার ওপর ঠিক যেন প্রসন্ন নয়। অথচ কেন যে নয়, তা কনক ভেবে পায় না। সে তার কাকী-জেঠীমার সমস্ত উপদেশ পালন করে আদর্শ বধূ হবারই চেষ্টা করে। তার বাড়িরও আর কোন মেয়ে কিন্তু এতটা পারত না। কাজও একা এক হাতে যতটা করা সম্ভব ততটাই করে—একটি কাজও ফেলে রাখে না। শ্বশুরের নোংরা কাজগুলো শাশুড়ী তাকে করতে দেন না—বার বার স্নান করতে হয় বলে। ওর এক ঢাল চুল, ভিজে থাকলে অসুখ করবে। শ্যামার চুল অসম্ভব পাতলা হয়ে গেছে, সামনেটা—মানে সিঁথির কাছটা তো চক্‌চকে টাকের মতই হয়ে উঠেছে—সুতরাং তার দশ বার

ান করলেও ক্ষতি হয় না। এ ছাড়া ভোরের রান্নাটা তার—সেও গরজে। াসিপাট সারতে হয় কনককে। শুধু বাসিপাট কেন—ঘর-দোর ঝাড়া-মাছা, রান্নাঘর দাওয়া উঠোন নিকানো, ক্ষার কাচা, বিছানা তোলা-পাড়া, াসন মাজা—কী নয়? ঐন্দ্রিলার যেদিন মেজাজ ভাল থাকে সেদিন সেই াঁধে—কিন্তু সে আর কদিন? তার অসহযোগের দিনই তো বেশী। সে সব দিনে কনককেই রান্না করতে হয়। এ ছাড়া শাশুড়ীর ব্যক্তিগত সেবাও করতে প্রস্তুত ছিল—যদি তাঁকে এক দণ্ড স্থির দেখতে পেত! শ্যামা তার স্বামী-সেবার মুহূর্তগুলি ছাড়া অষ্ট প্রহরই থাকে তার পাতা-গামড়া গাছপালার ঠেকো এবং নারকেল সুপুরি ও সুদের হিসেব নিয়ে। রাত্রে অন্ধকারেও হাত থামে না—তখন চলে পাতা চাঁচা। (অন্ধকারে হাতও কাটে না তো—অবাক হয়ে কনক ভাবে এক-এক দিন।) তাও শ্বশুরের খাওয়ানো নাওয়ানো ইত্যাদি বড় কাজগুলোর ভার তার ওপরই। তবু শাশুড়ীর মন পায় না কেন? ছেলে খুব বেশী ভালবাসলে অনেক সময় শাশুড়ীদের হিংসে হয় বৌদের ওপর। তার ঠাকুমা বলেন, 'ও হল গে সতীনের হিংসে'—মাগো কী নোংরা কথাই বলতে পারেন ঠাকুমা! কিন্তু এক্ষেত্রে তো সে কারণও নেই। সেটা নিশ্চয়ই এত দিনে লক্ষ্য করেছেন শাশুড়ী। তবে? সে কি এত ভাল, এত নির্বিবাদী, এত ঠাণ্ডা বলেই তাঁর রাগ? কোন খুঁত ধরে কি দোষ ধরে তাকে তিরস্কার করতে পারেন না বলেই? এক-এক সময় সেইটেই মনে হয় কনকের।

সুতরাং শ্বশুর ছাড়া এ বাড়িতে কোন আশ্রয় নেই তার।

নরেনও অষ্টপ্রহরই তার খোঁজ করে,—'কৈ গো, আমার মা লক্ষ্মী কোথায় গেলে গো মা, আমার মা জননী? এসো মা এসো।...একটু বোস্ না মা কাছে। আমার কাছে বসলে তবু দু দণ্ড জিরোতে পারবি। নইলে ঐ মাগী—ও কি কম হারামজাদা মেয়েমানুষ—ও তোর মুখে রক্ত উঠিয়ে ছাড়বে এই বলে দিলুম। খাটিয়ে খাটিয়ে মারবার জন্যেই তোকে এনেছে। জানিস না ওকে। ওদের ঝাড়ে-বংশে খচ্চর।...নিজে শুধু বসে বসে পাতা চাঁচবে আর পাতা কুড়োবে। ঐ পাতা ওর সঙ্গে স্বগ্গে যাবে। ঐ পাতায় ওর মুখে নুড়ো জ্বালা হবে। ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো।'

তার পরই গলাটা নামিয়ে বলে, 'দিস না মা, আজ যখন কাঁচকলা সেদ্ধটা দিবি—তার সঙ্গে ঐ যে তোদের উঠোনে ধানিলঙ্কা আছে—ঐ একটু টিপে

আর অমনি এক ফোঁটা তেল। শুধু শুধু ঐ কাঁচকলা সেদ্ধ যে আর খেতে পারি না—মুখে চড়া পড়ে গেল। আর কীই বা হচ্ছে! ওতেই কি আমি সেরে উঠছি?···দিবি মা? জিভটায় তবু একটু ছড়াঝাঁট পড়ে—?'

করুণ কণ্ঠে মিনতি করে।

মায়াও হয় কনকের, মন-কেমন করে। সে নরেনের পূর্ব ইতিহাস কিছুই জানে না—ক দিনে শাশুড়ী আর ননদের কথাবার্তার ফাঁকে আভাসে-ইঙ্গিতে যেটুকু জেনেছে—তাতে এমন কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না—সুতরাং তার মন-কেমন করার অনেক সঙ্গত কারণ আছে। তবু সে হেসে ঘাড় নাড়ে, 'না বাবা, সে আমি পারব না। মা আমাকে জ্যান্ত পুঁতবেন তা হলে। আপনার শরীরও তাতে বড্ড খারাপ হবে। আর তা ছাড়া মরিচের গুঁড়ো তো একটু দেওয়া হয়—'

হয়েছে? বিষমন্তর কানে ঢুকিয়েছে? দলে টেনে নিয়েছে মাগী? বাঁচলুম বাছা। জানি, মেয়েছেলে মাত্তরেই বেইমানের ঝাড়—। এ বাড়ির মাটির দোষ যে। এসেই অমনি গোড়ে গোড় পড়েছে। যা দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে—ছোটলোকের মেয়ে গোরবেটী হারামজাদী যা!'

কনক হাসতে হাসতে উঠে যায়। রাগ হয় না তার। এ গালাগাল গায়ে লাগে না। ছেলেমানুষের ছেলেমানুষিই মনে হয়।

আবার দু দণ্ড বাদেই ওদিক দিয়ে যেতে দেখলে ডাক পাড়বে, 'কৈ গা, আমার বৌমা কোথায় গেলেন! সন্তানকে একেবারেই ভুলে রইলেন!'

কিংবা বলবে, 'আর কবে কি করবি বেটী, আমার দিন যে ফুরিয়ে আসছে। এই বেলা আয়, দুটো-চারটে শলা দিয়ে যাই। আমার কথা শুনে রাখ্—নইলে ওদের সঙ্গে পেরে উঠবি কেন? দেখছিস ঐ মাগীর পাল্লায় পড়ে আমারই হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল!'

আপন মনেই এসব কথা বকে যায় সে, কনক আসুক বা না আসুক।

শ্যামা এক-এক দিন হাসে, আবার এক-এক দিন অন্য মেজাজে থাকলে দাঁত কিড়মিড় করে, 'মুখে আগুন তোমার! আগুন পড়েও কাজ নেই। মুখখানি পচুক তোমার। লোকে বলে সর্ব অঙ্গ থাকতে মুখটি পুড়ুক—আমি তাও বলি না। পচুক, পচুক, ও বেইমানের জিব পচে খসে পড়ে যাক। দিনরাত গু-মুত ঘাঁটছি তবু সেই এখনও আমার পেছনে না লাগলে আমাকে না গাল দিলে পেটের ভাত হজম হয় না!'

কনক হেসে বলে, 'কার ওপর রাগ করছেন মা? ওঁর কি জ্ঞান আছে া বলছেন?'

'তুমি জান না মা, জ্ঞান নেই তাতেই ঐ, জ্ঞান থাকলে অষ্টপ্রহর আমার াদ্দপুরুষকে চোদ্দবার নরকে ডোবাত!'

আবার মধ্যে মধ্যে নরেন চিনতেও পারে না কনককে। এসে দাঁড়ালে লে, 'কে-ও—কে? ও মল্লিকদের বাড়ি থেকে এসেছেন বুঝি! বসুন, বসুন, ার কী দেখতে এসেছেন? কিছু কি আর আছে? ওরে কে কোথায় গলি রে, একটা আসন দিয়ে যা না—মাগীর চিরদিন সমান গেল, ভদ্দরলোকদের াদর অভ্যর্থনা কিছু শিখলে না কোন দিন। আমাদের গা ইস্‌পিস্‌ করে এসব অসৈরন দেখলে, বুঝলেন না? আমরা কত বড় গুরুবংশের ছেলে—এসব যে নিয়ে জন্মেছি আমরা।...তা বসুন ঐখানেই বসুন। ময়লা নোংরা যা দেখছেন আমার বিছানায়—মেঝে দিব্যি পোষ্কার—বৌমা আমার চোদ্দবার ুছে নিচ্ছেন। যাব, যাব—একটু ভাল হয়ে উঠি, আপনাদের বাড়ি যাব। আর এই তো এখানেই রইলুম, ব্রতে কম্মে যখন ডাকবেন যাব।'

উঠোন থেকে শ্যামা শুনতে পেয়ে বলে, 'এ যে একেবারে সপষ্ট ভীমরতি ধরল দেখছি। কাকে কি বলছ, ও তো তোমার ব্যাটার বৌ!'

'ভীমরতি তোর ধরুক, তোর ছেলেমেয়েদের ধরুক। তোর চোদ্দগুষ্টির যে যেখানে আছে তাদের ধরুক। আমি চিনতে পারছি না! আসুন মা বসুন। ভাববেন না আমার সত্যি সত্যিই মাথার গোলমাল হয়েছে—ওদিক থেকে আলোটা এসে পড়েছে কি না তাইতেই—'

তার পর বলে, 'বসুন মা, বসুন।'

কনক হাসি চাপতে পারে না বহু চেষ্টাতেও। বলে, 'ওকি, আমাকে বসুন বলছেন কেন?'

'দোষ নেই। কিচ্ছু দোষ নেই। বৌমা তো—মা যখন বলেছি তখন আর কথা কি! কখনও আপনি বলব কখনও তুই বলব। এ যে আপনার জিনিস—মনের মত জিনিস। কখনও মাথায় কখনও পায়ে। সংসারের দস্তুরই যে এই। আর আপনাকে আপনি বলব না তো কাকে বলব মা—কত বড় বংশের মেয়ে আপনি। বলি আমার তো এ তল্লাটের কোন বামুন-বাড়ি জানতে বাকি নেই। পূর্ণ মুখুজ্জেদের কত বড় বংশ ছিল, আজই না হয় দেখছেন অমনি ট্যানাপরা ছাতি-বগলে মুখ শুকিয়ে ঘুরছে—নইলে ওরাই তো

ছিল ওখানকার জমিদার। তবে কী জানেন মা—এসব বুঝবে কে আজকাল? ইজ্জত বলুন, মর্য্যেদা বলুন—এ বোঝে সমানে সমানে! আমরাই কি একটা সাধারণ লোক!'

তার পর আবারও গলাটা অস্বাভাবিক নেমে আসে।

'দে না মা, এক গাল চাল-কড়াই ভাজা একটু অল্প করে তেল হাত বুলিয়ে? বলি শরীরটাই না হয় পড়েছে—দাঁত তো দেখছিস্, বত্রিশপাটি বজায় আছে ঠিকঠিক। যার্ যা ধম্ম, দাঁতের কিছু চিবোবার না দিলে চলে? গলা ভাত আর চিঁড়ের মণ্ড খেয়ে খেয়ে দাঁতে জং ধরে গেল যে।···আচ্ছা চাল কড়াই ভাজা না দিতে চাস—নিদেন দুটো কাঁটাল বীচি পুড়িয়ে দে!'

কনক নেতিসূচক ঘাড় নাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে তার পিতৃবংশ সম্বন্ধে মত পাল্‌টে যায়, 'তা দেবে কেন? তা দিলে যে তবু সদ্‌বংশের পরিচয় দেওয়া হবে। গোরবেটি হারামজাদী মেয়ে আমার যেমন—খুঁজে খুঁজে কনে ঠিক করলেন। মাথা কিনলেন আমার। ছোট লোকের ঝাড় ওরা—ওদের চিনি না! ওদের সাত পুরুষ ডাকসাইটে ছোটলোক। মেয়ে আমার বেছে বেছে সেই ছোট-লোকের ঝাড় ঘরে এনে পুরলেন।···একের নম্বর মামলাবাজ কুচকুরে লোক সব—মামলা করে করে সব্বস্বান্ত হয়ে গেল, তবু মামলা ছাড়তে পারলে না। ছোট লোকের বেটী ছোটলোক!'

আবার এক-এক দিন কী হয়—হঠাৎ কনকের রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, 'এসো মা এসো। দেখ দিকি—এসে দাঁড়ালে ঘর যেন জ্বলে উঠল। মা আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। তা হ্যাঁ মা একটা কথা বলছি—মনে কিছু করো না—আমার ঐ মিলিটারী মেজাজের ছেলে, ঐ হেমচন্দরের কথা বলছি গো—উনি রোজ রোজ অত রাত করে ফেরেন কেন মা? কী এমন ওঁর রাজকার্য চলে রাত তেরোটা অব্‌দি?'

কনকের হাসি-হাসি মুখে যেন একটা ছায়া ঘনিয়ে আসে। মাথা হেঁট করে বলে, 'তা আমি কেমন করে জানব বলুন!'

'সে কি কথা! জানি না বললে চলবে কেন? জান, খোঁজ নাও। জিজ্ঞেসা কর, কৈফেত চাও। এত রাত অব্‌দি কোথায় কী ভাবে থাকে জানা দরকার। এ যে অতিশয় মন্দ কথা, যৎপরোনাস্তি খারাপ কথা। ঘরে এমন রূপের ঢাল বৌ, সে কোথায় আপিস কামাই করে পেছনে পেছনে ঘুর

ঘুর করবে, না—রাত দুপুর করে বাড়ি ঢোকে। আমি যে সব টের পাই। না মা, খবরদার অত ঢিল দিও না। রক্ত বড় খারাপ ওর, ভারি বদ্ বীর্যে জন্ম। রাশ এতটুকু আলগা দিয়েছ কি মরেছ, দেখছ না ঐ করে তোমার শাশুড়ী মাগীর হাড়ীর হাল হল। বাপ কি বেটা সিপাই কি ঘোড়া—কুছ না হয় তো থোড়া থোড়া! আমি ঐ করে ওর মার সব্বনাশ করলুম, আবার ও ধরেছে তোমাকে। তোমার শাশুড়ীর রূপটাই কি কম ছিল মা, বললে বিশ্বাস করবে না ঐ পোড়া চেলাকাঠের রং এক কালে ছিল ঠিক বসরাই গোলাপ। আর তেমনি দুগ্‌গোপ্রতিমের মত মুখ। এখন যা দেখছ তা দেখে বুঝতে পারবে না সে চেহারা। আমার হাতে পড়ে সেই চেহারা এই হয়েছে। না মা, এখন থেকে যদি রাশ না টেনে ধর, শতেক ক্ষোয়ার করে ছাড়বে। আমার বংশ আমি ভাল রকম চিনি!'

শ্যামা দোরের বাইরে থেকে খরখর করে ওঠে, 'হ্যাঁ তোমার বংশ শুধু হলে তাই দাঁড়াত বটে, তবে রক্তটা যে আমার। অমন ছেলে লোকে তপস্যা করে পায় না!·· কেন মিছিমিছি বিষমন্তর ঢোকাচ্ছ ওর কানে তাই শুনি! অমন কুমন্ত্রণা যদি দাও, বৌকে আর এ ঘরে আসতে দেব না!'

'না না বামনী, রাগ করিস নি। ভালর জন্যেই বলছি, তোর বরাত দেখেই আক্কেল হয়ে গেছে যে! সেই জন্যেই ভয় হয়!'

'ওঃ, কত দরদ রে। এত দরদ তো কখনও বুঝি নি! আক্কেল হল এই মরবার কালে—বলতে গেলে শয়ে উঠে? দু দিন আগে হলে যে তবু কাজ দিত—তুমিও জুড়োতে আমিও জুড়োতুম!'

'বরাত, বুঝলি বামনী, তোরও বরাত আমারও বরাত। নইলে এমন হবে কেন? ·· কৈ গো বৌমা, অমন হাঁ করে সঙের মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন—একটু তামাক সাজ না!'

॥ ২ ॥

বর্ষাটাকেই ভয় ছিল সব চেয়ে বেশী—সেই বর্ষা পার হয়ে যখন পুজো পর্যন্ত কেটে গেল তখন যেন মনে মনে একটু আশ্বস্ত হল শ্যামা। হয়তো আর একটা বর্ষা পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যাবে। খুবই কষ্টকর—এই শয্যাগত রোগীকে সামলানো—বিশেষ সে যা ছেলেমানুষের মতই অবুঝ—তবু শ্যামা তার মৃত্যু

কামনা করে না : 'আহা, বাঁচুক—আমি যত দিন আছি, আমার ওপর দিয়েই যাক—আর কাউকে তো জ্বালাচ্ছে না!'

হেমও যে ঠিক ওর মৃত্যু চায় তা নয়। একটু জ্বালাতন বোধ হয় এটা ঠিকই—তবু মানুষ তো। স্বাভাবিক অবস্থায় কোন মানুষই বোধ হয় কোন মানুষের মৃত্যু কামনা করে না।

মহা তো মহাখুশী। একটা গর্ব করার মত কথা পেয়েছে সে। রান্নাঘর থেকে শুরু করে পথেঘাটে সর্বত্র গলা চড়িয়ে খবরটা দেয়, 'হবে না? বলি মার এয়োতির জোর নেই?···মা কি একটা যে সে সতী? ঐ পুরুষের সঙ্গে ঘর করেছে তবু কখনও এক বার উঁচু পানে চেয়ে দেখে নি। দেখছ না এখনও মার সিঁথির সিঁদুর কী রকম ডগডগ করছে লাল। আর শাঁখারই বা কী জেল্লা। ঐ জোরেই বাবা আবার ঠেলে উঠবে ঠিক—দেখো তোমরা!'

শুধু অভয়পদই ঘাড় নাড়ে, 'বলা যায় না ঠিক। অনেক সময় পচা বর্ষাও কাটে কিন্তু নতুন হিমের সময়টা কাটতে চায় না। পুরনো রুগী বেশী কাবু হয় শীতের মুখটায়।'

দেখা গেল অভয়পদর কথাটাই ফলে যায় শেষ পর্যন্ত। মহার আশা ব্যর্থ করে এবং তার স্বামীর আশঙ্কা সত্য করে অঘ্রানের শেষের দিকটায় একেবারে ফুলে পড়ে নরেন। দিনরাত পড়ে পড়ে হাঁপায়—জল পর্যন্ত সহ্য হয় না, এমন অবস্থা।

শ্যামার মুখ শুকিয়ে ওঠে। দু-তিন দিন দেখে হেমকে ডেকে বলে 'আর এক বার না হয় বড় ডাক্তার বাবুকেই ডাক। বাঁচবে না হয়তো, তবু লোকে বলবে যে একেবারে বিনাচিকিচ্ছেয় লোকটাকে মেরে ফেললে, সে বদ্‌নামটা তো বাঁচবে। তুই রবিবার সকালেই বরং নিয়ে আয় ডাক্তার বাবুকে—'

হেম বোঝে যে লোকে যত না বলুক—মার মনই বলছে কথাটা। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। শনিবার সকাল করে বাড়ি ফিরে বড় ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনে।

তিনি এসে গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়েন।

বাইরে গিয়ে বলেন, 'এ আমাদের ক্ষমতার বাইরে। হার্ট খুব ড্যামেজ্‌ড্‌—লিভারে আর কিছু নেই। আমার তো মনে হয় আর ওষুধ-বিষুধে পয়সা খরচ করে লাভ নেই। অবিশ্যি কলকাতা থেকে নীলরতন সরকার টরকারকে আনলে কী হবে জানি না—ওঁরা কিছু করতে পারবেন কিনা। আমার' আর

কিছু করবার নেই। বরং টোট্‌কাটুট্‌কি করা ভাল—অনেক সময় তাতে খুব ভাল রেজাল্‌ট পাওয়া যায়!'

হেম বলে, 'কিন্তু আগে কথাবার্তা সব গোলমাল হয়ে যেত—এখন সেগুলো বেশ পরিষ্কার।'

'ও অমন হয়। এসব রোগীর মরবার আগে মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। লোকে বলে না হেগো রুগী মুখে দড়। ওটা তাই—'

অর্থাৎ যাকে বলে 'এলে দিয়ে যাওয়া' তাই গেলেন।

খবর পেয়ে মল্লিকদের বড় গিন্নী দেখতে এলেন। ক্ষীরোদাও অতিকষ্টে পাল্‌কি করে এক দিন দেখে গেলেন।

সবাই উপদেশ দিয়ে গেলেন শ্যামাকে, 'করছ কি, একটা প্রাচিত্তির—চান্দ্রায়ণ করিয়ে দাও। আর কেন?'

শ্যামা আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাল করে চোগ রগড়ে মুছে স্বামীর কাছে এসে বসে। গলাটাকে নিয়েই যেন মুশকিলে পড়ে। সহজ স্বাভাবিক আওয়াজ যেন আর বেরোতে চায় না।

অনেক কষ্টে, খানিকটা একথা-সেকথার পর কথাটা পাড়ে, 'সবাই বলছে, বড় বেয়ানও বলে গেলেন, একটা চান্দ্রায়ণ করিয়ে দিতে—আর ঐ সঙ্গে একটা অঙ্গ প্রাচিত্তির। ওতে নাকি কষ্টটা কমে, অনেক সময় পরমায়ুও ফিরে পায়!'

নরেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়েই যেন খেঁকে ওঠে, 'কে, কোন্ গুয়োটা বলেছে তাই শুনি! গাঁজা গাঁজা, বুঝলি—স্রেফ গাঁজা। ছাই হয়। কী হবে প্রাচিত্তির করে তাই শুনি—পয়সা বড় সস্তা হয়েছে তোর, না?'

'পয়সা সস্তার হবে কেন—কী কষ্টের পয়সা তা তো দেখতেই পাচ্ছ। লোকে বলে তাই। বলে মহাপাতক কেটে যায়, শরীরটা ঝরঝরে হাল্‌কা হয়ে ওঠে—'

'তুই থাম দিকি। ওসব আমার মত বামুনদের পয়সা আদায়ের ফিকির! যদি পাপ ধরতে হয়—এ জীবনে এত পাপ করেছি যে তা তোর ও এক হন্দর প্রাচিত্তিরেও কাটবে না। আবার এধারে তো তোদের শাস্তরেই বলেছে—এক বার রাম নামে যত পাপ হরে—মানবের সাধ্য কি যে তত পাপ করে! ...তা একবার না হয় রাম নামই করে নিচ্ছি। আমার ওপর বিশ্বাস না হয় তুই-ই না হয় দিন দশ বার করে কানের কাছে রাম নাম শুনিয়ে যাস্।

চান্দ্রায়ণ! এক দিন উপোস করে খানিক ভেজাল ঘি খেলেই যদি সেরে উঠত আর ড্যাং ড্যাং করে স্বগ্গে যেত তা হলে আর ভাবনা ছিল না!'

এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে বোধ হয় খুব কষ্ট হয়, খানিকটা মড়ার মত পড়ে হাঁপাতে থাকে।

খানিক পরে আবার চোখ খুলে বলে, 'ও সব বুজরুকি—বুঝলি বামনী—বুজরুকি। ভড়ং। ও আমিও ঢের করেছি। মন্তর যা পড়িয়েছি তা আমিই জানি—তাইতেই তারা সব নিশ্চিন্তি হয়ে স্বগ্গে চলে গেছে।'

'হ্যাঁ—সবাই তোমার মত বামুন কি না!' শ্যামা রাগ করে বলে।

'সব সমান, সব সমান। কী জানিস, গুয়ের এপিঠ আর ওপিঠ! শোন, তোকে এই বেলা চুপি চুপি একটা কথা বলে যাই—মাছ আর তোকে কে কত খাওয়াচ্ছে তা নয়—আমি থাকতেই তো মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে আছে বলতে গেলে। তবে—নিজে পুকুর করেছিস, মাছ-টাছ যদি ভাল ওঠে কোন দিন—মানে আমি যাবার পর বলছি—এদিক ওদিক দেখে দুখানা খেয়ে ফেলিস। কিচ্ছু দোষ হবে না। আমি বলে গেলুম। দোষ হয় আমার হবে। আমার ও তো পাপের ভারা পূর্ণ আছেই—তাতে আর একটু-আধটু চাপলে টেরও পাব না। কিছুতে কিছু হয় না বুঝলি। হবেই বা কি—মাকড় মারলে ধোকড় হয়, চাল্‌তা খেলে বাকড় হয়—শুনিস নি ছেলেবেলা? তাই! চোখ বুজলেই সব ফক্কিকার। অনেক দেখলুম, অনেক পুণ্যাত্মাও দেখলুম! কিছু না, কিছু না!'

শ্যামা আর বসতে পারে না। চোখের জল যে এই লোকটার জন্যেই তার এমন অবাধ্য হয়ে উঠবে তা কে জানত!

মহা শুনে কান্নাকাটি করে। স্বামীকে বলে, 'একখানা ভাল লাল পাড় শাড়ি আনিয়ে দাও, আর মাছের মুড়ো—মাকে খাইয়ে আসি গিয়ে।'

অভয়পদ বলে, 'বল এনে দিচ্ছি। কিন্তু দু দিন আগে খাওয়ালে পারতে, এখন কি আর মুখে উঠবে! এখন মাছের মুড়ো খাওয়াতে যাবার মানে কি আর তিনি বুঝবেন না!'

'তবু এ সব করতে হয়। তুমি বড় সব তাইতে খুঁত কাট বাপু! তুমি বারণ করছ, এর পর লোকে বলবে অত বড় মেয়েটা ছিল কিছু করলে না—'

'না, না—তুমি কর গে! আমি বারণ করি নি। দুগ্‌গোকে বল—ও ভাল মাছ আনিয়ে দেবে।'

নরেন স্বয়ং ছেলেকে ডেকে পাঠায়। কাছে এলে বলে, 'বসো বাবা, বসো। দুটো কথা বলে নিই। দু দিন পরে তো আর বলা হবে না। তুমি আমার সুপুত্তুর—আমিই কু-পিতা, কখনও কিছু করতে পারলুম না, তা-বলছি কি- সবই তো বুঝছ, তোমার গর্ভধারিণীর খাওয়া পরা তো সব ঘুচতে চলল। এই বেলা এক দিন একটু ভাল করে মাছভাত খাইয়ে দাও। বৌমাকে বল রেঁধে বেড়ে খাওয়াবে।'

তার পর একটু থেমে বোধ করি বা হেমের উত্তরেরই আশা করে।

কোন জবাব না পেয়ে আবার বলে, 'আর আমাকেও -- যদি কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করে তো এই বেলা খাইয়ে দাও। আর ধরাকাঠ করে কী হবে—বুঝতেই তো পারছ ধরাকাঠের বাবা করলেও বাঁচাতে পারবে না। বিবেচনা কর, মাগী তো চান্দ্রায়ণ প্রাচিত্তির করবে বলে ক্ষেপে উঠেছিল, তাতে তো এক কাঁড়ি টাকা খরচা হত—সেটা বাঁচিয়ে দিলুম। ছেরাদ্দ শান্তিতে বেশী খরচ করো না—মরা গোরু ঘাস খায় না। তা ছাড়া ও কত ছেরাদ্দ তো করালুম আমি, ভুজ্জিই বল পিণ্ডিই বল সব বামুনকে দেওয়া। কুশের বামুন খাড়া করে তাকে তেল জল অন্নবস্ত্র দেওয়া। কেন রে বাপু? বলে জ্যান্তে দিলে না মুখে তুলে, মলে দেবে বেনার মূলে। তার চেয়ে তুমি আমাকেই যা হয় ভাল মন্দ খাইয়ে দাও। যদি সেই বামুনকেই খাওয়াতে হয়—আমাকে খাওয়াতে দোষ কি? আমিও ধর গিয়ে তো বামুন। বামুন তায় বয়োজ্যেষ্ঠ তায় গুরুজন। যার পর নাই তোমার পিতা!'

হেম চুপ করেই থাকে। তারই বা মনটা ক[illegible] এত খারাপ লাগছে কেন তা বোঝে না।

অনেকক্ষণ পরে শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'তা তোমার কি খেতে-টেতে ইচ্ছে হয়?'

'আমার? আমি বাবা সর্বভুক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার খাওয়ার ইচ্ছে। যা পার খাইয়ে দাও।'

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খাওয়াবার তো আমার ক্ষমতা নেই। খুব বেশী যা খেতে ইচ্ছে হয় তাই বল।'

'খুব বেশী—?' খানিকটা ভেবে নেয় নরেন, তার পর বলে, 'ক দিন ধরে পাতক্ষীরে বোঁদে ফেলে খেতে ইচ্ছে করছে খুব। তা পাতক্ষীর না পাও—একটু ক্ষবড়ির ঝোল? আর একটু মাংস। করার অসুবিধে হয় কলকাতার

কোন হোটেল থেকে একটু কিনেও আনতে পার। চার পয়সা—দু আনা? দেয় দেয়,—অমন ভাঁড়ে করেও দেয়!'

হেম সেই দিনই খুঁজে খুঁজে একটু ক্ষীর আর বোঁদে কিনে আনে। মাংস বাড়িতেই রাঁধাবার ব্যবস্থা করে। মাছ মাংস তো হয়ই না কোন দিন, হলে তবু বৌটাও খেতে পারবে একটু। জলের মত ডাল আর ডুমুর থোড় কাঁচকলা খেয়ে খেয়ে তো পেটে চড়া পড়ে গেছে। একেই পাত্‌লা পাত্‌লা গড়ন—তার ওপর এই খেয়ে রোগাও হয়ে গেছে খুব—সেটা এমন কি তারও চোখে পড়ছে কিছু কাল থেকে।

অভয়পদ প্রায় রোজই সন্ধ্যার সময় এসে খোঁজ নিয়ে যায়।

এক দিন কাছে এসে বসতে নরেন গলাটা নামিয়ে বললে, 'বাবা অভয়, তোমাকে আর কী বলব, তুমিই বলতে গেলে আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান—চিরদিন এ সংসারটা তো তুমিই ঠেললে। তা রইল সব, দেখো শুনো।···হ্যাঁ, বলছিলুম কি, বলতেও লজ্জা করে, কখনও তো এক পয়সার বাতাসা কোন দিন এনে দিতে পারি নি—তোমার কাছে এ সব বলাও ঠিক নয়—'

বাধা দিয়ে অভয়পদ প্রশ্ন করে, 'খাবেন কিছু—বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে করে?'

'ঠিক ধরেছ বাবা, মনের কথা টেনে নিয়ে বলেছ!' মহাখুশী হয়ে ওঠে নরেন—'বিশেষ কিছু নয়, খরচ-অন্তর করাতে চাই নে তোমায়, শুধু একখানা প্যাঁজের বড়া আর একটা ঝাল-ফুলুরি।'

অভয়পদ তখনই বেরিয়ে গিয়ে কিনে আনে বাজার থেকে।

শ্যামা যেন শিউরে ওঠে, 'ঐ রুগীকে দেবে আবার, বাজারের তেলে-ভাজা?'

'কী হবে মা না দিয়েই বা? বুঝতেই তো পাচ্ছেন—! আত্মা খেতে চাইছে যখন এত করে—দিয়েই দিন। এর পরে নইলে বড় আপসোস হবে। আর আমি এনেছিও একখানা করেই ঠিক। বেশী দেব না!'

সে দুটো খুব তৃপ্তি করে খায়। ক্ষীর বোঁদেও চেটে খেয়েছিল—কিন্তু মাংস মুখে দিতে পারলে না। মুখে দিয়েই থু-থু করে ফেলে দিলে। কেমন এক রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে পুত্রবধূর মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'এই বার সত্যিসত্যিই শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে মা চিত্রগুপ্তের পেয়াদা। নইলে মাংস আমার মুখে তেতো লাগে! না, আর দেরি নেই!'

দেরি যে আর নেই তা সকলেই বোঝে এবার।

হেম কৌশল করে বাপের মাংসর সঙ্গে একটু মাছ কিনে এনেছিল—সঙ্গে বসে খেলে—অত টের পায় নি শ্যামা। কিন্তু মহাশ্বেতা যেদিন তিন-চার রকম মাছ নিয়ে এসে রাঁধতে বসল সেদিন আর তার আসল অর্থটা শ্যামার বুঝতে বাকী রইল না। অভয়ের আশঙ্কাটাই আর এক বার সত্য হল। মেয়ে আর বৌ জোর করে শ্যামাকে ধরে এনে পাতের কাছে বসাল বটে কিন্তু সেই সুস্বাদু মাছের একটা টুকরোও মুখে দিতে পারল না সে। ভাত ভেঙে মুখে দিতে গিয়ে পাতের পাশেই হাহাকার করে আছড়ে পড়ল।

'কেন এনেছ এসব মা, এ তো আমি খেতে চাই নি। যেদিন থেকে আমার হরিনাথ গেছে সেইদিন থেকেই তো আমি পারতপক্ষে মুখে তুলি নি এসব। এতে করে কি আমার লোহা-সিঁদুর বাঁচবে মা?·· সেই তো আমার আসল, সেই তো আমার সব। ভগবান সব দিক দিয়ে মেরেছেন আমাকে চিরকাল, এইটুকু শুধু দিয়ে রেখেছিলেন—তাও কেড়ে নিচ্ছেন এবার। ওরে, ওর কি এই মরবার বয়স হয়েছিল—না বুড়ো হয়েছিল ও? কেন এল এত কাল পরে আমার কাছে—এ কি এই দাগা দেবে বলে? তার চেয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত, কোথায় থাকত কী খেত তা খবরও রাখতাম না, সেই তো ভাল ছিল। তেমনি করেই ওকে বাঁচিয়ে রাখলেন না কেন ভগবান।'

সেদিন আর খাওয়াই হল না কারুর।

মহা তবু জোর করতে যাচ্ছিল, কনক ইঙ্গিতে নিষেধ করলে। তার বয়স কম কিন্তু নারীহৃদয়ের সহজাত সহানুভূতি দিয়ে এটা বুঝেছিল যে, এ খাওয়ার চেয়ে শাস্তি মেয়েমানুষের আর কিছু নেই।

॥ ৩ ॥

এমনি করে প্রায় একুশ বাইশ দিন এখন-তখন হয়ে কাটবার পর নরেনের ফুলোগুলো আবার একটু কমতে শুরু হল। এই ক দিন যে টনটনে জ্ঞান ছিল সেটাও চলে গেল, আবার সেই আগেকার আধো-আচ্ছন্ন ভাবে ফিরে গেল। কথাবার্তায় গোলমাল হতে লাগল।

সকলে ভাবল, এ টালটাও সামলে গেল—আবার কটা দিন অন্তত যুঝবে।

পর পর তিন শনি-রবিবার কোথাও ঘোরা হয় নি হেমের, সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। রাণীবৌদি এর মধ্যে দু বার এসে দেখে গেছে। নতুন গুড়ের সন্দেশ এনে নিজে হাতে খাইয়ে এক রাশ আশীর্বাদ নিয়ে গেছে নরেনের—কিন্তু তাতে মন ভরে না। আড্ডার আলাদা সুখ। সুতরাং সে শনিবার হেম প্রতিজ্ঞা করেই বেরিয়েছিল যে অন্তত সন্ধ্যা পর্যন্ত আড্ডা না দিয়ে সেদিন সে বাড়ি ফিরবে না। তার ওপর অফিসে গিয়েই শুনলে ওদের এক প্রাক্তন সাহেব বিলেতে মারা গেছেন কাল খবর পৌঁছেছে—আজ সেই শোকে দু ঘণ্টা আগে ছুটি হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই বারোটাতে ছুটি সেদিন, তার দু ঘণ্টা আগে—অর্থাৎ দশটাতেই সেদিন বেরিয়ে পড়তে পারবে। এটাকে সে ঈশ্বরেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করল।

কলকাতায় নেমে প্রথমেই সিমলের রাস্তা ধরল। কমলারা তখন খেতে বসেছে। গিয়েই তো কেড়ে বিগড়ে রাণীবৌদির পাত থেকে খানিক ভাত তুলে খেয়ে নিলে, বড়মাসীর কাছ থেকে খানিকটা আমড়ার অম্বল। তার পর গোবিন্দর মেয়েটাকে নিয়ে লোফালুফি করল কিছুক্ষণ—এক কথায় অনেক দিন পরে অনেকটা হৈ-হৈ করে যেন বাঁচল সে।

বেশ হাসি-খুশিতেই কাটছিল, কিন্তু খানিকটা গল্প করার পর নাতনী ও ঠাকুমা দু জনেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল রাণী। ইঙ্গিতে হেমকে পাশের—অর্থাৎ নিজেদের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ঠাকুরপো, ঠিক ঠিক উত্তর দেবে?'

হেম রীতিমত ঘাবড়ে গেল ওর কথা বলার ভঙ্গীতে। এ যেন নতুন এক রাণীবৌদি। এ মূর্তির সঙ্গে তো সে পরিচিত নয়! সে একটু ভয়ে ভয়েই বললে, 'কী ব্যাপার বল তো? কিসের কথা?'

'তুমি বৌকে নাও না কেন?'

ঠিক এই প্রশ্ন এবং এত স্পষ্টভাবে—শোনবার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না হেম। সে চমকে উঠল।

'কে বললে তোমাকে? যে বলেছে সে—সে মিথ্যে করে লাগিয়েছে!'

'ভয় নেই, কনক বলে নি। সে মেয়েই সে নয়। তার বুক ফাটে তো মুখ ফাটবে না। ওসব মেয়েদের আমি ভাল করেই চিনি। বিষম আত্ম-সম্মান জ্ঞান কনকের!'

'তবে—?'

'ওগো মশাই আমাদের চোখ আছে, আমরা ঘাস খাই না। আমাকে তো চেন, পেটের কথা তোমারও জানতে কিছু বাকী নেই আমার। বল না কবে কোথায় কী করে এসেছ সব বলে দিচ্ছি। ওকি, মুখ শুকিয়ে উঠল যে। ভয় নেই—জানলেই বলতে হয় না। কিন্তু এ আলাদা কথা। বড্ড ভুল করছ ঠাকুরপো। বাইরে বাইরে ঘুরে শুধু এঁটোপাত চাটাই সার হয়—আসল ভোজের স্বাদ তাতে মেলে না। তোমার বাবাও আর এক রকম ভাবে বাইরে বাইরে ঘুরেছিলেন—জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল তাঁর—অকালে বুড়ো হয়ে কী অবস্থায় মরছেন দেখতে তো পাচ্ছ। কী লাভ এমন এর দোরে ওর দোরে ঘুরে বেরিয়ে আড্ডা দিয়ে বলতে পার ?'

'তুমিও এই কথা বলছ ? আমি আসি সেটা পছন্দ কর না ?' আহত কণ্ঠে বলে হেম।

'ছিঃ! সে কথা বলছি না। কিন্তু তুমি কি পেলে ? দুটো মুখের কথা, হাসি, গল্প—এই তো ? বুকে হাত দিয়ে বল দিকি! সুখ তোমার অন্যত্র। ঘরে সুখের সরোবর টলমল করছে—তা ফেলে আদাড়ে পাঁদাড়ে খানা-ডোবায় ডুবতে যেও না। অনেক ভাগ্য করে অমন বৌ পেয়েছ। আমার মত রূপ নয়—সে আমিও জানি। এও জানি—তোমাকে বলেই বলছি, লোকে শুনলে অহঙ্কার বলবে—আমার মত রূপ পথে ঘাটে পড়ে থাকে না! তা নিয়ে আপসোস করে লাভ নেই। যা পেয়েছ তাও কম না। তা ছাড়া ওর মনটা বড় ভাল, বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে। ওকে সুখী করো—তার চার গুণ সুখ তোমার লাভ হবে।'

আবহাওয়াটা কেমন যেন বিশ্রী হয়ে গেল। থমথমে গম্ভীর।

এই জন্যে কি তিন সপ্তাহ পরে ছুটে এল সে আড্ডা দিতে ?

ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল সে একটা বেজে গেছে। হঠাৎ উঠে পড়ল।

রাণীবৌদি হেসে বললে, 'এখন কোথায় চললে তাও জানি। আমার কথা পছন্দ হল না—কিন্তু এক দিন বুঝবে। সেদিন না হায় হায় করতে হয়! আমি খুব বোকা নই—আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে ভেবে দেখো।'

'তুমি বোকা ? তোমাকে যে বোকা বলে—শুধু সে-ই বোকা নয় তার ঝাড়ে বংশে বোকা। গুপ্তকবির কবিতা—তুমিই শোনাচ্ছিলে না সেদিন ? আচ্ছা এখন আসি—'

হেসে, কথাটাকে হালকা করে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে হেম। আর এক মুহূর্তও

যেন ওর সামনে থাকতে সাহস হয় না। সাংঘাতিক মেয়ে। ঠিক কতটা জানে আর কতটা ওপর-চাপ—সেটুকু খোঁজ করতেও সাহসে কুলোয় না ওর।

হেম সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা নলিনীর বাড়িতেই যায়। রাণী ধরেছিল ঠিকই। হয়তো ঘড়ির দিকে তাকানো থেকেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এ যাওয়াতে দোষ নেই। বিয়ের পর আরও কয়েক বার এসেছে। বসে গল্প করে খেয়ে চলে গেছে। কিরণ ফিরেছে কাশী থেকে—তবে সে কিরণ আর নেই—এখন ঝাঁজ অনেকটা কমে গেছে। হেমকেও সে আর খুব অপছন্দ করে না। বরং এক-এক দিন সেও বসে গল্প করে যায় খানিকটা।

আজ অবশ্য কিরণ ছিল না। নলিনী একাই ছিল। এটা ওটা খুচরো গল্প, কিছু থিয়েটারের গল্প করে—নলিনী এখন আবার থিয়েটারে যাচ্ছে, অন্য থিয়েটার—হঠাৎ হেমের বিয়ের প্রসঙ্গে চলে এল। বললে, 'ছ্যাখ হেমবাবু, সেদিন থেকে একটা কথা কইব কইব করে আর বলা হয়ে ওঠে নি। অবিশ্যি বিয়ের কনে দেখেছি সেই এক দিন—কিন্তু বৌ তুমি বাপু ভাল পেয়েছ। তুমিই জিতেছ। আমি তো বলব অমন বৌ পাওয়া তোমার ঠিক হয় নি। তা তুমি এখনও এমন করে এর দোরে ওর দোরে আড্ডা দিয়ে বেড়াও কেন?'

'তবে কি দিনরাত বোয়ের কাছে ধন্না দিয়ে বসে থাকব?' বিরক্ত হয়ে ওঠে হেম।

'তা বলি নি, তুমি রাগ করো না। ঘরবাসী তুমি ঠিক হও নি। অনেক দেখলুম, মানুষের মুখ দেখলে বুঝতে পারি। এখনও বাউণ্ডুলে আছ। আর কেন? ঘরে লক্ষ্মী এসেছেন, ঘরবাসী হও গে। যেদিন দেখব তাঁর তৃপ্তি তোমার মুখে ফুটেছে—সেদিন বুঝব তুমি যথার্থ ঘরবাসী হয়েছ। সেদিন দু দিন দু রাত আড্ডা দিলেও দোষ হবে না।'

হেম এই প্রসঙ্গটাতেই কেমন অস্বস্তি বোধ করে। দু-একটা অন্য কথা পাড়বার চেষ্টা করে কিন্তু আর যেন আলাপটা ঠিক জমে না। শেষে সে সেখান থেকেও উঠে পড়ে।

'ও কি—এরই মধ্যে চললে কোথায়?'

'ঘরে। ঘরবাসী হতে!··তুমিই তো উপদেশ দিলে!' ঈষৎ তিক্ততা ফুটে ওঠে ওর গলায়।

খপ করে ওর কনুইটা ধরে ফেলে নলিনী, 'অমনি বাবুর রাগ হয়ে গেল

বুঝি ? আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, আর কিছু বলব না, আমার ঘাট হয়েছে, বসে যাও একটু।'

হেম এবার হেসে ফেলে। বলে, 'তা নয় বাবার অসুখ যাচ্ছে তো খুব— তিন শনি-রবিবার তো বেরোতেই পারি নি। সকাল করে ফিরতেই হবে। আর এক দিন তখন আসব।'

'অসুখের নাম করলে কী বলব আর! মিথ্যে বলে থাক তো তোমার ধম্ম জানে। এসো তা হলে, দুগ্গা দুগ্গা!'

তবু তখনই ঠিক বাড়ির পথ ধরতে পারে না হেম। তখনও বেলা রয়েছে বেশ। শীতের সূর্যও পাটে বসে নি। কী ভেবে সে পায়ে পায়ে তার পুরনো থিয়েটারের আড্ডাতেই গিয়ে ওঠে।

সেদিন শনিবার, সকাল করেই থিয়েটার আরম্ভ হবে। গেটকীপাররা এসে গেছে সকলেই। আর থিয়েটার না থাকলেও এসে এখানেই জড়ো হয় ওরা। হেমকে দেখে সকলে হৈ হৈ করে উঠল। দক্ষিণাদার মুখে ওরা বিয়ের খবর পেয়েছে। কানাই বললে, 'কী বাবা—সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার শিব্‌স্ ফাদার ডোন্‌ট্ নো! ওসব চলবে না—এক দিন ভাল করে খাওয়াও! আর এক দিন কেন, আজই হোটেলে বলে দাও—ঢাকাই পরোটা আর কোর্মা!'

নন্দ বাধা দিয়ে বললে, 'দূর! এ হোটেলে তো খাচ্ছিই। একঘেয়ে খাওয়া। টাকা ছাড়ুক, এক দিন কোন চীনে হোটেলে খাওয়া যাক। ওদের ওখানে ভাত-ভাজা নাকি খুব ভাল করে—কুচো চিংড়ি ফোড়ন দিয়ে!'

'হ্যাস্!' কানাই উড়িয়ে দেয়, 'পয়সা খরচ করে আবার কেউ কুচো চিংড়ির ফোড়ন খেতে যায়! ও তো দু বেলাই খাচ্ছি। আর কি জোটে বল—চার পয়সায় কুচো চিংড়ি এই তো বাস্তু দেবতা। আর ভাত-ভাজা— সেও হামেশা—ভাত বেশী হলেই বৌদি ঐ কম্ম করে—তেলের ওপর প্যাঁজ কুচিয়ে দিয়ে ভেজে নেয়। বলে খাও, চীনেবাজারী পোলাও!···না না আমার এই ঢাকাই পরোটাই ভাল!'

'হবে হবে। এক দিন হবে।' বলে কাটিয়ে দেয় হেম, 'বাবার খুব অসুখ যাচ্ছে—এখন-তখন অবস্থা!'

বলেই ভুলটা বুঝতে পারে হেম। কানাই সঙ্গে সঙ্গে কুট্ করে বলে

ওঠে, 'বাবার এখন-তখন অবস্থা আর তুমি থ্যাটারে বসে আড্ডা দিচ্ছ। ভ্যালা মোর বাপ্‌রে!'

'না এই এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম তাই!'

বলেই সরে পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু সরে পড়া হয় না। দক্ষিণাদার সামনে পড়ে যায়। দক্ষিণাদা বলেন, 'কী রে—তোর বাবার অসুখ বলছিলি না? আমার কানে গেছে ঠিক—বাপের অসুখ আর তুমি এখানে শনিবার বজায় দিতে এসেছ?'

'না—না—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম—তাই একটু খবর নিতে—'

'হাওড়া থেকে হাওড়ায় ট্রেন ধরবে—এদিক দিয়েই বা যাও কেন?··· ত্মাখ্‌ আমি তোর সব খবর রাখি, কেন যে একটা মায়া পড়ে গেছে তা জানি না, তুই রাগ করিস তবু না বলে পারি না।···তুই এখনও রাত নটা-দশটা অবধি টো-টো করে পথে পথে ঘুরিস প্রত্যহ—বহু লোক তোকে দেখতে পেয়ে আমাকে এসে বলেছে। নলিনীর কাছেও মাঝে মাঝে যাস শুনেছি। ওর ভাড়াটে রেণু আমাদের এখানে বেরোচ্ছে তো—সে-ই এসে বলে। কেন রে? বৌ মনে ধরে নি? দিব্যি খাসা বৌ তো দেখে এলুম।· ওরে অমন করিস নি —ছেলেবেলায় যা ছোঁক ছোঁক করেছিস করেছিস—এ বয়সে আর ঘুরে বেড়াস নি। আমার কথা শোন, ঠেকে শেখা আমার। ঘরে মন বসা। এখনও যদি ঘরে না আটকে যাস তো চিরকাল আমার মত এই রকম ভেসে ভেসে বেড়াবি—জোয়ারের গুয়ের মত কোন ঘাটে ঠাঁই হবে না। যতই হোক ঘরের বৌ—দোষ হোক ঘাট হোক সে ফেলতে পারবে না।'

কী বিপদ! আজ কার মুখে দেখে কলকাতায় পা দিয়েছিল কে জানে!

তার ভুরু কোঁচকানো দেখেই দক্ষিণাদা মনের ভাবটা বুঝতে পারেন, 'কী, পছন্দ হল না তো কথাটা! রাগ হয়ে গেল তো!'

'আপনার কথায় কবে রাগ করি দক্ষিণাদা, আপনি যে আমার ভালর জন্যেই বলেন তা এখন অন্তত খুব বুঝি।· মনটাই ভাল নেই। চলি এখন!'

তবু ঠিক তখনই হাওড়ায় গেল না। পোস্তা ঘুরে পাঁচ সের আলু কিনে এটা ওটা সওদা করে হাওড়ার মোড়ে কপি দর করে ছটার ট্রেনে যখন সে বাড়ি ফিরল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বেশ নিশ্চিন্ত মনেই ফিরছিল—হঠাৎ ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায় পড়েই মনে হল, বাইরের

ঘরে যেন বড় বেশী লোক। হ্যারিকেনের স্তিমিত আলো—তবু বাইরে এত জমাট বাঁধা অন্ধকার যে তাইতেই অত দূর থেকেও অনেকগুলো মাথা নড়বার আভাস পাওয়া গেল।

উদ্বিগ্ন হয়েই জোরে জোরে পা চালাল সে। বাড়িতে ঢুকে বাগানটা পেরোতে পেরোতেই নজরে পড়ল পুকুরের ধারে কে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু চমকেই উঠত হয়তো—অমন সাদামত কী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে দেখে—কিন্তু সেই মানুষটাই ওকে চিনতে পেরে প্রায় ছুটে কাছে এল, 'ওগো, আজকেই কি এত দেরি করতে হয়! ভাখ গে, বাবার বোধ হয় শেষ অবস্থা—'

কনক। এর আগে কোন দিন 'তুমি' বলে নি সে। প্রথম দিন আপনি বলেছিল, তার পর আর বিশেষ প্রয়োজনই হয় নি, সামান্য যা কথা হয়েছে তাতে তুমি-আপনি এড়িয়ে গেছে। আজকের এই উদ্বেগের মধ্যেও সেটা লক্ষ্য করে হেম।

আলুর পুঁটলিটা ছুঁড়ে রকে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুকল সে। এসেছে অনেকে। প্রমীলার কোলে কচি ছেলে সে আসতে পারে নি—মহা এসেছে, তরলা এসেছে, তিন ভাই-ই এসেছে অভয়পদরা। অম্বিকাপদ মাথার কাছে বসে চেঁচিয়ে গীতা পাঠ করছে। অর্থাৎ শেষ অবস্থারই আয়োজন যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হেম একটু বিহ্বল হয়েই চাইল অভয়পদর দিকে।

'হঠাৎ কী হল এমন—। এই তো আমি দেখে গেলুম—কৈ তেমন তো কিছু—'

অভয়পদ বাইরে গিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলল। এরা কেউই টের পায় নি। আজকাল প্রায়ই ঝিমিয়ে পড়ে থাকত, সেই রকমই ছিল। আজ-কাল ঘুমোলে নরেনের একটু নাকডাকার মত আওয়াজ হত। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে আওয়াজটা হচ্ছিল, সেটাকেও ওরা নাকডাকার শব্দই ভেবেছিল। শ্যামা অনেক মৃত্যু দেখেছে কিন্তু সে-ও ধরতে পারে নি। অভয়পদ এসেছে চারটে নাগাদ, সে ঘরে ঢুকেই বুঝেছে শ্বাসের শব্দ এটা। ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে এনেছে। তিনিও বলে গেলেন যে তাই—আর খুব বেশী বিলম্ব নেই। তখন যতটা সম্ভব সকলকে খবর দিয়েছে। শুধু কান্তিকে খবর দেওয়া যায় নি। আর তরু পোয়াতি—তাঁর দিদিশাশুড়ী পাঠায় নি।

পাথর হয়ে গিছল হেম।

শোক ? ঠিক শোক নয় হয়তো—কেমন একটা বিমূঢ়তা। হাত-পায়ের জোরটাই কেমন যেন কমে গেছে।

ভেতর থেকে অম্বিকাপদ ডেকে বলে, 'হেম, এবার তোমার শেষ কাজটা কর, মুখে একটু জল দাও আর তারক-ব্রহ্ম নামটা—'

'হেম' শব্দটা কানে যেতে সহসা মৃত্যু-পথযাত্রী যেন একটু নড়ে ওঠে। ঠোঁটটা কাঁপে তার। একটু চেষ্টার পর চোখটাও খুলে যায়।

'আহা রে। ছেলেকে দেখবার জন্যেই প্রাণটা এতক্ষণ ছিল'—কে এক জন মহিলা বলে ওঠেন। সম্ভবত পাড়ার কেউ।

গলা জড়িয়ে গেছে। আওয়াজটাও নাকী হয়ে উঠেছে। নাকটা ভেঙে গেছে নীচের দিকটা—

'কে, হেম ? মানে আমাদের হেমচন্দর ? কৈ বাবা ? কোথায় ?'

হেম ছুটে গিয়ে মুখের কাছে উপুড় হয়ে বসে।

'কিছু বলবে আমায় ?'

'না, কী আর বলব। তুমি জ্ঞানবান ছেলে। সুপুত্তুর। মাগীকে দেখো—অবিশ্যি ও ভাঙবার মেয়ে নয়।... পথের ভিখিরী করেছিলুম—আবার কেমন বাড়িঘর করেছে দেখছ না। ও খুব শক্ত মেয়েমানুষ। তবে কঞ্জুষ হয়ে যাচ্ছে—হাড় কঞ্জুষ। বৌমাকে দেখো, আর মেয়েগুলোকে। আর বলাও হয়তো বৃথা, না বললেও দেখবে। বৌমা বড় লক্ষ্মী মেয়ে। কই দেখো। মাগী ওকে জ্বালাবে। আর ঐ খেঁদীটা।'

জড়িয়ে জড়িয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে আবার হঠাৎ চুপ করে যায়।

'তাউই মশাই, তাঁকে ডাকুন। ভগবানকে ভাবুন! হেম নাম কর।' অম্বিকা জোরে জোরে বলে।

হেম নাম করতে থাকে। পাশ থেকে অভয়পদও করে।

নরেন যেন একটু বিরক্ত হয়।

'আ মলো, কানের কাছে চেঁচায় দেখ না। একটু ঘুমোতেও দেয় না!'

চুপ করে যায় আবার।

এবার কণ্ঠশ্বাস শুরু হয়েছে, শুধু নালির কাছটা ধুক ধুক করছে।

আরও আধঘণ্টাখানেক এই ভাবে কাটল। হেম একটু জল দেবার চেষ্টা করল, সে জল পুরোটা গলায় গেল না—কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।